শারদীয়া ১৪২৯
পত্রিকা

শারদীয়া ১৪২৯

তিনটি উপন্যাস

কার মিলন চাও ২৮

বিপুল দাস

বিয়ের কিছু দিন পর বিতান-রাখির দাম্পত্যে ঘনিয়ে আসে অশান্তি। রাখির স্মৃতিপটে উঁকি দেয় যৌবনে পাওয়া পলাশের প্রেমপত্র। লতাকণ্ঠী সাধন হালদার নিজেকে নারী মনে করে। তার স্বপ্নের পুরুষ সুনীল দত্ত। সাধনকে দেখার পর ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে তথ্যচিত্র করতে চাইছে বর্ষা। নানা স্রোত এসে মিশেছে এই কাহিনির বাঁকে বাঁকে।

অনল অতল ১০৬

অভিজিৎ তরফদার

যুক্তিবাদী আত্মবিশ্বাসী অক্ষরের জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে এক জ্যোতিষীর একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে। শঙ্কা, পরিকল্পনা, পরিবার-চিন্তার আবর্তে ক্রমশ জটিলতর হতে থাকে তার অস্তিত্ব। পরিবর্তন আসে তার আচরণে, তবু কয়েকটি স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে সে এগনোর চেষ্টাও করে। এক সময় এক অভাবিত বাঁক নেয় তার দৈনন্দিন।

আবাহন ১৭০

কৌশিক পাল
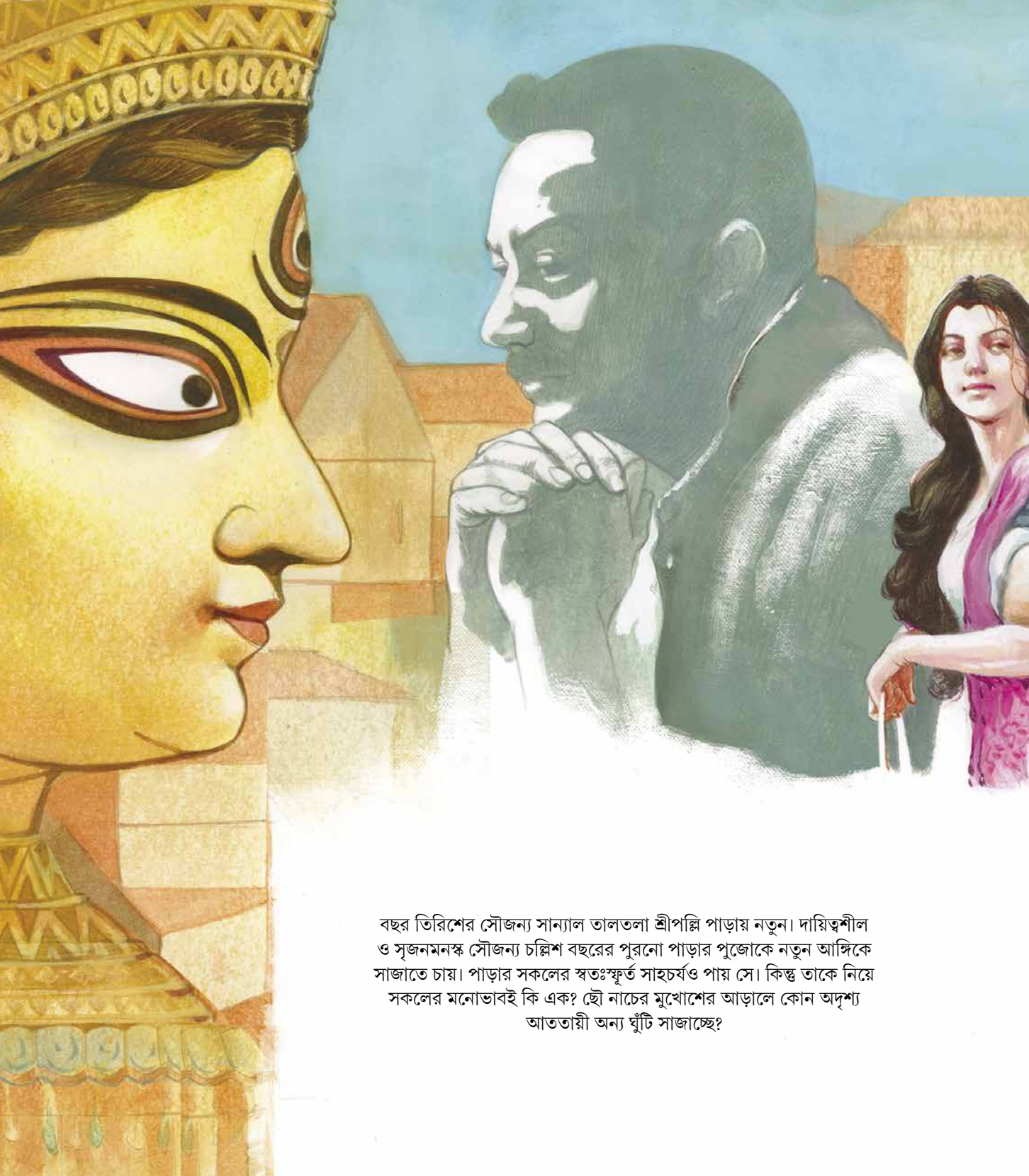
বছর তিরিশের সৌজন্য সান্যাল তালতলা শ্রীপল্লি পাড়ায় নতুন। দায়িত্বশীল ও সৃজনমনস্ক সৌজন্য চল্লিশ বছরের পুরনো পাড়ার পুজোকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে চায়। পাড়ার সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সাহচর্যও পায় সে। কিন্তু তাকে নিয়ে সকলের মনোভাবই কি এক? ছৌ নাচের মুখোশের আড়ালে কোন অদৃশ্য আততায়ী অন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছে?

রামায়ণ ১৬

মানুষ রামচন্দ্র

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের রামচন্দ্র দেবতা বা অবতার নন, সর্বশুভত্বের একমাত্রিক স্টিরিয়োটাইপও নন, তিনি এক জন রক্তমাংসের মানুষ। শৌর্যে বীর্যে তিনি যেমন মহাপরাক্রমী, অন্য দিকে তাঁর মধ্যে রয়েছে দুর্বলতার মুহূর্ত, মায়া-মমতা, বিচ্যুতি, ভ্রান্তিও। বৈপরীত্যের এই নিখুঁত সহাবস্থানেই নির্মিত রামের জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। লিখছেন **তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়**।

রাজনীতি ১ ২৩

রাজনীতির নবীন বিস্ময়

ঠিক স্বেচ্ছায় নয়, কিছুটা পরিস্থিতির দায়ে এক রঙিন জগৎ থেকে রাজনীতির ভুবনে এসেছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী **নবীন পট্টনায়ক**। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি বরাবরই নির্জন, নির্বান্ধব, অন্তর্মুখী। প্রাইম টাইম টেলিভিশন কিংবা সংবাদপত্রের হেডলাইনে আসতে তাঁর ঘোর অনীহা। তাঁর পোশাকের মতো ভাবমূর্তিতেও তিনি ‘মিস্টার ক্লিন’। তাঁকে নিয়ে লিখছেন **অগ্নি রায়**।

খাওয়াদাওয়া ৬০

কাফেক্ষেত্র কলিকাতা

কিছু মানুষ এখনও এ শহরেও আছেন, এক বারটি প্রিয় কাফেয় না-গেলে যাঁদের দিনটায় ফাঁক থেকে যায়। প্রিয় কাফে মানে স্বাচ্ছন্দ্যের উঠোন। ছিমছাম বিকেলে গোধূলির সুখযাপন। সে ভাবেই কলকাতায় তৈরি হচ্ছে নানা রঙের নানা রূপের কফিঠেক। সঙ্গে বহুবিধ মুখরোচক স্ন্যাক্সেরও ব্যবস্থা। রেস্তরাঁর চেয়ে কাফে-আড্ডাতেই ইদানীং অধিক স্বচ্ছন্দ বাঙালি। কফির কাপের ফেনায় যেন আস্ত একটা পৃথিবী আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে কলকাতা! খোঁজখবর নিলেন **ঋজু বসু**।

ফ্যাশন ১ ৬৮

পূজা পর্যায়ে...

শাড়ি হাতে নেওয়ার মুহূর্ত থেকেই সখ্য তৈরি হয় তার সঙ্গে। জরির পাড়ে, সুতোর বুনটে, মখমলি আঁচলের স্পর্শে তা ছুঁয়ে যায় সবার হৃদয়। বিশেষত পুজোর মরসুমে শাড়ি ও নারীর এই অন্তরঙ্গতা চিরকালীন। **সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের** শারদসাজের সঙ্গী **ঈপ্সিতা বসু**।

তীর্থ ৭৫

বিজয়ওয়াড়ার কনকদুর্গা

অন্ধ্রপ্রদেশের পার্বত্য পরিবেশে প্রবহমানা কৃষ্ণা নদী, সেখানেই বিজয়বাটিকার ইন্দ্রকিলা পর্বতের শীর্ষদেশে কনকদুর্গার অধিষ্ঠান। বিজয়বাটিকার বর্তমান নাম বিজয়ওয়াড়া। পুণ্যসলিলা কৃষ্ণায় অবগাহন করে দুর্গাবিগ্রহ দর্শন করেন তীর্থযাত্রীরা। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ার সময়ে দেবীর রোম এখানে পতিত হয়েছিল। **ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের** কলমে তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

সিনেমা ১ ৮০

‘পরম’আনন্দে

অতিমারি পর্বেও তিনি কলকাতা-মুম্বই উড়ানের নিয়মিত যাত্রী। গত দু’বছরে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ততম অভিনেতার নাম **পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়**। তবে শুধু অভিনয়ের গণ্ডিতে আটকে নেই তিনি। পরিচালনা-প্রযোজনা দু’ধরনের কাজেই সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর খারাপ সময়ের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে সাফল্যের রাস্তায় আসার কঠিন যাত্রার কথা শুনলেন **দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ**।

ভ্রমণ ১৮৫

অন্য কিন্নরের কথা
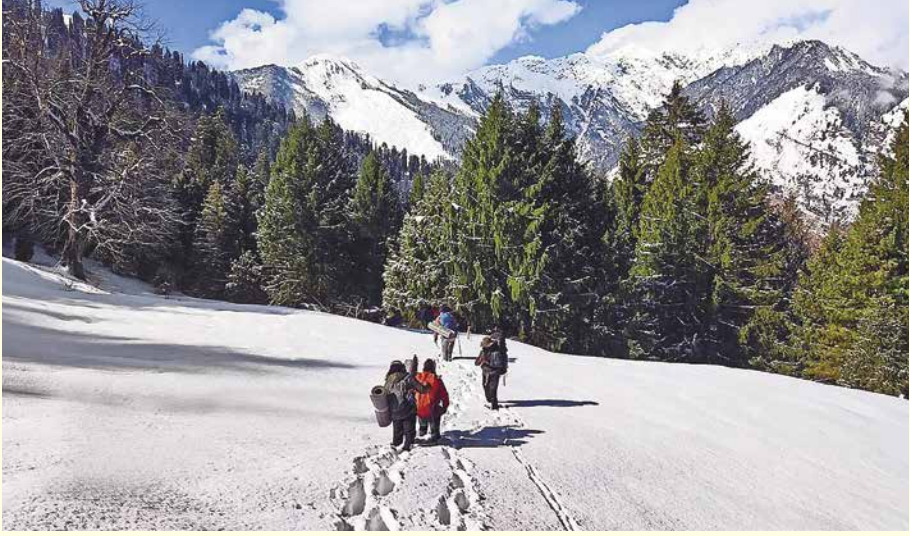
হিমাচল প্রদেশের কুলু ও মানালির মাঝে এক ছোট্ট জনপদ, রাইসন। এখান থেকে কিছুটা উপরে উঠলে কুফরি ভ্যালির পথ। চার পাশে আপেল, নাসপাতি, পিচ ও অন্যান্য ফলের বাগান। মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি। আর হিমালয়ের শ্বেতশুভ্র রুপোর মুকুটে সোনালি রোদের ঝিলিক। ঘুরে এলেন **সায়ন্তনী ভট্টাচার্য**।

ধর্ম ৯২

ভার্যাদের কৃষ্ণভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাগ্য

কৃষ্ণ নিজে জানাননি তাঁর ক'জন স্ত্রী। মহাভারত কয়েকটা নাম দিচ্ছে। আরও নাম মিলছে পুরাণগুলি থেকে। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি নামেই স্থির হচ্ছেন— রুক্মিণী। কিন্তু এত কালের প্রচলিত অষ্টভার্যা তত্ত্বের কী হবে তা হলে? যাঁকে নিয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সব কাব্যকাহিনি, যিনি বাঙালির নিভৃত প্রেমের দেবী— কী হবে সেই শ্রীরাধার? উত্তর খুঁজলেন **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**।

গান ১ ১০০

‘কেত্তন’ থেকে কীর্তন অথ অদিতি কথা

কীর্তনের মাধুর্য নতুন করে শহুরে শ্রোতাদের মরমে প্রবেশ করিয়েছেন তিনি। গানের রিয়্যালিটি শো-এ মিষ্টি মুখ এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কন্যেকে দেখার ও শোনার জন্যেও বেড়েছে অনুষ্ঠানের টিআরপি। গানে বাংলার মানুষের মন জয় করে **অদিতি মুনশি,** এসেছেন রাজনীতিতে। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় **পারমিতা সাহা**।

রাজনীতি ২ ১৪৭

মুকুট পড়িল পদতলে...

তেল-জলে পুষ্ট এক স্ফীতোদর বঙ্গ-নেতা— এই ছিল তাঁর পরিচিত অবয়ব। তাঁর কোটি কোটি টাকা, বিপুল ভূ-সম্পত্তি এবং মহিলামণ্ডলী বাংলার রাজনীতি ও সমাজের চেহারাটাই বুঝি বদলে দিল। **পার্থ চট্টোপাধ্যায়** ছিলেন দলের নীতি-নিয়ামক, তাঁর মুকুটই আজ দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পাঁকে নিমজ্জিত। লিখছেন **দেবাশিস ভট্টাচার্য**।

ফ্যাশন ২ ১৫৩

সুন্দর এসো হে...
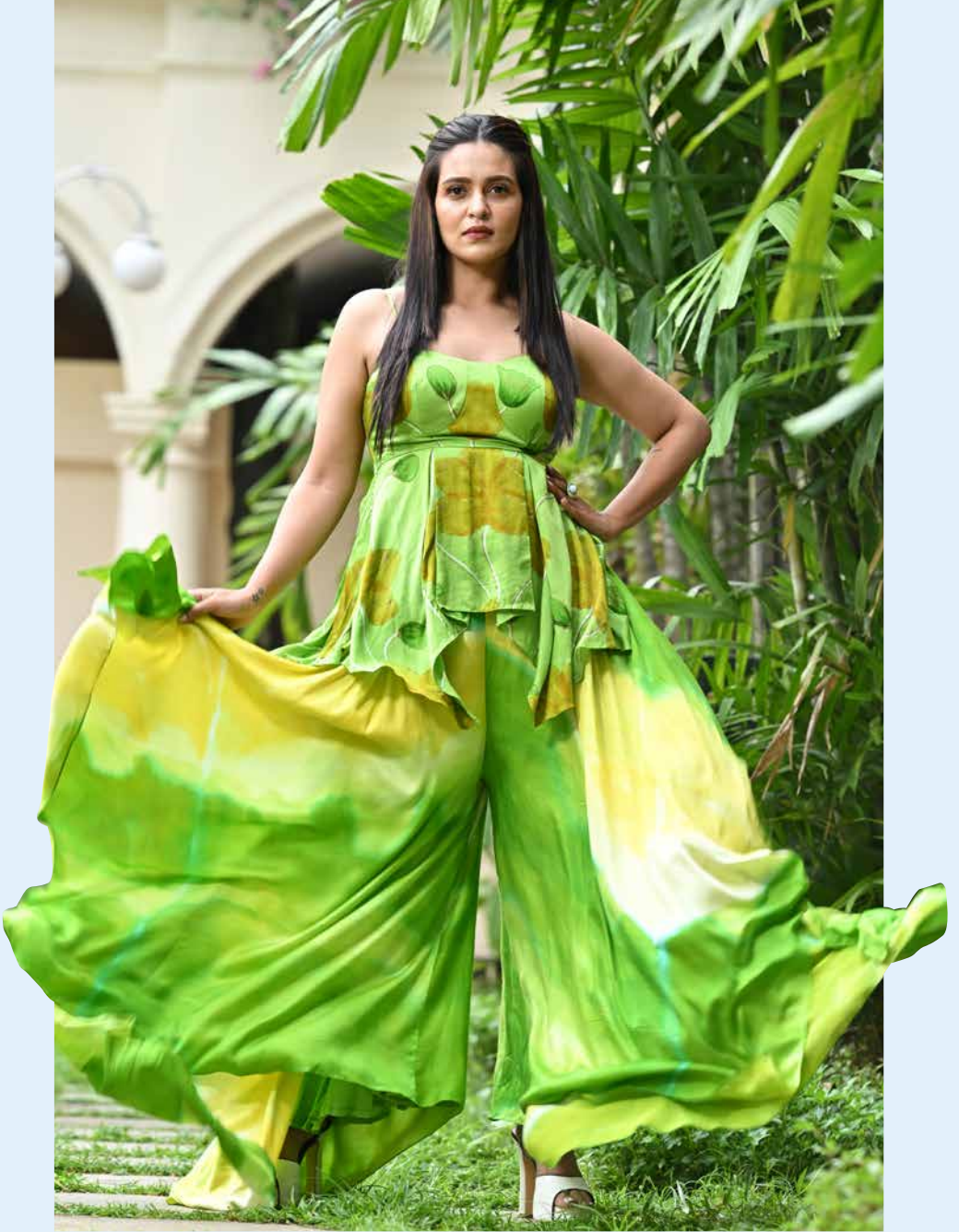
উৎসব উচ্ছ্বাসের সময়ে ইচ্ছে হয় অন্য রকম হতেও। রোজকার আটপৌরে ছেড়ে বেছে নিতে মন চায় পাশ্চাত্যের ধাঁচধরন, পোশাকি সৌন্দর্যের আবরণ। বঙ্গনারীর চেনা চেহারা যে সব বহিরঙ্গেই সমান স্বচ্ছন্দ, তা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিতে মন চায়! আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষে ইন্দো-পশ্চিমের পোশাকি পরশ শরীরে বুলিয়ে নিলেন অভিনেত্রী **প্রিয়াঙ্কা সরকার**।

চিকিৎসা **১৬০**

অবহেলা নয় গ্যাস্ট্রাইটিসকে

পেটের প্রদাহজনিত রোগ গ্যাস্ট্রাইটিস। গ্যাস্ট্রাইটিস-এর মূল লক্ষণ পেট জ্বালা এবং পেটের উপর দিকে, দুই পাঁজরের খাঁজের নীচে ব্যথা। পেটে হজমের প্রক্রিয়া ঠিকমতো না হলে পেট ভার, সঙ্গে বমি-বমি ভাবও হয়। জীবনযাপন বদলে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এই রোগকে। রোগের কী-কী উপসর্গ দেখলে সচেতন হতে হবে, সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করলেন **সৌরজিৎ দাস**।

ভ্রমণ ২ **১৬৪**

এক চিলতে আমেরিকা

আমেরিকা মানেই গগনচুম্বী বহুতল খচিত দুনিয়া নয়। সে দুনিয়া আশ্রয়হীন মায়ের সন্তানকে নিয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকার, পড়ন্ত বিকেলে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের নদীর ধারে বসে অতীত রোমন্থনেরও। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পিটসবার্গ, ডেনভার পেরিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস ঘুরে সেই অদেখা দুনিয়া দেখে এলেন **কুন্তক চট্টোপাধ্যায়**।

সিনেমা ২ **২১৪**

সেরার সিঁড়িতে কিয়ারা

অভিনয়, লাস্য, সৌন্দর্য ছাড়াও একটি এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে **কিয়ারা আডবাণী**র মধ্যে। ফলে আধুনিক ড্রিমগার্ল হয়ে উঠতে সময় লাগেনি তাঁর। ইতিমধ্যেই তাঁর ঝুলিতে বিগ বাজেটের একাধিক ছবি। নবাগতা হয়েও অক্ষয়কুমার, শাহিদ কপূরদের বিপরীতে উজ্জ্বল তাঁর উপস্থিতি। তাঁকে নিয়ে লিখছেন **সায়নী ঘটক**।

খেলা ১ **২২০**

হাসিমুখের এক ঘাতক

সেট হয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসা কিংবা অদ্ভুত সব শট খেলা— সমালোচনা পিছু ছাড়েনি তাঁর। প্রশ্ন উঠেছে অধিনায়কত্ব নিয়েও। তিনি শুধু হেসেছেন। **ঋষভ পন্থ** জানেন, রাস্তা যত কঠিন হবে, ততটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু মুখের হাসি যেন মুছে না যায়। লিখেছেন **কৌশিক দাশ**।

গান ২ ২২৫

নীতি, মেরি জান...

তাঁর কণ্ঠে মেয়েবেলার ‘ইশকওয়ালা লাভ’ থেকে যৌবনের ‘জিয়া রে’ হয়ে ‘মেরি জান’-এর কোমল আকুতি পৌঁছে গিয়েছে সমস্ত শ্রোতার হৃদয়ে। এই প্রজন্মের প্রায় সব নায়িকার লিপে গান গেয়েছেন **নীতি মোহন**। তাঁর ঘরে-বাইরের গল্প তিনি শোনালেন **মধুমন্তী পৈত চৌধুরীকে**।

আসন ২৩০

‘যোগ’ফল

যোগবিদ্যার উৎস অতি প্রাচীন, এর শাখাপ্রশাখাও অনেক। এর উল্লেখ আছে বেদ, উপনিষদেও। উপযুক্ত পথে আয়ত্ত করা যোগাভ্যাসই মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনের দিশা দেখায়। লিখছেন **নবনীতা দত্ত**।

খেলা ২ ২৩৮

প্রজ্ঞায় মাত

শতরঞ্জের ময়দানে ভারতের নতুন চমক **প্রজ্ঞানন্দ**। মাত্র ১৬ বছর বয়সি ছেলেটি সকালে স্কুল করে, আর রাতে দাবার বোর্ডে ঘটায় ইন্দ্রপতন। সে জানে যে, সে পৃথিবীতে জিততেই এসেছে। তাঁকে নিয়ে লিখছেন **সুমিত ঘোষ**।

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

সম্পাদক: ঈশানী দত্ত রায়

মানুষ রামচন্দ্র

বাল্মীকি রামায়ণের রামচন্দ্র কোনও দেবতা বা অবতার নন, তিনি পূর্ণ মাত্রায় একজন রক্তমাংসের মানুষ। শৌর্যে বীর্যে মহত্ত্বে তিনি যেমন মর্তে অতুল্য, অন্য দিকে তাঁর মধ্যে রয়েছে দুর্বলতার মুহূর্ত, স্খলন, পরাজয়ও। বৈপরীত্যের এই সহাবস্থান না থাকলে কিছুতেই নির্মাণ করা যেত না রামের জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। লিখছেন **তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

Know then thyself, presume not god to scan,
The proper study of mankind is man (Alexander Pope, Epistle II of Pope's Essay on Man)

রামায়ণ-এর একেবারে শুরুতেই আমরা দেখি, মুখোমুখি বসেছেন দু'জন। একজন মহর্ষি বাল্মীকি, অন্যজন বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ। মহাকবি বাল্মীকি (তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের বৈয়াকরণ বাল্মীকি নন, নন মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বের বাল্মীকিও, ইনি প্রচেতার পুত্র ভৃগুবংশজাত ভার্গব বাল্মীকি-ই সম্ভবত) জিজ্ঞাসা করছেন মহামুনি নারদকে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে এমন কি কোনও পুরুষ আছেন যিনি যথার্থই গুণবান? গুণবান অর্থে যিনি সর্বগুণসম্পন্ন, অমিত পরাক্রমী, ধর্মপরায়ণ, লোক ব্যবহারে পারদর্শী, সচ্চরিত্র, দৃঢ়ব্রত, সকল প্রাণীর হিতকারী, বিদ্যাপারঙ্গম, দক্ষ, প্রিয়দর্শন, ধীর, জিতক্রোধ অথচ যিনি ক্রুদ্ধ হলে দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে প্রকম্পিত হন?

কবির এই প্রশ্নের উত্তরে ত্রিলোকজ্ঞ নারদ যা বললেন তা মোটের উপর এমনই দাঁড়ায় যে, কোনও একজন ব্যক্তির মধ্যে এত সব উত্তম বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান দুর্লভ, কারণ বিধাতা একজনের মধ্যে এত গুণের সমন্বয়ের বিরোধী। তবু তিনি যদি এই মর্ত্যে এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি হচ্ছেন ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাম নামক এক নৃপতি। এমন সত্যনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ প্রজাবৎসল কৃতবিদ্য সর্বশুভ সর্বতোভদ্র মানুষ সাম্প্রতিক কালে আর দ্বিতীয়টি নেই। রামের আকার-আকৃতি, বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার বিবরণ দিয়ে তিনি বললেন যে, রাম "সদ্বক্তা, বিনয়ী, নীতিপরায়ণ, জ্ঞানী, বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষাকর্তা, শত্রুনাশক, ভক্তের আশ্রয়দাতা, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়... তিনি সাগরের মতো গম্ভীর, পর্বতের মতো ধৈর্যশীল, বিষ্ণুর মতো বলবান ও বীর্যবান, চাঁদের মতো সুন্দর, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, বিধ্বংসী আগুনের মতো তাঁর ক্রোধ।" এই রামকে অয়ন বা প্রতিপাদ্য করে রচিত যে কাব্য, তা-ই রামায়ণ।

রামায়ণ যখন আদি মহাকাব্য এবং তার এই প্রধান চরিত্রকে যেহেতু আঁকা হয়েছে নরচন্দ্রমা বা মর্যাদাপুরুষোত্তম (পুরুষদের মধ্যে যিনি উত্তম তার সর্বোচ্চ সীমা) রূপে, তখন এমন সম্ভাবনা প্রবল হতেই পারত যে, আদিকবি রামচন্দ্রকে নির্মাণ করে ফেললেন একজন একমাত্রিক চরিত্র হিসেবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই রকম সুপ্রাচীন যুগের এক কাব্যে, যখন সমাজ ও জীবন এমন জটিল হয়নি, মানব আদর্শের পরাকাষ্ঠা রাম চরিত্রের সৃজনে বাল্মীকি ভুলেও অবিমিশ্র ভালত্বের কোনও স্টিরিয়োটাইপ গড়ে তুললেন না। অভূতপূর্ব দক্ষতায় তৈরি করলেন এক বহুমাত্রিক চরিত্র, সাহিত্যের ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি 'রাউন্ড ক্যারেক্টার'। ভাল-মন্দ, মহত্ত্ব-স্খলন, প্রবল বীরত্ব-সাময়িক দুর্বলতা, অপরিমেয় দৃঢ়তা-মানসিক ও নৈতিক দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে সৃষ্ট এমন এক রক্তমাংসের চরিত্র, যার শরীরে পিন ফোটালে রক্ত ঝরে।
যে কেন্দ্রীয় চরিত্রে এত ইতিবাচক গুণের সমাবেশ, যে কোনও অনুৎকৃষ্ট গৌণ কম-প্রতিভাধর স্থুলরুচির কবির হাতে পড়লে তিনি হয়তো তাকে ছকে বাঁধা, এক রঙে আঁকা, আলোছায়াহীন, জীবনের অনিবার্য উত্তাপহীন, আপাদমস্তক মিছরির ডেলা দিয়ে তৈরি এক দেবমূর্তি বানিয়ে ছাড়তেন। কিন্তু বাল্মীকি মহাকবি, তাই তিনি রামকে দেবতা না গড়ে একজন মানুষ গড়েছেন আর তাঁর সেই মানুষ গড়ার কাজে সর্বপ্রথমে যে লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে, তা তাঁর এক পক্ষপাতহীন বাস্তববোধ। পৃথিবীর সর্বকালের সেরাদের মধ্যে একজন রূপদক্ষ হিসাবে তিনি অভ্রান্ত। জানেন, কোনও চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠবে না আর সাহিত্যের রসোত্তীর্ণতা যেহেতু সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাই সেই সত্যের সার্থক উপস্থাপনা ছাড়া তা কিছুতেই কালজয়ী হবে না।
বুদ্ধদেব বসুর কথায়, সত্যের এই উপস্থাপনাই হল মহাকবির বাস্তবতা, "সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্মম যে, তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়্যালিজ়মের চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তার নির্বিকার দর্পণ। মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই, তাতে গলা কখনও কাঁপে না, গলা কখনও চড়ে না, বড় ঘটনা আর ছোট ঘটনায় ভেদ নেই, সমস্তই সমান। আগাগোড়াই সমতল এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্ম রূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি।"
রামায়ণ বা মহাভারতকে আমরা এখানে মহাকাব্য বললেও সেই মহাকাব্যকে পাশ্চাত্যের 'এপিক'-এর ধারণার সমার্থক ভাবলে ভুল হবে, বরং আমাদের ঐতিহ্যগত ভাবে একে সংস্কৃত শব্দে 'ইতিহাসা' বলাই শ্রেয়। এই ইতিহাসাকে আবার পশ্চিমি ধারণা 'হিস্টোরি'-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। এখানে 'ইতিহাসা'-কে বুৎপত্তিগত ভাবে ভাঙলে আমরা যদি পাই 'ইতি-হ-আসা' অর্থাৎ সত্যি এমনই ঘটেছিল, তবুও একটা মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়। রামায়ণ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হয়েও থাকে বা তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নিই অতীতে রাম নামে সত্যিই এক রাজা ছিলেন, তবুও তো এ কথা অস্বীকার করার কোনও রাস্তা নেই, এখানে সেই সব বৃত্তান্তকে কবির হাতে গাঁথা শব্দের পথ দিয়ে ধরা দিতে হয়েছে কাব্যের শরীরে। সেই চরিত্র বা ঘটনাক্রমকে উঠে আসতে হয়েছে জীবনের ভেরিসিমিলিটিউড (verisimilitude) হিসেবে। সাহিত্য নামক রূপান্তরের পথ ধরে হয়ে উঠতে হয়েছে জীবনের মতোই স্পন্দমান, বহুমাত্রিক, স্পর্শগ্রাহ্য অনুভবযোগ্য ও প্রতীয়মান। রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলেছেন, রামায়ণ কোনও দেবতার অবতারলীলা নয়, এ মানুষের কাব্য, "কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র

রাম চরিত্রের সৃজনে বাল্মীকি অবিমিশ্র ভালত্বের স্টিরিয়োটাইপ গড়েননি। দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করেছেন এক বহুমাত্রিক চরিত্র।

বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত— সুতরাং তাহাতে কাব্যাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।" বাল্মীকির সাহিত্যিক রূপান্তরে এ ক্ষেত্রে তাই অবতারোচিত দূরত্ব ও ত্রুটিমুক্ততায় নয়, রাম কতটা মানুষোচিত বিন্যাস ও নৈকট্যে নিয়ে পাঠকের সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠতে পেরেছেন, সেটাই আমাদের আলোচনার অভিকেন্দ্র হবে। মনুষ্য চরিত্রের প্রাথমিকতম বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই সে ভুল করে (to err is human), তার সঙ্কট আছে, সংশয় আছে, অসহায়ত্ব আছে, দুঃখ বিপদ আবেগ অভিমান দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে সে কাঁদে, রক্তাক্ত হয়। জীবনযাপনের বিচিত্র খাতে অনন্যসাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অতিসাধারণ মানুষ যে সব ভুলচুকের শিকার হতে পারে, রামচন্দ্রকেও আমরা দেখি সে রকম নানা বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে যেতে।
অযোধ্যাকাণ্ডের শুরুতেই যখন রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে পুষ্যা নক্ষত্রযোগের এক নির্দিষ্ট দিনে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করতে চলেছেন, তখন রামকে আমরা যথেষ্টই হৃষ্টচিত্ত দেখি। তাঁর আচার-আচরণে কোনও বিষয়-ঔদাসীন্য, যোগীতুল্য নির্লিপ্তি ধরা পড়ে না। বরং তাঁকে মনে হয় 'আনন্দের এক পুত্তলিকার ন্যায়', তাঁকে দেখা যায় আর দশটা স্বাভাবিক নবযুবকের মতোই উচ্ছল, উৎসুক, উত্তেজিত। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের আগে পিতা দশরথের কক্ষে প্রণাম করতে গিয়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কৈকেয়ীর মুখে তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁকে পিতৃসত্য পালনে বনে যেতে

বনে যাওয়ার আগে সীতার সঙ্গে দেখা করে রাম যা বলেন, তা আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উপাদানকেও হার মানায়

হবে এবং তাঁর বদলে ভরত বসবেন অযোধ্যার সিংহাসনে, তখন এহেন 'মৃত্যুতুল্য কষ্টদায়ক ও অপ্রিয় বচন' শুনেও তিনি ব্যথিত হলেন না। যথোচিত আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আমি মহারাজের সত্যপালনের নিমিত্ত জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনে যাইতেছি। কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। আমি নিজের প্রীতির নিমিত্তই আমার ভাই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, এমনকি সীতাকেও দান করতে পারি।'' (সীতাকে দান করার প্রসঙ্গটি জটিল, তাই পরে বিশদে আলোচনার জন্য রাখছি)। কৈকেয়ী রামকে যত শীঘ্র সম্ভব বনবাসের পথে যাত্রা করতে তাড়া দিলে উন্নতশির দাশরথি বললেন, ''দেবি, আমি স্বার্থপর নহি, আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন।'' বনবাসে যাওয়ার আগের রামের আচরণ ঋষিতুল্যই বটে। কিন্তু তা মোটেও প্রাসাদ-অন্দরমহলের রাজনীতির কাণ্ডজ্ঞানহীন ও বাস্তববোধশূন্য নয়। বনে যাওয়ার আগে সীতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি তাঁকে যা বলেন, তা যে কোনও আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উপাদানকেও হার মানায়। প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে তিনি বলছেন, ''আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিগণ অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না।'' রামের রাজ্যাভিষেক পণ্ড করে ও তাঁকে অধিকারচ্যুত করে বনে পাঠানোর কারণ হয়ে ওঠায় লক্ষ্মণ ভয়ানক রূঢ়তার সঙ্গে নিন্দাসূচক বাক্য কৈকেয়ীর প্রতি উচ্চারণ শুরু করলে, রাম তাঁকে বাক্‌সংযমের উপদেশ দেন। লক্ষ্মণ যখন রামের প্রতি এমন প্রকাণ্ড অন্যায়ের জন্য নিজ পিতা দশরথের কৈকেয়ীর প্রতি কামাসক্তিকে দায়ী করে তাঁকে হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হন, তখন রাম বহু অনুনয়ে সুমিত্রানন্দনের ক্রোধ প্রশমন করতে পারলেও তাঁদের বনবাসের প্রথম রাতে আমরা সেই পরম স্থিরপ্রজ্ঞ রামের মনোভূমির যে ছবি ফুটে উঠতে দেখি, তা তাঁর আপাত ভাবমূর্তির একেবারেই পরিপন্থী। অরণ্যে সন্ধ্যা নামার পরে বিশাল এক বৃক্ষমূলে রাম তৃণশয্যায় শুয়ে সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে বলে ওঠেন, ''আজ হইতে প্রতি রাত্রিতেই আমাদিগকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। আজ মহারাজ দশরথের দুঃখের ও কৈকেয়ীর আনন্দের অন্ত নাই। ভরতকে উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যলাভের নিমিত্ত কৈকেয়ী মহারাজের প্রাণহানি করেন কিনা— আশঙ্কা করিতেছি। মহারাজ বৃদ্ধ ও আমাদের বিরহে শোকাকুল। তিনি এখন অজিতেন্দ্রিয় ও কৈকেয়ীর বশীভূত। ...তাঁহার এই দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, সংসারে অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল। কোনও মূর্খ ব্যক্তিও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আমার ন্যায় আজ্ঞাবহ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কৈকেয়ীপুত্র ভরত পত্নীর সহিত আনন্দিত হইবেন। পিতা দশরথ পরলোক গমন করিলে আমি অরণ্যবাসী হওয়ায় ভরত একাকী রাজ্যসুখ করিবেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত কামাসক্ত, মহারাজ দশরথের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। ... ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ, তুমি আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় যাত্রা কর। আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। তুমি অনাথা কৌশল্যাদেবীকে রক্ষা করিবে। পাপচিন্তা কৈকেয়ী তোমার ও আমার জননীকে বিষও দিতে পারেন। আমার জননীর নিতান্তই দুর্ভাগ্য। কোনও মহিলা যেন আমার ন্যায় দুঃখপ্রদ পুত্রের জননী না হন।'' এমন মর্মভেদী বিলাপদীর্ণ ও আত্মকরুণায় ভরপুর রামকে আমরা শুধু এখানেই নয়, রামায়ণের একাধিক জায়গাতেই পাই। যে রামকে বাল্মীকি সিংহের মতো শোভন গতি, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষস্থলের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, বীরত্বে ইন্দ্রের চেয়েও দুর্জয়, শত্রুর কাছে যমের মতো ভয়াবহ রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁকেই আবার তিনি বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেবতাসদৃশ দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ, অপরাজেয়তায় পরিবেশন করে তাঁর মানবত্ব হরণ করেননি। দণ্ডকারণ্যে ভীষণাকৃতি রাক্ষস বিরাধ সীতাকে বলপূর্বক আকস্মিক ভাবে কোলে তুলে নিলে রামকে

কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্লান, আশঙ্কিত ও সন্দিহান দেখায়। ওই অরণ্যবাসকালেই রাক্ষসাধ্যক্ষ খরের সঙ্গে যুদ্ধে আক্রমণোদ্যত খর রামের খুব কাছে চলে এলে, রামকে বাণক্ষেপণের জন্য তিনপদ পিছোতে দেখা যায়। পিঠ না দেখালেও এই দুই-তিন পা পিছিয়ে প্রতিআক্রমণ শানানোর জন্য বাল্মীকি-পরবর্তী মহাকবি ভবভূতি তাঁর ‘উত্তররামচরিত’-এ রামপুত্র লবের মুখ দিয়ে তাঁর সমালোচনা করতে ছাড়েননি। দু’বার রামকে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলেও দৈববলে রক্ষা পেতে দেখা যায়। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাক্ষসরাজকে কিছুতেই বিনষ্ট করতে না পেরে, বাল্মীকির রামচন্দ্রকে কিছুক্ষণের জন্য চিত্রপটের মতো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

উত্তরকালের টীকাকারদের ব্যাখ্যায়, কবি তুলসীদাস বা বাঙালি কৃত্তিবাসের ভক্তিরসাশ্রিত রামায়ণে রামের এই জাতীয় দুর্বলতার মুহূর্তগুলিকে প্রভুর লীলা হিসাবে বিবৃত হলেও, বাল্মীকির মতো উচ্চকোটির স্রষ্টার কাছে এই জাতীয় প্রলেপনের প্রয়াস নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাঁর ধ্রুপদী নান্দনিক বোধ এ ব্যাপারে সম্যক সচেতন যে, মহাকাব্যের নায়ক বা হিরো যা-ই বলা যাক, তাঁর ক্ষণিকের অনুজ্জ্বলতা, দুর্বলতা বা মুহূর্তগুলোক অনুপুঙ্খ পরিবেশনা ছাড়া তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্ব কিছুতেই জাজ্বল্যমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সেই কারণেই আদিকবি রামের মধ্যে সমস্ত রকম বিপরীতের সহাবস্থান রাখতে এমন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সফল হয়েছেন। রাবণের কাছে বর্ণনায় যে রামকে মারীচ বলছেন, “আমি বৃক্ষে বৃক্ষে কৃষ্ণাজিনপরিহিত করাল মৃত্যুসদৃশ ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের মূর্তি দেখিতে পাইতেছি।” সীতাকে অন্তর্হিত দেখে সেই রামচন্দ্রকেই আমরা দেখি শিশুর মতো অশ্রুপাত করতে! বিরহোন্মত্ত হয়ে কখনও তিনি আশ্রমের হরিণশিশুদ্বয়কে জিজ্ঞেস করছেন, “হে হরিণযূথ! আমার প্রাণপ্রিয়া হরিণাক্ষী কোথায়?” কখনও সীতাকে খুঁজতে বেরিয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে কুসুমিত কদম্ববৃক্ষকে, কখনও বিল্ববৃক্ষের কাছে বা কখনও পত্রপুষ্পেবিকশিত অশোকতরুর কাছে জানতে চাইছেন, সীতা কোথায় গিয়েছে বা উপদেশ চাইছেন, কী ভাবে জানকী বিহনের এই প্রবল শোকাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অপহৃত সীতার সম্ভাব্য অবস্থান নিরুপণের পরে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর মধ্যে থেকে জেগে উঠতে দেখি এক সংবেদী কবিকে, “হে সমীরণ, আমার প্রিয়তমা যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও, তাঁহাকে স্পর্শ করে আসিয়া আমাকেও স্পর্শ করো। তাপতপ্ত নয়ন চন্দ্রদর্শনে যেরূপ শীতল হয়, সেই রূপ প্রিয়াস্পর্শকারী তোমার স্পর্শে আমার দেহও শীতল হইবে।” কঠোর ও কোমলের আশ্চর্য সমন্বয় এই রামচন্দ্র তাই শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের নিরিখেই এক বিরলতম দৃষ্টান্ত ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের নিরিখেও এক ও অদ্বিতীয় এপিক হিরো।

তুলসীদাস বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের রাম চরিত্রায়ণে ঐশীগন্ধ এতই প্রবল যেন তাঁরা দেহবর্জিত কামবর্জিত কোনও অতিদেব। মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজের কর্মঠবৃত্তি থেকে উৎপন্ন এক ধরনের সংরক্ষণশীলতা, শুচিতা, সংস্কার ছাড়াও বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভাবাচ্ছন্ন এই সব পরিবেশনায় রামকে মনে হয়, তিনি একেবারেই শাকাহারী, বনের ফলমূল খেয়েই স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁরা অরণ্যে বাস করেন, একেবারেই সন্ন্যাসীদের মতো। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে আমরা রামকে দেখি পর্যাপ্ত মৃগমাংস ভক্ষণ করতে। পাখির মাংস, এমনকি মাছও তাঁর অতিপ্রিয়। রাবণের অশোকবনে সীতার কাছে এসে হনুমান যখন রামের দুরবস্থা বর্ণনা করছেন, তখন বলছেন, ‘‘ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈবং মধু সেবতে / বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্।’’ অর্থাৎ আপনি তাঁর

সীতাবিহনে যে রাম প্রাণত্যাগ করতে চান, সেই রামের সঙ্গে তাঁর সংযমী জিতেন্দ্রিয় ঋষিসুলভ চেনা ভাবমূর্তির কোনও মিল নেই

জীবন থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে তাঁর এমনই শোকাকুল অবস্থা যে, তিনি আর মাংসভোজন করেন না, মদ্যও সেবন করেন না। সন্ধ্যাবেলায় বনের ফলমূলাদি খেয়ে তাঁর দিন কাটে। সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থের মতে, একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংস ও মদ্যপান মোটেও দোষের নয়।

দূরে দণ্ডায়মান ঋষ্যমূক পর্বত, বসন্তের আগমনে বনস্থলি, সমস্ত প্রাণী ও পক্ষীকূল, বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফল উতলা। সিন্ধুবার ও মাতুলুঙ্গ ফুল ফুটেছে, কোবিদার-মল্লিকা-করবী দুলছে স্নিগ্ধ বাতাসে, ময়ূর ময়ূরীরা একে অপরের সান্নিধ্যে নৃত্য করছে। দাত্যূহ করুণকণ্ঠে ডাকছে, তামারঙের পল্লব অভ্যন্তরের রক্তবর্ণ রেণু মৌমাছিরা ডানায় বয়ে নিয়ে এসে প্রবেশ করছে প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ির ভিতরে। অঙ্কোল কুরুন্ট ও চূর্ণক বৃক্ষ পম্পাতীরের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখে রাম আত্মহারা হয়ে পড়ে সীতার জন্যে বিলাপ করতে লাগেন। লক্ষ্মণকে তিনি বলে ওঠেন, “তিনি বসন্তে প্রাণত্যাগ করিবেন। ঐ দেখ লক্ষণ, কারণ্ডব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় কান্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার ঐশ্বর্য কিংবা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না।” এই বর্ণনার মধ্যে যে প্রকট যৌনাভাষ তা নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এর মধ্যে রয়েছে শোনিতপ্রবাহের মৌল উত্তাপ, অনিবার্য জৈবনিকতা, এক হৃদয়ের জন্য অন্যের আকুতি, শত বিপদ-বিপর্যয়ের মধ্যেও একের জন্যে অপরের এই যে অপরিহার্যতাবোধ, তা মাটির পৃথিবীতে জন্ম নিলেও আদতেই স্বর্গীয়।

এমন তীব্র অশোভন কথা শুনে লক্ষ্মণ সীতাকে তিরস্কার করে সেই যে রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, সেই শূন্যস্থান দিয়ে...

সীতাবিহনে যে রাম প্রাণত্যাগ করতে চান, যে বিরহী রাজকুমারকে দেখা যায় প্রলাপোক্তি করতে, লক্ষ্মণ যাঁর মধ্যে নানারকম উন্মত্ততা লক্ষ করে ভীত হন, সেই রামের সঙ্গে তাঁর সংযমী জিতেন্দ্রিয় ঋষিসুলভ চেনা ভাবমূর্তির কোনও মিল নেই। যে কোনও বিশালহৃদয় নরপুঙ্গবের মতোই তিনি এখানে মাত্রাতিরিক্ত আবেগপ্রবণ। বয়সোচিত কারণেই তীব্র প্যাশনেট। যে প্যাশন যৌবনের এহেন সম্পৃক্ত অবস্থায় একান্তই বাস্তবিক। প্রিয়াবিহনে শুধু রামকেই যে উন্মাদপ্রায় হতে দেখি তা নয়, রামের কণ্ঠ অনুকরণ করে মৃত্যুর মুহূর্তে মারীচের 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' আর্তনাদ শুনে প্রিয়বিহনের আশঙ্কাতে সীতাকে যে ভাবে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠতে দেখা যায়, তা-ও যেন একই রকম মানবোচিত চিত্তবৈকল্যের উদাহরণ। রামের বিপদাশঙ্কায় লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখে বৈদেহী সীতার যে ধরনের মতিভ্রম হয় এবং লক্ষ্মণকে যে রূঢ়তায় তিনি বলে ওঠেন, "ওরে নির্দয় কুলাঙ্গার... রামের সমূহ বিপদই তোমার প্রিয় বলিয়া মনে করি। তোমার ন্যায় কদর্য গুপ্তশত্রুর মনে যে অসদভিপ্রায় থাকিবে— ইহা বিচিত্র নহে। দুষ্টস্বভাব তুমি ভরত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অথবা নিজেই আমাকে লাভ করিবার অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকী বনে রামের অনুগমন করিয়াছ। তোমার এই অভিপ্রায় কখনও সিদ্ধ হইবে না।"

এমন তীব্র অশোভন কথা শুনে লক্ষ্মণ সীতাকে তিরস্কার করে সেই যে রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, সেই শূন্যস্থান দিয়ে সীতার 'নেমেসিস' হয়ে প্রবেশ করেন লঙ্কাধিপতি রাবণ (প্রসঙ্গত, লক্ষ্মণরেখা টানা আর রাবণের তা পার না হতে পারার মতো কোনও ঘটনাই বাল্মীকির রামায়ণে নেই)। অতএব মোদ্দা কথা হল, পরবর্তীকালে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল নাগাদ) যে রাম-সীতাকে আমরা বিষ্ণু ও দেবীলক্ষ্মীর অবতার হিসাবে দেখা শুরু করছি, তার আগে পর্যন্ত তাঁরা কিন্তু যাবতীয় মানবিক ভঙ্গুরতা বা frailty নিয়েই উপস্থিত, যথার্থ মাল্টি ডায়মেনশনাল রাউন্ড ক্যারেক্টার। এক্ষেত্রে তাই আমরা যদি তাঁদের যথেষ্ট আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বৈরাগ্য কঠোরতায় দেখতাম, এই মহাকাব্য তা হলে নিতান্তই প্রাণহীন দেবলীলা হয়ে যেত, মানুষের কাব্য থাকত না।

সীতার অপহরণের পরে এই রকম তীব্র মানসিক অস্থিরতা, তার মধ্যেই বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা, অগ্নিসাক্ষী করে তাঁর সঙ্গে মিতালিস্থাপন এবং নিজেকে তাঁরই মতো বেদনাতুর অবস্থায় (রাজ্যচ্যুত ও স্ত্রী অপহৃতা) দেখে তাঁকে রামের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলা। গাছের পিছন থেকে শরনিক্ষেপ করে বালীকে হত্যা করার পরে বিস্মিত বালী যখন বলছেন, "আপনি ধর্মধ্বজ কিন্তু অধার্মিক, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নন," তখন যেন মনে হচ্ছে এ শুধু বালীর মুখ দিয়ে বলানো কথামাত্র নয়, আসলে তা যেন বাল্মীকিরই মনোভাবের প্রকাশ। রচয়িতার এই জাতীয় প্রবণতা থেকে একটা কথা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, স্রষ্টা এখানে তার সৃষ্ট চরিত্রের উপর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চান না। তাঁদের চালকের আসনে বসতে চান না। অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে বালীবধকে অনেকেই রাম-সমালোচনার একটি বড় দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখাতে চাইলেও, ঘটনাটিকে যদি মনোবিজ্ঞানের আলোয় দেখা যায়, তবে এমনটা বলা ভুল হবে না যে, মনের ওই রকম অস্থির অবস্থায় তখন বালীর মধ্যে রাম হয়তো ছায়া দেখেছিলেন লঙ্কেশ রাবণের। বালী বা রাবণ যদি অন্যায় ভাবে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমা ও তাঁর স্ত্রী সীতাকে হরণ করতে পারেন, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় কেনই বা প্রয়োগ করা যাবে না?

তা ছাড়া ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থই হচ্ছে, ক্ষত হতে যিনি ত্রাণ করেন। তাই রামের ক্ষাত্রধর্মের মূল জায়গাটাই হচ্ছে, যে বা যারা ক্ষত থেকে মুক্তি পেতে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, তাদের সাহায্য করা। বালীবধের ক্ষেত্রে রামের কাছে এই ক্ষত্রিয় ধর্মটিই প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেমনটা তাঁর ক্ষেত্রে চিত্রকূট পর্বত থেকে

দক্ষিণাভিমুখী যাত্রার সময়েও ঘটেছিল। পথের মধ্যে সীতা তাঁকে নিষেধ করেছিলেন ঋষিদের অনুরোধের বশবর্তী হয়ে অরণ্যবাসী রাক্ষসদের সঙ্গে অকারণ শত্রুতা না করতে, তাদের নির্বিচার নিধনযজ্ঞে মেতে না উঠতে। কিন্তু রাম তা শোনেননি এবং সেই ক্ষাত্রধর্মেরই দোহাই দিয়েছিলেন। এমন সিদ্ধান্তে-স্থির, পরের কথায় কর্ণপাত না করা, একবগ্‌গা চরিত্রে তবে কী এমন ঘটল যে, তিনি রাবণবধের পর সীতাকে গ্রহণ করার প্রশ্নে 'জনবাদভয়াদ্রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা' লোকনিন্দার ভয়ে দ্বিধাদীর্ণ হয়ে উঠলেন? যে রামচন্দ্রকে আমরা কিছু পর্ব আগেই দেখছি সীতাকে হারিয়ে বিরহকাতর, পাগলপ্রায়, আত্মহননোন্মুখ, সেই রামকেই লঙ্কাজয়ের পরে দেখা যাচ্ছে 'মানাকাঙ্ক্ষী' এবং নিজমুখেই তিনি সীতাকে বলছেন, "রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষার্থে আমি যুদ্ধে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরমপ্রীতির সামগ্রী, কিন্তু নেত্ররোগী যেরূপ দীপের জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। এরূপ পৌরুষবর্জিত ব্যক্তি কে আছে যে, শত্রুগৃহস্থিতা স্বীয় স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া সুখী হয়। তুমি রাবণের অঙ্কক্লিষ্টা, রাবণের দুষ্ট চোখে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে নিয়ে গেলে আমার পবিত্রগৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিলাম, ইহা তোমার জন্য নহে, আমার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই দশদিক্ পড়িয়া আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও। লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণ, ইঁহাদের যাঁহাকে অভিরুচি, তাঁহারই উপর মনোনিবেশ করো।" (রামায়ণী কথা, দীনেশ চন্দ্র সেন)

রামের মুখে এমন কঠোর কথাগুলি শুনে সীতার ব্যথার যেমন শেষ থাকে না, ব্যথিত হন পাঠকও। লজ্জায় অপমানে যেন নিজের শরীরেই মিলিয়ে যেতে চান জানকী। একজন তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারীর মতোই পতিদেবকে সমুচিত জবাব দিতে ছাড়েন না। বলে ওঠেন, "লক্ষ্মণ, তুমি চিতা সজ্জিত করিয়া দাও। আমি আর এই অপবাদ-কলঙ্কিত জীবন বহন করতে ইচ্ছা করি না।" রামের চরিত্রের সবচেয়ে সমালোচিত অংশ অবশ্যই সীতা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে চাইলে তাঁকে বাধা না দেওয়া। লঙ্কেশ রাবণের মতো মহাপ্রতাপশালী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করার পরে এই যে রামকে আমরা পাচ্ছি, সে এক অন্য রাম। তিনি এখন আর নিতান্তই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নন, তিনি এখন শক্তিকেন্দ্রে অবস্থান করছেন, প্রবেশ করতে চলেছেন রাষ্ট্র-ক্ষমতার বলয়ে। তাই তিনি এখন অনেক বেশি জনগণমন সচেতন। অনেকের মতে, এই রাম এখন যতটা না সীতাপতি, তার চেয়েও বেশি রাজা রাম। যিনি এখন নিজসত্তা ও তার সঙ্গে অভিন্ন সীতার চেয়ে জনচিত্ত নিয়ে বেশি চিন্তিত। এ প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই অযোধ্যা কাণ্ডের সেই উক্তিতে, যেখানে তিনি কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, ভরত চাইলে আমি তাঁকে রাজ্য, প্রাণ, ঐশ্বর্য এমনকি সীতাকেও দিয়ে দিতে পারি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সীতাকে দান করার অধিকার আদৌ কি তাঁর রয়েছে? সীতা কি অপ্রাণীবাচক সম্পদ যে, কেউ চাইলেই তিনি তাঁকে দান করতে পারেন? সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এক্ষেত্রেও চোখ এড়ালে চলবে না, সীতার প্রসঙ্গে আসার আগে রাম নিজের প্রাণদানের কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বাল্মীকির শব্দপ্রয়োগে সীতা ও তাঁর প্রাণের গুরুত্ব একই বা সমতুল্য।

তবে এই যুক্তিকেও দ্বিধাহীন মনে বৈধতা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, যখন প্রায় সম্পূর্ণ একটি বছর লঙ্কায় অপরিসীম মানসিক নিপীড়ন

এ কথা শোনার পরে রামের দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হল, মুখ রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো এবং অস্তমিত সূর্যের মতো প্রভাহীন হল।

ও লাঞ্ছনা সহ্য করার পরে রামের কাছে ফিরে এসে সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুরুষটির মুখ থেকে সীতাকে শুনতে হয়, তুমি যে দিকে দু'চোখ চায় চলে যেতে পারো বা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ, যার কাছে চাও চলে চলে যেতে পারো, তাতে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। আর উত্তরকাণ্ডে এসে সেই সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করলে তাঁর প্রতি রামের অবিচার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে। রামের রাজ্যাভিষেকের পর দু'টি মাস অতিক্রান্ত, রাজ্যে নিরঙ্কুশ শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বিরাজ করছে, সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পরে রামের আনন্দের সীমা নেই, তখনই একদিন নিজের চার সঙ্গী বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ ও ভদ্রের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার সময়ে ভদ্রকে রাম জিজ্ঞাসা করেন, নগরীতে এখন প্রজারা কোন বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা করছে। তাতে ভদ্র জানান, প্রজারা সকলেই মহারাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে একটি চর্চার বিষয় লোকমুখ থেকে কিছুতেই যেন অন্তর্হিত হতে চায় না। সেটি হল, রঘুনন্দন "রাবণের সীতাস্পর্শের জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনরায় সীতাকে আপন পুরীতে আনিয়াছেন। রাবণস্পৃষ্টা সীতাকে কী প্রকারে রাম ভালবাসেন, তাহা বুঝিতে পারি না। রাজার অনুকরণে আমাদিগকেও ভার্যাদের এইরূপ দোষ সহ্য করিতে হইবে।" (সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ)

এ কথা শোনার পরে রামের দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হল, মুখ রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো এবং অস্তমিত সূর্যের মতো প্রভাহীন হল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নকে ডেকে সীতাকে নিয়ে জনপদবাসীদের অপবাদের কথা জানিয়ে খেদের সঙ্গে বললেন, সীতা অগ্নিপ্রবেশের মধ্য দিয়ে

রামায়ণ, মহাভারত প্রাক-গণতান্ত্রিক যুগের রচনা। সে যুগের জীবনকে বর্তমান মূল্যবোধ, আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করা মূর্খামি

তাঁর পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিয়েছেন, অগ্নিপ্রমুখ দেবতারাও পর্যন্ত তাঁকে কলঙ্কহীন ঘোষণা করে গিয়েছেন, তবুও এই অপবাদ আর সহ্য করা যাচ্ছে না, প্রজারা তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে। "আমি লোকনিন্দার ভয়ে নিজের জীবন ও তোমাদিকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর কথা আমি আর কী বলিব। জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখে কখনও পড়ি নাই।" এই লোকনিন্দাভয় যেন রাজা রামের কাছে যেন এক 'প্রিঅকুপেশন' বা 'অবসেশন' হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। শুধু সীতা-নির্বাসনই নয়, শম্বুক বধের ক্ষেত্রেও একজন আদর্শ রাজা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে রামকে দেখছি ক্রমশ ওই রাজধর্মের নৈষ্ঠিক ধারণার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বা সেই ধারণার প্রাণহীন নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়তে। তাবড় পুরাণবেত্তা, পণ্ডিত-সহ রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই উত্তরকাণ্ড মূল রামায়ণের অপরিহার্য অংশ নয়, উত্তরকালের কোনও এক কবির হাতে সংযোজিত, তাই প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু এই উত্তরকাণ্ড না থাকলে আমরা রামকথাকে অবশেষে একটি পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে দেখতাম না। দেখতাম না, রামকে নিজের ভুলের পথ দিয়ে এক অনভিপ্রেত পথের যাত্রী হয়ে একজন ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে উঠতে।

জ্যোতিভূষণ চাকী 'গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ'-এর ভূমিকায় উত্তরকাণ্ডের গুরুত্ব অংশে উপযুক্ত যুক্তিবিন্যাসে লিখছেন, এই অংশ না থাকলে রামায়ণের পরিণতি ও আবেদন এমন গভীর ও মর্মস্পর্শী হত না। "রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা সীতা রামের সঙ্গে সুখে সংসার করতে থাকলে পাঠক সুখী হত বটে, কিন্তু বেদনার আত্মসংবিৎ থেকে হত বঞ্চিত। একটি মহৎ মানুষ মহাদুঃখভোগের পর ঈপ্সিতের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হলেন। উত্তরকাণ্ডের দান এই ট্র্যাজেডি।" সেই অর্থে এই ট্র্যাজেডির সঙ্গে গ্রিক বা শেক্সপিয়রিয়ান ট্র্যাজেডির তেমন মিল না থাকলেও, গ্রিক মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এর আন্তরিক সম্পর্ক আছে। ট্র্যাজেডি হলে তো ট্র্যাজিক হিরোর একটি 'ফেটাল-ফ্ল' থাকতে হবে। জ্যোতিভূষণের প্রশ্ন, রামের ক্ষেত্রে তবে সেই 'হামার্তিয়া' বা 'ফেটাল ফ্ল'-টি কী? রামের ক্ষেত্রে সেই 'ফ্ল' অবশ্যই কোনও নৈতিক ত্রুটি নয়, "হয়তো তাঁর সিদ্ধান্তের নৈষ্ঠিকতা"। তাঁর পরিণতি আমাদের মধ্যে 'পিটি' (করুণা) ও 'ফিয়ার' (শঙ্কা) তৈরি করে। শঙ্কা আর করুণার পরিপাকে পাঠকের মনে ঘটে ক্যাথারসিস, যার ফল, এক বিষণ্ণ প্রশান্তিতে মন ভরে ওঠা। "ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী বলতে পারি শঙ্কিত করুণার স্থায়ীভাব করুণরসে পরিণত হয়, আমরা উপলব্ধি করি, একো হি রসঃ করুণ এব হি সঃ।"

আর একটি বিষয় কিছুতেই ভুললে চলবে না। রামায়ণ বা মহাভারত যে সময়ের রচনা, সেটি প্রাক-গণতান্ত্রিক যুগ। তাই সেই যুগের নরনারীর জীবনকে আজকের সময়ের সামাজিক অধিকার, মূল্যবোধ, আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করলে তা মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবুও সেই কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের এই সব মহাকাব্যের মানব-মানবীরা যে সহজাত বা স্বতোৎসারিত মানবিক সম্ভ্রম, মূল্যবোধ, নৈতিক সঙ্কটের উদাহরণ হয়ে ওঠেন, তার তুলনা সমকালীন বিশ্বের আর কোনও মহাকাব্যেই মেলে না। গিলগামেশ, ইলিয়াড, ওডেসি, ভার্জিলের ইনিড, বেউলফ, ওভিডের মেটামরফোসিস, ফিরদৌসির শাহনামা, নিবেলাংগনলিড কোথাও রামের মতো এমন 'বিশাল, জটিল, বিস্ময়কর' এক চরিত্রের দেখা মেলে না। সর্বোপরি, রামচন্দ্রের মতো এমন চলিষ্ণু চরিত্র, যিনি কোনও নীতিগল্পের প্রতীকমাত্র বা স্রষ্টার হাতের পুতুলমাত্র নন। যিনি শুরুতেও যেমন ছিলেন শেষেও তাই থাকবেন।

শুরুতেই আমরা যে রাউন্ড ক্যারেক্টারের কথা বলেছিলাম, তার শর্ত মেনে রাম চরিত্রকে যে ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে দেখি, ক্রমাগত বিবর্তিত হতে দেখি, তা রামায়ণকে একটি চিরকালীন আধুনিক টেক্সট হিসাবে আমাদের সামনে আনে। আশ্চর্য হতে হয়, এই রকমের একটি আধুনিক কাব্য যে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পরুচির দান তার উৎকর্ষ, অগ্রসরমানতা ও সফিস্টিকেশনের কথা ভেবে। মহাকাব্যের নায়ককে দেবতা না বানিয়ে যদি রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে পারি, মধ্যযুগের ভক্তির চশমা ছেড়ে যদি বস্তুনিষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে এর নির্মিতির ভিতরে উৎকর্ষের চরণচিহ্নগুলো ধরে এগোতে পারি, তবেই পৌঁছতে পারব এমনতর মহৎ এক সৃষ্টির অন্তরলোকে। উৎকৃষ্টের (সাবলাইম) পুনঃপুনঃ স্বাদগ্রহণই একমাত্র আমাদের নতুন করে ফেরাতে পারে সেই সব হৃত-উৎকর্ষের পথে।

ছবি: রৌদ্র মিত্র

গ্রন্থঋণ

১। রামায়ণী কথা / দীনেশচন্দ্র সেন
২। বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ / রাজশেখর বসু
৩। গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ / সম্পাদনা – জ্যোতিভূষণ চাকী
৪। রামায়ণের চরিতাবলী / সুখময় ভট্টাচার্য
৫। প্রবন্ধ সংকলন / বুদ্ধদেব বসু
৬। প্রাচীন সাহিত্য / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনীতির নবীন বিস্ময়

পঞ্চাশ বছরে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে আজ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখেননি তিনি। ফরাসি এবং ইংরেজিতে চৌকস নবীন এই সে দিনও ওড়িয়া বলতে পারতেন না ভাল করে। কিন্তু ওড়িশাবাসীর মনে তাঁর সাদা পোশাকের মতোই 'মিস্টার ক্লিন' ভাবমূর্তিটাও বুনে দিতে সক্ষম হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। লিখছেন অগ্নি রায়

ওড়িয়া ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বিজু পট্টনায়ক-এর প্রিয়ভাজন রাজকিশোর মিশ্রর কাছ থেকে শোনা একটি গল্প দিয়েই না হয় শুরু করা যাক। রাজকিশোরের আরও একটি প্রাসঙ্গিক পরিচয়, তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের ওড়িয়া ভাষার গৃহশিক্ষকও বটে! ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষাভুবনে সদা আমোদিত নবীন, মাঝবয়সে বিপাকে পড়েই তখন রাজকিশোরের শরণাপন্ন। ওড়িয়া লেখা বা পড়া দূরস্থান, তখন বলতেও যে পারেন না ভাল করে! অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা, কিছুটা না জানলে চলে কী উপায়ে!

'গৃহশিক্ষক'-এর কাছে তখন তালিম চলছে জোরদার। কিন্তু তাতে যে ছাত্রের বিরাট উন্নতি হচ্ছে, এমনটা বলা চলে না! তার প্রধান কারণ, ছাত্রের প্রবল অনাগ্রহ। ওড়িয়ায় কোনও রসই পান না, আপোলিনের, বদলেয়ার, সিমন দ্য বভোয়ার, কামু, সার্ত্রে গুলে খাওয়া নবীন। ফলে শিক্ষা চলেছে মন্দগতিতে! এমন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী নজর করলেন, তাঁর এই অজ্ঞতাকে ঘিরে চারপাশে ব্যঙ্গ ঠাট্টা চলছে একটু কদর্য ভাবেই।

বনমহোৎসবে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে

বিজু জনতা দল তৈরির পরে বিজু পট্টনায়কের বাড়ির সামনে

নবীনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিস্ময়। তিনি উচ্চকিত নন, বরং অন্তর্মুখী। প্রাইম টাইম টেলিভিশনে দেখতে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ কিছু মন্ত্রী ও বিধায়ক ভালমানুষের মতো মুখ করে, তাঁরই সামনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে প্রায়ই কথার ফাঁকে ফোকরে বাছাই করা দু' তিনটি গালি গুঁজে দিচ্ছেন ওড়িয়া ভাষায়! অর্থ না বুঝলেও নিজের প্রখর কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন নবীন। শব্দগুলি মুখস্থ করে ফিরে এসে মাস্টারমশাইয়ের কাছে তার অর্থ জানতে চাইলেন। বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়। পরের দিন বৈঠকে একই ভাবে গালি দেওয়া শুরু হল। নবীন গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে শুধু বলেছিলেন, 'আমি সবই বুঝতে পারছি!' ব্যস, ঘরে কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য। এর পর উপস্থিত জনা বারো বিজেডি নেতাকে দেখা যায় নবীনের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে!

নবীন পট্টনায়ককে নিয়ে গল্পের, কাহিনির এমনকি লোককথার বোধহয় কোনও শেষ নেই। তাঁকে এবং তাঁর সাফল্যকে ঘিরে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কৌতূহলও গভীর। আপাদমস্তক বর্ণময় এক উপন্যাসোপম এই মানুষটি, স্বভাবে, গোত্রে, রুচিতে, যাপনে এতটাই স্বতন্ত্র, তাঁর সমসাময়িক জীবিত বা মৃত যে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর সঙ্গে যাঁর তুলনাই চলে না।

বাবা বিজু পট্টনায়ক ছিলেন ওড়িশার রাজনীতিতে কিংবদন্তি। কিন্তু কতই না অমিল পিতা-পুত্রে! চরিত্রে ও স্বভাবে যে নির্জনতা রয়েছে নবীনের, তা ছিল না বিজুর। তিনি ছিলেন যাকে বলে 'মাস লিডার'। বিজুর রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের হলেও, তার বেশির ভাগটাই তো কেটেছে বিরোধী আসনে। দশ বছরেরও কম সময় বিজু ছিলেন ক্ষমতাসীন। আবার বছর দশেক ক্ষমতাকালের মাঝে মধ্যেও রয়েছে দশকওয়াড়ি ব্যবধান। আর নবীনের রাজনৈতিক কেরিয়ারে নাগরদোলার আভাসটুকুও নেই। পঞ্চাশ বছর বয়সে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে আজ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখেননি তিনি। '৯৭ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি প্রথমবারের জন্য ওড়িশার, 'আসকা' নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে সাংসদ হন। এর দু'বছরের মধ্যে পরপর দু'বার লোকসভা ভোটে (মার্চ '৯৮, অক্টোবর '৯৯) জেতেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। কিন্তু এ তো সবে শুরু। ২০০০ সালে ওড়িশার ভোটে বিপুল ভাবে জিতে প্রথমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হলেন নবীন। অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়ে আজও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী সেই তিনিই। ক্রিকেটে ডন ব্র্যাডম্যান এবং টেনিসে রজার ফেডেরার, আর রাজনীতিতে জ্যোতি বসু এবং পবন চামলিং ছাড়া এমন ধারাবাহিক সাফল্যের রেকর্ড আর কার! বিষয়টি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক তথা সমাজবিজ্ঞানের গবেষকদের অবাক করেছে বারবার। পবন চামলিং, জ্যোতি বসুর পরই তাঁর একটানা (পরপর পাঁচবার জিতেছেন) মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ। উপরোক্তদেরও তিনি ছাড়িয়ে যাবেন অচিরেই। অথচ এই বাইশ বছরে আমূল বদলে গিয়েছে ভারতবর্ষ, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, গণচরিত্র। এনডি, ইউপিএ-র কালখণ্ড পার হয়ে দেশে তৈরি হয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য (এখনও পর্যন্ত) শক্তি, যার নাম নরেন্দ্র মোদী। দেশের বহু রাজ্যে নিয়মিত ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। কেরলে বাম এবং কংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে এবং এআইডিএমকে, উত্তরপ্রদেশে বিএসপি এবং এসপি (শেষ পর্যন্ত বিজেপি) ঘুরেফিরে এসেছে। বাংলায় ৩৪ বছরের বাম শাসন পরাভূত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ঢেউয়ে বদলে গিয়েছে দেশের নিরাপত্তা মানচিত্র। ২০০৮-এর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে চিনের অভ্যুত্থান ঘটেছে আরও বড় মাপে। সেনসেক্স ৪ হাজার থেকে পৌঁছেছে ৪০ হাজারে।

কিন্তু ওড়িশা থেকে গিয়েছে সেই নবীনেই! এমনকি ২০১৪ সালে মোদী ঢেউ যখন তোলপাড় করে দিয়েছেন গোটা দেশ, ওড়িশায় তার সামান্য ধাক্কাও লাগেনি। বরং ফলাফল সেবার ভাল হয়েছে বিজেডি-র। লোকসভায় একুশটি আসনের মধ্যে কুড়িটিতেই জিতেছেন তিনি।

নবীনকে ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়েছে বিস্ময়। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো তিনি উচ্চকিত নন, বরং অন্তর্মুখী। প্রাইম টাইম টেলিভিশনে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। চটজলদি কিছু বলে সংবাদপত্রের হেডলাইনে আসতে তাঁর ঘোর অনীহা। দেশের সবচেয়ে সফলই শুধু নন, একইসঙ্গে সবচেয়ে নীরব মুখ্যমন্ত্রীও কি তিনি নন? এমনকি যে ওড়িশা তাঁকে পাঁচ-পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী করেছে, সেখানকার হাটে-বাজারে এমনকি সংবাদপত্রের দফতরেও কান পাতলে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না নবীন পট্টনায়ক সম্পর্কে। '৯৭-এ সক্রিয় রাজনীতিতে ঢোকার আগে

অবশ্য তাঁর জীবনযাপন নিয়ে অনেক গল্প ভেসে বেড়ায়, তাঁরই কিছু সাংবাদিক বন্ধুর সৌজন্যে, কিন্তু তার পরে আর বিশেষ নয়। কী রোমহর্ষকই না সেই সব কাহিনি! শুনতে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। সে সব গল্পে যাওয়ার আগে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক নবীনের বড় হওয়া। বিজুবাবুর তিন ছেলে মেয়ে— প্রেম, গীতা এবং নবীন। এঁরা প্রত্যেকেই মূলত ওড়িশার বাইরেই বড় হয়েছেন। দুন স্কুল (সঞ্জয় গান্ধীর সহপাঠী) এবং সেন্ট স্টিফেন্সে পড়াশোনা নবীনের, ওড়িশার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত থেকে যা বহু দূরে। নয়াদিল্লির ঔরঙ্গজেব রোডের বাড়ি থেকে ভুবনেশ্বরে বাবা-মায়ের কাছে যেতেন মাঝেমাঝেই, কিন্তু তা নিয়ে কখনও হইচই হয়নি কোথাও। রাজনীতি থেকে এতটাই দূরে ছিলেন তিনি, ওড়িশায় কেউ ভাবতেও পারেননি ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে।
নবীন পট্টনায়কের ককটেল সার্কিট নিয়ে কতই না গল্প! সাংবাদিক তভলীন সিংহ তাঁর 'দুর্বার' বইটিতে লিখেছেন যার কিছু কিছু। দিল্লিতে নবীনের বাড়িটিই সে সময় বিখ্যাত ছিল হাই প্রোফাইল

রথযাত্রায়

পার্টির জন্য। রোলিং স্টোনস-এর মিক জ্যাগার থেকে অভিনেত্রী কু স্টার্ক (যিনি ব্রিটেনের যুবরাজ অ্যান্ড্রু-র একদা প্রেমিকাও বটে), ঔপন্যাসিক ব্রিস চ্যাটউইন— চোখধাঁধানো বিদেশি অভ্যাগতদের ভিড় লেগে থাকত সেখানে। যদিও আজীবন জনগণের দৃষ্টির আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেছেন নবীন, কিন্তু তাঁর সামাজিক সংযোগ ছিল চোখধাঁধানো। একবার নবীনের এক বিদেশি বন্ধু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছিলেন, 'রবার্ট' নামে এক ব্যক্তি তাঁর যাত্রাপথে কয়েক দিনের জন্য দিল্লি থাকতে চান, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করা কি সম্ভব? নবীন 'হ্যাঁ' বলেন এবং সেই 'রবার্ট' কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে চলে যান। পরে জানা যায়, সেই 'রবার্ট' আর কেউ নন, হলিউডের সুপারস্টার রবার্ট ডি নিরো!
এক দিকে এই সব গল্প। অন্য দিকে সংবাদমাধ্যম থেকে কিছুটা দূরত্বে থাকা। এই দুইয়ে মিলে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্যের এক বলয়। ২০০০ সালে, তাঁর প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের আগে, জনসভাগুলিতে নবীন মানুষকে বলতেন, ওড়িয়া শিখতে তাঁর একটু সময় লাগবে। আগে থেকে রোমানে লেখা হিন্দি বক্তৃতা পড়ার আগে ভাঙা ভাঙা ভাবে তিনি বলতেন, 'মোটে ভালা ওড়িয়া কাহিবা পান টিকে সময় সম লাগিবা।' ওড়িয়া ভাষা বলার ক্ষেত্রে তাঁর অপারদর্শিতাই তো শুধু নয়। নবীনের বাইশ বছর শাসনের পরেও কি সমৃদ্ধির বিপুল বান ডাকছে রাজ্যে? না, এমনটা তো নয় আদৌ।

এখনও রাজ্যের বহু জায়গায় অপুষ্টিতে মৃত্যু হচ্ছে শিশুর। দুর্নীতি এবং দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বত্র। নবীন রাজ্যকে রাজনৈতিক স্থিরতা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারেননি। তবে ওড়িশার পর্যবেক্ষকরা সেই সঙ্গে অন্য একটি কথাও বলছেন। কথাটা ফেলে দেওয়ার নয়। নবীন ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক টালমাটালে ভরা ওড়িশাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছিল হতাশা। রাজনীতিবিদরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থেকেছেন। সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরিহিত (এই পোশাক ছাড়া গত বাইশ বছরে তাঁকে কেউ দেখেনি) নবীন যখন দায়িত্ব নিলেন, গলা পর্যন্ত বঞ্চনায় ডুবে থাকা ওড়িশাবাসী তাঁকে দেখে ভেবেছিল, এই মানুষটার সাহেবিয়ানা থাকতে পারে, কিন্তু লোভ নেই। মানুষকে ঠকিয়ে নিজের পকেট ভরানোর মানসিকতা বা প্রয়োজন এঁর নেই। নবীন রাজনীতিতে আসার পর ক্রমশ নিজের ভাবমূর্তিও আমূল বদলে ফেলেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বা অগ্রজ রাজনীতিবিদদের মতো অহর্নিশ নিজের প্রচার করে যাওয়া তাঁর স্বভাবে কোনও দিনই

বিজু পট্টনায়ক হকি স্টেডিয়ামে

দিল্লিতে নবীনের বাড়িটি বিখ্যাত ছিল হাই প্রোফাইল পার্টির জন্য। চোখধাঁধানো বিদেশি অভ্যাগতদের ভিড় লেগে থাকত।

ছিল না। কিন্তু দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরে আসার পরে জীবনযাপনও যেন বদলে ফেললেন এই চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রী। চারপাশ থেকে ভিড় কমিয়ে ফেললেন। হাতেগোনা দু'-একজন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর সিঙ্গল মল্ট-এর সঙ্গী হওয়ার ডাক পেতেন না। এমনকি প্রকাশ্যে সিগারেট খেতেও তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। বিশ্বের সমস্ত আধুনিক কেতাদুরস্ত ফ্যাশন ব্র্যান্ড যাঁর নখদর্পণে, তিনি আশ্রয় নিলেন ওই অত্যন্ত সাদাসিধে সাদা পোশাকে। সঙ্গে সাধারণ চপ্পল। ধীরে ধীরে ওড়িশাবাসীর মনে তাঁর পোশাকের মতোই 'মিস্টার ক্লিন' ভাবমূর্তিটাও বুনে দিতে সক্ষম হয়েছেন নবীন। তাঁর সতীর্থ অন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যখন একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, নবীনের দিকে তর্জনী তুলতে পারেনি কেউ। বড়জোর 'নবীনবাবুর লোকগুলো সব চোর কিন্তু নবীনবাবুর তিনকুলে কেউ নেই, একা থাকেন, কোথাও বিশেষ মেশেন না, ওঁর কী হবে চুরি করে'— এমন কথাই বারবার শোনা গিয়েছে

অবনীন্দ্রনাথ স্কুল অব আর্ট-এর ভক্ত নবীন

জাঁকজমকপূর্ণ জায়গায় তিনি খেতে যান না। যত বড় অতিথি আসুন, বাড়ির রাঁধুনি মনোজের তৈরি খাবার পরিবেশিত হবে।

রাজ্যবাসীর আলোচনায়।
কথাটা যে একেবারে অসত্য, তা-ও তো নয়। নবীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সাংবাদিক বীর সাংভি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর জীবন সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'পাপ্পুর (নবীনের ডাক নাম) বৈষয়িক কোনও কিছু নিয়ে কোনও মাথাব্যথা রয়েছে বলে তো মনে হয় না। একটি ঠিকঠাক বাড়ি, ড্রাইভার (নিজে গাড়ি চালাতে পারে না) আর দু'জন ভৃত্য থাকলেই ওর চলে যায়। কোনও জাঁকজমকপূর্ণ জায়গায় ও খেতে যায় না। আজও যত বড়ই অতিথি আসুন না কেন, বাড়ির রাঁধুনি মনোজ যা যা তৈরি করবে, সেগুলিই পরিবেশন করা হবে। ওর গোটা ওয়র্ড্রোবে শুধুই কুর্তা-পাজামা।' তাঁর এই সরল জীবন নিয়ে একবার নাকি সাংভিকে বলেছিলেন নবীন, 'আমি অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস মানুষের বাড়িতে দেখেছি। সুন্দরকে ভালবাসার জন্য তাকে কিনতে হয় না, শুধু উপভোগ করলেই চলে।' এখানে বলে রাখা ভাল, শিল্পে অনুরক্ত এই মানুষটি নিজেকে পরিচয় দিতে ভালবাসেন, অবনীন্দ্রনাথ স্কুল অব আর্ট-এর ভক্ত হিসেবে।
বিজেডি নেতা ও সাংসদ ভ্রাতৃহরি মহতাব (বিজেডি সাংসদ) একবার তাঁর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করে বলেছিলেন, দু'জনেই কংগ্রেস পরিবার থেকে উঠে আসা, পরবর্তীতে কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি করা, দু'জনেই অকৃতদার এবং শিল্প অনুরাগী। মহতাবের বক্তব্য ছিল, মমতার সঙ্গে নবীনেরও জাতীয় রাজনীতিতে আসা উচিত। শোনা যায়, জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে মমতার সঙ্গে সব মিলগুলি মেনে নিয়েছিলেন নবীন। শুধু শিল্পপ্রসঙ্গটি ছাড়া! তিনি নাকি সে দিন বলেন, মমতা কালীঘাটের পটশিল্পী হলে, তিনি অবনীন্দ্রনাথ স্কুল অব আর্ট! এই ভ্রাতৃহরিই আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন সাংবাদিকদের এক সময়ে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী একবার দিল্লি এসে তাঁকে ফোন করে ডাকেন। বলেন, একবার তাঁর সঙ্গে খান মার্কেট যেতে হবে। দ্রুত কাজ ফেলে ভ্রাতৃহরি পৌঁছে গিয়ে দেখেন নবীনের হাতে মোড়ানো কাগজ। তাতে একটি পুরনো পেন্টিং। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ফ্রেমের দোকানে নবীন সময় ব্যয় করেন বুঝতে ও বোঝাতে যে, ছবিটির ফ্রেমিংটা কেমন হবে! পাশে দাঁড়ানো ভ্রাতৃহরি অবাকই হতেন, যদি না মানুষটিকে চিনতেন।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই অনন্য মানসিকতা কিন্তু ভোটের বাক্সে বরাবরই লাভজনক হয়ে দেখা দিয়েছে। যখন ভুবনেশ্বরে থাকতে এলেন, দিল্লির দীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরকে পিছনেই ফেলে এলেন চিরতরে। কিছুটা দূরত্বও বোধহয় তৈরি করে নিলেন সেই বলয়ের সঙ্গে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর খ্যাতনামা বন্ধুরা কার্ড, চিঠি পাঠিয়ে গিয়েছেন নিয়মিত, কদাচিৎ তার উত্তর দিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব বেড়েছে।
এই একাকিত্ব তাঁকে কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছে এমন একটি রাজ্যে, যেখানে ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদরা পরিবারতন্ত্রের উপাসক। তিনি কখনওই কোনও স্বজনকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া দূরস্থান, সামান্য অভিযোগে ক্ষমতাবান নেতা মন্ত্রীদেরও দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন বরাবর। এমনকি খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠা আমলাকেও তাঁর কর্মজীবন শেষ হলে তৎক্ষণাৎ বিদায় জানাতে বিলম্ব করেননি। তাঁরই দফতরের শীর্ষস্থানীয় এক আমলার উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যাঁর উপর খুবই নির্ভর করতেন নবীন। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে তাঁর মেয়াদ শেষ, এ বার সেই অফিসার অন্য দায়িত্বে যাবেন। ভাবলেন, একবার নবীনকে বিদায় জানিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর নবীনের ঘরে ঢোকা এবং বেরোনোর ব্যবধান ছিল সেকেন্ড তিরিশেক! সৌজন্য এবং ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত নবীন। কিন্তু যাঁর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে সরকারি ভবনে বসে একটি বাক্যবিনিময়ও জরুরি মনে করেননি মুখ্যমন্ত্রী। কোনও সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। একই ভাবে নিজের মন্ত্রিসভা থেকেও যাঁদের বিদায় দিয়েছেন, ফিরে তাকাননি। রাজ্যের মানুষ তাঁর এই দিকটিকে বরাবরই প্রশংসার চোখে দেখেছে।
কোনও ময়লা নিজের সাদা কুর্তায় যাতে না লাগে, সে জন্য সদা সতর্ক থাকতে দেখা যায় তাঁকে আজও। ২০১৩ নাগাদ বালেশ্বরে এক যুবতী গৃহবধু তাঁর স্বামীর (তৎকালীন আইনমন্ত্রী এবং বিজেডি

দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে

নেতা রঘুনাথ মোহান্তির ছেলে) সম্পর্কে অভিযোগ আনেন, তাঁকে যৌতুক নিয়ে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে হইচই শুরু হয়। নবীন পুলিশকে সোজা নির্দেশ দিলেন, বাপ-ছেলেকে গ্রেফতার করার। জনতার সামনে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হল নবীনের। এর কিছু সময় পরে ওই বিবদমান স্বামী এবং স্ত্রী নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেন। কিন্তু মোহান্তির দিকে আর ফিরে তাকাননি নবীন।

শুধুমাত্র স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই যে তাঁকে এত দিন মসনদে রেখে দিল, এমনটা মনে করে না ওড়িশা। ক্ষমতায় আসার পরই তিনি সাধারণ এবং দরিদ্র মানুষদের উন্নয়নকে পাখির চোখ করেছিলেন বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রকল্পের মাধ্যমে, যা ওড়িশাকে উন্নয়নের চূড়ান্ত শীর্ষে না নিতে পারলেও তাঁর ভোটবাক্সে ফল দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ওড়িশাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে তাঁর কাজ শুধু রাজ্যবাসীর উপকারে লাগেনি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আদায় করেছে। গত কয়েক বছরে জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি থেকেছে তাঁর রাজ্যের গড় বৃদ্ধি (৮ শতাংশ)। বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রেও ওড়িশা থেকেছে শীর্ষ তালিকায়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের অন্ন ও আবাস যোজনা সফল ভাবে চলছে গত কয়েক বছর। কোভিড মোকাবিলাতেও নবীনের প্রশাসনকে অনেক বড় রাজ্যের তুলনায় সফলই বলা যায়।

নিজের 'মিনিম্যালিস্ট' এবং বিতর্কহীন যাপনের পাশাপাশি, আরও একটি বিষয় ভাল বোঝেন নবীন। তা হল সূক্ষ্ম দেওয়া নেওয়ার খেলা। ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত এনডিএ-তে যোগ দেননি তিনি। অন্যান্য অ-বিজেপি রাজ্যের মতো ওড়িশাতে বিজেপি-কে এখনও দাঁত বসাতে দেননি। কিন্তু দিল্লির সংসদীয় রাজনীতিতে এক প্রচ্ছন্ন সহায়তা কেন্দ্র অর্থাৎ বিজেপি সরকারকে করে গিয়েছেন নবীন এবং তাঁর দল। সরকারের পক্ষে যে কোনও অস্বস্তিকর ভোটাভুটি এড়িয়ে গিয়েছেন, কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে যখন তোলপাড় করছেন বিরোধীরা, তিনি নীরবতা এবং দূরত্ব বজায় রেখেছেন। বিনিময়ে রাজ্যের জন্য আদায় করেছেন প্রাপ্য সুবিধা এবং অর্থ। তীব্র স্বরে অন্যান্য দলের বিরোধী নেতাদের আজকাল প্রায়ই বলতে শোনা যায়, বিজেডি আসলে বিজেপি-র 'বি টিম'। কিন্তু তাতে দৃকপাতই শুধু নয়, কর্ণপাতও করার প্রয়োজন মনে করেন না নবীন পট্টনায়ক। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, ওড়িশার রাজনীতিতে জয়ের রথ ধরে রাখা।

দিল্লির বিভিন্ন দলনেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও প্রবাদপ্রতিম। একটি ঘটনার উল্লেখে যা হয়তো বোঝা যাবে। ১৯৭৫ সাল। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সে দিনই সকালে বিজু পট্টনায়ককে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। থমথমে পরিস্থিতি। রাজনীতি থেকে তখনও বহু যোজন দূরে থাকা নবীন সেই রাতে দিল্লিতে কারও বাড়িতে পার্টি করছেন। হঠাৎ শোরগোল। সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এক সুন্দর দম্পতির প্রবেশ। ঢুকছেন রাজীব গান্ধী আর সনিয়া! এক সাংবাদিক নবীনকে টেনে নিয়ে গেলেন সেখানে। নবীন ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেই সাংবাদিককে সে দিন বলেছিলেন, 'তুমি তো আমার হুইস্কিতে ছাই ফেলে দিলে!'

অথচ রাজীব, সঞ্জয়, সনিয়া, কমলনাথদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল নবীনের। ভারতে এখনও যে হাতে গোনা কয়েকজন কংগ্রেস সভানেত্রীকে 'সনিয়া' বলে সম্বোধন করেন, নবীন তার মধ্যে অন্যতম। দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে আজও। এক সময়ে ইউপিএ সরকারের আমলে রাহুল মাঝে মধ্যেই এসপিজি-কে না জানিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছেন বলে হইচই লেগে থাকত। এমনই একবার ওড়িশা সফরে এসে, রাহুল বেপাত্তা। তাঁকে খুঁজে বার করেছিল নবীনের প্রশাসন। শোনা যায়, নবীন নিজে সনিয়াকে ফোন করে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলেকে একটু বোঝাও, এভাবে যেন হুটপাট না ঘোরে। ওড়িশার অনেক জায়গাই মাওবাদী অধ্যুষিত। নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা হয়ে যেতে পারে।'

পাঁচ বছর আগে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়েন নবীন পট্টনায়ক। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন থেকেই গুঞ্জন তৈরি হয়, নবীনের পর কী হবে বিজেডি তথা ওড়িশার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ? গুঞ্জন স্থায়ী হয়নি, নবীন অসুস্থতা কাটিয়ে ফিরে এলে হাল ধরেছেন। তবে অসুস্থতা, অতিমারি, লকডাউন পর্বের পর থেকে আরও বিধিনিষেধ এসে গিয়েছে তাঁর জীবনে। ব্যক্তিগত স্তরে হয়ে উঠেছেন আরও নির্জন, নির্বান্ধব। নবীন-পরবর্তী ওড়িশা নিয়ে গুঞ্জন স্তিমিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মিলিয়ে যায়নি। ঠিক স্বেচ্ছায় নয়, বলা যায় কিছুটা পরিস্থিতির দায়ে এক রঙিন জগৎ থেকে রাজনীতির ভুবনে এসেছিলেন নবীন পট্টনায়ক। কিন্তু আজ এই পক্বকেশ প্রবীণ সামনে তৈরি করে যাচ্ছেন এক বিপুল শূন্যতা। বহু রকম ছদ্মনামে এই মর্ত্যধাম ভ্রমণ করা মানুষ নবীন। তিনি উদাসীন রাজপুত্র, নাকি সুচতুর রাজনীতিবিদ? বুদ্ধিমান প্রশাসক নাকি শিল্পপ্রাণ এক দার্শনিক? তাঁকে ঘিরে এই রহস্যের বলয় বোধহয় কোনও দিনই অস্তমিত হওয়ার নয়।

কার মিলন চাও

বিপুল দাস

বিয়ের এক বছরের ভেতর বিতান বুঝতে পেরেছিল রাখিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তাদের বিয়ের বন্ধনটা একটা বেমানান গিঁট। এখন উঠতে-বসতে খোঁচা লাগছে। অথচ বিতানের মনে হয়েছিল তাদের এই সম্পর্ক অসাধারণ প্রেমময় হয়ে উঠবে। দু'জন দু'জনকে ভালই বুঝতে পারবে। তাদের পছন্দেরও মিল রয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা পড়তে রাখির ভালই লাগে। বিতান ভেবেছিল তার কবিতার প্রথম পাঠিকা হবে তার বৌ। অনেক পত্রিকাতেই আজকাল বিতানের কবিতা বেরোচ্ছে। কবি হিসেবে পরিচয় তৈরি হচ্ছে। রাখি নিশ্চয়ই সে খবর রাখে। এ সব ভেবে সে এক রকম সুখ পেয়েছিল ভেতরে-ভেতরে। চেহারা, চালচলন দেখেই বোঝা যায় তার ভেতরে একটা মার্জিত, রুচিশীল সংস্কৃতিমনস্কতা রয়েছে। যা কিছু বাকি থাকবে, সেটুকু বিতান ঘষেমেজে তৈরি করে নেবে। সে সব বিতান খুব ভাল পারে। তার নিজের দলের কত বুনো ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়েছে সে। তার উপরতলার নেতারা জানে ব্রেনওয়াশ করতে বিতান দত্তর মতো আর কেউ পারে না।

আসলে বিয়ের আগে রাখিকে যেমন নরমসরম পুতুল-পুতুল মনে হয়েছিল, রাখি তার চেয়ে অনেক শক্ত ধরনের মেয়ে। উপর থেকে কিছুই বুঝতে পারেনি বিতান। রাখির ভেতরে এক ধরনের কাঠিন্য আছে, অনেক পরে বুঝতে পেরেছে সে। বিতানের মতো আধিপত্যকামী পুরুষের পক্ষে সেটা মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল। মানসিক ভাবে রাখি খুব শক্ত প্রকৃতির। মুহূর্তেই যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির হাল ধরে নিতে পারে। বুঝতে পেরেছিল পছন্দ না হলে সে যে কোনও ব্যাপারে বিতানের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারে। তার নিজস্ব মতামতের ব্যাপারে সহজে আপস করে না। ব্যাপারটা বিতানের পছন্দ হয়নি। সে দাপ দেখিয়ে বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী। কলেজের কমনরুমে, ক্লাসে, অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে তার কথা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। বিতান ভেবেছিল কাদামাটির তৈরি পুতুল-পুতুল মেয়েটাকে নিজের ছাঁচে ফেলে গড়ে নেবে। মাস ছয়েকের ভেতরে ভুল ভাঙল। মাটি নয়, রাখির ভেতরে একটা শক্ত ধাতু আছে। তাকে ইচ্ছেমতো বাঁকানো যায় না। আর দাপের তাপ দিয়ে গলিয়ে ছাঁচে ফেলতে হলে যে উত্তাপ দরকার, তাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে না। সেটাও গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যেতে পারে।

বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মতান্তর, তার থেকে মনান্তর। দু'পক্ষেই ইগো সমস্যা তৈরি হয়েছিল দ্রুত। অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে বিতান প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার

পর ভেতরে-ভেতরে একটা প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের আবহ তৈরি হল। রাখির দৃঢ়তার কাছে অনিচ্ছে সত্ত্বেও বিতানকে নতিস্বীকার করতে হত। ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল বিতান। এ রকম জীবনের কথা সে কখনও ভাবেনি। তার চরিত্রের স্বাভাবিক কর্তৃত্বপরায়ণতা বাধা পেতে কোনও দিন অভ্যস্ত ছিল না। এখন রাখির উপর তার নিজের মত চাপাতে গিয়ে দেখল সব কিছু বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়ার মেয়ে নয় তার স্ত্রী। তার একটা নিজস্ব স্বর আছে। আনুগত্য আশা করা যায়, কিন্তু জোর করে আদায় করা যায় না।

চা-বাগানের মেয়ে রাখি। বিতানের কোলিগ সূর্যর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল রাখির বন্ধু রঞ্জনার। তবে চা-বাগানে নয়, সূর্য বলেই দিয়েছিল অন্তত কাছাকাছি কোনও শহরে যেন বিয়ের ব্যবস্থা করে ওরা। সে ভাবেই জলপাইগুড়িতে রঞ্জনার পিসির বাড়িতে এনে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বরযাত্রী বিতান বিয়ের আসরে রাখিকে দেখে একদম চমকে গিয়েছিল। দুর্গাপ্রতিমার মতো টানা চোখ, মাথায় কোঁকড়া কালো চুলের ঢল। সবাই যখন হালকা ইয়ার্কি মারছে, রাখি আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভিড়ের মাঝেও অনন্যা। বরযাত্রীরা নতুন বৌ ফেলে রাখিকেই ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। বিতান কায়দা করে রাখির চেহারা, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার শরীরও মেপে নিয়েছিল চোরা-চাউনি দিয়ে। অস্বীকার করে লাভ নেই, বিয়ের আসরেই তার রাখিকে দেখে সামান্য যৌন উত্তেজনা হয়েছিল। মনে হয়েছিল চা-বাগানের নরমসরম মেয়ে, নিজের পছন্দ মতো তৈরি করে নেবে। বাগানের মেয়ে হলেও শহরের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছে। জড়সড় নয়। স্মার্ট। ভাল লেগেছিল বিতানের। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি। এখন মনে হয় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেদিন। রাখিকে আর ভাঙাগড়া যাবে না। রাখি ফিনিশড প্রোডাক্ট।

প্রথম দিকে রাখি অনেক কিছু মেনে নিত। দোকানে গিয়ে বিতানের পছন্দের শাড়ি নিত। বেডকভার, সোফার কভার, জানলা-দরজার পর্দার কাপড়, সব কিছু বিতানের পছন্দ অনুযায়ী কেনা হত। একটু-একটু করে রাখি তার স্বাধীন ইচ্ছে প্রকাশ করে ফেলত। বিতানের পছন্দ-করা শাড়ি না নিয়ে নিজের পছন্দসই শাড়ি নিয়ে ফেলত। রাখি দেখল সে রকম দিনে বিতান সারাদিন মুখ গম্ভীর। বুঝতে পারত, রাতে তুচ্ছ অজুহাতে তাকে তিক্ত কথা শোনাবে বিতান। পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। রাখিকেই তার রাগ ভাঙাতে হবে। তার পর হিংস্রতা নিয়ে দাঁত, নখের ব্যবহার শুরু করবে বিতান। কোনও আদর নয়, ভালবাসার কথা নয়, লাঙলের ফলায় নির্মম ভাবে মাটি দীর্ণ করে মাংস খুঁজবে। ক্রমশ আনন্দ চলে গিয়ে বিরক্তি বাড়ছিল রাখির। একটু-একটু করে মানসিক দূরত্ব বাড়ছিল। খুব সামান্য ব্যাপার নিয়েও কথা বন্ধ হয়ে যেত। সম্পর্কে তিক্ততা আসছিল। সেটা দু'জনই বুঝতে পারছিল। কিন্তু দু'জনই লুকিয়ে রাখত সেটা। হঠাৎ কোনও-কোনও দিন নিষ্ঠুর আঘাত করত বিতান। রাখি প্রথম-প্রথম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তার পর সেও প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল।

বিয়ের আগে বিতান বেশ ক'বার রাখির সঙ্গে দেখা করেছে। বিতান কবিতা লেখে। তাঁর বন্ধুরা প্রায় সবাই গল্প-কবিতার লাইনের। এক সময় ওদের সঙ্গে হইহই করে পত্রিকা বের করেছে বিতান। বিয়ের আগে এ সব গল্প বলার সময় রাখি কবিতা নিয়ে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিল। বিতান বলেছিল তার কবিতা সঙ্কলন বেরোবে নামী প্রকাশনা থেকে। রাখির চোখে আনন্দের আভা দেখে বিতান খুশি হয়েছিল। এক দিন সূর্যর নিরিবিলি কোয়ার্টারে বিতান শরীরী কামনায় একটু বেশি উতলা হয়ে পড়েছিল। প্রবল বাধা দিয়েছিল রাখি।

"কেন রাখি, আমাদের তো বিয়ের ডেট পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। আমি তো বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করতে চাইছি না। এক বার সেক্স করলে কিসের সমস্যা? তোমার ইচ্ছে করছে না?"

"অসম্ভব, পারব না। আমি রক্ষণশীল নই, কিন্তু আমার একটা এথিক্স আছে। জোর কোরো না, প্লিজ়। ক'টা দিন অপেক্ষা করো। অপেক্ষার ফল দেখবে অনেক বেশি মিষ্টি লাগবে।"

"ও সব পুরনো প্রবাদ এখন অচল। জীবন এখন অনেক ফাস্ট। কবে স্বাভাবিক নিয়মে ফল পাকবে, তার জন্য ক্ষুধার্ত মানুষ অপেক্ষায় থাকে না এখন।"

"কিছু-কিছু প্রবাদ খুব সত্যি কথা, চিরকালের জন্যই। লাইফ ফার্স্ট কিংবা স্লোয়ের ধার ধারে না। নিত্যকালের সূর্য ওঠার মতো। কার্বাইড দিয়ে পাকানো ফল আর গাছপাকা ফলের স্বাদ আলাদা হয়।"

"রাখি, আমি...আমি আর পারছি না। এখন এ সব কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এসো..." ভিখারির মতো রাখির হাঁটু জড়িয়ে কোলে মাথা রেখে বিতান ভিক্ষা চেয়েছিল।

কিন্তু হতাশ হয়েছিল বিতান। রাখি কিছুতেই রাজি হয়নি। অথচ সেদিন শুধু মানসিক প্রস্তুতি নয়, সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিয়ে বিতান প্রস্তুত ছিল। অবশ্য শুধু সে দিন নয়, আরও কয়েক বার নরম কথায় রাখিকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি। তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল রাখি। বিতানের মনে হয়েছিল এই মেয়ে ততটা নরম নয়। তার ভেতরে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা রয়েছে। অথচ এক সময় বিতান ধরেই নিয়েছিল, চা-বাগানের সামান্য মেয়ের সাধ্য হবে না তাকে অস্বীকার করার। এক বছরের ভেতরেই বিতান বুঝেছিল, যে কোনও অন্যায়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে রাখির। সেখানে সে কোনও আপস করতে রাজি নয়। প্রায়ই হেরে যাচ্ছিল বিতান। তাঁর জীবনযাপনের ছকবাঁধা রুটিন ভেঙে যাচ্ছিল। রাখি তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর ততই সে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠছিল।

তাড়াহুড়োয় সে দিন ফোন নিয়ে বেরোতে ভুলে গিয়েছিল বিতান। কলেজে বেরোনোর আগে কত কিছু মনে করে নিতে হয়। টিফিন-বক্স, জলের বোতল, ড্রয়ারের চাবি, পার্স, মোবাইল। বিয়ের আগে কলেজের ক্যান্টিনে টিফিন সেরে নিত। ওখানে ভাল ফিল্টারের জল, নিশ্চিন্তে খেয়ে নিত। রাখি সে সব নিয়ম পাল্টে দিয়েছে। বাড়ি থেকে রাখির তৈরি টিফিন আর জলের বোতল নিয়ে যেতে হয়। মৃদু আপত্তি তুলেছিল বিতান। রাখির যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে মেনে নিয়েছিল।

অফিসে গিয়ে দেখল পকেটে ফোন নেই। সর্বনাশ, নিশ্চয়ই রাস্তায় চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না বেরোনোর সময় পকেটে মোবাইল নিয়েছিল কি না। ইতিহাসের সত্য মণ্ডলের কাছ থেকে ফোন চেয়ে নিয়ে নিজের নম্বরে ফোন করেছিল। এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, তার নিজের নম্বরই মনে পড়ছিল না। শেষে সত্যকে বলেছিল তার নম্বরে ফোন করতে। দুরু দুরু বুকে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফোন বেজেছিল। ও পাশ থেকে রাখির গলা পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিল। যাক, হারায়নি। বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোনও অজানা কারণে তার মেজাজ বিগড়ে রইল। আসলে সঙ্গে মোবাইল থাকাটা জীবনযাপনের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে যে, বাড়ির বাইরে থাকলে সঙ্গে যদি তার স্মার্টফোন না থাকে, কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। মনে হয় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একলা মানুষ হয়ে গেছে। তাকে যদি সবাই ভুলে যায়? ভেসে থাকতে হবে, সব সময় ভেসে থাকতে হবে স্রোতে। এক বার তুমি সার্কিট থেকে বেরিয়ে গেলে মুহূর্তেই তোমার শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে ফিরে এসে আর তোমার জায়গাই খুঁজে পাবে না। কে জানে, হয়তো সবারই এমন মনে হয়।

"দুপুরে বা বিকেলে মোবাইলে আমার কোনও কল বা মেসেজ এসেছিল?" কলেজ থেকে ফিরেই রাখিকে প্রশ্ন করেছিল বিতান।

"কেন? কোনও কল আসার কথা ছিল নাকি? আর মেসেজ এলে তো ইনবক্সেই পাবে, দেখে নাও।"

"আমার কোনও প্রশ্নের তুমি সোজা উত্তর দিতে পারো না?"

"সোজা উত্তর দিলেও তুমি সেখানে বাঁকা কথার গন্ধ পাও। কী করব, আমার মন বাঁকা, আমার বাপের বাড়ির সব কিছু বাঁকা। গিয়ে দ্যাখো, আমাদের মথুরাপুর চা-বাগানের বাড়ির উঠোনটাও তোমার কাছে বাঁকা মনে হবে।"

"বেশি বড়-বড় কথা বোলো না। ভুল করে বাড়িতে ফোন রেখে গেলে তুমি কললিস্ট চেক করো না? ইনবক্স খুলে মেসেজ পড়ো না?"

"কে বলেছে?"

"কেন, ক'দিন আগেই তো শোনালে, আমি এখন বেশ ভালই মোবাইল অপারেট করা শিখেছি। মেসেজ ডিলিট করাও শিখে গেছি। নিশ্চয়ই তুমি আমার ইনবক্স খুলে দেখেছ ফাঁকা।"

"কী হয়েছে তাতে? স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে কেন গোপনীয়তার আড়াল থাকবে? তাদের কেন আলাদা প্রাইভেট লাইফ থাকবে?"

"প্রাইভেট লাইফ বলতে কী বোঝাতে চাইছ তুমি? বিবাহ-বহির্ভূত কোনও বিশেষ সম্পর্ক? আমাকে অবিশ্বাস করো তুমি! শ্রদ্ধাভক্তি তো দূরের কথা, আমার উপরে সামান্য বিশ্বাসটুকুও তোমার আর নেই। প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তার জগৎ থাকতে পারে। সেখানে সে একদম একা। সেটা তোমারও থাকতে পারে। আমি তো ভাবতেই পারি না চুরি করে তোমার ফোন খুলে দেখছি। তা ছাড়া তুমি তো কী একটা কোড দিয়ে ফোন লক করে রাখো।"

"ছিঃ, তার মানে বলতে চাইছ আমি চুরি করে তোমার ফোন খুলে দেখি। এই নাও, আমার ফোনের লক খুলে দিচ্ছি। তোমার যা খুশি, যত ক্ষণ খুশি দেখো।"

"না, আমি সেটা মিন করিনি। শোনো, প্রতিটা মানুষের বুকের গভীরে একটা দিঘি থাকে। সেখানে সে শুধু নিজের মুখের ছায়া দেখতে পায়। তুমি তো এ সব বিশ্বাস করো না। তুমি মনে করো ইনবক্স ফাঁকা, সব মুছে দিয়েছি আমি। সুতরাং গোপন কোনও জীবন আমি যাপন করছি। তোমার ধারণা আমার মেসেঞ্জারে রোজ অসংখ্য মেসেজ আসে বা কল আসে, সেগুলো নিশ্চয়ই সবই সুন্দরী তরুণীদের। পড়া হলে আমি সেগুলো মুছে ফেলি। সন্দেহ একটা ধূসর অন্ধকারের মতো তোমার মনের ভেতরে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। এই সন্দেহের স্বপক্ষে স্পষ্ট অবয়ব তৈরি করতে না পারার কষ্টে তুমি ক্রমশ স্বরাষ্ট্র দফতরের দুঁদে আমলার মতো রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছ।"

"এই শুরু হল তোমার ভারী-ভারী কথার মারপ্যাঁচ। কী করে এত বড়-বড় কথা বুঝব বলো। মূর্খ পরিবার থেকে এসেছি। নর্থ বেঙ্গলের এক চা-বাগানের সামান্য বাগানবাবুর মেয়েকে বিয়ে করে উদ্ধার করেছ। তোমাদের কত মহান পরিবার। তোমার কত কবিবন্ধু, লেখকবন্ধু। কত নেতামন্ত্রীর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ। কত উচ্চমার্গের আলোচনা হয় তোমাদের। কত মেয়ে তোমার কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক। সরি, পাঠিকা। আমি কী এমন খারাপ কথা বলেছিলাম? বলেছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর আর আলাদা কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারে না। একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জনই দু'জনের কাছে যথেষ্ট।"

"ভুল জানো। এই ভুল জানা থেকে তোমার চিন্তাভাবনার জগতে একটা ছোট্ট ধূসর বিন্দু ক্রমশ বিশাল জমাট অন্ধকার হয়ে আমাদের সম্পর্কের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আমাদের জীবনযাপনের শিরা-ধমনী বেয়ে। রাস্তায় তাকিয়ে দেখো, মানুষের স্রোত চলেছে। অথচ সবাই আসলে একা-একা হেঁটে চলেছে। মানুষ আসলে একা।"

"তোমার কথার খেলা বহু দিন ধরে শুনে আসছি। এই মারপ্যাঁচে তুমি অনেককেই ঘায়েল করেছ, বুঝতে পারি। বড়-বড় সাহিত্যের ভাষা আমি অত বুঝি না। আমি সোজা কথার মানুষ। তুমি যখন ব্যাচেলর ছিলে, বা আমিও, তখন নিশ্চয়ই আমাদের একটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যক্তিগত জগৎ ছিল। কিন্তু এখন তো দু'জনকেই পরস্পরের কমফোর্ট জ়োনটা বুঝতে হবে। জবরদস্তির ব্যাপার নয়। একটা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আমাদের সংসার চালাতে হবে। তুমি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আমি অবশ্যই বলব। প্রতিবাদ করব।"

"আমিও তো তাই বলছি। দু'জনেরই একটা আলাদা স্পেস থাকা উচিত। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"আর আমি বলছি সেই স্পেসে অন্যের ঢুকে পড়াটা কি অস্বাভাবিক?"

আর কথা বাড়ায়নি বিতান। এক বার কথার জঙ্গলে ঢুকে পড়লে বেরোনোর পথ থাকে না। দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেক কষ্টে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় বিতানকে।

বিতান প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনের সময়। তাদের ওয়ার্ডে বুথ ছিল নিশিকান্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুলে। তাদের কমপ্লেক্স থেকে দশ মিনিটের পথ। সে দিন দুপুরে টুথপিক দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি পরিষ্কার করছিল বিতান। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সে খুব সচেতন। সময়মতো পরিষ্কার না করলে জীবাণুর আক্রমণে পচন ধরে। মুখে বড় গন্ধ হয়। বাংলার অধ্যাপক বিতান দত্ত জীবাণু বিষয়ে আর বিশেষ কিছু জানে না। মনে হলে মাউথওয়াশ ব্যবহার করে নেয়। তার পান-সিগারেট খাওয়া নিয়ে রাখির সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। শেষে মাঝে-সাঝে একটা-দুটো, এই শর্তেই বিতান রাজি হয়েছিল। বিফল রাত্রি তাঁর পছন্দ নয়। মাথা গরম হয়ে যায়। ছটফট করে। আর রাখি ভাবে দিনের শান্ত, মার্জিত তার অধ্যাপক বর রাতে কেমন হিংস্র মাংসাশী হয়ে ওঠে। কবি বিতান দত্ত তছনছ করে করে দেয় রাখির শরীর। রাখির ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে, রাখির ব্যথার অনুভবকে উপেক্ষা করে তার সুখ সে আদায় করে নেয়। রাখির সুখের খোঁজ সে রাখে না। পাশ ফিরে শুয়ে খুব সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রাখি। তার অতৃপ্তির কথা মিশে যায় অন্ধকারে। মশারির ঘেরাটোপে।

সকালেই বিতান বলে দিয়েছে আজ এক বিশেষ দিন, আজ বেশ একটা জর্দাপান আর সিগারেট খাবে কিন্তু। ভ্রুভঙ্গি করে চুপ করে ছিল রাখি। বিতান বুঝেছিল রাখি বেশি ঝামেলা করবে না। বিতান বুঝতেও পারে না রাখির মনের কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে যে সিগারেট ধরায়, মুখে জর্দাপান দেয়, রাখি টের পায়। তার প্যান্টের পকেটে তামাকের গুঁড়ো পায় মিনুর মা, তার সাদা পাঞ্জাবিতে পানের ছিট লেগে থাকে। কিছু বলে না রাখি। বলে কী লাভ? সজ্ঞানে মিথ্যে বলে যাচ্ছে কবি বিতান দত্ত। ফেসবুকে যার ফলোয়ার দু'হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী কবিদের মাঝে সম্মাননীয় কবি বিতান দত্ত। বিতানই এক দিন বলেছিল আসানসোল থেকে 'অস্থি' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা বেরোচ্ছে তাকে নিয়ে। তার কবিতার দর্শন নিয়ে। এই কবি রাত্রি নামলে রাখির শরীরের মাটি ঘাঁটাঘাঁটি করে। বিবিধ পন্থায় মাটি থেকে মাংসের গন্ধ তুলে আনে। কষাটে চা পাতার তীব্র গন্ধ চাপা পড়ে যায় আদিম ক্ষার গন্ধে।

"প্লিজ় রাখি, রেসপন্স করো," কাতর কণ্ঠে বলবে বিতান। নির্বিকার, উদাসীন থাকবে রাখি, ছিন্ন হতে-হতে মনে করার চেষ্টা করবে মথুরাপুর চা-বাগানের আদিবাসী রমণীর যৌথনৃত্য, সমবেত সঙ্গীত। 'সাসাংবেড়া রে বন জাত এনা হো।' সেই প্রাচীন গান রাখির বুকের ভেতরে বেজে যায়। তার মনে হয় এই মশারির ঘেরাটোপ সেই চায়চাম্পা দেশ। সে ছিল নিশ্চয়ই এক পাহাড়ি উপত্যকা। ঝর্না ছিল। মাদল আর বাঁশির সঙ্গে কামনার মদস্রাবী গন্ধ নিয়ে দুরন্ত যৌবনবতী মেয়েদের উদ্দাম নাচ ছিল। নাচতে-নাচতে ওরা মঞ্জিথানে এল। তখন ওরা নাচে অর্ধচন্দ্রাকারে। তার পর সাসাংবেড়ায় এসে গোত্রে-গোত্রে ভাগ হয়ে গেল ওরা। সোমরা ওরাওঁয়ের কাছে গল্প শুনত রাখি। উত্তরের ধূমল পাহাড়। রাখি তাকিয়ে দেখে দুটো পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় একটুকরো সাদা মেঘ আটকে আছে। আবার কখনও

অবিরল বৃষ্টির ধারাপাত। সেই মহুয়া গাছে ফুল ফুটলে তার তীব্র মাদক-গন্ধ। সোমরা বলত, 'হাতি আসতে পারে।' রাখির শরীরেও কি সেই গন্ধ জড়িয়ে আছে? সেই গন্ধেই কি দামাল একটা হাতি রাতে তাকে তছনছ করে দেয়? মত্ত দন্তীর সেই আঘাত যতটা না শরীরে, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যথা দেয় মনে।

বেশ মনোযোগ দিয়ে দুর্গম অঞ্চল থেকে মাংসের কুচি খুঁচিয়ে বের করে তৃপ্তি পেল বিতান। পান এনে রেখেছে। এবার বেশ জমিয়ে পান মুখে দেবে। দু'বার পিক ফেলার পর যখন বেয়াড়া সুপুরির টুকরো জব্দ হয়ে আসবে, তখন একটা সিগারেট ধরাবে।

"রাখি, এ বেলা গিয়ে তোমার ভোটটা দিয়ে এসো। এখন একটু ফাঁকা হয়েছে বোধ হয়। বেশি দেরি কোরো না। একা যাবে, নাকি আমি যাব সঙ্গে?"

"তোমার যেতে হবে না। আমি আর মিনুর মা এক সঙ্গে যাব।"

"তোমাদের না কাক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই! অলীকবাবুর মিসেসের সঙ্গে গেলেই পারতে। আর শোনো, সেই মুগা রঙের সিল্কটা পরে যেয়ো।"

রাখি কিছু বলল না। আজ কী করতে হবে, না হবে, সে ব্যাপারে আরও অনেক কিছু তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে বিতান। তৈরি হয়ে ভোটার কার্ড নিয়ে মিনুর মায়ের সঙ্গে রাখি বেরোল। বিতান বাথরুমে ছিল। না হলে অবাক হয়ে দেখত রাখি তার নিজের পছন্দমতো একটা ব্রাইট কালারের শাড়ি পরেছে।

রাখি সকাল থেকেই টের পাচ্ছিল বিতানের শরীর-মনে আজ একটা উত্তেজনার চোরা স্রোত বইছে। রাতের খাওয়া শেষ হলে বিতান এসে ব্যালকনিতে বসল।

"রাখি, তোমার জন্য ফ্রিজে পান রেখে দিয়েছি। বারান্দায় এসো।"

"জর্দা নেই তো? বমি হয়ে যাবে কিন্তু আমার।"

"না না, মিষ্টি পান।"

রাখি জানে এ সবই ভণিতামাত্র। বিতান দত্ত ওত পাতছে। লেজে মোচড় দিচ্ছে।

আজ বিতানই বিছানা পরিষ্কার করে মশারি টাঙিয়েছে। দরজা-জানলা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে রাখি বিছানায় এল।

"তোমাদের লাইন... ভিড় ছিল নাকি?"

"খুব বেশি নয়। আমার আগে চার-পাঁচজন ছিল।"

"হাওয়া কেমন বুঝলে?"

"দাঁড়াও না, এত তাড়াহুড়ো করছ কেন।"

দীর্ঘ উপোসী ভাইপারের মতো পাক খুলতে থাকে বিতান। প্রবাদের মতো নিঃশ্বাসে টানে হরিণীকে। বিতান একটু অবাক হচ্ছিল। আজ রাখির ভেতরেও যেন নতুন একটা জাগরণ দেখতে পাচ্ছিল। আজ কোনও মাটি নেই, শুধুই জৈব গন্ধ। বিতান জীবনে প্রথম অন্য স্বাদ পাচ্ছিল। অন্য রকম অভিজ্ঞতা।

"যেখানে বলেছিলাম, সেখানেই কাস্ট করেছ তো?"

"উম, পরে বলব।"

"বলো না, সেখানেই দিয়েছ তো?"

"উঁহু, আমি আমার পছন্দের চিহ্নে কাস্ট করেছি।"

মুহূর্তেই রাখি টের পেল বিতান দৃঢ়তা হারাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে। গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। শিথিল বিতান কোনও জ্বলন্ত অঙ্গারে পুড়ে ছাই হতে থাকে। আর লক্ষ বছরের খিদে নিয়ে রাখি ক্রমশ গ্রাস করতে চায় বিতানকে।

"কী হল তোমার?"

"সরে শোও রাখি, আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন গো, শরীর ভাল নেই?"

"না," বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল বিতান।

রাখি হাসছিল। বুঝতে পারছিল বিতান আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে। যেন একটা বিশ্বাসের, অন্ধ অহঙ্কারের স্তম্ভ ভেঙে যাচ্ছে। ধসে পড়ছে বিতানের অস্তিত্ব। যেন রাখির ওই একটা ভোটে এই নির্বাচনী এলাকার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। হেরে যাবে বিতান যে ঘোড়ার উপর বাজি রেখেছে। এ পাশে ফিরলে বিতান দেখতে পেত অন্ধকারেও রাখির দাঁত ঝকঝক করছে। নিঃশব্দে হাসছে রাখি। ভয় পেত বিতান।

২

সাধন হালদারের অনুশীলনের সময় তার ঘরে প্রবেশ করা বারণ। সে নিজেই দরজার উপর নোটিশ সেঁটে দিয়েছে 'রেওয়াজের সময় শিল্পীকে বিরক্ত করিবেন না'। মেয়েলি ছাঁদের হাতের লেখা সাধনের। ভোরবেলায় ছ'টা থেকে আটটা, সন্ধেয় সাতটা থেকে ন'টা। পাড়ার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির সেক্রেটারি বাদল ঘোষ কথা দিয়েছে, এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাধন হয়তো সুযোগ পাবে। বাদল ঠিক কথা দিচ্ছে না, কিন্তু সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

সাধনের মুশকিল হল, সে হাতে একবার মাইক্রোফোন পেলে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বছর দুয়েক আগে নবপল্লীর বিজয়া সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিতে হয়েছিল। সেটাই ছিল তার শেষ অনুষ্ঠান। তার পর থেকে কেউ আর তাকে ডাকছে না। প্রথম যে বার সে মঞ্চে সুযোগ পেয়েছিল, তাক লাগিয়ে দিয়েছিল শ্রোতাদের। প্রথমে উইংসের আড়াল থেকে সে দু'কলি গায়, তারপর হাতে মাইক্রোফোন নিয়েই গাইতে-গাইতে মঞ্চে ঢোকে। পাবলিক হাততালিতে ফেটে পড়ে। হালদারবাড়ির ছোটছেলে সাধন হুবহু লতার গলায় গাইছে। চোখ বুজে শুনলে কে বলবে লতা মঙ্গেশকর নয়। চোস্ত পাজামা আর কাজকরা পাঞ্জাবি পরে, চোখে হালকা কাজলের রেখা, মঞ্চে ঘুরে-ঘুরে লতাকণ্ঠী হয়ে গাইতে থাকে, 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে জাগো রে'। 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে ...' গান শেষ হলে মিষ্টি করে হাসে। তার মঞ্চে ঘুরে-ঘুরে হাঁটার ধরনে নারীসুলভ কমনীয়তা, লাবণ্য থাকে। তারপর ধরে, 'দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা'। উল্লাসে ফেটে পড়ে পাবলিক। সিটি দেয়। পর্দার আড়াল থেকে সে যখন গান শুরু করেছিল, সবাই ভেবেছিল চমৎকার গলা তো মেয়েটির। একটু বাদে সাধন হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে স্টেজে ঢুকলে দর্শকেরা প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, তার পর হাততালিতে ফেটে পড়েছিল। এর পর থেকে বাইরে ডাক পেতে শুরু করে সাধন হালদার।

বর্ষাকে নিয়ে শম্পা এসেছিল জলপাইগুড়ি থেকে। এ বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিল, "সাধনদা কোথায় পিসি?"

"শুনতে পাচ্ছিস না, দরজা বন্ধ করে মেয়েদের গলায় গান প্র্যাক্টিস করছে। আজকাল আবার নতুন কায়দা ধরেছে। একাই দু'রকম গলায় গান করে। এক বার ছেলেদের গলায়, এক বার মেয়েদের গলায়। ডুয়েট। শুধু মেয়েদের গান নাকি বাজারে আর চলছে না। কিশোর-লতাই বেশি চলছে। এ মেয়েটা কে রে শম্পা? কী মিষ্টি চেহারা!"

"ও আমার বন্ধু, বর্ষা। ময়নাগুড়ি কলেজে পড়ায়।"

"যা, তোরা বাইরের ঘরে বোস। আমি আসছি।"

"না না পিসি, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। বড়বৌদি ঘরে আছে না?"

"সারাদিন কম্পিউটারে ইস্কুলের ক্লাস নেয়। কোথায় আর যাবে।"

"ছোটু আর মিঠু? ওদেরও তো অনলাইন ক্লাস। এটা নাও, তোমার পছন্দের জিনিস। দিলুদার দোকানের ক্ষীরদই। আর এই তোমার জর্দার কৌটো। জর্দাটা এ বার কমাও পিসি। যা শুনি মাঝে-মাঝে..."

"এ সব আবার আনতে গেলি কেন? রাখ টেবিলে। একটা কথা বলি শম্পা তোকে। তোর কথা হয়তো সাধন শুনতে পারে। ছোটবেলা

থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছিস। ওকে এ সব গানটান ছেড়ে কোথাও একটা চাকরির চেষ্টা করতে বল না! এসব করে কত বড় আর্টিস হবে, বল! ও সব মেয়েলি গলার গান, আজকাল লোকজন হাসাহাসি করে। পথেঘাটে ওকে দেখলেই আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় গান করে। তুই ব্যাটাছেলে, দাপটে থাকবি। তা নয়, নামেই ছেলে, কাজে মেয়েরও অধম। কী বলব তোকে, তোর বন্ধু রয়েছে, তার সামনে বলতে লজ্জাও করে। পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছে সাধনা।"

শম্পা হাসল। এ ভাবে যে বেশি দিন চলবে না, সাধনকে বলে লাভ নেই। লোকে গান নয়, এক ধরনের মজা পাচ্ছে, সেটা সাধনের মাথায় ঢুকবে না। তার ধারণা শিল্পী হিসেবে সে বেশ নাম করে ফেলেছে। এ রকম গান করে সে কত দূর উঠবে! সাময়িক হুজুগে লোকে শুনছে। নতুন খেলনা পেলে বাচ্চারা যেমন কিছু দিন খেলে তার পর হারিয়ে ফেলে, সাধনও হারিয়ে যাবে।

"পিসি কিছু মনে কোরো না। দোষ তোমারও আছে। আমরা তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। পরপর দুই ছেলের পর খুব মেয়ের শখ ছিল তোমার। সাধনদাকে মেয়েদের ফ্রক পরিয়ে রাখতে, কাজল পরাতে, কপালে টিপ পরাতে। চুল কাটাতে না। বড় চুলে চুড়োখোঁপা বেঁধে দিতে। সাধনদা নাকি তোমার রাধারানি। ওর বয়সি ছেলেরা যখন ধুলোবালি মেখে রাস্তায় বা মাঠে খেলছে, কাদা মাখছে, মারামারি করছে, সাধনদা তখন মেয়েদের সঙ্গে রান্নাবাটি খেলত। ওকে কোনও দিন বন্দুক কিনে দাওনি, দামি-দামি পুতুল কিনে দিতে। হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গিতে মেয়েলিপনা দেখেও পাল্টানোর চেষ্টা করোনি। এখন আর ওকে ব্যাটাছেলে কেমন করে বানাবে?"

চুপ করে রইলেন শম্পার পিসি। শম্পাকে উত্তর দেওয়ার মতো কিছু নেই। সত্যিই সাধনকে মেয়ে সাজিয়ে রেখে তার এক রকম সুখ হত। হারাধন, বাঁধনের পর আবার ছেলে হলে মনে-মনে ভাবতেন তার দুই ছেলে, এক মেয়ে। ভগবান ভুল করে সাধনের শরীরটা ছেলেদের মতো করে দিয়েছে। সে ভাবেই তাকে বড় করে তুলেছেন। আস্তে-আস্তে দেখলেন তার স্বভাব, চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি ক্রমশ মেয়েদের মতো হয়ে যাচ্ছে। চেহারাতে পুরুষালি ভাবটাই নেই। আত্মীয়স্বজন এলে তাকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করত। "নিলু, তোর ছোটছেলেটা একদম মেয়েদের মতো হয়েছে," বলত। সেটা নিলুপিসিও বুঝতে পারতেন। এক রকম ভয় করে উঠত বুকের ভেতরে। সাধনের মেয়েবন্ধুরা আসত বাড়িতে। তাদের সঙ্গে স্কুলে যেত। দরজা বন্ধ করে গল্প করত। সবাই মিলে নখে নেলপালিশ লাগাত। বড়ছেলে হারাধন একদিন তার বাবরি চুলের গোছা বাড়িতে নাপিত ডেকে ছোট করে কেটে দিলে সে কী কান্না সাধনের।

"হ্যাঁ রে শম্পা, আমারই ভুল। ওর মনটাই পাল্টে গেছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় ছেলেদের শরীরটাই ওর এখন শত্তুর। না পুরোপুরি ব্যাটাছেলে, না হয়েছে পুরো মেয়ে।"

"হ্যাঁ পিসি, এটা একটা অসুখ, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয়। আসলে কিছু হরমোনের খেলা। থাক, ও সব তুমি বুঝবে না।"

"আমার আর কিছু বুঝতে ইচ্ছেও করে না। তোর কথা শোনে, দ্যাখ, এসব অমুককণ্ঠী-তমুককণ্ঠী না হয়ে নিজের গলায় গান গাইতে পারে কিনা। গলায় ভাল সুর আছে ওর। হারাধন বড় হেনস্থা করে ওকে। অত বড় ছেলের গায়ে হাত তোলে। আমি কিছু বলতে গেলে আমাকেও প্রায় মারতে আসে। আমার জন্যই নাকি ম্যাদামারা হয়েছে। ছুটিছাটায় বাঁধন এলেও ওর পেছনে লাগে। কোনও সময় 'সাধন' বলে ডাক দেয় না। 'এই যে সখী' বলে ডাকে। আজ পর্যন্ত কোনও দিন ভাই বলে ডাকেনি। আমি বুঝতে পারি, ওরা দু'জনই ঘেন্না করে ওকে। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ কাঁদে ছেলেটা। আমার ভয় করে কোন দিন না কোনও অঘটন ঘটিয়ে বসে। হারাধন তো হাবেভাবে বলেই দিয়েছে ওর নিজের ব্যবস্থা যেন নিজে করে নেয়।"

একটু আড়াল থেকে বর্ষা ইশারা করছিল শম্পাকে। এ সব কথা সবই তার জানা। শম্পা সবই বলেছে। এলজিবিটিকিউ নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে নানা রকম আলোচনা করত শম্পার সঙ্গে। কথায়-কথায় শম্পা একদিন তার পিসতুতো দাদা সাধনের কথা বলেছিল। খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল বর্ষা। এক দিন আলাপ করতে চেয়েছিল। আসলে আলাপের ছলে একটা সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিল বর্ষা। মোটামুটি ঠিক করেছিল ট্রান্সদের নিয়েই কাজ করবে। সেজন্য তার উৎসাহ ছিল এখানে আসার। জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি এমন কিছু দূরও নয়। তাকে রোজ কলেজে আসতে হয়। সাধন হালদারের সঙ্গে কথা বলার জন্য বর্ষা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শম্পা বাংলা পড়ায়। এসব ভাল বোঝে না। দু'জনে রায়কতপাড়ায় একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে। বর্ষা বটানির। নিজস্ব কৌতূহলে তার প্রথমে সাইকোলজি, পরে এজিবিটিকিউ নিয়ে পড়াশোনা। যৌনতার রকমফের। কী বিচিত্র, কত রকমের রহস্যে মোড়া মানুষের মনের অন্দরমহল। বর্ষা মাঝে-মাঝে ভাবে মানুষের শরীর মনকে চালায়, নাকি মনই শরীরের নিয়ন্ত্রক। বড় গোলমেলে ব্যাপার। আরও কত রকম কারণ কাজ করে। এ নিয়ে কিছু লেখাও তার বেরিয়েছে।

দরজায় সাঁটা নোটিস দেখে একটু হাসল শম্পা। দরজায় টোকা দিয়ে মৃদুস্বরে ডাক দিল, "ছোড়দা, আমি শম্পা। দরজা খোল।"

"তোর সঙ্গে কে আছে?" একটু সময় নিয়ে জানতে চায় সাধন।

"আমার বন্ধু। বর্ষা। কলেজে পড়ায়। দরজাটা খোলো না।"

একটু বাদে দরজা খুলল সাধন। একটা ঢোলা পাজামা আর উজ্জ্বল মেরুন কালারের ছোট ঝুলের পাঞ্জাবি পরে। ঠোঁটদুটো খুব চকচকে। শম্পার মনে হল চট করে একবার হালকা লিপগ্লস লাগিয়ে নিয়েছে। চোখে খুব সূক্ষ্ম কাজলরেখা।

"আয়, ভেতরে আয়। বোস।"

দেওয়াল ঘেঁষে দুটো অনেক পুরনো বেতের চেয়ার। সে দুটো দেখাল সাধন। ওরা বসল।

"এ আমার বন্ধু বর্ষা। বর্ষা রায়চৌধুরী। বটানি পড়ায়। একটু-আধটু সাইকোলজি নিয়েও পড়াশোনা করে। তোর গান শুনবে বলে আমায় খুব ধরেছে। শোনাবি না?"

সাধনের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাত জোড় করে নমস্কার করল। বর্ষাও প্রতিনমস্কার জানাল।

"তুমি কি গান শেখো?"

বর্ষার ইচ্ছে করছিল ফোনে সাধনের সঙ্গে তার কথাবার্তা রেকর্ড করে রাখতে। সাধনের প্রতিটি নড়াচড়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল। তার শরীর, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের লম্বা নখে বেগুনি রং। কত সহজেই সে বর্ষাকে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলল। বর্ষা ছেলে হলে এই স্বাভাবিকতা কি সাধন দেখাত?

"না না, আমি আসলে...ওই, গান সংগ্রহ করে বেড়াই। শুনলাম আপনার কাছে কিছু রেয়ার গান আছে। সেগুলো আপনি নাকি ফিমেল ভয়েসে অসাধারণ করেন। সে রকম একটা-দুটো শুনব। আপনার আপত্তি না থাকলে রেকর্ড করব। এখনকার নয়, একটু পুরনো গান আমার পছন্দ। দোমোহনির পূরবী অধিকারীর গান শুনেছেন আপনি?"

"এই শম্পা, এ তোর কেমন বন্ধু রে! আমাকে 'আপনি আপনি' করে যাচ্ছে। ভাল লাগে না ভাই। অ্যাই মেয়ে, আমাকে বন্ধুর মতো 'তুমি' বলতে পারছ না? তুইও বলতে পারিস।"

শম্পার সঙ্গে চোখে-চোখে কথা হল বর্ষার। মাথা নামিয়ে মুখের গোপন হাসিটুকু আরও গোপন করল বর্ষা। মনে-মনে ভাবল, হ্যাঁ, এ রকমই তো হওয়ার কথা। ব্যস্ত হয়ে ব্যাগ থেকে ফোন বের করতে গেল। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সাধন গান শুরু করল। লতার গান। 'এক প্যায়ার কা নগমা হ্যায়'।

প্রথমে বর্ষাও চমকে উঠেছিল। নিখুঁত সুরে গাইছে সাধন হালদার। চোখ বুজে শুনলে বোঝার উপায় নেই কোনও ছেলে গাইছে। পুরোটা না হলেও লতার গায়কি কিছুটা রপ্ত করেছে। বর্ষার মনে হল ওইটুকু নকল না করলেই হত। ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে গাইলে আরও ভাল লাগত। একটু অস্বাভাবিকও লাগছিল। মনে হচ্ছিল টিভিতে কোনও মিমিক্রি শো দেখছে।

"বাঃ, খুব ভাল লাগল। আপনি, ইয়ে...তুমি, তোমাকে একটা কথা বলব?"

"হ্যাঁ ভাই, বলো না। লজ্জা করছ কেন। তুমি শম্পার বন্ধু, মানে আমারও বন্ধু।"

"এ সব লতা, আশা নয়, আমাকে তোমার নিজের গলার গান শোনাও। তোমার এত সুন্দর সুরের আন্দাজ, কেন অন্যের কণ্ঠী হয়ে থাকবে? তোমার নিজের গান নেই?"

"তোমার নিজের গান নেই, তোমার নিজের গান নেই," বিড়বিড় করে বলল সাধন, "পারি না," বিষাদময় সাধনের কণ্ঠ, "আমার ভাল লাগে লতার গলায় গান গাইতে। কেমন যেন একটা সুখ হয়। তোমাদের বোঝাতে পারব না। তখন মনে হয় আমিই লতা মঙ্গেশকর। আমার গান রেকর্ডিং হচ্ছে। নায়িকার লিপে আমার গান শুনছে সবাই। কী যে সুখ হয় তখন। হাজার লোক আমার গান শুনে ক্ল্যাপ দিচ্ছে। 'নয়নো মেঁ বদরা ছাঁয়ে', ফিল্ম 'মেরা সায়া', মিউজ়িক মদনমোহন। সাধনার লিপে আমিই গাইছি সুনীল দত্তর জন্য। কখনও মনে হয় আমিই সাধনা। শাড়ি, ব্লাউজ়, টাইট ব্রা পরে আমিই গাইছি। কপালের উপর ঝুরো চুলগুলো উড়ছে। আমার শরীর শিরশির করে
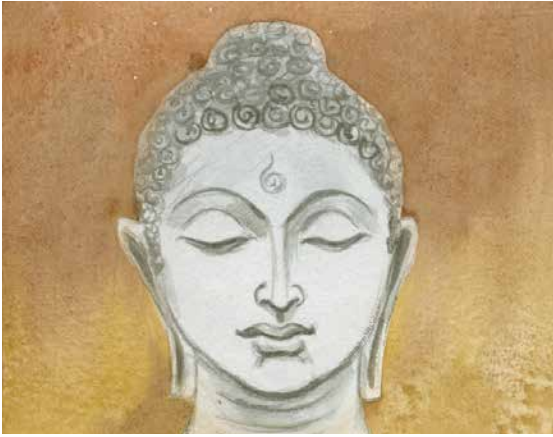
ওঠে সুনীল দত্তর জন্য। কেন যেন কান্না পায় হঠাৎ। এই শরীর নিয়ে আমার কোনও দিন সুনীল দত্তকে পাওয়া হবে না।"

বর্ষার স্মার্টফোনে রেকর্ডিং হচ্ছিল সাধনের অসহায় কান্না। এক ফাঁকে রেকর্ডিং অন করে দিয়েছে বর্ষা। তার তথ্য চাই। ডিজিটাল হলেও অসুবিধে নেই। পরে লিখে নেবে। যত বেশি কেস হিস্ট্রি নিতে পারবে, তত তার কাজের সুবিধে। যা চেয়েছিল, তার বেশি পাচ্ছে। শম্পা এক দিন তার কাছে জানতে চেয়েছিল ট্রান্সজেন্ডার আর ট্রান্সসেক্সুয়ালের পার্থক্য।

"দেখ, এ দুটোকে এক নিক্তিতে মাপা যায় না। সেক্স আর জেন্ডারের ভেতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শারীরিক কিছু বিশেষ লক্ষণের ভিত্তিতে আমরা সেক্স ডিফাইন করি। ছেলেদের ক্ষেত্রে পেনিস এবং টেস্টিস, মেয়েদের ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনা এবং ওভারি, এই চিহ্ন দিয়ে আমরা তার বায়োলজিক্যাল সেক্স ঠিক করি। জেন্ডার ব্যাপারটা কিন্তু একটু জটিল। এর সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, পরিবেশের একটা ভূমিকা থাকে। বেশির ভাগ সমাজেই কিছু রীতিনীতি আছে, যেগুলো পুরুষ এবং নারী ভেদে আলাদা হয়। তুই খেয়াল করে দেখবি আমাদের সংসারে ছেলেদের খেলনা-বন্দুক, খেলনা-গাড়ি আমরা উপহার দিই। আর মেয়েদের বেলায় বার্বি ডল কিংবা ফ্যান্সি ড্রেস দিচ্ছি। আমাদের ভাবনার ভেতরে থাকে শিশুটি কী ভাবে বড় হয়ে উঠবে, সেই দিকের প্রবণতাকে চিহ্নিত করা। এ ভাবে শুরু হয় পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের প্রক্রিয়া। সাধারণ ভাবে বলা যায় ট্রান্সজেন্ডার যারা, তারা তাদের সামাজিক অবস্থানে বায়োলজিক্যাল সেক্সের থেকে ব্যতিক্রমী আচরণ করে।"

"আর-একটু ব্যাখ্যা কর। ভাল বুঝলাম না।"

"মানে ধর, এক জন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ, তার মনে হবে নারী আইডেন্টিটি তাকে বেশি ফিট করে। বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তখন তার ইচ্ছে করবে তার একটা মেয়েলি নাম থাকুক। মেয়েদের মতো পোশাক পছন্দ করবে। তার সমাজসংস্কৃতিতে যে কাজ মেয়েদের জন্য, সেগুলো করবে। লক্ষ্মীপুজোয় সুন্দর আলপনা দেবে। সোয়েটার বুনবে নিপুণ দক্ষতায়। এমনকি কোচবিহারে একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ আমাকে বলেছিল, তাদের বাড়ির সাধারণ বাথরুমে গিয়ে তার মেয়েদের ভঙ্গিতে বসতে ভাল লাগে। আসলে যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গচিহ্ন থেকে আলাদা, তারাই ট্রান্সজেন্ডার। রূপান্তরিত লিঙ্গ। এদের যৌন অভিব্যক্তি জন্মগত যৌনতা থেকে আলাদা।"

"কী আশ্চর্য! আর ট্রান্সসেক্সুয়াল?"

"শারীরগত ভাবে এক জন নারী বা পুরুষ যখন তার চাহিদা মতো দৈহিক পরিবর্তনের প্রসেসে থাকে তার প্রার্থিত জেন্ডার পাওয়ার জন্য, সে জন্য হরমোন ট্রিটমেন্ট, এমনকি সার্জারিরও সাহায্য নেয় তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে, সেটাকে ট্রান্সসেক্সুয়াল বলা হয়। বাংলায় রূপান্তরকামী বলতে পারিস। সেটার চাপ অনেক সময় শরীর নিতে পারে না। দুর্ঘটনা ঘটে যায়।"

সাধনের কথা শেষ হলে ওরা তিন জনই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। রেকর্ডিং অফ করে দিল বর্ষা।

"তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। একটা ফটো নেব তোমার? একটা শুধু তোমার, আর একটা আমাদের তিন জনের সেলফি মোডে নেব।"

"সত্যি, আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে? দাঁড়াও," মুখের বিষণ্ণতা কেটে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাধনের মুখ। উঠে ঘরের কোণে টাঙানো ছোট আয়নায় এক বার নিজেকে দেখে নিল। গাল মসৃণ, তবু একবার দু'গালে হাত ঘষে নিল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঝুলিয়ে ফটো তোলার জন্য তৈরি হয়ে বসল।

"ছোড়দা, এ সব অন্যের গলায় গান ছাড় তো। তোর নিজের গলাই তো খুব মিষ্টি। ছোটবেলায় কী সুন্দর গাইতিস, 'ও আকাশ সোনা সোনা'। আবার মুখে মিউজ়িক দিতিস, টু রু রু রু রু। মনে নেই তোর? অন্যের গলা নকল করে তুই কত দূর যাবি! নিজের গলায় নিজের গান কর ছোড়দা। সিন্থেসাইজ়ার শুনেছিস না, সব রকম ইন্সট্রুমেন্টের আওয়াজ বাজানো যায়। অথচ সিন্থেসাইজ়ারের কোনও নিজস্ব স্বর নেই। তুই নিজের গলায় গান কর। দরকার মনে করলে কারও কাছে শেখ। তারপর গানের টিউশন করেও দেখবি দিব্যি তোর চলে যাচ্ছে। শোনা দেখি একটা। বর্ষা যাঁর নাম বলল, পূরবী অধিকারী, তাঁর সেই বিখ্যাত গানটা কর না ছোড়দা। জানিস না?"

একটু চুপ করে থেকে আচমকাই নিজের স্বরে গান ধরল সাধন, "বনমালী, তুমি পর জনমে হইও রাধা।"

বর্ষা ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকাল শম্পার দিকে।

"আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে বানাব আধা আ আ/ তুমি আমারই মতন জ্বলিও জ্বলিও বিরহ কুসুমহার গলেতে পরিও/ তুমি যাইও যমুনার ঘাটে না মানি নদীর বাধা আ আ আ.../ তুমি

আমারই মতন কাঁদিও কাঁদিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে জপিয়ো/ তুমি বুঝিবে তখন নারীর বেদন রাধার প্রাণে কত ব্যথা আ আ আ...”

আর পারল না সাধন। তার গলা বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর মেয়েদের মতো হয়ে যাচ্ছিল। দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল সাধনের।

“সরি শম্পা, সরি রে বর্ষা, আমি পারছি না।”

বহু দিন বাদে সাধনের স্বাভাবিক গলার গান শুনে নিলুপিসি এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে। তাঁর মুখে আনন্দ খেলা করছে, চোখে কান্না ঝলমল করছে।

নিলুপিসি বলেছিল, দুটো ডালভাত খেয়ে যেতে। শম্পা বারণ করেছিল। বর্ষাও চোখের ইশারায় আপত্তি জানিয়েছিল।

“না পিসি, আমরা একটু চালসায় বন্ধুর বাড়ি যাব। আর-এক দিন এসে খেয়ে যাব। বোরোলি মাছের ঝোল দিয়ে খাব সে দিন।”

ফেরার পথে শম্পা আর বর্ষা কেউ বিশেষ কোনও কথা বলছিল না। বর্ষা তার নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিল। পুরনো চালক। গাড়িতে বসে চালককে বলল, “রামুদা, এখন বাড়ি ফিরব না।”

“এখন তবে কোথায় যাবি?” শম্পা জানতে চেয়েছিল।

“তোর চালসা যাওয়ার গল্প শুনে ইচ্ছে করল লাটাগুড়ির জঙ্গলের দিকে যেতে। আসলে একটু নির্জনতায় যেতে মন চাইছে। একটু ভাবতে হবে।”

“বেশ বেলা হয়ে গেছে কিন্তু। খিদে পেয়ে যাবে।”

“দাঁড়া, আমাদের ল্যান্ডলেডিকে জানিয়ে দিই আমাদের দেরি হলে যেন চিন্তা না করে। ভদ্রমহিলা কিন্তু বাড়ির নামটা দারুণ দিয়েছে। দিদিমার দস্তানা। আস্তানা বললেও চলত।”

“দস্তানায় কিন্তু বেশ একটা কোজ়ি ভাব এসেছে। রাশিয়ার রূপকথায় এ রকম নামের গল্প হত। কুড়ুলের জাউ, গোলরুটি, ভানিয়ার জুতো। খাব কোথায় আমরা?”

“মালবাজার টুরিস্ট লজ আছে। উলটো দিকে বিখ্যাত বাপির হোটেল। মাংসটা হেভি বানায়। পেট্রোল পাম্পের পাশের দোকানটায় চা খাব আগে। চলো রামুদা। গোরুমারা হয়ে একদম বাতাবাড়ি, চালসা, মালবাজার।”

ময়নাগুড়ি বাজার পার হওয়ার পর ওরা দু'জনই চুপ হয়ে গেল। লাটাগুড়ির চৌপথি পেরোলে দু'পাশে অজস্র রিসর্ট। তার পর নতুন উড়ালপুলের পাশ দিয়ে দু'পাশে শুরু হল গোরুমারার প্রাচীন অরণ্য। শাল, শিমুল, জারুল, সেগুনের নিবিড় সংঘ। এ পথে যত বার বর্ষা গেছে, তত বার মনে হয়েছে এমন নিবিড় শ্যামলিমা, এমন নির্জন বনবীথি বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মাঝে-মাঝে এলিফ্যান্ট করিডর পার হওয়ার সময় মনে হয় এই বুঝি একটা দাঁতাল বেরোল।

এত ক্ষণ একটা-দুটো কথা বলছিল ওরা। জঙ্গল শুরু হতেই দু'জনই একদম চুপ হয়ে গেল। মনে হল কোথাও অদৃশ্য সতর্কবাণী লেখা, কথা বলা নিষেধ। কুমারী অরণ্যের ঘুম ভেঙে যাবে। পথের মাঝখানে একটা ময়ূর বসে ছিল। হর্ন বাজাতে সেটা ঝটপট করে উড়ে পাশের একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল।

“রামুদা, বামনিঝোরার কাছে দাঁড়িয়ো তো। জানিস শম্পা, বামনিঝোরার মন্দিরের আগের পুরোহিতকে রাত্রিবেলা একটা হাতি এসে মেরে ফেলেছে। এই নির্জন জঙ্গলের ভেতরে কয়েকটা পাথর সাজিয়ে শিবের পুজো করা হয়। হাতিদের এলাকার ভেতরে ওরা বহিরাগতকে মানতে পারেনি। পাশ দিয়ে একটা ঝোরা গেছে। ওটাই বামনিঝোরা। দেখার কিছু নেই। তবু টুরিস্টরা আসে। ধূপকাঠি জ্বালে। দশ-কুড়ি টাকা দক্ষিণা দিয়ে যায়। ওটার জন্যই জীবন বিপন্ন করে এই জীবিকা। আমার এই স্পটটাকে পৃথিবীর নির্জনতম জায়গা মনে হয়। এখন আর নেই। সেই পবিত্র নির্জনতা নষ্ট হয়ে গেছে টুরিস্টদের জন্য। তবু ভাল লাগে। অদ্ভুত একটা ফিলিংস হয় আমার। নেচারের ভেতরে একটা অদ্ভুত একটা বন্য স্বাধীনতা আছে। আমাদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের হিসেব-নিকেশের সংসারের বাইরে এই লিবার্টি আমি ফিল করি। মূর্তি নদীর দিকে যাবি নাকি?”

“না রে, অনেক দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, অনেক বার গেছি। সেই একই তো নদী। যা মূর্তি, তাই জলঢাকা।”

“উঁহু, প্রতিটা নদী আলাদা। শুধু নামেই কি একটা নদীর পরিচয় শেষ হয়? তার সোর্স আলাদা, চলার পথ আলাদা, তার চরিত্র আলাদা। তার উপনদী, শাখানদী আলাদা। একটা নদীকে বুঝতে হলে তার দু'পারের জনবসতিকেও বুঝতে হয়। ভেবে দ্যাখ প্রতিটি নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছে কোনও নদীকে কেন্দ্র করে। তা সে সিন্ধু সভ্যতা হোক, মিশরীয় সভ্যতা হোক বা গ্রিক সভ্যতা। নদীই হল আমাদের লাইফলাইন। অথচ দ্যাখ সে সব সভ্যতা কবেই ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই নদী কিন্তু ঠিকই বয়ে চলেছে। যে জাতি নদীকে ভালবেসেছে, নদীও তাকে ফুলে-ফলে উর্বরা করে গোলায় ফসল ভরে দিয়েছে। মানুষের চেয়ে নদী অনেক প্রাচীন। নদীকে শাসন করা যায় না।”

একটু থেমে গাঢ় স্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে উচ্চারণ করল বর্ষা:

“ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার শুধু দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।”

চুপ করে রইল ওরা দু'জন। পথের দু'পাশে গাছগুলো এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে, যেন এক দীর্ঘ বৃক্ষতোরণের মাঝবরাবর ওরা চলেছে। কালো পিচরাস্তার উপর পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে আলোছায়ার আলপনা। বাতাস এলে নকশা পালটে যায়। গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক পার হয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর শম্পা কথা বলল।

“ছোড়দাকে দেখে কী বুঝলি?”

অন্যমনস্ক ছিল বর্ষা। আবার জিজ্ঞেস করল শম্পা, “কী রে, সাধনদাকে দেখে কী মনে হল তোর?”

“ইন্টারেস্টিং কেস। তবে এমনটাই হয়। শরীর আর মনের দ্বন্দ্ব। ক'দিন আগে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ছিলাম। শোন, ‘দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী/ আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি’। কেউ যখন বুঝতে পারে তার পুরুষ শরীরের ভেতরে এক কিশোরীর বসত হয়েছে, তখন একটা সাফারিং শুরু হয়। লড়াই শুরু হয়। সেই স্বাদ না পাওয়ার কষ্ট। কৃষ্ণ হয়ে রাধাসঙ্গ, আবার রাধা হয়ে কৃষ্ণসঙ্গ। বড় কঠিন ব্যাপার। ‘বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়/ রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়’। মানুষ এই শরীরকে বড় ভালবাসে রে। কত সাজগোজ। পুরুষ বল আর নারী বল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ-মুখ দ্যাখে। আঁচল সরিয়ে শরীর দ্যাখে। কখনও লোভ হয়। কেউ বুঝতে পারে, কেউ সারাজীবনেও বুঝতে পারে না। যে বুঝতে পারে, চাহিদা পূরণ পুরোপুরি হল না বলে কষ্ট পায়। পুরুষ তখন রাধা হতে চায়, নইলে এই শরীরের মাধবকে যে কেমন করে পাবে, বল? সে তখন লুকিয়ে শাড়ি পরে, চোখে কাজল দেয়, মেয়েদের গলায় গান করে। গোপন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিকল্প উপায়।”

যেন শম্পাকে নয়, সে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে, এমন ভাবে কথাগুলো বলছিল বর্ষা। ওরা টিলাবাড়ি পার হয়ে বড়দিঘি চা-বাগান পেরিয়ে যাচ্ছিল।

“বর্ষা, সবই কি হরমোনের খেলা? আর কিছু নেই?”

“বুঝি না রে ঠিক। হরমোন সিক্রেশন-গ্ল্যান্ডকে কে উত্তেজিত করে? একটা মননক্রিয়া তো অবশ্যই কাজ করবে। বড় হয়ে ওঠার সময় সোসাইটি, ফ্যামিলিতে তার নার্চারিংয়ের প্রসেস, তার পরিবেশ, তার কমিউনিটি রীতিনীতি এই মননক্রিয়া তৈরি করে দেয়। তার পর

হরমোন তার কাজ শুরু করে। আমার তো তাই মনে হয়। আমাকে আরও অনেক পড়াশোনা করতে হবে। তবে এই প্রসেসকে স্বাভাবিক কোর্সে যেতে দেওয়া উচিত। জোরজবরদস্তি করলে শরীর আর মনের দ্বন্দ্বে মানুষটার বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

"বর্ষা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করিস না।"

"বল?"

"তাপুদার সঙ্গে আর দেখা হয় না তোর? এখনও দীপাদির সঙ্গেই আছে?"

"নাঃ, দেখা হয় না। শ্রীমান তপেশ দীপাকে নিয়ে এখন কলকাতায় থাকে। ট্রান্সফার নিয়েছে দীপা, দ্যাট ইনফার্নাল বিচ। আমি কলেজে বেরিয়ে গেলে প্রায়ই মেয়েটাকে ডেকে পাঠাত বিখ্যাত শিল্পী তপেশ রায়চৌধুরী। আমাদের শোয়ার ঘরের কোথায় কন্ট্রাসেপটিভ লুকিয়ে রাখত তাপু, সেটাও জানত মেয়েটা। আমি যে দিন সব জানতে পারলাম, তাপুকে জিজ্ঞেস করলাম, সব অস্বীকার করল তাপু। যত বড় আর্টিস্ট হোক, বড়-বড় গ্যালারিতে যতই তার ছবির এগজ়িবিশন হোক, তার পর সেই মানুষের সঙ্গে কী করে এক বিছানা শেয়ার করে রাতে থাকা যায়, বল! আর মদ। মাসে এক-আধ দিন ঠিক আছে। কিন্তু রোজই তোমার একটু না খেলে মুড আসে না! এক দিন বলেছিলাম চোখের নীচে বেশ ভারী পাউচের কথা, আমাকে পৃথিবীর সব আর্টিস্টদের লাইফ বোঝাতে শুরু করল। কলেজে পড়ানো আর ছবি আঁকা নাকি আকাশপাতাল তফাত। আমি মিডিওকার, শিল্পের আমি কী বুঝি। আমি জানি তাপুর প্রতিভা ছিল। ওর এলোমেলো লাইফস্টাইলও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু দীপার ব্যাপারের পর আমাকে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতেই হল। বেশ ভাল আছি রে এখন। আমার পড়াশোনা, চাকরি আর এই ক্যামেরা।"

"তাপুদার ছবি আঁকার স্কুল?"

"উঠে গেছে। একটা মোবাইলের দোকান হয়েছে ওখানে।"

"বর্ষা, আমাদের ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে আছে? ক্যাম্পাসের ভেতরে দিয়ে সেই ছোট্ট নদী, অজস্র জারুল, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, শাল, সেগুন।"

"আঃ, সে সব কী ভোলা যায় রে। রাতে উত্তরে তাকালেই আলো-ঝলমল কার্শিয়াং, তিনধারিয়া। দিনে পাহাড়। পরিষ্কার থাকলে স্পষ্ট দেখা যেত কার্শিয়াংয়ের টিভি টাওয়ার। তুই কি ভাবছিস তাপুর কথা ওঠায় আমার মন ভার হয়ে গেছে? তাই সুদিনের গল্প শোনাচ্ছিস?"

"ধ্যাৎ, এই ফরেস্ট দেখে আমার হঠাৎ সেই ক্যাম্পাসের কথা মনে পড়ে গেল। শাল-সেগুনের মঞ্জরী আর বসন্তে যেন রঙের বুরুশ কেউ চালিয়ে দিত ক্যাম্পাস জুড়ে। তোর সেই কদম গাছটার কথা মনে আছে?"

উত্তর দিল না বর্ষা। কী যেন ভাবছিল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে শম্পাও চুপ করে রইল।

চালসা মোড় থেকে ওরা বাঁ দিকে মালবাজারের দিকে ঘুরে গেল।

"তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, ও মন জানো না," মৃদুস্বরে গাইছিল বর্ষা।

৩

কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে, বুঝতে পারছিল বিতান। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সামনের ফাঁকা চত্বর জুড়ে এখানে-ওখানে লোকের জটলা। কোথাও কোনও রিকশা, টোটো, অটো বা রেন্টাল ক্যাব নেই। অন্য বার বাইরে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভাররা ছেঁকে ধরে, "গ্যাংটক গ্যাংটক, দার্জিলিং, লোকাল ট্যাক্সি লাগবে স্যার।"

একটা দোকানে জিজ্ঞেস করে বিতান জানতে পারল স্টেশন চত্বরের দখলদারি নিয়ে দুই ইউনিয়নের মধ্যে বড় ঝামেলা হয়েছে। দুই নেতার অনুগামীদের ভেতরে টুকটাক প্রায়ই ঝামেলা হচ্ছিল। আজ একেবারে তাণ্ডব হয়েছে। জায়গাটা যাকে বলে সোনার খনি। প্রচুর দোকান, হাজার যানবাহন, হকার, পাশেই এফসিআই-এর গোডাউন। সেখানে প্রতিমুহূর্তে বড়-বড় ট্রাক ঢুকছে। ও দিকে ইন্ডিয়ান অয়েলের ডিপোয় ট্যাঙ্কার আসছে-যাচ্ছে। এখানকার খবরদারির দায়িত্ব মানে পয়সা, শুধু পয়সা। সেটা হাতে রাখার জন্য ঝামেলা লেগেই থাকে।

"কী করবে এখন?" রাখিকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

"অত চিন্তা করার কিছু নেই। আমি আছি তো সঙ্গে। আরও কত লোক আমাদের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধ তো ডাকেনি কেউ। ঝামেলা হচ্ছে দেখে সবাই দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। এখনই আবার খুলে যাবে। গাড়িটাড়িও এসে যাবে। এক দিনের রোজগার কে বন্ধ করতে চায়? শুনলাম, এক জন বড় লিডার এসে সব মিটমাট করে দিয়ে গেছে। একটু অপেক্ষা করো না।"

বিতান ঠিকই বলেছিল। একটা-দুটো করে দোকানগুলো খুলতে শুরু করেছে। কিছু গাড়ি এসে আবার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছে। একটা লোকাল ট্যাক্সি নিল ওরা। হিলকার্ট রোডে এক রাতের জন্য একটা হোটেল বুক করেছে রাখি। পরদিন সকালে রায়মাটাং রওনা হবে। গাড়ি হোটেল থেকেই ঠিক করে দেবে, ফোনে এ রকম কথা হয়েছে রাখির সঙ্গে।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর দিন টিভির সামনে সারাদিন বসে ছিল বিতান। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ বার তার পার্টি ভাল ফল করবে। কিন্তু যতই সময় এগোচ্ছিল, বিতান বুঝতে পারছিল একশোতেও পৌঁছবে কি না সন্দেহ। মুখ থমথমে হয়ে যাচ্ছিল তার। সরকার গড়ার ব্যাপারে আরও অনেকের মতো সেও নিশ্চিত ছিল। তাদের কেন্দ্রে প্রথম কয়েক রাউন্ডে এগিয়ে থাকার সময় সে সাহসী হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিল। তারা যখন সরকার গড়ছে, বিতান দত্ত তাদের শিক্ষক সংগঠনের জেলা সম্পাদক হবে, তখন ঘরে বসে একটা সিগারেট খেতে এত ভয় কিসের? রাখি এক জন সাধারণ মেয়ে ছাড়া তো আর কিছু নয়।

রাখি বারান্দায় বসে একটা ম্যাগাজ়িন পড়ছিল। আগে এ সব মেয়েলি ম্যাগাজ়িন বিতান কোনও দিন ছুঁয়েও দেখেনি। রাখিই কাগজওয়ালাকে বলেছিল বাড়িতে দিয়ে যেতে। বিতান আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করলেও কিছু বলেনি। রাখি জানে এটা বিতানের পছন্দ হয়নি। কিন্তু সে কী নিয়ে সময় কাটাবে? বিতান কলেজে বেরিয়ে গেলে তার অখণ্ড অবসর। মাঝে-মাঝে মনে হয় কী লাভ হল এত পড়াশোনা করে? চাকরির কথা এক বার বলেছিল বিতানকে। বিতান এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিল। রাখি জানত রক্ষণশীল বিতান কোনও দিনই তার বৌকে চাকরি করতে দেবে না। মুখে নানা রকম বাজে ওজর দেখাবে। দেখাতে চাইবে আসলে তার আপত্তি নেই, কিন্তু... কী দরকার, তাদের দু'জনের জন্য তার একার রোজগার কি যথেষ্ট নয়? রাখি বরং সংসারটা মনোযোগ দিয়ে করুক। রাখি স্পষ্ট বুঝতে পারে ভেতরে-ভেতরে বিতান অসম্ভব পুরুষতান্ত্রিক। রাখির স্বাধীন ইচ্ছেগুলোকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এ ভাবে কি তাদের বাকি জীবন কাটিয়ে যেতে হবে? একটা মৃত সম্পর্কের বোঝা টেনে নিয়ে যেতে হবে তীব্র অনিচ্ছে নিয়ে? নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ থাকলে সেও সাহসী ডিসিশন নিতে পারত হয়তো।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে যেতেই ভ্রু কুঁচকে ঘরের দিকে তাকাল রাখি। সকাল থেকে টিভির সামনে বসে আছে বিতান। এক বার ও ঘরে গিয়ে দেখেছিল তার মুখ বেশ হাসিখুশি। রাখি বুঝতে পেরেছিল বিতানের পার্টি নিশ্চয়ই কয়েকটা আসন পেয়েছে। কয়েকটায় এগিয়ে আছে। নইলে এত ক্ষণে সে টিভি বন্ধ করে অকারণে খিচখিচ করত। নিশ্চয়ই এত ক্ষণে আরও কিছু আসনের ফল তাদের অনুকূলে গেছে। তাই রাখিকে তোয়াক্কা না করে প্রবল

আত্মবিশ্বাসে সিগারেট ধরিয়েছে। ধরাক। যত খুশি সিগারেট ধরাক, জর্দা-পান খাক, মদ গিলুক, রাখি আর কিছু বলবে না। লুকিয়ে তো খাচ্ছেই। সামনে খেতে আর অসুবিধে কিসের? কিন্তু বিতান তো জানে সিগারেটের ধোঁয়ায় তার শ্বাসের অসুবিধে হয়। তাতে কী বিতানের কিছুই আসে যায় না। আশ্চর্য! সে কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লেও মনে হয় বিতানের কিছু আসবে যাবে না। কত দিন জ্বর নিয়ে সে শুয়ে থেকেছে, বিতান কপালে হাত দিয়ে দেখা দূরের কথা, এক বার জিজ্ঞেসও করেনি তার কী হয়েছে। গায়ে জ্বর নিয়েও বিতানের চাহিদা পূরণ করতে হয়েছে।

পত্রিকা টেবিলের উপর উপুড় করে রেখে উঠে গেল রাখি। বেশ জোরে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। রাখির নিজের কানেই শব্দটা কর্কশ শোনাল। আজ সারাদিন বিতান টিভির সামনে বসে থাকবে। মাঝে হয়তো এক বার চা খেতে চাইবে। সে এসে আবার পত্রিকা নিয়ে বসল।

সাড়ে বারোটা নাগাদ দরজা খুলে বাইরে এল বিতান। মুখ থমথমে। রাখি বুঝল ভোটের ফল বিতানের মনের মতো হচ্ছে না। সে যা ভেবেছিল, ঘটনা অন্য দিকে গড়াচ্ছে।

"দরজাটা অত জোরে বন্ধ করার কী হয়েছে? তুমি কি আমার উপর মেজাজ দেখাচ্ছ? দরজার উপর রাগ দেখিয়ে কী লাভ। কোনও অসুবিধে থাকলে আমাকে বলো।"

"রাগ দেখাইনি তো। তোমার সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে আমার কষ্ট হয়, তুমি ভালই জানো। তবু আজ ঘরের ভেতর সিগারেট ধরালে।"

"কেন, একটা সিগারেট ধরালে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? যাও না, রাস্তায় প্রতিটি গাড়ি থেকে যে পরিমাণে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, হাজার সিগারেটের সমান। ওদের গিয়ে বলতে পারছ না, আমার উপর রাগ দেখাচ্ছ!"

"হুঁ, ইলেকশনের রেজ়াল্ট কী? আমাদের এ দিককার কী খবর?"

"কী আবার, পাবলিক যদি নিজের ভাল না বোঝে, তবে যা হওয়ার তাই হবে। আমি জানতাম..."

"কী জানতে? তুমি যেটা জানতে, তাই কি হয়েছে? ভুল জানতে তুমি। কালনেমির মতো লঙ্কাভাগ করে নিয়েছিলে মনে-মনে। তোমাদের ক্যালকুলেশনে ভুল ছিল। মানুষের মনের কথা বোঝা অত সহজ নয়।"

"চুপ। একদম মুখ বন্ধ করে রাখবে। আমি জানতাম বিতান দত্ত যা চায়, সেটা কোনও দিন পাবে না। ভাঙা কপাল আমার। তোমার মতো মেয়েছেলে যার ঘাড়ে চেপেছে, তার স্বপ্ন কোনও দিন পূর্ণ হবে না।"

"মেয়েছেলে? তুমি আমাকে মেয়েছেলে বললে? কোথায় শিখলে এই ল্যাঙ্গুয়েজ। হাউ ডেয়ার ইউ বিতান!"

"ডোন্ট আস্ক। আর আমাকে নাম ধরে ডাকার অধিকার তোমাকে কে দিল? তোমার মা কি তোমার বাবাকে নাম ধরে ডাকত? সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সব কিছু অস্বীকার করতে চাও? আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার মুখ দেখেছি, কী করে ভাল রেজ়াল্ট আশা করব।"

"মানে, কী বলতে চাইছ তুমি? আমার জন্য তোমার পার্টি খারাপ ফল করেছে? এত কুসংস্কার তোমার! এই তুমি আধুনিক কবিতা লেখো? মনুষ্যত্বের কথা, প্রগতির কথা বলো?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার জন্য। তোমাদের মতো মেয়েদের জন্য কালাহান্ডিতে খরা হয়, তোমার জন্য পোয়াতির মিসক্যারেজ হয়ে যায়, তোমার জন্য বাতাসে মারণ-ভাইরাস ঘুরে বেড়ায়। তোমার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অশুভ কিছু ঘটবে। নইলে আমাদের এখানে প্রথমে অত ভোটের লিড নিয়েও কী করে অত পিছিয়ে গেলাম? সব তোমার কুনজর।"

"ছিঃ, এত নিচু তোমার মন। আমি ভাবতেই পারছি না।"

"মুখে-মুখে একদম তর্ক করবে না। ডোন্ট আরগিউ। আমি পছন্দ করি না। পলিটিক্সের তুমি কী বোঝো? পাওয়ার-পলিটিক্স কিছু বোঝো? আমিও পোস্ট-গ্রাজুয়েট, তুমি একা নও। ঘরে বসে সংসার করছ, তাই করো। তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। তোমার কোন অভাবটা রেখেছি? যা তোমার পছন্দ, তাই এনে দিচ্ছি। বেশি ডানা ঝটপট করলে, ডানা ছেঁটে দিতে আমার সময় লাগবে না।"

স্তব্ধ হয়ে অনেক ক্ষণ বসে রইল রাখি। এই তা হলে কবি-অধ্যাপক বিতান দত্তর আসল চেহারা। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে, আশাভঙ্গ থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে যে হিংস্রতার জন্ম হয়েছে, তার ফলে মুখোশ খুলে গেছে। তার উপর কুৎসিত আক্রমণ করে ক্ষোভ মেটাচ্ছে। বাকি জীবন এই মুখোশ-পরা লোকটার সঙ্গে সংসার করে যেতে হবে। কী করে পারবে রাখি?

বিতান যেন আরও উদ্ধত হয়ে গেছে, আরও নিষ্ঠুর। দু'জনেরই উদ্যত ফণা সব সময় অপেক্ষা করে থাকে একে-অপরকে আঘাত করার জন্য। স্বামী-স্ত্রী নয়, পরস্পরের প্রতিপক্ষ যেন। সামান্য দোষত্রুটি ধরার অপেক্ষা করে বিতান। তার পর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাখি বেশি ক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। প্রতিবাদ করে। বিতান অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিতান যত বুঝতে পারছিল কর্তৃত্বের অধিকার তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে, তত যেন আদিম হয়ে উঠছিল। রাখি ঠিক করল এ নিয়ে বিতানের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবে।

"শোনো, আমরা এ ভাবে ঝগড়া-মারামারি করে কত দিন সংসার করব? মাসের মধ্যে অন্তত কুড়ি দিন আমাদের কথা বন্ধ থাকে। তুমি বুঝতে পারছ না আমরা অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি!"

"কী করতে চাও তুমি? অন্তত এক জনকে শান্ত, সংযত হয়ে চলতে হয়। তুমি কোনও দিন কোনও ব্যাপারেই হার স্বীকার করতে বা নিচু হতে চাও না। তুমি মনে করো তোমার প্রতিভা আমার চেয়ে কম নয়। তুমি মনে করো যুক্তির জালে আমাকে হারিয়ে দিলেই আমার চেয়ে বড় হয়ে গেলে। বাইরের দুনিয়ার কতটুকু জানো তুমি? ভালমানুষের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চিরকাল লাইনের শেষেই থাকতে হবে। দরকার হলে কনুই মেরে, অন্যের পা মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হয়। নেকুপুষুদের এই কম্পিটিশনের বাজারে জায়গা নেই। ন্যায়, নীতি, সততা আমিও জানি। কিন্তু দরকার পড়লে, টিকে থাকতে হলে মাঝে-মাঝে দাঁত-নখ বের করতে হয়। না হলে চিরকাল মার খাওয়াদের দলে পড়ে থাকতে হয়। বিতান দত্তকে সে রকম মানুষ ভেবো না।"

"তো, তুমি নও, আমাকেই সব সময় নম্র, শান্ত, রন্ধনে নিপুণ, গৃহকর্মে পারদর্শী সুগৃহিণী হয়ে থাকতে হবে, এই তো চাও? তোমরা, পৃথিবীর সব পুরুষ এক রকম। সব এক ছাঁচে ঢালা। সে তোমার মতো শিক্ষিত অধ্যাপক হোক, কবি হোক, রিকশাওয়ালা হোক আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হোক, সবাই শর্তহীন আনুগত্য চাও। কোনও দিন আমার মনের খবর নিয়েছ? তোমাদের কবিসভা আর কলেজের নোংরা পলিটিক্স ছাড়া আর কোনও গল্প নেই তোমার। কোনও দিন মনে হয়নি সারাদিন একা-একা কীভাবে বাড়িতে আমার দিন কাটে। কলেজে অফডে-তেও তোমায় যেতে হয়। বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়। রোজই কি তোমার মিটিং থাকে? আমার কথা ভাবার সময় আছে তোমার? তোমরা মনে করো শরীরের অধিকার পাওয়া মানে সব পাওয়া হয়ে গেল। ভুল জানো।"

"মনে হচ্ছে অনেক পুরুষকে দেখা হয়ে গেছে তোমার?"

ছিটকে উঠে দাঁড়াল রাখি। তার চোখে একরাশ বিস্ময়, ঘৃণা। রাখি ভাবতে পারেনি এ রকম নোংরা কথা বিতান তাকে বলতে পারে। ছিঃ, এই লোকটা তার স্বামী। কবিতা পাঠের আসরে, সমালোচনা সভায় সম্মাননীয় ব্যক্তিত্ব। মেয়েরা তার সঙ্গে সেলফি তোলায় ব্যাকুল। সে সব ফটো আবার তাকে দেখায় বিতান। রাখি এখন বোঝে ভালবাসা

নয়, বিতান তার কাছে পুজো চেয়েছিল। নিঃশর্ত সমর্পণ চেয়েছিল। কোনও প্রশ্ন নয়, বিতান যেমন চায়, তেমনই ভঙ্গিতে শুতে হবে। তেমন রান্না করতে হবে। তেমনই পোশাক পরতে হবে। বিতান নিজেকে এমন একটা উঁচুতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যেন তাকে মাটির মানুষ নয়, প্রায় ঈশ্বরের মতো দেখায়। ঘাড় উঁচু করে রাখি দেখবে বিতান আর তার মাঝে কী আশমান-জমিন ফারাক! রাখি তাকে দেবতার মতো পুজো করবে। বিতান যেখানে বলবে, রাখি সেই চিহ্নে ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপবে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতায় বিতান ক্রমশ অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। রাখিকে আঘাত দিয়ে যেন একটা মানসিক তৃপ্তি পায়।

"তুমি...তুমি এ কথা বলতে পারলে আমাকে!"

বিতান বুঝতে পারছিল প্রতিক্রিয়া একটু বেশি কর্কশ হয়ে গেছে।

"সরি রাখি। আমি মিন করতে চাইনি। হঠাৎ বলে ফেলেছি। মেজাজটা ভাল নেই। লাভ ইউ রাখি। কিছু মনে কোরো না।"

হঠাৎ চোখে জল এল রাখির। কত দিন বাদে বিতান তাকে 'লাভ ইউ' বলল। আস্তে-আস্তে গিয়ে বিতানের চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকে বিতানের মাথাটা টেনে নিল তার বুকের মাঝে। কতদিন বাদে আজ ইচ্ছে করছে বিতানকে আদর করতে। বিতানের চুলের ভেতরে বিলি কেটে দিতে লাগল রাখি। তার বুকের ভেতরে ভালোবাসার স্রোত নদী হয়ে বইছিল। বিতান তার মাথা আরও পেছনে ঝুঁকিয়ে দিল। সে বুঝতে পারছিল রাখি তাকে সত্যিকারের ভালবাসছে। ক্রমশ তার শরীর জেগে উঠল।

"রাখি।"

"উঁ, বলো।"

"চলো, ঘরে যাই।"

"চলো। ভাল লাগছে তোমার?"

"হুঁ, তোমার?"

"জানি না, যাও।"

প্রবল রভসে বিতানের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে তাকে নিজের বুকের আরও কাছে টেনে নিল রাখি। সে বুঝতে পারছিল তার শরীর জেগে উঠছে। স্তনবৃন্ত ফুলে উঠেছে। শরীরের অভ্যন্তর প্রস্তুত হয়েছে সার্থক একটি রমণের জন্য...

"তোমাকে একটা কথা বলব, রাগ কোরো না।"

"দাঁড়াও, আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না, হেবি টায়ার্ড লাগছে। মাথার দিকের জানলাটা খুলে দাও। ফ্যান চললেও কেমন ঘেমে গেছি, দ্যাখো।"

"যা দাপাদাপি করেছ, ঘামাটাই স্বাভাবিক। জানো, তোমাকে আজ অন্য রকম লাগছিল। ইশ, যা অসভ্যতা করেছ, আমার ঠোঁট এখনও জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।"

"তোমাকেও আজ কেমন নতুন-নতুন লাগছিল। তুমিও কী ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিল আজ। আমার ঠোঁট কি কম জ্বালা করছে!"

"চুপ, বেশ করেছি। আমার বর, আমি যা খুশি তাই করব। তোমার কী মশাই?"

বহু দিন বাদে বিতানের মুখে লাজুক হাসি দেখল রাখি। ভাল লাগছিল রাখিরও। শরীর আর মনের তৃপ্তির রেশ এখনও তাকে বিভোর করে রেখেছে। কিন্তু আসল কথা এখনও বাকি। পোশাক ঠিকঠাক করে নিয়ে জানলা খুলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল রাখি। এখন বিতানের পাশে শুয়ে পড়লে সে ঘুমিয়ে পড়বে। তৃপ্তির পরে যে ক্লান্তি আসে, তখন দ্রুত ঘুম এসে যায়। মিনুর মা'র আসার সময় হয়ে গেছে। বিতান একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়বে। সেও ঘুমিয়ে পড়লে লজ্জার ব্যাপার হবে। দিনদুপুরে দরজায় খিল এঁটে তারা দু'জন ঘুমোচ্ছে, কী ভাববে মিনুর মা! মিনুর মা অনেক কিছুই আন্দাজ করে। তার সামনেই বিতান রূঢ় কথা কত দিন বলেছে। তার আর বিতানের জীবন যে সমান্তরালে চলছে না, সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

"শুনছ, আজ যেমন তোমার ভাল লাগল, ইচ্ছে করে না অন্য রাতগুলো তেমনই ভাল হোক।"

"করে তো। তুমি যেন কেমন কাঠ-কাঠ হয়ে থাকো," আবার রাখিকে জড়িয়ে ধরল বিতান।

"এই না, আর না। এখনই মিনুর মা আসবে। সুখটুকু আমাকে মনে-মনে এনজয় করতে দাও। শোনো, কাঠের পুতুলের ভেতরে প্রাণ নিয়ে আসা কঠিন নয়। তুমি আজ কত দিন বাদে আমাকে লাভ ইউ বললে। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে। তুমি কত প্রেমের কবিতা লেখো, অথচ মেয়েরা আসলে কী চায়, সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারো না। ফিজ়িক্যালি মেটিংটাই তোমরা আল্টিমেট সুখ, বা চরম পাওয়া মনে করো। হ্যাঁ, এক সময় শরীর সেটা চায়। কিন্তু মেয়েরা আরও কিছু খুব সামান্য ছোটখাটো জিনিস চায়। কেয়ারিং চায়। মনোযোগ চায়। দামি উপহার নয়, একটা সাধারণ হেয়ারব্যান্ড আনলেও খুশি হয়। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের মতো আমরা দু'জন প্রাণী অবিশ্বাস্য গতিতে রোজ পরস্পরের থেকে সহস্র মাইল দূরে সরে যাচ্ছি। বুঝতে পারছ না আমরা দু'জনই মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আজকাল তোমার মেজাজ সব সময় খারাপ হয়ে থাকে।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল বিতান। রাখি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে টেনে বিছানায় বসাল। দু'জন দু'জনের চোখের দিকে বেশ কিছু ক্ষণ তাকিয়ে রইল। রাখি দেখল বিতানের চোখে নরম ছায়া।

"জানি রাখি। আমার রক্তের ভেতরে কোথাও একটা বিরুদ্ধ স্রোত কাজ করে। মনে হয় নরম হলে বুঝি হেরে যাব। হেরে যেতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। তুমি বুঝতে পারো না, অনেক সময় আমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করি, কথা বলে ফেলি। আসলে, রক্ত। বুঝলে, আমার প্রবল প্রতাপান্বিত পিতৃদেব অতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত ঘাপটি মেরে রয়েছে আমার রক্তে। আমি না, বিশ্বাস করো রাখি, আমি না... অতীন দত্ত যেন আমার উপর ভর করে। আর কেউ নয়, তাঁর দোষ-গুণ সব আমিই পেলাম।"

বাবার কথা মনে পড়ল বিতানের। সে সব কথা রাখিকে বলা যায় না। তাদের গ্রামের বাড়ির গল্প। দাপুটে জোতদার অতীন্দ্রনারায়ণের অত্যাচারের গল্প। জোতদারি নেই, কিন্তু 'জলসাঘর'-এর ছবি বিশ্বাসের মতো মেজাজটা রয়ে গেছে। মনে পড়ে চিরকাল বিছানায় পড়ে থাকা তার অবহেলিত মায়ের কথা আর তাদের বাড়িতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলা জবামাসির কথা। তাদের বাড়ির পেছনে ছিল বিশাল দিঘি। লোকজন বলত ঠাকুরানির দিঘি। এক সন্ধেয় সে দেখেছিল বাবা পুকুরে ভারী বজরার চালে সাঁতার কাটছে। দিঘির পৈঠায় বসে আছে জবামাসি। বাবা সাঁতার কাটতে-কাটতে মাসির সঙ্গে গল্প করছে। মাসিকে বলছে, "আয় জবা, এক সঙ্গে সাঁতার কাটি।"

"না জামাইবাবু, এই অবেলায় আমার ঠান্ডা লেগে যাবে।"

"এক চুমুক ব্র্যান্ডি খেয়ে নিস। ঘরে আছে। ঠান্ডা চলে যাবে।"

মাঝপুকুরে শুধু মাথা জেগে রয়েছে অতীন দত্তের। ভেসে থাকার জন্য সামান্য হাত-পা নাড়াতে হচ্ছে। জেগে থাকা মাথার চার পাশ থেকে ছোট-ছোট ঢেউ উঠে পুকুরের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যেগুলো সামনে এগিয়ে আসছে, বিতান শুধু সেগুলোই দেখতে পাচ্ছে। জবামাসির পায়ের কাছে এসে সেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। জলে কোনও শব্দ নেই।

"আয় জবা, গা ধুবি না! আয়..."

"ইশ, এই সন্ধের সময় ডাক দিলেন! জ্বরজারি হলে আপনার সংসার কে চালাবে? না জামাইবাবু, হঠাৎ যদি কেউ এখানে এসে পড়ে। যদি ছোটখোকা আসে..."

“কে, বিতান? এই শীতে ও কেন দিঘির পাড়ে আসবে? আয় না। দিঘিতে মাছের খেলা দেখেছিস? চল, জলের তলায় তোকে একটা জিনিস দেখাব। ডুব দিতে পারবি তো?”

খুব ধীরে-ধীরে সাঁতার কাটছে অতীন দত্ত। তার লম্বা শরীরটা জলে-জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে একটা ডিঙির মতো একটু-একটু করে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। জবামাসি যেন হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়াল। ডিঙিনৌকো এখন অনেক কাছে। অনেক স্পষ্ট বোঝা যায়।

“উঠে আসুন, শেষে জলের তলায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবেন।”

“কী যে বলিস! জানিস, মাঝে-মাঝে কী মনে হয়? যখন এখানে কেউ থাকে না, অন্ধকারে একা আপনমনে সাঁতার কাটি, মনে হয় দিঘির গভীর থেকে কেউ আমাকে ডাকছে। আয়, তোকে কলসভরা মোহর দেব, ময়ূরপঙ্খী জাহাজ দেব, আরও জমি দেব, মৎস্যকন্যার যৌবন দেখবি তো আয়। মদ, মেয়েছেলে, সব দেব। মনে লোভ আসে। পারে যাব, না গভীরে যাব, বুঝতে পারি না। পারে উঠতে চাইলেও কে যেন নিয়তির মতো ডাক দেয়। একা যেতে ভয় করে। যাবি জবা আমার সঙ্গে? জানিস, ইচ্ছে করে লোক লাগিয়ে সবার জোতজমি, হিমঘর, দেবু বাগচীর সিনেমা হল, জাজোদিয়াদের পাটগোলা লুট করে নিই। হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছে করে আমার। কচ্ছপের মতো মানুষের শরীরে শক্ত খোলস হয় না কেন রে?”

“মাথা ঠান্ডা রাখুন তো জামাইবাবু। আপনার কি নিজের সম্পত্তি কম? এত বড় বাগান। গাছগাছালির শেষ নেই। সবজিখেত, দিঘিপুকুর, জোতজমি, শহরে দোকান...”

“মনে হয় শরীরের ভেতর দিয়ে রক্ত নয়, আগুন দৌড়ে যাচ্ছে। মনে হয় আড়াল থেকে কেউ আমাকে দেখে যাচ্ছে। ভয় করে ওঠে। বুঝি পঙ্গপালের ঝাঁক আকাশ কালো করে মেঘের মতো সব আমার জমিতেই নেমে আসবে। কোথায় যে কে দংশন করার জন্য ওত পেতে আছে। বল জবা, কী দিয়ে গণ্ডি কাটব, বল? কী যেন এক সর্বনাশের আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠি আমি। আমার তৃষ্ণার শেষ নেই রে। সব জোতজমি দখল করে ভুঁইঞা হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। সব চাকলা, সব পরগনার দখল চাই। হাল মারার অধিকার চাই।”

“এ সব ভাবনা মাথা থেকে দূর করুন তো।”

বিতান দেখল শাড়ি-সায়া খুলে জলে ঝাঁপ দিল জবামাসি। সেটা ছিল বিতানের মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষার দিন। বিতান কী করে বলবে রাখিকে তার বাবার তীব্র যৌনকাতরতা, অশনে, বসনে জীবনযাপনের তীব্র প্যাশনের কথা। দাপুটে মেজাজের কথা। ভোগী স্বভাবের কথা। ভেতরে-ভেতরে নিষ্ঠুর এক ডাকাত ছিল অতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত। তার অন্য বোন বা দাদাদের রক্তে নয়, তার রক্তেই বাহিত হয়েছে সেই উত্তরাধিকার। এ সব সে ধীরে-ধীরে বুঝতে পেরেছে। কী করবে সে। নাচার পুরুষের অসহায়তা মেয়েরা কোনও দিন বুঝতে পারে না। সমাজ ধর্ষক পুরুষকে চরম শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু তবু কি পুরুষের রিপুদমন হয়? পুরুষের শরীর এক নাছোড় হারামজাদা। জীবজন্তুর মতোই বিপরীত লিঙ্গবিহারের জন্য বরফে-ঢাকা উপত্যকা, বিপদসঙ্কুল অরণ্য, উত্তাল নদী পার হয়ে ছুটে যায় নারীর কাছে। পুরুষের শরীর রিপুর কাছে চিরকাল অসহায়। কেউ প্রকাশ্যে রিপুর দাসত্ব স্বীকার করে, কেউ বা গোপনে মোক্ষণ ঘটায়। এই মোক্ষণ অনিবার্য। কালো মেঘে যখন তড়িতাধান সঞ্চয় অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন মোক্ষণের জন্য বিপরীত আধানের দিকে ছুটে যাওয়া ছাড়া তার অন্য পথ থাকে না। আমরা বলি বাজ পড়ল। আসলে তো শক্তির মুক্তি। মানুষেরও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া পথ থাকে না। রাখির কাছে এ সব বললে রাখি বলবে, ‘এ তোমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেদের নোংরা প্রবৃত্তির পক্ষে ছেঁদো যুক্তি। মেয়েদের শুধু ভোগের বস্তু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারলে না কোনও দিন।’

“একটা কথা বলব?”

রাখির কথায় অন্যমনস্কতা ভাঙল বিতানের। পুকুরপাড় থেকে নিজের ঘরে ফিরে এল।

“বলো, কী বলবে?”

“আমাদের মনে হয় এক বার কাউন্সেলিং করা দরকার। আমরা নিজেরা হয়তো আমাদের সমস্যার মূলে যেতে পারছি না। যে যার যুক্তিতে স্টিক করে থাকছি। কাউন্সেলিং করে কত প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। তিনি যদি বলেন, তখন না হয় সাইকায়াট্রিস্টের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব। আমার মনে হয় একটা-দুটো সিটিংয়েই কাজ হবে।”

ওরা দু’জন বিছানায় পাশাপাশি বসে ছিল। বিছানার দিকে তাকিয়ে রাখির অস্বস্তি হচ্ছিল। বিচ্ছিরি ভাবে কুঁচকেমুচকে রয়েছে। তার ইচ্ছে করছিল চাদর-বালিশগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে। তার এই স্বভাবের কথা বিতান জানে। বিছানার চাদর, কী ছাদে মেলে দেওয়া কাপড় এক ইঞ্চিও এ দিক ও দিক হলে তার মন খুঁতখুঁত করে। টেনে সমান না করা অবধি স্বস্তি হয় না। বিতান বলেছিল এটা নাকি এক রকম অসুখ। অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজ়অর্ডার। হতে পারে। কিন্তু এখন থাক, পরে বিতান বিছানা ছেড়ে উঠলে করা যাবে। এখন জরুরি কথাটা বলার সময়।

“কেন রাখি, আমরা কি নিজেরা আলোচনা করে নিজেদের সমস্যা মেটাতে পারি না? আমরা কি পাগল হয়ে গেছি যে, সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে?”

“তা হয়তো পারি, কিন্তু তা হলে ভেবে দেখো এত লোক কেন কাউন্সেলিং করায়, ডাক্তার দেখায়? আমরা তো ডাক্তার নই। এ সব ব্যাপারে স্পেশালিস্টের কথার তো একটা গুরুত্ব আছে।”

“ধুস, আমার এ সব পছন্দ নয়। আমাদের পার্সোনাল প্রবলেমের কথা বাইরের লোককে কেন বলতে যাব? নিজেকে কেমন খাটো মনে হয়। মনে হয়...”

“কী মনে হয়?”

“মানে, মনে হয় লোকটার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে। সব দেখে নিচ্ছে, পড়ে নিচ্ছে লোকটা। কবে কোথায় কী অন্যায় করেছি, সব বুঝি টের পাচ্ছে।”

“প্লিজ়, এক বার চলো। খারাপ লাগলে আর যাব না আমরা। আমাদের দু’জনের সঙ্গে আলাদা-আলাদা করে নিশ্চয়ই কথা বলবেন। আমার সম্পর্কে তোমার যত ভাল লাগা, না-লাগা আছে, যত অভিযোগ আছে, যা আমাকে বলতে পারো না, সব খোলা মনে বলবে। দেখবে অনেক হালকা লাগবে। আমিও বলব তোমার কোনটা আমার ভাল লাগে না, কোনটা লাগে। আজকাল তো অনেকেই ফ্যামিলি-কাউন্সেলিং করায়। সব ঠিক হয়ে যায়। মনেরও তো একটা বিজ্ঞান আছে। সেটা শরীরের সঙ্গে রিলেটেড। দুটোর তৃপ্তি দু’পক্ষেরই হওয়া উচিত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একজোড়া সমান্তরাল রেললাইনের মতো। কোথাও একটু ব্যবধান কম-বেশি হলে সংসারের রেলগাড়ি বেলাইন হয়ে যায়। একবার চলো, প্লিজ়। সব বলবে। আমাদের কথা, তোমার ছোটবেলা, তোমার বাবার কথা। কিচ্ছু লুকোবে না। আমিও সব বলব। যাবে না?”

“যাব, কিন্তু এই মফস্‌সল শহরে তুমি কোথায় ভাল কাউন্সেলিং করার মতো ডাক্তার পাবে?”

রাখি বুঝল, এ শহরে অধ্যাপক হিসেবে বিতানকে অনেকেই চেনে। ফলে বিতানের অস্বস্তি হচ্ছে। ডাক্তারও যদি পরিচিত হয়, সেই ভয় পাচ্ছে। রাখি এটা আগেই আন্দাজ করেছিল। ইন্টারনেট ঘেঁটে পাশের বড় শহরের কাউন্সেলরদের নাম-ঠিকানা জোগাড় করেছে। বিতানকে রাজি করাতে পারলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবে।

“না, আমরা শিলিগুড়িতে গিয়ে দেখাব। আমি ইন্টারনেটে

খোঁজ নিয়েছি। এক জনের রেটিং খুব ভাল। পেশেন্টদের কমেন্টও স্যাটিসফ্যাক্টরি। দ্য মাইন্ড, ডা. মধুবন্তী বড়ুয়া।"

"তা হলে চলো।"

বিতানকে জড়িয়ে ধরে তীব্র আশ্লেষে চুমু খেল রাখি। বিতানও খেল, কিন্তু তার চুম্বনে তীব্রতা কম ছিল।

ভেনাস মোড় থেকে স্টেডিয়াম পেরিয়ে মার্কেটের ক্রসিংয়ে এসে ডানে চিত্রা নার্সিংহোমের দিকে ঘুরে একটু এগোলে মহামায়া টাওয়ার। রাখি দু'পাশে লক্ষ রাখছিল 'দ্য মাইন্ড' সাইনবোর্ডের। সে রকম ইন্টারনেটে বলা ছিল। একটা মোড়ে জিজ্ঞেস করতে হল। তার পর একটা তস্য গলির ভেতরে পাওয়া গেল 'দ্য মাইন্ড'। ডা. মধুবন্তী বড়ুয়া। এমডি ইন সাইকায়াট্রি। স্পেশালিস্ট ইন ফ্যামিলি কাউন্সেলিং। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনে ছিল, কনসাল্টেশন ফি ফাইভ হানড্রেড পার আওয়ার। পেশেন্ট হিসেবে ওদের দু'জনের নামই লেখা হয়েছে।

চেম্বার ফাঁকা। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে এসেছে ওরা। রিসেপশনে বসে একটা মেয়ে সুদোকু মেলাচ্ছে। রাখি সামনে গিয়ে বলল, "ছ'টার সময় আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

মেয়েটি উল্টো দিকের দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "নাম বলুন।"

"রাখি দত্ত, বিতান দত্ত। আঠারো তারিখে বুক করেছিলাম। সম্ভবত আপনার সঙ্গেই কথা হয়েছিল।"

মেয়েটি বেশ মোটা, নীল মলাটের একটা ডায়েরি খুলে বলল, "বসুন। ম্যাম এখনই নামবেন।"

বিতান বুঝল নীচে চেম্বার, উপরে থাকার ব্যবস্থা। ভাগ্যিস তাদের আগে অন্য পেশেন্ট নেই। বোঝাই যায় কাউন্সেলিং যখন, মিনিমাম এক ঘণ্টা তো লাগেই।

খুব মিষ্টি জলতরঙ্গের সুরে কোথাও বেল বাজল। রিসেপশনের মেয়েটা উঠে দরজা ফাঁক করে সম্ভবত ডা. মধুবন্তী বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলল। ফিরে এসে ওদের বলল, "আপনারা ভেতরে যান। ম্যাম এসে গেছেন।"

সুইংডোর ঠেলে দু'জনে ভেতরে ঢুকল। মৃদু একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে ঘরে। মধুবন্তী বড়ুয়ার মাথার ঠিক পেছনে, একটু দূরে, দেওয়ালে একটা কাচঘেরা বাক্সের ভেতরে বুদ্ধমূর্তির উপর প্রথমেই চোখ পড়ল ওদের। দেওয়ালের সঙ্গে পোক্ত একটা শেলফ বানিয়ে তার উপর বাক্সটা রাখা। বিতানের প্রথমেই মনে হল কোনও বাস্তুটাস্তু নয়, লাফিং বুদ্ধ বা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ নয়, এটাকে মূর্তি হিসেবেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় দু'ফুট উঁচু, রাজহাঁসের পালকের মতো সাদা রং। তার উপরে, দেওয়ালে সিমেন্ট খোদাই করে কিছু লেখা। বিতান পড়তে পারল না। পরে আরও অনেক বার সে লেখাগুলো পড়েছে। কিছু বোঝেনি। শেষে জিজ্ঞেস করেছিল। ডান দিকের, বাঁ দিকের দেওয়ালে দেওয়াল-গাথা বইয়ের আলমারি। বাঁ দিকের আলমারিতে খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল বিতান। বেশির ভাগ ইংরেজি বই। একটা-দুটো বাংলা বইও রয়েছে। একটা বইয়ের নাম পড়তে পারল বিতান। 'মনের বিকার ও প্রতিকার'।

ডা. বড়ুয়া ওদের দু'জনকে দেখছিলেন। ড্রয়ার খুলে একটা ডায়েরি বের করে কয়েক পৃষ্ঠা উলটে এক জায়গায় পেজ-মার্ক দিয়ে সামনে টেবিলের উপর রাখলেন।

"নমস্কার, বসুন," টেবিলের উল্টো দিকে দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিলেন মধুবন্তী বড়ুয়া।

খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বিতান। ছিঃ, ঘরে ঢুকেই নমস্কার জানানো উচিত ছিল। আসলে ঘরে ঢুকে কেমন যেন একটু অন্য জগতে চলে গিয়েছিল সে। রাখিও বোধ হয় প্রথমে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করছিল। বুদ্ধমূর্তিটাই প্রথমে মনোযোগ টেনে নেয়। ঘরে কোথাও ধূপকাঠি জ্বলছে না, কিন্তু বিশেষ একটা ধূপের মতো মৃদু সুগন্ধ ঘরে ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত রুম-ফ্রেশনারের গন্ধটাই এ রকম।

"নমস্কার। আমাদেরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আজ। আসলে আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি। সেটা নিয়ে আমাদের ফ্যামিলি-লাইফ খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে। সে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাই, সাজেশন চাই আমরা।"

"আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে কথা বলবেন, নাকি আলাদা করে? আর কোথায় থাকেন বলার দরকার নেই। এখনই নাম-ঠিকানার দরকার নেই। যা-যা জানার দরকার, সব আমি জিজ্ঞেস করে জেনে নেব। চা খাবেন তো? আমি খুব ঘন-ঘন চিনি ছাড়া লাল চা খাই। আপনাদের?"

মাথা নাড়ল বিতান। তারা দু'জনই চিনি ছাড়া লিকার চা খায়। বোতাম টিপলেন ডা. বড়ুয়া। ভেতরে কোথাও পাখির ডাক শোনা গেল। দরজা ঠেলে একজন মহিলা ভেতরে ঢুকলে ডা. বড়ুয়া ইশারায় তিনটে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "দুধ-চিনি ছাড়া।"

মহিলা চলে যাওয়ার পর বিতান দরজার দিকে তাকাল। একটু বাদে ভদ্রমহিলা তিন কাপ চা এনে রেখে দিলে গেল। নিঃশব্দে।

"আমরা যখন কথা বলব, সুইংডোরের এ পাশে একটা স্লাইডিং দরজাও আছে, সেটা বন্ধ করে দিলে ভেতরের কথা বাইরে থেকে কিছুই শোনা যাবে না। আপনারা তো স্বামী-স্ত্রী?" জানতে চাইলেন ডা. বড়ুয়া

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"কিছু মনে করবেন না। ক্যাজুয়ালিই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে অনেকে বান্ধবীকে নিয়ে আসে, কেউ বা আত্মীয়াকে নিয়ে আসেন। পরস্পরের সম্পর্কটা জানা থাকলে আমার কথাবার্তা বলতে একটু সুবিধে হয়। নিন, চা-টা খেয়ে নিন।"

বিতান এক বার আড়চোখে বাঁ হাতের ঘড়ি দেখে নিল। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। চা খেয়ে আলোচনা শুরু হতে আরও কিছু সময় নষ্ট হবে। আসলে হয়তো আধ ঘণ্টা সময় দেবেন উনি। পেশাদারদের কিছু নিয়ম, কিছু নৈতিক দায় থাকা উচিত।

"এক কাজ করা যাক, মিস্টার দত্ত, আগে আমি আপনার কাছে সব শুনব। তার পর ওঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব। শেষে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে এক সঙ্গে বসব। মনে রাখবেন কাউন্সেলিংয়ে কাজ না হলে মেডিসিন দরকার হতে পারে। আর-একটা কথা, আমি রোজ ম্যাক্সিমাম পাঁচ জন পেশেন্ট দেখি। সকালের সেশনে দু'জন, বিকেলে এক জন। সন্ধের পর দু'জন। এক ঘণ্টা লেখা থাকলেও কোনও কেসই এক ঘণ্টায় শেষ হয় না। তা ছাড়া আপনাদের সমস্যা একটা সিটিংয়ে সলভ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুটো বা তিনটে সিটিংও লাগতে পারে।"

বিতানের হঠাৎ মনে হল দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে বৌদ্ধ মঠ বা বিভিন্ন কিউরিও শপে যে বুদ্ধমূর্তিগুলো দেখেছে, সেগুলোর মুখে মঙ্গোলয়েড শৈলী স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু তার চোখের সামনে এই শ্বেত বুদ্ধমূর্তির মুখে রয়েছে অজন্তা-ইলোরা শৈলীর ওরিয়েন্টাল ছাপ। অনেক বেশি প্রশান্তি। অনেক দয়া, অনেক ক্ষমা। রাখিও কি সেটা বুঝতে পেরেছে?

"তা হলে ম্যাডাম, আপনি রিসেপশনে গিয়ে একটু বসুন। পেপার, ম্যাগাজিন আছে। ভাল না লাগলে মোবাইল খুলে ফেসবুক করুন। মিস্টার দত্তর সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে আপনাকে ডাকব। নিশ্চয়ই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে আপনার?"

রাখি বেরিয়ে গেলে বিতান মধুবন্তী বড়ুয়ার দিকে ভাল করে তাকাল। রিমলেস চশমা, গ্লাসদুটো স্বচ্ছ নয়, হালকা লাল আভা রয়েছে। কানের দু'পাশে কিছু চুল সাদা। ফিফটি প্লাস হবে, বিতান মনে-মনে ভাবল। বড়ুয়া তো অসমের ও দিককার পদবি। ভদ্রমহিলার

চেহারা দেখে সেটা বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। বৈবাহিক সূত্রেও বড়ুয়া হতে পারেন। চোখ, মুখ, নাকে কোনও মঙ্গোলয়েড বৈশিষ্ট্য নেই। সামনের বুদ্ধমূর্তির দিকে আবার দৃষ্টি পড়ল তার। সামান্য কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিল বিতান। বোকার মতো বসে না থেকে একটু কথা বলা যাক।

"আচ্ছা, উপরে কী লেখা রয়েছে? বুঝতেই পারছি না।"

"টিবেটানদের মধ্যে জোঙ্খা, সিকিমিজ়, লাদাখি, অনেক রকম স্ক্রিপ্ট আছে। উপরে লেখা আছে নাম মায়্যো রেঙ্গে কায়্যো।"

"তার অর্থ?"

"এটা লোটাস সূত্র। বুদ্ধিজ়মের মূল এসেন্সটা কী জানেন? উই হ্যাভ দি এবিলিটি টু ওভারকাম এনি সাফারিংস অর ডিফিকাল্টি দ্যাট উই এনকাউন্টার ইন লাইফ। প্রত্যেক জীবিত সত্তার ভেতরে এই দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করার ক্ষমতা থাকে। অ্যান্ড দিস ইজ় ইনেট। লর্ড বুদ্ধা ট্রায়েড টু ফাইন্ড দ্য মিনস। এগুলোই লোটাস সূত্র। জীবনে দুঃখ-কষ্ট তো ইনেভিটেবল, তাই না?"

বেশ কিছু ক্ষণ চুপ করে রইল বিতান। সে তো কিছুতেই পারছে না নিজের ক্রোধকে নিরাময় করতে, ভেতরের জ্বালা-অপমানকে শান্ত করতে। এই হেরে যাওয়ার অপমানকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কি তার ভেতরে নেই? লোটাস সূত্র কি তবে মিথ্যে?

"হ্যাঁ, এ বার বলুন আপনাদের সমস্যাটা কী নিয়ে? লজ্জা করবেন না, কোনও ছোটখাটো বিষয়ও বাদ দেবেন না। এমনকি আপনাদের সেক্স-লাইফ নিয়েও আমি জিজ্ঞেস করতে পারি। খোলাখুলি উত্তর দেবেন। বলুন, আপনাদের ভেতরে কিসের সমস্যা?"

বিতান বুঝতে পারছিল না কী ভাবে শুরু করবে।

"আমাদের বিবাহিত জীবন বেশি দিনের নয়। এক বছরের একটু বেশি। ওর এমএ পরীক্ষার রেজ়াল্ট বেরোনোর আগেই আমাদের বিয়ে হয়।"

"তবে তো বেচারা জীবনটা দেখলই না। পড়াশোনার পাট চুকলে একটু আনন্দফূর্তি করবে, তা না আপনি সংসারে ঢুকিয়ে দিলেন!"

"না, মানে আমাদের মা, মাসিদেরও তো...কোনও প্রবলেম হয়নি। হ্যাপি কনজুগাল লাইফ কাটিয়েছে। ডিভোর্সের কথাও শোনা যায় না। তা ছাড়া রাখি, মানে মনে হয়েছিল আমার স্ত্রী সব অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে। আসলে ভীষণ...কী বলব, সব কিছু নিজে ডমিনেট করতে চায়, বসিং করার প্রবণতা খুব বেশি। একদম নিজের পছন্দ মতো চলতে চায়।"

"আপনি শিয়োর আমাদের মা, মাসিদের মনে কোনও গোপন দুঃখ ছিল না? সবাই পরিপূর্ণ ভাবে সুখী ছিল। কখনও চ্যালাকাঠ দিয়ে, কখনও কয়লা ভেঙে একটা ছোট্ট ঘরে দমবন্ধ ধোঁয়ার মধ্যে জীবনের বেশি সময়টা কাটিয়েছে। এত্ত বাসন মেজেছে, জামাকাপড় কেচেছে, সন্ধেবেলায় দুপুরের খাওয়া খেয়েছে। মুখ ফুটে বলেনি নিজের শখের কথা, তাই প্রবলেম হয়নি। আমাদের মনে হয়েছে কী সুন্দর অ্যাডজাস্টমেন্ট, কী হ্যাপি লাইফ। এখন তো গ্যাসের আভেন, ওয়াশিং মেশিন, রানিং ওয়াটার, কিচেনে চিমনি, এলইডি স্ক্রিনের টিভি। তবু কেন এত ডিভোর্স, এত ম্যাল-অ্যাডজাস্টমেন্ট, বলুন!"

"রাখি একেবারেই অন্য রকম। খুব সিরিয়াস টাইপের। খুব শক্ত টাইপের। নিজে যা মনে করে, তার বাইরে কারও কথা শুনতে চায় না। হাল্কা কথাবার্তা একদম পছন্দ করে না। খুব ম্যাল-অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে আমাদের মধ্যে।"

"আপনাদের মধ্যে সমস্যাটা কী নিয়ে? ইগোর লড়াই, সেক্সুয়াল প্রবলেম, উনি কি শুচিবায়ুগ্রস্ত? আপনার কাজের বাইরে স্ত্রীকে কতটা সময় দেন?"

"না, সে সব কিচ্ছু নয়। কী বলব, ও একদম বুনোঘোড়ার মতো। ওকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, কখনও আমারও মাথা গরম হয়ে গেছে। আমি একটা কথা বললে আমাকে দশটা কথা শোনায়। সম্পর্কটা শত্রুর মতো হয়ে গেছে।"

"কিপ কুল মিস্টার দত্ত। আস্তে-আস্তে ঘটনাটা বলুন। আর-এক বার চা খাবেন?"

মধুবন্তী বড়ুয়ার কথার কোনও উত্তর দিল না বিতান। সে বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকিয়েছিল। সে তাকিয়েছিল লোটাস সূত্রের দিকে। তারপর যেন ঘোরের ভেতরে কথা বলতে লাগল।

"বিয়ের আগের থেকেই রাখির সঙ্গে আমার সামান্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন থেকেই বুঝেছিলাম রাখির এথিক্যাল সেন্স খুব বেশি। মনে হয়েছিল বিয়ের পর আমার মতো করে তৈরি করে নেব। আসলে আমিও একটু বেশি নিজের মতো চলতে পছন্দ করি। সেখানে কোনও প্রতিরোধ এলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। এটা কি জেনেটিক হতে পারে? আমার বাবাও ঠিক এ রকম ছিলেন।"

"আপনাদের সেক্সুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি কেমন?"

"এই বয়সে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, আমার ধারণা আমার আর্জ তার চেয়ে একটু বেশি। আসলে আমাদের ফ্যামিলিতেই সেক্সের চাপ একটু বেশি। আমার ঠাকুর্দার শুনেছি খাস বৌ ছিল তিন জন, প্লাস একজন বৈষ্ণবী রেখেছিলেন।"

"ইন্টারেস্টিং।"

"বাট...আমার স্ত্রী রাখি...আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় রাখি বোধহয় ফ্রিজিড। আনেবল টু এনজয় সেক্স। বরাবর অবশ্য এ রকম ছিল না।"

"আচ্ছা, কিন্তু আপনি যেটা বললেন, সেটা অ্যাবনর্মাল কিছু নয়। আপনাদের এটা কোনও সিরিয়াস সমস্যা নয়। কত রকম বিচিত্র সমস্যা নিয়ে মানুষ আমার কাছে আসে। আমার এথিক্সে আটকায়, নইলে আমি দু'-একটা বলতাম। বুঝতেন আপনাদের সমস্যা খুবই নরম্যাল। স্ত্রীকে সময় দিন, ছোটখাটো গিফট দিন। আদর করুন, ভালবাসুন। আর খুব তাড়াতাড়ি কোথাও ঘুরে আসুন। আমাদের এখানে তো দু'পা গেলেই পাহাড়। যান, দু'জনে আবার হানিমুন করে আসুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর-একটা সিটিং হয়তো লাগবে। সেদিন বলে দেব কোনও মেডিসিনের দরকার আছে কি না। মনে হচ্ছে দরকার হবে না। আপনি যান, আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন...না, ফি-টা আমাকে নয়। রিসেপশনে দিন।"

বিতান বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে রাখি ঢুকল। এসে বসল সেই একই চেয়ারে।

ডা. বড়ুয়া বললেন, "হ্যাঁ, বলুন। মিস্টার দত্তর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁকে আর-একদিন আসতে হবে। আজ উনি খোলা মনে কথা বলেননি। কোথাও একটা সঙ্কোচ ছিল। আপনি বলুন, আপনার কিসের সমস্যা?"

রাখি সব বলল। বিয়ের আগে বিতানের চাহিদা। বিতানের আধিপত্যকামিতা। উপরে প্রগতিশীল হলেও ভেতরে-ভেতরে চূড়ান্ত পুরুষতান্ত্রিকতা। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাখিকে অপমান করার প্রবণতা। মাঝে এক-আধদিন হয়তো তাদের দিন ভাল কাটে, কিন্তু...অশান্তি লেগেই আছে। কিছু মানসিক সমস্যা আছে ওঁর। মানিয়ে নিতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। কী করবে সে? নিজের জগৎ ছাড়া কিছু বোঝে না বিতান। বিতান তাকে ভালবাসে কি না, সন্দেহ আছে তার। তাকে নিয়ে বিতান সুখী হয়নি বোধ হয়। এ ভাবে বাকি জীবন কেমন করে করে তারা কাটাবে? সে নিজে অনৈতিকতা, অসততা একদম মানতে পারে না। ফলে নিয়মিত ঝগড়া করতে-করতে দু'জনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সব শেষে সে বলল, "ওকে সুস্থ করুন ম্যাম।"

"দেখুন, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাকে রোজ ডিল করতে হয়। মানুষের মনের গভীর যে কী এক রহস্যময় জায়গা, এখনও সব জানা
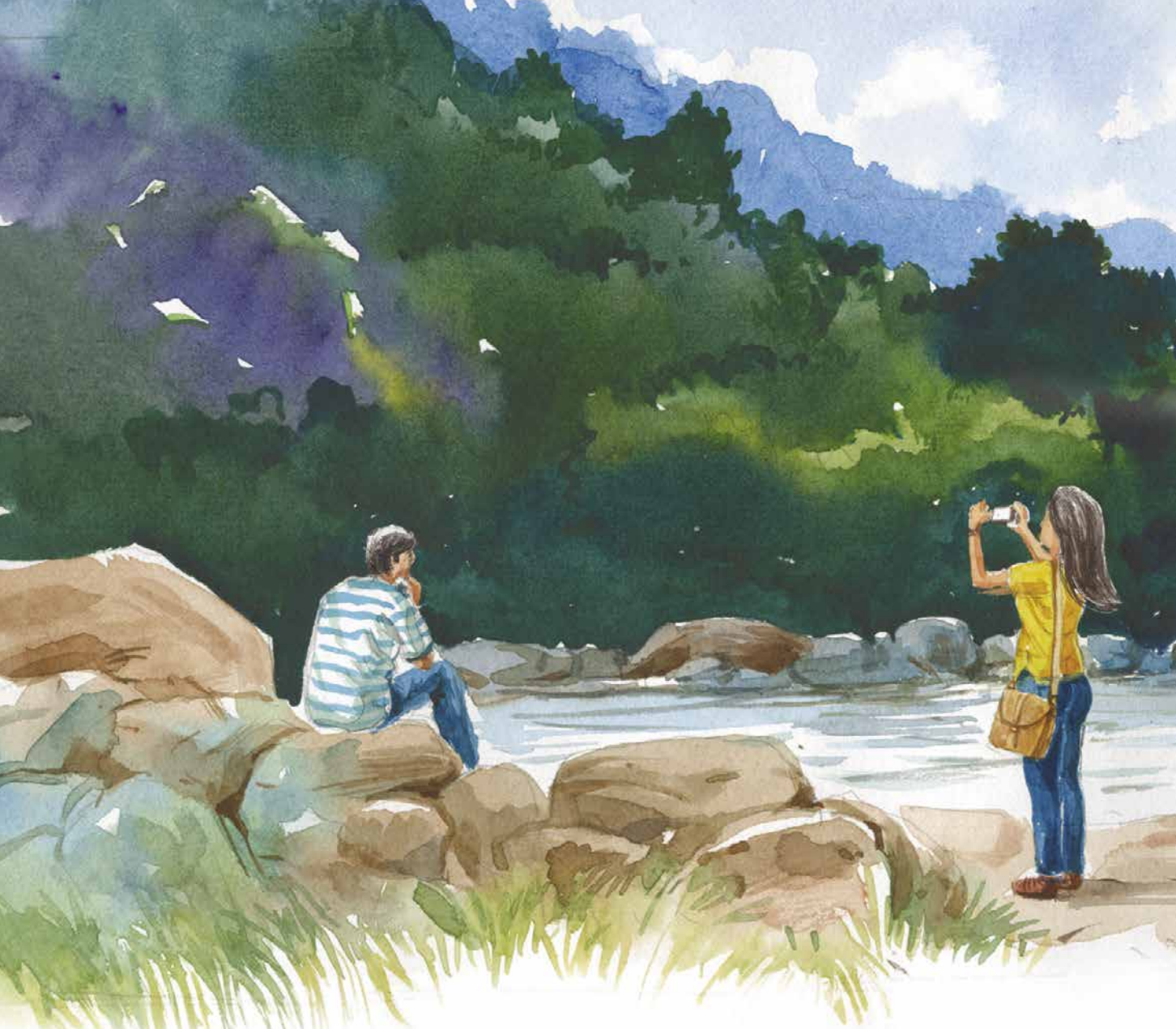
হয়নি। আপনাদের তো তেমন কোনও প্রবলেম হয়নি। কত মহিলা আসেন তাঁদের স্বামী অন্য মহিলার সঙ্গে ফিজ়িক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি আসক্ত। কিছুতেই নেশা ছাড়াতে পারছে না। কত হাজ়ব্যান্ড আসে তাদের স্ত্রী কোল্ড, সে কী করবে জানতে চায়। অনেকের স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্ত, দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্ক রয়েছে, আবার স্বামীর সঙ্গেও দিব্যি সংসার করে যাচ্ছে। কত মহিলা এসে কান্নাকাটি করে তার স্বামীর অন্যায়, অদ্ভুত, বিকৃতকামের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না। কেন করছে? কোথাও নিশ্চয়ই গরমিল হয়েছে। হিসেব মতো হিসেব মেলেনি। আর আপনাদের কেসটা দেখুন। আপনি সুস্থতার জন্য আমাকে খুঁজে বের করেছেন। স্বামীকেও নিয়ে এসেছেন। আবার আপনি চাইছেন আপনার স্বামীর সুস্থতা আগে। নিজের কথা ভাবছেন না। কী সুন্দর বন্ড রয়েছে আপনাদের মধ্যে, আর আপনি যত আজেবাজে কথা বলছেন। এক কাজ করুন, আমার পেছনে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। ভগবানের মুখের দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকুন। তার পর এক মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকুন। তার পর আমি আপনার সঙ্গে গল্প করব। ঠিক আছে? বাই দ্য বাই, আপনার স্বামীর কি কোনও অন্য কোথাও অ্যাফেয়ার্স আছে?”

“যত দূর সম্ভব, আমার মনে হয়, নেই।”

“ওকে।”

পাঁচ মিনিট বুদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর যখন রাখি চোখ বন্ধ করল, তখন তাঁর সমস্ত চেতনাজুড়ে জ্যোতির্ময় একটা মুখ শুধু। প্রথমে প্রখর রজতশুভ্র একটা মুখ, স্পষ্ট বোঝা যায় না। ক্রমে নীলাভ হয়ে এল সেই দীপ্ত মুখশ্রী। এখন বোঝা যায় অসীম করুণাঘন তাঁর চোখের চাওয়া। সেই দৃষ্টি যেন স্নিগ্ধ, শীতল জলে স্নান করিয়ে দিল রাখিকে। চন্দনসুরভিত দাহনিবারক দৃষ্টি ঘিরে রেখেছে রাখিকে। আস্তে-আস্তে চেতনা থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে তথাগতর মুখ। শেষে দৃশ্যপট একদম কালো হয়ে গেল। চোখ খুলল রাখি। ডা. বড়ুয়া রাখির মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসলেন।

“আপনি অনেক লজিক্যাল। চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। দু’জনে কোথাও ঘুরে আসুন। পাহাড়ে যান, ডুয়ার্সে যান। আমাদের এই ডুয়ার্সের মতো গ্রিনারি পৃথিবীর কোথাও পাবেন না।”

বাইরে এসে রাখি দেখল বিতান রিসেপশনের সামনে বসে
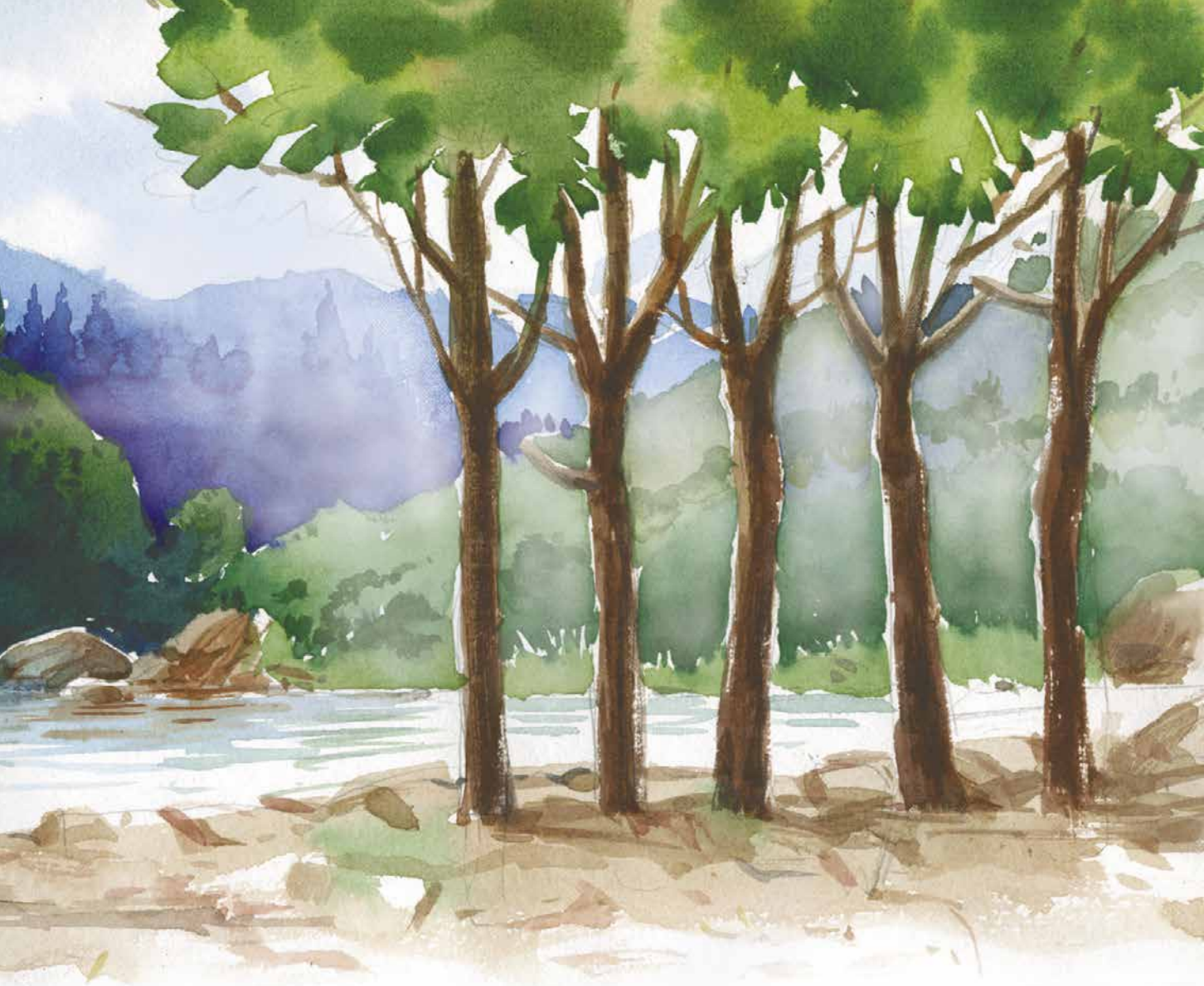
খবরের কাগজ দেখছে। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমাদের কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। আর তোমাকে আর-একটা সিটিং দিতে হবে। আমাদের কোনও প্রবলেম নেই। উই আর অলরাইট। আমার তো ভালই লাগল মহিলাকে। তোমার?"

"এর মধ্যে? আমার তো কোচবিহারে সমিতির জরুরি কনফারেন্স রয়েছে এ মাসে। যাবে কোথায় ঠিক করে ফেলেছ নাকি? আমি কিন্তু ভিড়ভাট্টার মধ্যে যাব না।"

"ভাবছি। রায়মাটাং যাব, না সিলারিগাঁও?"

"আমি কনফারেন্স থেকে ফিরে এলে দেখা যাবে। এখনই কিছু ফাইনাল কোরো না।"

"ঠিক আছে। আমি এ ক'দিন ইন্টারনেটে একটু দেখে-শুনে নিই।"

৪

কোচবিহারে তাদের শিক্ষক সংগঠনের সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর রাখি দেখল বিতানের মেজাজ সপ্তমে। এমনকি রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে স্ল্যাং পর্যন্ত উচ্চারণ করছে। এ রকম আগে কোনও দিন দেখেনি রাখি। বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। যা বলছে, অনির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে অরুচিকর, অমার্জিত কথা। রাখি বুঝতে পারছিল ওদের মিটিংয়ে সম্ভবত বিতান তার আগের গুরুত্ব হারিয়েছে। ক্ষমতা হারানোর ভয়েই মানুষ এমন হয়ে যায়। যুক্তিহীন ক্রোধের শিকার হয়। দ্য মাইন্ড-এ দ্বিতীয় বার ঘুরে আসার পর বিতানের ভেতরে একটা সামান্য হলেও পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিল রাখি। ভেবেছিল, সব আবার আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে যাবে আস্তে-আস্তে। সম্মেলনে কিছু একটা হয়েছে, বিতানকে ভীষণ আপসেট করে দিয়েছে সেটা।

"এত চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কোনও ব্যাপারে খুব আপসেট হয়ে পড়েছ। ঝগড়া করেছ কারও সঙ্গে? কেউ বাজে কথা বলেছে?"

রোববার দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে রাখি জিজ্ঞেস করল। বিতান ঘুমোয়নি, কিন্তু উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে শুয়ে আছে। ঘুমোলে বিতানের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। তা ছাড়া

এটা বিতানের ঘুমোনোর স্বাভাবিক ভঙ্গিও নয়। কোনও উত্তর দিল না বিতান। রাখি তার মুখ থেকে বালিশ সরিয়ে তাকে জড়িয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

"চোখ বুজে রয়েছ কেন? আমার দিকে তাকাও। তোমাদের মিটিংয়ে নিশ্চয়ই কোনও ঝামেলা হয়েছে তোমার সঙ্গে, তাই না? এসব ছেড়ে দাও তো। পার্টি করতে গিয়ে তোমার নিজের লেখালিখির ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছ না? নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলে, সেটা শেষ করো।"

বিছানা ছেড়ে উঠে বসল বিতান। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে ঘরে এসে একটা ছোট প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। মুখ গম্ভীর। ভীষণ সিগারেটের তেষ্টা পাচ্ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতরে সিগারেট এখন আর ধরায় না। উঠে বাইরে গিয়ে সিগারেট টেনে আসতেও কেমন যেন আলসেমি লাগছে।

"কালকের ছেলে, আমাকে পলিটিক্স শেখায়! বাস্টার্ড। সংগঠনে নতুন এসেই সব বুঝে ফেলেছে। আমার কবিতা নিয়ে সমালোচনা করতে এসেছে। আমি নাকি সংগঠন-বিরোধী কবিতা লিখেছি।"

"দলে তো বিরোধী সুর থাকতেই পারে। সেটাও শুনে বোঝা দরকার কেন বলছে।"

"সে এক-দু'জনের থাকতেই পারে। কিন্তু পুরো একটা গ্রুপ কী করে আমার বিপক্ষে চলে গেল? মনে হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার ইনার পার্টি গন্ডগোলের জের এটা। মনোময় সমাদ্দার বহু দিন ধরেই আমার পেছনে লেগে আছে। কলেজ ইউনিয়নগুলোর কমিটি তার ইচ্ছেমতো করতে পারেনি। আমিই বাধা দিয়েছিলাম। তার পর থেকে ঘোঁট পাকাচ্ছিল। ও দিকে মালদার জেলা সম্পাদক মোজ্জামেলকে হাত করেছে। সব খবর আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি এই কনফারেন্সকেই ওরা টার্গেট করেছে। বাচ্চা ছেলেটাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়ে আমাকে বেইজ্জত করবে। আমার প্যানেল ভেস্তে দেবে।"

"একটা কথা বলব? রাজনীতি তোমার জায়গা নয়। দ্যাটস নট ইয়োর কাপ অব টি। কবিতায় ফিরে এসো।"

বিতান চুপ করে রইল। তার মনের গোপন পরিকল্পনার কথা এখনও রাখিকে বলার সময় আসেনি। পার্টি সে ছেড়ে দেবে, কিন্তু পলিটিক্স ছাড়বে না। তার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ, তার কবি-পরিচিতি, তার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল, তার ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপকদের উপর বেশ প্রভাব ফেলে। পার্টির উপরতলা সেটা ভাল করেই জানে। বিতান বুঝতে পারছিল এ বারের নির্বাচনে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হিসেবে মনোময় সমাদ্দার অ্যান্ড পার্টি পাকে-প্রকারে তার ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেছে। প্রোপাগান্ডায় বেরিয়ে দু'-এক জায়গায় ঝামেলা হয়েছিল। টিভি, খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল সে খবর। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক নাকি ভাল নয়। বিতান দত্তর খারাপ ব্যবহারের জন্য ঝামেলা হয়েছে। তার ঔদ্ধত্য নাকি পার্টির খারাপ ফল করার একটা কারণ।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না বিতান। গত সপ্তাহে এক বার, গতকালও এক বার তার কাছে ফোন এসেছিল শিবু মাইতির।

"তা হলে স্যর, ঠিক করলেন কিছু? কোচবিহারে তো আপনাকে ল্যাজেগোবরে করে দিল সমাদ্দার। আপনাকে কিন্তু আমরা একদম ওপেন অফার দিয়ে রেখেছি। আপনার মতো লোক আমাদের খুব দরকার। আপনার গাটস আছে মশাই। আপনার ডিমান্ড ইচ্ছে করলে জানাতে পারেন। আপনাকে না পেলেও আমরা তরতরিয়ে এগিয়ে যাব। থাকলে পালে একটু বেশি বাতাস পেতাম। ভাবুন দাদা, ভাল করে ভেবে উত্তর দিন। হাতে প্রচুর সময়। আমরা এখনও অনেক দিন আছি। বুঝতে পারছি দলে থেকে কাজ করতে পারছেন না। ভেবে দেখুন নিত্য লাথি-ঝাঁটা খাবেন, না স্বাধীন ভাবে কাজ করবেন। আপনি কাজের মানুষ। আশা করি কাজ করার সুযোগ ছাড়বেন না। আমি সামনের সপ্তাহে আবার ফোন করব। এর মধ্যে কিছু ঠিক করলে আমাকে নিশ্চিন্তে জানাতে পারেন।"

"কোচবিহারের খবর আপনারা জানলেন কী করে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বিতান। রুদ্ধদ্বার সমাবেশ, অথচ সব খবর ওদের কাছে চলে গেছে!

"আপনার কি ধারণা জুডাসই ছিল পৃথিবীর শেষ বিশ্বাসঘাতক? যে কোনও মানুষের কম-বেশি বিক্রয়মূল্য আছে। ও সব বাদ দিন। আসলে আপনাকে আমরা বরাবর ট্র্যাক করে যাচ্ছি।"

না, রাখিকে আগে কিছু বলা যাবে না। সে ঈশপের নীতিমালার গল্পের ঝুলি খুলে বসবে। কিন্তু এ বার তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাখি কিছু বললে সে তুলকালাম করে ছাড়বে। গুলি মারো মধুবন্তী বড়ুয়ার কাউন্সেলিং। ক্ষমতাহীন মানুষের কোনও মূল্য নেই এই পৃথিবীতে। আর সাহিত্যের জগৎ হোক, বা রাজনীতির জগৎ, ক্ষমতা হারাতে সে চায় না। মনটা বেশ খুশি-খুশি হয়ে উঠল বিতানের।

"রাখি, চলো আজ তোমাকে নিয়ে একটু বেরোব। তোমার তো সবই শাড়ি, কোনও সালোয়ার-কামিজের সেট নেই। আজ তোমার পছন্দমতো এক সেট কিনে দেব।"

বিতানকে জড়িয়ে আদর করল রাখি। বিতানও সাড়া দিল। কাউন্সেলিংয়ে তা হলে কাজ হয়েছে। ভাবল রাখি। এ বার বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। সিলারিগাঁও বা লামাহাটায় মনে হচ্ছে এখন লোক বেশি যাচ্ছে। রায়মাটাংই ভাল। ঠান্ডা কেমন কে জানে। নইলে আবার গরম জামাকাপড় বের করতে হবে।

একটু হিংসা হচ্ছিল বিতানের। এ বারের ট্রিপটা বিতানের সাহায্য ছাড়া রাখি একা-একাই কী সুন্দর সাজিয়ে ফেলছে। বিতানকে কিছুই করতে দেয়নি। তা ছাড়া রাখি লক্ষ করছিল বিতানের শরীরও ভাল নেই। একটা কাশি কিছুতেই কমছে না। সিগারেট খাওয়া কমাতে বলে লাভ নেই। অনেক বলেছে রাখি। মুখে বলে কমিয়েছে, আসলে ঘরে কমিয়েছে, কিন্তু বাইরে সেটা পুষিয়ে নেয়। তার উপর রয়েছে পান-জর্দা। বছরে এক-আধদিন ড্রিঙ্কও করে। টের পেয়েছে রাখি। খিদে কমে গেছে, ওজনও মনে হয় কিছুটা কমেছে। কোনও শারীরিক পরিশ্রম করলে অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে। ডাক্তার দেখানোর কথা ক'বার বলেছে। পাত্তা দেয়নি বিতান। রাখি বুঝতে পারে যদি ডাক্তার স্মোকিং বন্ধ করে দেয়, সেই ভয়েই ডাক্তার দেখাতে চায় না বিতান।

কালচিনি পার হওয়ার পর একটা পথ বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ওদের সাদা গাড়ি ছুটছিল। ড্রাইভার কিরণ বেশ সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল। স্মার্ট ছেলে। সকাল আটটা নাগাদ ওরা ব্রেকফাস্ট করে নেওয়ার পর চালকের ফোন এল। রাখি ওদের পিকআপ স্পট বলে দিল। ওখান থেকে ওদের তুলে নিতে।

"ওক্কে ম্যাডাম," বলে গাড়ির নম্বর বলে দিল ড্রাইভার। আজ ভোরে উঠতে হয়েছিল। আসার পথে জানলা দিয়ে স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল। কমলা থেকে ক্রমে কুসুম-কুসুম রং ধরছিল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। "দেখে যাও," রাখি ডাক দিল বিতানকে।

বিতান এসে একটু দেখেই তার মোবাইলে ঢুকে পড়ল। রাখি তার মোবাইলে কয়েকটা ফটো তুলে রাখল।

তৈরি হয়ে নীচে নেমে ওরা নম্বর মিলিয়ে সাদা গাড়িটা দেখল। ডান দিকের দরজার পাশে মঙ্গোলয়েড মুখের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। ফেডেড জিন্স, লেদার জ্যাকেট, মাথায় চওড়া কার্নিশওয়ালা টুপি, পায়ে সাফারি বুট। তার পোশাক এবং মুখের ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি দেখলে হঠাৎ মনে হয় কোনও টেক্সাস ফিল্মের নায়ক বুঝি। সাদা গাড়ির বদলে একটা সাদা ঘোড়া হলেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হত।

"তুমি কিরণ, আমাদের নিয়ে যাবে? বাংলা বোঝো?"

"হ্যাঁ স্যর, আমি কিরণ, কিরণ লামা। আমার জন্ম এখানেই। বাংলা

পড়তেও পারি।”

“তোমার ফোন নম্বর দাও। কখন কোন দরকারে পড়ে।”

“লিখেন স্যর, নাইন ফোর সেভেন ফাইভ থ্রি...”

বিতান তার ফোনে নম্বরটা সেভ করে নিল।

রায়মাটাং চা-বাগান পার হওয়ার পর অনেকগুলো শুকনো নদীখাত পেরোল ওরা। কিরণ বলছিল বর্ষাকালে ভীষণ স্রোত থাকে এ সব নদীতে। প্রায় চার মাস বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে রায়মাটাং। তখন বস্তির লোকেদের খুব দুর্দশা চলে। তবে ইদানীং টুরিস্ট স্পট হিসেবে অনেকেই আসছে। আগে মাত্র দুটো থাকার জায়গা ছিল। একটা ফরেস্ট বাংলো আর পুষ্পরাজ ছেত্রীর হোম-স্টে। এখন আরও অনেকগুলো হয়েছে।

“আপনাদের কোনটা?” কিরণ জানতে চেয়েছিল।

“হামরো ঘর, মহাদেব ছেত্রীর,” রাখি উত্তর দিয়েছিল।

“ভাল আছে,” কিরণ বলল।

বাড়িটার সামনে বাগানটা ছোট, কিন্তু অজস্র মরসুমি ফুল ফুটে রয়েছে। মাঝখানে দুটো গার্ডেন আমব্রেলা, সাদা বেতের চেয়ার। একেবারে সাহেবি কেতায় সাজানো। বিকেলে চা খাচ্ছিল ওরা। সূর্য পশ্চিমে একটু ঢলে পড়তেই ঠান্ডা বেশি লাগছে। বিতান প্যান্ট, টুপি, জ্যাকেট পরে আছে। রাখি সেই নতুন সালোয়ার-কামিজের উপর শাল জড়িয়ে নিয়েছে। বাগানের সামনে দিয়ে একটা মাটির পথ ডান দিকের জঙ্গলে চলে গেছে। নানা রকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। কিরণ বলছিল, এখানে অনেক বার্ড-ওয়াচার আসে এই সময়ে। লম্বা-লম্বা ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কখনও সঙ্গে গাইড নেয়, কখনও নিজেরাই ঘুরে বেড়ায়।

টুংটাং শব্দ শুনে সামনে তাকিয়ে ওরা দেখল সাত-আটটা ছাগল নিয়ে একটা পাহাড়ি ছেলে জঙ্গলের ওদিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে। ছাগলগুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে ঘণ্টার শব্দ শুনে খুঁজে পেতে সুবিধে হয়। বাঁ দিকে রায়মাটাং বস্তি। দূরে অনেক সুপারি গাছের সারি দেখা যাচ্ছিল। অনেক বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। জঙ্গল থেকে নিশ্চয়ই রোজ জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে আনে। সন্ধে নামলেই জীবনযাপনের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে। লণ্ঠন নিভিয়ে বাচ্চাকে কোলের কাছে নিয়ে রূপকথা বলে, নয়তো ঘুমপাড়ানি গান গায়। ধোঁয়াগুলো বাতাসে মিশে যাচ্ছে না। হালকা কুয়াশার সঙ্গে মিশে মাটির একটু উপরে ভেসে আছে। অল্প আলোয় হঠাৎ মনে হয় আকাশ থেকে টুকরো-টুকরো মেঘ নেমে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে ধূসর কাঁথার মতো।

“শোনো, আমি না আমার বিয়ের আগে কেনা একটা জিন্স এনেছি। পুলওভারের সঙ্গে পরলে তুমি রাগ করবে? একটা ফটো তুলে দিয়ো।”

“না, এখানে পরতেই পারো। কে আর বিতান দত্তর বৌকে এখানে চিনবে? সবারই একটু চেঞ্জ দরকার। আমারও চেঞ্জ দরকার। জীবনে কিছু করতে হলে নতুন-নতুন অ্যাভিনিউগুলো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হয়। গতির নামই জীবন। স্থবির হয়ে এক জায়গায় পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।”

“চলো, আমরা দু’জন সামনের ওই পথটা দিয়ে একটু হেঁটে আসি। আমার না ভীষণ আমাদের সেই চা-বাগানের কথা মনে পড়ছে। কাছেই এ রকম ফরেস্ট ছিল।”

“নাঃ, শুনলে না মহাদেব ছেত্রী সন্ধের পর বাইরে যেতে বারণ করে গেল। লেপার্ড আছে, পাহাড়ি পাইথন আছে। মাঝে-মাঝে হাতিও বেরোয়। তা ছাড়া, ওই এবড়োখেবড়ো পথে এতটা লং জার্নির পরে খুব টায়ার্ড লাগছে। রাতে ডিনারে কী দেবে, বলে গেছে কিছু?”

“হ্যাঁ, দেশি চিকেন, ডাল আর ভাজি। শোনো, তুমি কিন্তু আজকাল খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছ। একটু রোগাও হয়েছ। এ বার গিয়েই এক বার ওজন নেবে তো। আর মাঝে-মাঝে কাশি উঠলে যে তোমার মনে হয় আউট অফ ব্রিদ হয়ে যাচ্ছ, সেটাও ডাক্তারকে বলবে। এত দৌড়োদৌড়ি তোমার শরীর নিতে পারছে না। ক’দিন একটু শান্ত হয়ে ঘরে বিশ্রাম নাও তো। কে জানে, কিসের পেছনে এ ভাবে ছুটছ। আদারওয়াইজ়, ডা. বড়ুয়াকে দেখানোর পর তোমার অনেক চেঞ্জ হয়েছে।”

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ডান দিকের জঙ্গলের শেষে উঁচু পাহাড়। মাথায় মনে হয় দুটো সিংহ মুখোমুখি বসে।

“দ্যাখো দ্যাখো,” আকাশের দিকে আঙুল তুলে রাখি বলল।

বিতান তাকিয়ে দেখল এ যেন অন্য আকাশ। চিরদিনের চেনা আকাশ নয়। অজস্র তারা ফুটে আছে অনেক বেশি উজ্জ্বলতা নিয়ে। ঝলমল করছে পুরো আকাশ। মনে হয় আকাশ অনেক নীচে নেমে এসেছে। অথবা তারা দু’জন আকাশগঙ্গার অনেক কাছে উঠে এসেছে। এমন নক্ষত্রখচিত আকাশ এর আগে ওরা কোনও দিন দেখেনি। বিতানের হাত আঁকড়ে ধরল রাখি। তার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিল। টের পেল বিতানও তার আঙুল দিয়ে রাখির আঙুল জড়িয়ে নিয়েছে।

“এই শোনো, তুমি আমাকে ভালবাসো?” প্রায় ফিসফিস করে বলল রাখি।

“ছবিটা কি ফেসবুকে পোস্ট করবে? তোমার জিন্সপরা ছবিটা?”

আস্তে আঙুল ছাড়িয়ে নিতে গেল রাখি। কিন্তু বিতান ছাড়তে দিল না। ধরে রইল রাখির হাত।

“বাসি রাখি। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে ভালবাসার মানুষ?”

“বুঝি না কেন এ রকম মনে হয়! মাঝে-মাঝে এত মেঘ করে কেন বলো তো। তোমাকে চিনতে পারি না।”

“তোমরা বড় লাউড ভালবাসা চাও। পদে-পদে প্রমাণ চাও ভালবাসার। অনেক সময় রুক্ষ ব্যবহারের আড়ালেও আমাদের ভালবাসা লুকিয়ে থাকে। সেই গভীরতা তোমরা খুঁড়ে দেখতে চাও না। উপরের উত্তাল তরঙ্গ দেখে জলের গভীরতা মাপা যায় না রাখি। তা ছাড়া পুরুষের অভিমান তোমরা, মেয়েরা, বুঝতে পারো না। বড় মারাত্মক। তোমাদের অভিমানে চোখ দিয়ে জল গড়ায়, ছেলেদের গড়ায় বুকের ভেতর থেকে। দেখা যায় না। পুরুষ নিজেকে ছারখার করে দেয় অভিমানে। কেউ টের পায় না। ছেলেরা কাঁদতে পারে না। কষ্ট হলেও দাপুটে অতীন্দ্রনাথ দত্তের ছেলের চোখে কোনও দিন জল আসবে না।”

রাখি এবার বিতানের মাথা নিজের ভারী বুকের উপর টেনে নিল। মৃদুস্বরে বলল, “এ বার ফিরেই ডাক্তার দেখাবে তুমি।”

“হুম, দেখাব। শরীরটা সত্যি ভাল যাচ্ছে না। আজকাল এত ক্লান্ত লাগে কেন বলো তো। জানো আমার বাবা হাজার বছর বাঁচতে চাইতেন। আমারও ইচ্ছে করে... জানো মানুষের চেয়ে কচ্ছপ অনেক দিন বেশি বাঁচে।”

“শরীরকে তো বিশ্রামই দিচ্ছ না। চরকির মতো ঘুরলে ইলেকশনের আগে। জায়গাটা পছন্দ হয়েছে তোমার? তেমন লোকজন নেই। কী নির্জন। মনে হচ্ছে আমাদের কথাও কেউ অনেক দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে। জানো, চিতাবাঘ এলে বস্তির কুকুরগুলো ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে ডাকে। আর হাতি এলে খুব জোরে জোরে ডাকে।”

“তাই তো হবে। কুকুরের সঙ্গে চিতাবাঘের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। হাতির সঙ্গে নয়। খিদে পেলেও হাতি কখনও কুকুরকে খাবে না। ভারতে এখন চিতা নেই বললেই চলে। লেপার্ডকেই লোকাল লোকজন চিতা বলে। রাখি, একটা সিগারেট খাব? বেশ শীত করছে। চা কিন্তু বেশ ভালই বানায় এরা।”

“তার মানে তুমি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এসেছ। এখন একটা

খেতে পারো। রাতে খাওয়ার পর কিন্তু আর নয়। প্লিজ় এখানে নয়, একটু দূরে গিয়ে খাও। আমার সত্যি ধোঁয়ার গন্ধে কষ্ট হয়।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল বিতান। একটু দূরে গিয়ে পায়চারি করতে-করতে সিগারেট শেষ করে ফিরে এল। এক বার ভেবেছিল তার দলবদলের ব্যাপারে রাখির সঙ্গে কথা বলবে। শেষ মুহূর্তে আর বলেনি। এটা নিয়ে মতান্তর, মনান্তর হোক, বিতান চাইল না। দুটো দিন এখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে। রাখির কথামতোই চলবে।

৫

পথটায় আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। দু'পাশে ঝাঁকড়া গাছপালায় দিনের বেলাতেও কেমন ঘন ছায়ার জন্য আঁধার-আঁধার লাগে। রাতের বেলায় একা চলতে গেলে কেমন গা ছমছম করে। তবু এ পথে লোকজনের চলাচল আছে। সে ওই পথের শেষে চৌধুরীদের হরিমন্দিরের জন্য। সকালে সবাই পাশেই ডাউকি নদীতে একটা ডুব দিয়ে মন্দিরে প্রণাম করে যায়। সন্ধেবেলায় ভোগারতির সময় এসে কিছু ক্ষণ ঠাকুরের নাম শোনে। তার পর মন্দিরচত্বর খাঁ খাঁ করে। পালাপার্বণে বেশ ভিড় হয়। বেদিতে শুধু মাধবের বিগ্রহ। রাধা নেই।

মাথা ঘুরছিল সাধনের। অসম্ভব খিদে পাচ্ছিল। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার পর কোথায় মুকুন্দপুর, কোথায় নাগরের খাল, কোথায় পুনিয়ার মাঠ— পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। কোনও হুঁশ ছিল না। কানে শুধু একটা শব্দই ঘুরেফিরে এসেছে, ‘হিজড়ে হিজড়ে।’ গালে একটা চড়ও মেরেছিল বড়দা। তখন জ্বলেপুড়ে উঠেছিল গালটা। এখন আর শরীরের সেই জ্বলুনি নেই। কিন্তু “হিজড়ে কোথাকার!” বলে যে গলাধাক্কা দিয়েছিল, সেই এক ধাক্কায় সে বাড়ির বাইরে চলে এসেছিল। সেই দু'টি শব্দ অনবরত মাথার ভেতরে পোকার মতো কিলবিল করছে, মাঝে-মাঝে কামড়ে ধরছে। উফ মাথার চুল টেনে ধরছে সাধন। পাগল হয়ে যাবে সে।

সাধন তো জানে হিজড়েদের কোনও নারী-পুরুষ বলে শরীরের ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু সে তো শরীরে পুরুষ, মনে-মনে নারী। সে তো প্রেমিক হিসেবে এক জন পুরুষের কথাই ভাবে। সুঠাম, সুন্দর, সাহসী পুরুষ। তার বুকেই তো মাথা রাখতে ইচ্ছে হয়। হিজড়েদের এমন বাসনা হয় নাকি। কেন তার শরীরে নারীচিহ্ন হল না। চিরকাল তাকে এই অসম্পূর্ণতার ব্যথা বয়ে বেড়াতে হবে। তার এই পুরুষশরীর কখনও কোনও পুরুষকে নারীমিলনের পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারবে না।

শীতের রাত। ঘন কুয়াশা পড়েছে আজ। হরিমন্দিরের পথ শুনশান। দু'পাশে সারি-সারি গাছ, সিঁথির মতো তার মাঝখান দিয়ে পথ। টালমাটাল পায়ে সেই পথ দিয়ে হাঁটছিল সাধন। কুয়াশার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে অস্পষ্ট একটা আলোকবিন্দুর ইশারাটুকু বোঝা যাচ্ছে। সেই ইশারা বুঝতে পেরে হা-ক্লান্ত এক অসহায় মানুষ সেই আলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। একদম সামনে পৌঁছে বুঝতে পারল এত ক্ষণ হরিমন্দিরের পথেই সে হাঁটছিল।

মন্দিরের সিঁড়ির উপর শুয়ে পড়ল সাধন। শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত। মন্দিরের বারান্দায় বসে ঠাকুরমশাই মৃদুস্বরে গাইছিলেন, “গোপীজনবল্লভ, হে মাধব, কৃপাসিন্ধু জগৎমাঝারে। হরি তুমিই কান্ডারি এই কঠিন পারাবারে।।”

মন্দিরের ভেতরে একটামাত্র প্রদীপ জ্বলছে। খুব সামান্য আভা এসেছে বাইরে। সেই আলোয় হঠাৎ মনে হল সিঁড়িতে কেউ শুয়ে রয়েছে। হরি হরি।

“কে গো?” উঠে এলেন ঠাকুরমশাই, “আহা, এখানে কেন শুয়ে বাবা। কী হয়েছে তোমার? কিসের কষ্ট গো?”

ধুলোয় মলিন মুখ তুলল সাধন। এমন করে কে তাকে ডাকে। মা নাকি?

“দাঁড়াও বাবা, লণ্ঠনটা নিয়ে আসি। চিনতে পারছি না। উঠে এস বাবা। এসো,” হাত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুরমশাই। হাত বাড়াল সাধন।

“তুমি হালদারবাড়ির ছোটছেলে, সাধন, তাই না? চেহারা এমন হয়েছে কেন?”

“আমি এক বার ভেতরে যাব? বিগ্রহ প্রণাম করব।”

“নিশ্চয়ই যাবে। জয় মাধব। দ্যাখো ঠাকুর কে এসেছে তোমার কাছে। যাও বাবা। জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। তিনি তো সবারই বল্লভ। চণ্ডাল বলো, আর দ্বিজ বলো, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আমাদের রাধারমণ। যাও বাবা। তোমার য তক্ষণ খুশি থাকো। আমি না হয় তত ক্ষণে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। পরে দরজায় তালা দিয়ে দেব আমি। যাও, কী চাইবে তাঁর কাছে, চেয়ে নাও।”

লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঠাকুরমশাই। অন্য দিন মন্দিরের দরজায় তালা দিয়ে চলে যান। আজ না হয় একটু ব্যত্যয়ই হল। ছেলেটার চোখে-মুখে কষ্ট। নিবেদন করুক না হয় মাধবের পায়ে।

অবসন্ন শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল সাধন হালদার। টলতে-টলতে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পার হয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকল। একটা প্রদীপ শুধু জ্বলছে ভেতরে। দাঁড়িয়ে দেখল মাধবের বিগ্রহ। প্রদীপের আলোয় দেখল পদ্মপলাশের মতো আয়ত দু'টি চক্ষু, চূড়ায় শিখী পাখা, শ্যামলবরণ নন্দকিশোর। হাতে বাঁশি। শরীর শিরশির করে উঠল সাধনের।

টলমল পায়ে মূর্তির পায়ের কাছে প্রণাম করবে বলে নিচু হল সাধন। পারল না দুর্বল শরীরে ভারসাম্য রাখতে। পাথরের মূর্তির শক্ত পায়ের উপর তার মাথা সজোরে আঘাত করল। চেতনা হারাল সাধন হালদার।

অনেক ক্ষণ বাদে ঠাকুরমশাই লণ্ঠন হাতে ফিরে এলেন। এবার মন্দিরের দরজায় তালা মেরে বারান্দায় বসে আপনমনে একটু ঠাকুরের নাম করবেন। যাওয়ার সময় দেখে গেছেন হালদারবাড়ির ছোটছেলেটা এসেছে ঠাকুরপ্রণাম করবে বলে। তাকে রেখেই তিনি রাতের খাওয়া সেরে এসেছেন। সে কি এখনও আছে, নাকি প্রণাম সেরে চলে গেছে, কে জানে। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে। ছেলেটার মুখে কষ্টের চিহ্ন ছিল। মানুষ যখন আর মনের ভেতরের দুঃখ-কষ্টের ভার বইতে পারে না, ভাবে কারও কাছে দুঃখের কথা নিবেদন করলে হয়তো বুকের পাষাণভার নেমে যাবে। যে পাপের কথা আর গোপনে বইতে পারা যায় না, তখন সে কোনও বৃক্ষের কাছে, কোনও পাথরের কাছে, নদীর কাছে নিবেদন করে ভারমুক্ত হতে চায়। এরও হয়তো বুকের ভেতরে কোনও কষ্ট রয়েছে। মাধবের পায়ে নিবেদন করে শান্তি খুঁজতে এসেছে।

বাইরে থেকেই দেখলেন বিগ্রহের পায়ের কাছে এখনও পড়ে আছে ছেলেটা। যেন সর্বস্ব নিবেদন করে নিঃস্ব হয়ে গেছে, এমন ভাবে শুয়ে রয়েছে। সামনে এসে লণ্ঠন তুলে দেখলেন বিগ্রহের পায়ের কাছে রক্তের আলপনা। তার মাঝে শুয়ে আছে হালদারবাড়ির ছোটছেলে। দেখে আঁতকে উঠলেন।

“এই ছেলে, কী হয়েছে তোমার? ওঠো, কিছু খাবে?”

নিঃশব্দে পড়ে আছে ছেলেটা। হাত দিয়ে দেখলেন শরীরে কোনও সাড়া নেই। নাড়ি দেখলেন, কোনও স্পন্দন নেই। বুঝলেন ছেলেটা মরে গেছে। সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছে। আশ্চর্য! কী এক অদ্ভুত প্রশান্তি লেগে রয়েছে ছেলেটার মুখে। যেন পরমপ্রিয় কিছু পেয়েছে সে।

৬

“শম্পা, একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। ব্যাপারটার কিছুই আমি জানি না, অথচ মাঝে-মাঝে

ইচ্ছেটা এমন প্রবল হয়ে উঠছে...”

“খুলে বল না। আমার কাছে লুকনোর কী আছে। তোর কোন কথাটা আমি জানি না? মাথায় নতুন কোনও প্রোজেক্ট এসেছে?”

“ইয়েস ডার্লিং। কী করে বুঝলি? এই জন্য তো তোকে এত ভালবাসি। ট্রান্সদের নিয়ে একটা ডকুফিল্ম বানাব। বানাবই। আজ হোক, কাল হোক, ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। তুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। অবশ্য রাগ ভূপালির ভিত্তিতে।”

“মানে? সেটা আবার কী? ফেলুদার মতো রহস্যময় ভাষায় কথা বলছিস কেন? এ সব আমার মাথায় চট করে ঢোকে না। লালমোহনবাবুরও অধম।”

“আঃ, এটা একটা সাধারণ জোক। ভূপালিতে মধ্যম আর নিষাদ বাদ থাকে। মানে ‘মা’ ‘নি’ নেই। তুইও ওটা ছাড়াই আমার সহকারী নির্দেশক।”

“একটা কিছু দিস। যা হোক।”

“কী নিবি বল? তোকে দিলাম অনেক আদর আর ভালবাসা।”

“ও ডিয়ার,” শম্পা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল বর্ষাকে।

“শোন বর্ষা, শিলিগুড়ির রোহণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিস। রোহণ দাশগুপ্ত। মাঝবয়সি ভদ্রলোক। বন্ধ চা-বাগান নিয়ে একটা দারুণ ডকু করেছে। আমার মনে হয় তোর প্রোজেক্ট শুনলে হেল্প করতে রাজি হতে পারেন। তুই কি নিজে ফান্ডিং করবি, না স্পন্সর পেয়েছিস? সরকারি দপ্তর থেকেও সাহায্য করে শুনেছি।”

“আরে, আমি ও সব কিচ্ছু জানি না। মাথায় জাস্ট ভাবনাটা এসেছে। ক’মিনিটের হবে, স্ক্রিপ্ট লেখা, ফিলার, এডিটিং...কিচ্ছু জানি না। খরচের ব্যাপারে কোনও আইডিয়াই নেই। আইডিয়াটা জাস্ট কনসিভ করেছি।”

“হুঁ, বমি তো শুরু হয়ে গেছে, হ্যা হ্যা...”

“সিরিয়াস ব্যাপারে ইয়ার্কি মারিস না তো। ভদ্রলোকের ফোন নম্বর আছে তোর কাছে? শিলিগুড়ির কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?”

“রাজা, মানে আমার ভাইকে বললে ঠিক জোগাড় করে দেবে। ভদ্রলোক ওদের বাগানেও গিয়েছিল তথ্য জোগাড় করতে। মজদুরদের ইন্টারভিউ নিয়েছিল।”

“সেই মথুরাপুর টি গার্ডেন? তোর ভাই তো ওখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।”

“হ্যাঁ, ওরও বাইট নিয়েছিল। রাজা নিশ্চয়ই খোঁজ দিতে পারবে। আমি আজই ফোন করে নেব। আমার মনে হয় রোহণ দাশগুপ্তের সঙ্গে ডিটেলসে কথা বললে তুই সব বুঝতে পারবি। তবে সাবধান, শুনেছি ভদ্রলোক নাকি এক নম্বরের রমণীরঞ্জন।”

“সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়। আমার হৃদয়দুয়ার আন্ডার লক অ্যান্ড কি। অউর চাবি খো যায়ে।”

“কিচ্ছু বলা যায় না রে। কবে হঠাৎ কোন ম্যাজিক চাবিওয়ালা এসে তোর হৃদয়দুয়ারে ঘা দেবে। তুই নিজেই টের পাবি না তোর শরীর-মন ওয়াইড-ওপেন হয়ে গেছে।”

“হুঃ, অত শস্তা নয় বর্ষা রায়চৌধুরীকে ওয়াইড-ওপেন করা। আমার কন্ডিশনে আমি বেঁচে থাকব। কোনও ছেলে এই স্বাধীনতা মানতে চায় না। আমারও কিছু করার নেই। আই হেট স্লেভারি। আই হেট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। তপেশকে দূরে সরিয়ে দিতে আমার কোনও কষ্ট হয়নি। ওর কথা ভাবলেও আমার ঘেন্না করে। আই কেয়ার আ ফিগ ফর দ্যাট সান অব আ বিচ। ‘গো টু অ্যাসহোল,’ বলে দিয়েছিলাম। এথিক্যাল সেন্স, মরালিটিকে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই, তুই জানিস তো।”

“ও, তোকে তো একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি। কয়েক দিন আগে তাপুদাকে দেখলাম মেরিনার সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে।”

“একা ছিল, নাকি সেই দীপা, দ্যাট হোর ছিল সঙ্গে?”

“একাই মনে হল। সঙ্গে আর কেউ ছিল না।”

“হুঁ, দীপাও কি ওকে তাড়াল? হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি তাপুর সঙ্গে প্রেম করা যায়, বাট সংসার? ইমপসিবল। তুই জানিস আমি নিজে খুব ডিসিপ্লিনড। আমি আর পারছিলাম না। এত এলোমেলো জীবনযাপন, শিল্পের অজুহাত দিয়ে ডিবচারি, মাতলামি... এখন বুদ্ধিজীবী শুনলে আমার বমি আসে। কতদিন বলেছি রং-তুলি হাতে নিয়ে ক্যানভাসের সামনে কাজের সময় ড্রিঙ্কস নিয়ো না। রোজই বলত, ‘নাঃ, কাল থেকে কমিয়ে দেব।’ এ দিকে ফ্যাটি লিভার। বিলিরুবিন, ট্রাই গ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, সবই অসম্ভব হাই। দু’বার নার্সিংহোম ঘুরে এসেছে। আমি তো ঠিকই করেছিলাম জোর করে রিহ্যাবে রেখে আসব। খুব অশান্তি করে বাড়িতে খাওয়া কমিয়েছিলাম। কী লাভ, বাইরে থেকে খেয়ে আসত। বোকার মতো হাসত। ক্ষমা চেয়েছে। আর মদ ছোঁবে না বলে আমার মাথায় হাত রেখে দিব্যি কেটেছে। মাতাল হয়ে আমার পায়ে মাথা রেখে কেঁদেছে। রাতদুপুরে ঘর থেকে ঝাঁটা দিয়ে ওর বমি পরিষ্কার করেছি। এমনকি ওর বন্ধুর বমি পর্যন্ত। আর কত বল! শেষে আমার নিজেরই মনে হত ওর মরে যাওয়াই ভাল। বাট, এখনও আমি বলছি, ছবিটা তাপু ভালই আঁকত। বেশ দামে কিছু বিক্রিও হয়েছে। আঁকার স্কুল থেকেও ভালই রোজগার ছিল। সব চলে যেত মদের পেছনে। লেখক, শিল্পী, কবি শুনলেই আমার এখন এক রকম নসিয়া হয়। রিপালশন হয়। আমার মতো এ রকম ভুক্তভোগী বোধ হয় আর কেউ নেই। তাও দ্যাখ ওকে নিয়েই সংসার করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দীপাকে নিয়ে নোংরামিটা জানার পর আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না ওর সঙ্গে থাকা। দীপাও পারবে না বেশি দিন ওকে সহ্য করতে।”

“সব পুরুষই তো একরকম নয়।”

“হ্যাঁ, কারও-কারও খুব টাইট মুখোশ, কারও লুজ়। লুজ়গুলো খুব সহজেই খসে পড়ে। এদের সহজেই চেনা যায়। টাইট মুখোশওয়ালাদের চিনতে সময় লাগে। আজ পর্যন্ত এমন এক জন পুরুষ দেখলাম না, কোনও মহিলার বুকের দিকে তাকায় না। কেউ হ্যাংলার মতো সোজাসুজি চোখ দিয়ে চাটে, কেউ চোরের মতো লুকিয়ে। পনেরো থেকে শুরু করে অন্তর্জলী যাত্রার সময়েও এদের তৃষ্ণা মেটে না। বাসে-ট্রামে-মেট্রোয় লোভী হাতগুলোর কথা বাদই দিলাম। সব শালা মাংসখেকো ব্যাক্টেরিয়া। সুযোগ পেলেই হাত বাড়ায়। বাদ দে এ সব কথা। তপেশ বেশি দিন বাঁচবেও না। লিভার, কিডনি দুটোই অ্যাফেক্টেড। তুই কিন্তু মনে করে ভাইকে ফোন করবি। ওই ভদ্রলোকের ফোন নম্বর আর ঠিকানা যেন জোগাড় করে রাখে। আর-একটা কথা, আমি একা যাব না। তুইও যাবি আমার সঙ্গে।”

“এর মধ্যে একদিন নিলুপিসির বাড়িতে যেতে হবে রে। ছোড়দার ও রকম মৃত্যুর পর পিসি একদম ভেঙে পড়েছে। বড়দা নিজেও ভাবতে পারেনি ছোটভাই ওই কাণ্ড ঘটাবে। থম ধরে আছে পুরো বাড়ি। খবরটা পেয়ে তোকে জানিয়েছিলাম। তারপর ও বাড়ি গিয়েছিলাম। সবাই জানে অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় বড়দাই ওকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিল। ওকে হিজড়ে বলে গালাগালি দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। আর ভেবে দ্যাখ, হরিমন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণর পায়ের কাছে মরে পড়ে ছিল। মাথার খুলির এক সাইড ফেটে কত ক্ষণ ধরে রক্ত বেরিয়েছে। আমি এ সব বিশ্বাস করি না, তবু কেন যেন মনে হয় এটাই ওর নিয়তি। একদম প্রিডেস্টিনড। ওর ইন্টারভিউয়ের রেকর্ডিংটা আছে না তোর কাছে?”

“আছে। ওটা আমার খুব কাজে লাগবে। এ সব মানুষদের বড় কষ্টের জীবন রে। অনেকেই জোর করে ট্রান্সসেক্সুয়াল হওয়ার চেষ্টা করে। সেটাও অনেক খরচের ব্যাপার। সব সময় সেটা সফলও হয় না।

ওষুধের চাপ নিতে না পেরে মারাও যায় অনেকে। আমারও কেমন যেন মনে হয়েছিল ছেলেটা অনেক কষ্ট পাবে। তবে এ রকম মারাত্মক হবে ভাবতে পারিনি।"

ঠিক দু'দিন বাদে শম্পা জানাল রোহণ দাশগুপ্তর ফোন নম্বর আর ঠিকানা পাওয়া গেছে। রাজা দ্রুত যোগাযোগ করে সব জোগাড় করেছে। রাজা আরও বলেছে, সরকারি একটা দফতর আছে, সেখানে প্রোজেক্ট জমা দিয়ে টাকার জন্য আবেদন করতে। নানা রকম বিভাগ আছে। শিক্ষামূলক, মহাপুরুষদের জীবনী, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, সমাজকল্যাণমূলক। তবে সরকারি দপ্তর তো। অনেক সময় লাগে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, কাঁধ ঘষাঘষির ব্যাপার আছে। সাধ্যের মধ্যে হলে নিজে করাই ভাল।

আগেই ফোনে কথা বলে নিয়েছিল বর্ষা। রোহণ দাশগুপ্ত থাকেন শিলিগুড়ির একটু বাইরের দিকে 'উত্তরায়ণ' উপনগরীতে। শহরের হইচই থেকে দূরে বেশ নিরিবিলি জায়গা। খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো। বর্ষা শম্পাকে নিয়ে তার নিজের গাড়িতে যাবে। ভাল করে পথঘাট বুঝে নিয়েছিল। বাইরে থেকে দেখেছে আগেই। ভেতরের নিশ্চয়ই ব্লক অনুযায়ী বিভিন্ন পথ থাকবে। সেগুলো জেনে নিয়েছিল বর্ষা। বেশ ভারী গলা ভদ্রলোকের। কথার ভেতরে একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। সেটার আওয়াজও ভদ্রলোকের মতোই ভারী।

রোহণ দাশগুপ্ত বলে দিয়েছিলেন মেন গেটে ঢুকে বর্ষা যেন ফোন করে। উনি গেটের সামনে থাকবেন। বর্ষা ওর গাড়ির রং, নম্বর জানিয়ে দিয়েছিল।

অসম্ভব রসিক ভদ্রলোক। প্রথম আলাপ থেকেই এমন মজার

কথা বলছিলেন, বর্ষার প্রাথমিক জড়তা মুহূর্তেই উধাও। ফোনে ভারী গলার আওয়াজ শুনে বর্ষা ভেবেছিল না জানি কেমন রাশভারী হবেন। বর্ষার একটু চিন্তা ছিল, শম্পা শেষ মুহূর্তে জানিয়েছে ওর শরীরের যা অবস্থা, কিছুতেই যেতে পারবে না। বর্ষা অবশ্য জানে পিরিয়ডের সময় অসম্ভব পেটে ব্যথা হয় শম্পার। নড়তে পারে না। গাড়িতে হলেও সামান্য ঝাঁকুনিও সহ্য করতে পারত না। একাই আসতে হয়েছে।

"আর সময় হল না তোর শরীর খারাপের," বর্ষা মন খারাপ নিয়েই বলেছিল।

ঘড়ি দেখল বর্ষা। ঠিক এগারোটা। দূর থেকেই বর্ষা দেখতে পেয়েছিল চশমাপরা মাঝবয়সি এক জন লোক একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। সামনে এলে বর্ষা দেখল কাঠচাঁপা ফুলের গাছ। বেশ বড় হয়েছে গাছটা। হাত দেখালেন ভদ্রলোক। বর্ষা নামলে হাতজোড় করে বললেন, "আসুন, আমিই রোহণ দাশগুপ্ত। আপনিই বর্ষা রায়চৌধুরী। আসুন।"

"হ্যাঁ," প্রতিনমস্কার করে হাসিমুখে বলল বর্ষা।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ ছিল। ওরা যখন গেটের সামনে, সামান্য দু'-এক ফোঁটা জল পড়ল আকাশ থেকে।

"আমি জানতাম," ভদ্রলোক বললেন, "আমি জানতাম, অকালে যখন বর্ষা আসছে, দু'-এক ফোঁটা ঝরতে পারে।"

হেসে ফেলল বর্ষা। তখনই তার সঙ্কোচ কেটে গেল। বুঝল গলার আওয়াজটাই গম্ভীর, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

"দাঁড়ান, চা খাবেন তো?"

"হ্যাঁ, খাব। কিন্তু ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। পরে হলেও চলবে। আপনার কথা আমার এক বন্ধুর ভাইয়ের কাছে শুনেছি। মথুরাপুর চা-বাগানের রাজা আচার্য। ও-ই আমাকে আপনার ফোন নম্বর আর ঠিকানা দিয়েছে। আমি একটা ডকুমেন্টারি করতে চাইছি। ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের নিয়ে।"

"হ্যাঁ, রাজাকে মনে আছে। ভাল ছেলে। খুব হেল্প করেছিল। এমনকি আমাকে বিশ্বাস করে মালিকদের বাগান বন্ধ করে দেওয়ার কিছু গুপ্তকথাও বলেছিল। বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। আমার সঙ্গে একটা ফটো তুলেছিল। পরে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে।"

"আমার খুব ক্লোজ় বন্ধুর ভাই।"

"আপনার বিষয় তো খুব ইন্টারেস্টিং। আমি অবশ্য কিছুই জানি না, ওই সামান্য ভাসা-ভাসা। আপনি তো বলেছিলেন কলেজে পড়ান, এই বিষয়ে হঠাৎ আগ্রহ হল?"

কী বলবে বুঝতে পারছিল না বর্ষা। একটু হাসল, "প্রথমে নিছক কৌতূহল ছিল। পরে নিজের আগ্রহে এলজিবিটিকিউ-দের নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বিষয়টার উপর খুব ইন্টারেস্ট এসে যায়। প্রথমে ভেবেছিলাম একটা লেখা তৈরি করব। অনেক কেস স্টাডি করেছি। ইন্টারভিউ নিয়েছি এ রকম মানুষদের। প্রচুর স্টিল এবং ভিডিয়ো রেকর্ডিং রেখেছি। ডেটা কালেকশন করেছি অনেক। হঠাৎ মনে হল আমার এই স্টাডির একটা অডিয়ো-ভিশুয়াল নিদর্শন রাখা উচিত। একটা তথ্যচিত্র যদি করতে পারি...তাই, এই প্রোজেক্টের ভাবনা। ফিল্ম তৈরির ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। ফিকশন বা নন-ফিকশন, সে যাই হোক। আপনি বেশ কিছু, বিশেষ করে চা-বাগান নিয়ে কিছু ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন। আপনার 'হিরণ্ময় নীরবতা' পুরস্কারও পেয়েছে। আমাকে শুধু টেকনিক্যাল ব্যাপার নয়, সব ব্যাপারেই হেল্প করতে হবে। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আমি সব সময় আপনার নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করব।"

"দেখুন, বিষয়টা নিয়ে আমার কোনও আইডিয়া নেই। টি গার্ডেনের খুঁটিনাটি আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোনও দিন ভাবিইনি। অ্যাকচুয়ালি এলজিবিটিকিউ-এর ফুল ফর্মও আমি জানি না। একদম পিছড়ে বর্গ বলতে পারেন।"

"লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, ক্যুয়ার। আমি কাজ করতে চাই ট্রান্সদের নিয়ে। অবশ্যই যতটা না বিজ্ঞানভিত্তিক, তার চেয়ে বেশি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ধরতে চাই।"

"কিন্তু ধরতাই পাচ্ছেন না, তাই তো?"

"ঠিক তাই। আমাকে গাইড করতে হবে স্যর। আমার ডিএসএলআরে ফটো তোলা ছাড়া ক্যামেরা সম্পর্কে কোনও আইডিয়া নেই।"

"টেকনিক্যাল ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করতে পারব, কিন্তু আমাকে স্যর বলা ছাড়তে হবে। খুবই সাধারণ মানুষ আমি। ভেতরের একটা প্যাশন থেকে ফিল্ম বানাই। ডকুতেই আমার বেশি আগ্রহ। যাকে বলে কাহিনিচিত্র, সেটা আমি কোনও দিনই করব না। আমাদের কত প্রাচীন সম্পদ, দেশজ সংস্কৃতি শুধু সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো ডকুমেন্টেড করে রাখা খুব দরকার ছিল।"

"আমাকেও 'আপনি' বলা ছাড়তে হবে। আমি আপনার চেয়ে অনেকটাই ছোট।"

"যদি এক সঙ্গে কাজ করতে হয়...সে আস্তে-আস্তে হয়ে যাবে। সবাইকে 'আপনি' করে বলতেই আমি অভ্যস্ত। বাজারে একটা রসিকতা চালু আছে, আমি নাকি আমার বাড়ির কুকুরটাকেও আপনি সম্বোধন করি।"

"হ্যাঁ, একটা বেশ ভারী আওয়াজের কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। আপনার?"

"হুঁ, আপনি আসবেন, তাই ভেতরে বেঁধে রেখেছি। ম্যাস্টিফ।"

"কামড়ায়? আমার একটু ভীতি আছে। ছোটবেলায় একবার কুকুরের কামড় খেয়েছিলাম।"

"আজ পর্যন্ত কাউকে কামড়াতে পারেনি। তবে নতুন লোক দেখলে লাফালাফি একটু বেশি করে। কেউ আদর করে, কেউ ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। বসুন, চা বসিয়ে আসি। খেয়ে বলবেন কেমন বানিয়েছি। ভাল দার্জিলিং লিফ। ক্যাসেলটন বাগানের সেকেন্ড ফ্লাশ। লাল ছাড়া চিনি তো?"

প্রথমে বুঝতে পারেনি বর্ষা। এক মুহূর্ত বাদেই বুঝতে পেরে হেসে ফেলেছে।

"হ্যাঁ। ইয়ে, মানে আপনি নিজে বানাবেন?"

"ইয়েস, মাসির করোনা। আসতে বারণ করে দিয়েছি। এক জনের রান্না করতে আমার কোনও প্রবলেম হয় না। একটা মজার কথা শুনুন। এই উপনগরী তৈরি হয়েছে একটা চা-বাগান উচ্ছেদ করে। আয়রনিক্যালি, সেখানেই আমার ঘর। সামনের এই টেবিলটা দেখুন, উপড়ে-তোলা চা গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি। উলটো করে সাজিয়ে তার উপর একটা টপ বসিয়ে দিয়েছে। তার পরে ঝকঝকে পালিশ করে দিয়েছে।"

ভদ্রলোক ভেতরে গেলে ঘরটা ভাল করে দেখল বর্ষা। একদম সাদামাটা ঘর। দুটোমাত্র ছবি কাচবাধাই করে টাঙানো। একটা হাতে-আঁকা, পাহাড়ের উপত্যকায় সবুজ গালিচার মতো চা-বাগান। অন্যটা একেবারে আলাদা দিক থেকে নেওয়া করোনেশন ব্রিজ। একটা ডিভান, একটা কাঠের সোফাসেট। মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল। চা গাছের শিকড় ওলটানো।

বর্ষা বুঝতে পারছিল না ভদ্রলোক নিজে চা বানাতে গেলেন কেন। কাজের মাসির অসুখ। কিন্তু ওঁর গৃহিণী কি বাড়িতে নেই? নাকি রোহণ দাশগুপ্ত বিয়ে করেননি, মৃতদারও হতে পারেন। কে জানে। জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই নেই। ভীষণ অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে।

একটা সুন্দর কাঠের ট্রে-র উপর দু'কাপ চা আর প্লেটে চানাচুর নিয়ে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। এবার বর্ষা লক্ষ করল বেশ লম্বা রোহণ দাশগুপ্ত। পাজামার উপর একটা ঘন নীল পাঞ্জাবি পরেছে। চোখে কালো ফ্রেমের বেশি পাওয়ারের চশমা। চুলে একটা দুটো রুপোলি ঝিলিক।

"নিন, সত্যি করে বলবেন কতটা অখাদ্য হয়েছে।"

"অখাদ্য, না অপেয়?"

একটু হেসে চায়ের কাপ তুলে নিল বর্ষা। আস্তে চুমুক দিল। দেখল গোয়েন্দার মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন রোহণ।

"বাঃ, সত্যি খুব ভাল হয়েছে।"

রোহণ দাশগুপ্তের মুখে তৃপ্তির হাসি। চোখেও আনন্দ।

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমরা খুব ভাল চা মুখে নিয়ে বলি, 'আঃ।' আবার দিনের শেষে পিঠ থেকে চা পাতা ভর্তি টুকরি নামিয়ে একজন মজদুরও বলে, 'আঃ।' আমরা বুঝতেই পারি না এই খয়েরি ট্যানিনের সঙ্গে মিশে আছে কত ঘাম। বাদ দিন ও সব কথা, আপনার কাজের কথা বলুন। কী ভাবে এগোবেন, কিছু ভেবেছেন? স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন? যে কেস স্টাডিগুলো করেছেন, তাদের বাড়ির লোকদেরও ইন্টারভিউ কিন্তু দরকার। ওদের গ্রোয়িং-আপ খুব জরুরি। কয়েক জন সাইকায়াট্রিস্টের সঙ্গে ইন্টারভিউ দরকার। হালকা একটা স্টোরি-লাইন রাখতে পারেন। তথ্য এবং তত্ত্বের কচকচিতে অনেক সময় ভাল বিষয়ও বোরিং হয়ে যায়। উদ্দেশ্যটাই মার খেয়ে যায়। ক'মিনিটের করবেন? ভয়েসওভার ব্যবহার করবেন? কিছু আর্কাইভ্যাল ফুটেজ খাওয়াতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য দরকার বুঝে। আমরা খালি চোখে যেমন দেখি, থ্রু দ্য লেন্স কিন্তু দৃশ্যের ডাইমেনশন পালটে যায়। ক্যামেরাম্যানের উপর সব ছেড়ে দেবেন না। নিজে লুক-থ্রু করে সন্তুষ্ট হলে শট রাখবেন। আমি একটু বিষয়টা নিজের মতো করে দেখে নিতে চাই। শুনুন, প্রথম বার ডকু বানাতে গিয়ে আমার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ হয়েছিল। যেন হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা। আপনি একটা গল্পের মতো করে স্ক্রিপ্টটা লিখুন। পরে আমি বুঝিয়ে দেব ওর ভেতরে কী করে শট ডিভিশন করে নিতে হবে। আর-একটা কথা মনে রাখবেন, ডকুমেন্টারিতে এডিটিং ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কোথায় শট ডিজল্‌ভ হবে, কখন ফেড ইন, কখন ফেড আউট, কখন কন্টিনিউয়েশন ভেঙে কিছু জুড়ে দিতে হবে, কখন জাম্পকাট করে পরের ফ্রেমে যেতে হবে, এ সব ঠিকঠাক হওয়া খুব জরুরি। আগে মাথার ভেতরে ছবিটা তৈরি করুন। লিখুন। দেখবেন, মাথায় আপনা থেকেই ভাবনা এসে যাবে কোথায় কী রাখতে চান। সব নোট করে রাখুন। দরকার হলে আমি যা পারি সাহায্য করব।"

অসহায়ের মতো, দিশেহারার মতো রোহণ দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে রইল বর্ষা। ভদ্রলোক যেন বাংলা নয়, অচেনা কোনও ভাষায় এত ক্ষণ বর্ষার সঙ্গে কথা বললেন। ফেরার সময় বর্ষা একটা ব্যাপারে শুধু সিদ্ধান্ত নিতে পারল। ভয়েসওভার তো রাখতেই হবে। এবং সেটা রোহণ দাশগুপ্তের কণ্ঠস্বর। কমেন্ট্রি দিয়ে অনেক শটের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে হবে।

"আমার নিজের মনে হয় ফিকশন ফিল্ম থেকে ডকু মেকিং বেশি কঠিন। শুধু তো গল্প বলা নয়, শুকনো বিষয়কে ইন্টারেস্টিং করে তুলতে হয়। একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে হয়। শুরু করে দিন। আমিও এর মধ্যে একটু দেখে শুনে নিই। যখন যা মনে আসবে, নোট রাখবেন। আর-এক কাপ চা খাবেন?"

"না-না, এ বার উঠব আমি। আমার মাথা ঘুরছে। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমাকে আরও অনেক বার হয়তো আপনাকে বিরক্ত করতে হবে। আপনার মোবাইল নম্বর পেতে পারি?"

"লিখুন, নাইন ফোর..."

"আপনাকে একটা মিসড কল করছি। আমার নম্বরটা রাখবেন।"

"ও, আর-একটা কথা, যে কেসগুলো স্টাডি করেছেন, তাদের ছোটবেলার ফটো পারলে জোগাড় করবেন। অবশ্যই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। পরে যখন ওদের ইন্টারভিউ নেবেন, সেগুলো রঙিন। ওদের ইন্টারভিউয়ের জন্য একটা প্রশ্ন তালিকা তৈরি করুন। সেটা এক বার আমাকে দেখিয়ে নেবেন। ইয়ে, একটা সিগারেট খেলে কি আপনার অসুবিধে হবে?"

"জিজ্ঞেস করে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমার অসুবিধে হয়। আপনি বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারেন।"

মনে হল রোহণ দাশগুপ্ত একটু আশ্চর্য হলেন। বর্ষা সরাসরি আপত্তি করবে, এটা বোধ হয় ভাবতে পারেননি। আবার মেয়েটার সোজাসুজি কথা বলা ভালও লাগল তার। মেয়েটা অন্য রকম, ভাবলেন রোহণ।

৭

উত্তরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল রাখি। জন্ম থেকে দেখে

আসছে। চোখের অভ্যাস হয়ে গেছে। কোথাও গেলে উত্তরে তাকিয়ে পাহাড় না দেখতে পেলে এখনও অস্বস্তি হয়। হঠাৎ মনে হয় কী যেন নেই। এখনও কী তীব্র আকর্ষণ পাহাড়ের দিকে। কত রকম সবুজ। একদম সামনে ঘন সবুজ। দৃষ্টি আরও দূরে ছড়িয়ে দিলে মনে হয় কুয়াশাজড়ানো সবুজ, তার পর নীল। নীলের মাঝে ছেঁড়া সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজের মাঝে হঠাৎ অনেকটা ধূসর জায়গা দেখা যায়। রাখি জানে ওখানে ধস নেমেছে। বড়-বড় গাছ নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে পাহাড়। পথ বন্ধ হয়ে গেছে। টয়ট্রেনের লাইন উড়ে গেছে।

বাড়ির সামনে মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাখি। সোমরা বলেছিল মহুয়া ফুলের গন্ধে হাতি আসে। কোনও কোনও দিন সকালে উঠে সোমরা বলত কাল রাতে হাতি এসেছিল। কুকুরগুলো খুব ডাকছিল। চা-বাগানে কুলি-লাইনের লোকজন ক্যানেস্তারা বাজিয়েছে, পটকা ফাটিয়েছে। ভুট্টাখেত তছনছ করে ফিরে গেছে ওরা। সোমরা চিতাবাঘের গল্প বলত। কেমন করে চা-বাগানের নালার ভেতরে চিতা তার বাচ্চাকে লুকিয়ে রাখে। হাতির দল কেমন করে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ওই নদী পার হয়ে ও পারের ফরেস্টে চলে যায়। বস্তির একটা কুকুরকে এক বার একটা মস্ত বড় সাপ কী ভাবে পেঁচিয়ে ধরেছিল। হাঁ করে শুনত রাখি। পুজোর সময় ট্র্যাক্টরে চেপে পাশের বাগান মগনবাড়ির পুজো দেখতে যেত ওরা। এ সব তো ছোটবেলার কথা। আর ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় পলাশদার দেওয়া চিঠি। ব্লাউজ়ের ভেতরে সেই চিঠি লুকিয়ে ফেলেছিল রাখি। পুজো দেখার হইচইয়ের মধ্যে বের করে পড়ার সুযোগ পায়নি। বুঝতে পারছিল ঘামে ভিজে উঠছে চিঠিটা। বুক ধুকপুক করছে। মনে হচ্ছিল মুখ দেখলেই মা বুঝে যাবে পলাশদা তাকে চিঠি দিয়েছে। ট্র্যাক্টরে ভিড়ের মাঝে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল পলাশদা। অন্ধকারে তার হাত টেনে নিয়ে হাতে গুঁজে দিয়েছিল। অনেক দিন থেকে পলাশদা তাকে দেখলেই আড়ষ্ট হয়ে যেত। অথচ অন্য সময় লুকিয়ে তাকেই দেখছে, বুঝতে পারত রাখি। বুকের ভেতরে শিরশির করত।

প্রথমে বুঝতে পারেনি।

"এখন লুকিয়ে রাখো, পরে পড়ে নিয়ো," ফিসফিস করে বলেছিল পলাশদা। পলাশদার পাশে রতনদা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গেই রাখি বুঝেছিল পলাশদা তাকে লাভ-লেটার দিয়েছে। দ্রুত ব্লাউজ়ের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছিল। বুকের ভেতরে ঢাকের শব্দ। মনে হচ্ছিল বলাকা, সন্ধ্যা, রায়মণি, মনমায়া, সবাই ওর বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কেউ কি দেখে ফেলেছে পলাশদার চিঠি দেওয়া? ইশ, মনে হচ্ছে তার জ্বর এসেছে। ইশ, কাল থেকে কী ভাবে পলাশদার দিকে তাকাবে!

কী লেখা ছিল সেই লাভ-লেটারে। কী লিখেছিল পলাশদা। আই লাভ ইউ রাখি? নাকি কিছু খারাপ কথা লিখেছিল? নাঃ, পলাশদার মতো ভাল ছেলে, অত সুন্দর ভলিবল প্লেয়ার, কী লম্বা, কী ভাল অঙ্ক শেখায়, খারাপ কথা লিখতেই পারে না। শেষে কান্না পাচ্ছিল রাখির। তাকে কেন, তাকেই কেন চিঠি দিল পলাশদা। বলাকাকে দিতে পারত, পাপড়িকে দিতে পারত, রঞ্জনাকে দিতে পারত। তাকে কেন দিল? সে কী করবে এখন? বেশ রাত করে পুজো দেখে ফেরার পথে গাড়িতে পলাশ যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার একদম উলটো দিকে দাঁড়িয়েছিল রাখি। মগনবাড়ির পুজোর প্যান্ডেলে মাইকে গান বাজছিল, 'রং বরসে ভিগে চুনরিওয়ালি রং বরসে...' উদ্দাম নাচছিল বাগানের মজদুররা।

রাখি পলাশকে খুঁজছিল। ইচ্ছে করছিল একটু আড়ালে গিয়ে বুকের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে। না, কেউ দেখে ফেলার ভয় আছে। সঙ্গে বিলু আছে। সে তাকে দেখতে না পেলেই খোঁজ করবে। থাক, একেবারে বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে পড়বে। ভাই তো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। একটু পেছনে তাকিয়ে দেখল পলাশ তার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রাখি। ভীষণ ভয় করছে। ঘাম হচ্ছে তার।

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রাখি। ভাই বিলু সোজা রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসে গেছে। প্রথমেই বুকের ভেতরে হাত দিয়ে চিঠিটা বের করল। নীল কাগজ। একটা কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পলাশদা যদি জানত তার হাতের লেখা এত ক্ষণ রাখির বুকের ওমে দুটো পাহাড়ি উপত্যকার মাঝে এক টুকরো মেঘের মতো লেপ্টে ছিল, তবে...

চিঠিটা ঘামে ভেজা। চার ভাঁজ করা। রাখি খুলতে গেল। তখনই দরজায় ধাক্কা দিয়ে মা ডাক দিল, "রাখি, দরজা খোল। তোর বাবা পঞ্জিকাটা চাইছে। তোর বুকশেলফে রয়েছে।"

দিশাহারা রাখি কী করবে বুঝতে না পেরে চিঠিটা খোলা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। ধরা পড়লে বাড়িতে মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যাবে। খুব রক্ষণশীল পরিবার তাদের। নিয়মনিষ্ঠা, নীতিনৈতিকতার উপর ভীষণ জোর দেয় তার বাবা। চরিত্র গেলে মেয়েদের আর কিছুই থাকে না। সে ভাবেই তাদের মানুষ করেছে। অথচ তাকেই পলাশদা হাতে চিঠি গুঁজে দিল। আর সেও কিছু বুঝতে না পেরে সেটা নিয়ে নিল। ছিঃ, কী ভুল করেছে। যাকগে, খুব ভোরে উঠে কুড়িয়ে নিলেই হবে।

সেই রাতেই হাতি এসেছিল তাদের বাগানে। একলা একটা দাঁতাল হাতি কুলি-লাইনের অনেক বাড়ি ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। মশাল নিয়ে, টিন বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে অনেক লোক চিৎকার করতে করতে তাদের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বাবা দরজা বন্ধ করে বলেছিলেন, "কেউ বাইরে যাবে না। জলের ট্যাঙ্কির কাছে হাতিটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।"

রাখির খুব ইচ্ছে করছিল হাতিটাকে দেখতে। তার পর হাতিটা তাকে দলেপিষে মেরে ফেলুক। তার হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন করে দিক দাঁতালটা।

হইচই থামলে বাবা বেরোলেন। বেশ কিছু ক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, "গেছে আপদটা। অনেকগুলো ঘর ভেঙেছে। একলা দলছুট দাঁতাল বড় মারাত্মক। একটা ধাক্কা দিলে আমাদের এই পাকা ঘরও মাটিতে মিশে যাবে। সে নাকি এক বিশাল কালো পাহাড়ের মতো। জয় বাবা গণেশ। ভাগ্যিস এদিকে আসেনি।"

পরদিন খুব ভোরে উঠে রাখি দেখল কাল রাতের মানুষের স্রোতে কোথায় চলে গেছে সেই চিঠি। তাদের পায়ের সঙ্গে সঙ্গে দলে পিষে ধুলোয় মিশে গেছে কিছু গোপন অক্ষর। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল রাখি। তার প্রথম লাভ-লেটার একটা দাঁতাল নিয়ে গেছে নদীর ওপারের জঙ্গলে। কী লিখেছিলে পলাশদা? আই লাভ ইউ রাখি? নাকি বাংলায় লিখেছিলে, তোকে ভালবাসি। হয়তো কোথাও দেখা করতে বলেছিল।

এ তার গোপন কথা। এ কথা কারওকে বলা যায় না। কিছু-কিছু কথা চিরকাল আড়ালে বহন করে নিয়ে যেতে হয় আমৃত্যু। বিতানেরও হয়তো আছে। তাকে কোনও দিন এ বিষয়ে কিচ্ছু বলেনি। স্কুলের চাকরি পেয়ে পলাশদা চলে গিয়েছিল দূরের শহরে। আর কোনও দিন পলাশদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রাখি ভাবে সেই না-পড়া তার প্রথম প্রেমপত্রের কথা। কোনও দিন জানা হবে না পলাশদার মনের কথা।

স্টিল-বর্ন বেবি ডেলিভারি হয়েছিল রাখির। অথচ তার আগের সপ্তাহেই চেকআপের সময় গাইনি মিসেস চ্যাট্যার্জি বলেছিলেন এভরিথিং ইজ় ফাইন। কী করে তার পরেই আমবিলিক্যাল কর্ডের প্রবলেম হয়! প্রোল্যাপসড হয় কর্ড। পরে বিতান জেনেছিল ওই সময়ে ফিটাসে অক্সিজেন সার্কুলেশন কমে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে সিজ়ারিয়ান সেকশন করে ডেলিভারি করাতে পারলে বেঁচে যাওয়ার চান্স থাকে।

সবচেয়ে ভাল নার্সিংহোমে রাখিকে ভর্তি করেছিল বিতান।

প্রেগন্যান্সি কনফার্ম হতেই বিতান ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল রাখিকে নিয়ে। মিনুর মা ছাড়াও আর-এক জনকে রাখা হয়েছিল শুধু রাখির দেখাশোনার জন্য। রায়মাটাং থেকে ফেরার এক মাস বাদেই রাখি বলেছিল তার পিরিয়ড মিসের কথা। বিতান ডাক্তার দেখানোর কথা বললে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার কথা বলেছিল। বিতান বলেছিল, "দেখো, শিয়োর ছেলে হবে। আমিই কিন্তু নাম রাখব।"

"কী নাম রেখেছ? বিতানের সঙ্গে মিলিয়ে জিদান কিন্তু ভাল হবে।"

"ইয়ার্কি মেরো না বেশি। জিদানই রাখব।"

"কী করে রাখবে? মেয়েদের নাম আবার জিদান হয় নাকি।"

"মানে? এর মধ্যে মেয়ের কথা কোথা থেকে আসছে?"

"আসছে মশাই। আমি শিয়োর আমাদের খুকু হবে। আমি নাম ঠিক করেছি অরুন্ধতী। আর ছেলে হলে... পলাশ," একটু ইতস্তত করে রাখি বলল।

"ধুস, সারাজীবন নামের সঙ্গে লাশ বয়ে বেড়াবে। বাজে নাম। আমাদের ক্লাসে পলাশ ছিল ভীষণ তোতলা। ওর কথা মনে পড়বে সব সময়।"

"ইশ, কোন কথা থেকে কোন কথায় নিয়ে গেলে।"

"এই না, এ রকম ভেবো না। এটা জাস্ট কথার কথা। লাভ ইউ রাখি। রায়মাটাংয়ের সেই রাত্তিরটার কথা মনে পড়ছে। আমার মনে হয় সেই রাত্তিরেই তুমি কনসিভ করেছ। কী উদ্দাম হয়ে উঠেছিলে তুমি। বাপরে, পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো উঠছিলে নামছিলে। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে। পরপর তৃপ্তি হচ্ছিল তোমার। আমি হেরে যাচ্ছিলাম।"

"এই না, প্লিজ় চুপ করো। আমার ভীষণ লজ্জা করছে। বেশ করেছি। আমার ভাল লাগছিল। জানো, তখন আমার সন্ধেবেলায় দেখা আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলোর কথা মনে পড়ছিল। কী উজ্জ্বল ছিল তারাগুলো। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। তোমাকেও মনে হচ্ছিল আকাশের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমার মুঠোয় বন্দি হয়েছ। তোমার উত্তাপে আমি মোমের মতো গলে যাচ্ছিলাম। আমার তৃপ্তির শেষ হচ্ছিল না।"

"রাখি, এই সময়ে বোধ হয় তোমার শরীরের কাছে আসা আমার উচিত নয়। অথচ তোমাকে কী ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। সে দিনের কথা ভেবে আমার ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। কী অসম্ভব ছিল সেই তারাদের রাত। বারে বারে কানে আসছিল জঙ্গল থেকে ঘরে ফেরা একটা দলছুট ছাগলের গলার ঘণ্টার শব্দ। ওই শব্দ আমাকে ধাক্কা মারছিল। আমাকে উত্তেজিত করছিল। আমাকে তোমার শরীরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। আমি আরও, আরও গভীরে যেতে চাইছিলাম। বুঝতে পারছিলাম তুমিও চাইছ আরও, আরও পেনিট্রেশন। উপোসি বাঘিনির মতো নখ আর দাঁত দিয়ে আমাকে ছিন্ন করছিলে তুমি।"

"চুপ-চুপ-চুপ করো। লজ্জা করছে আমার। আমার ভাল লাগছিল। তোমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় আমি বুঝতে পারছিলাম তুমি অনেক পালটে গেছ। তুমি আমার কথাও ভাবো। আমার বারে বারে তৃপ্তি হচ্ছিল। আমারও তোমার মতো মনে হচ্ছিল সতর্কতাহীন এই সেক্স কুড ব্রিং আ নিউ ফিউচার।"

রাখির মনে পড়ল সেই রাতের কথা। বিতানের উন্মাদনা তাকে নিশ্চিন্ত করেছিল। বিতান পাল্টে গেছে। প্রভুত্বকামী বিতান নয়, এই বিতান অনেক সমঝোতা করতে শিখেছে। ভাল লাগছিল রাখির। সেই সুখে তার সুখ বারে বারে গড়িয়ে নামছিল। সে নিজেই অবাক হচ্ছিল এত দিন কোথায় ছিল এই আনন্দঝর্না।

আমবিলিক্যাল কর্ড, অক্সিজেন সাপ্লাই, প্রোল্যাপ্স, এ সব কিছুই জানত না বিতান বা রাখি। রাখি বলেছিল, সম্ভব হলে সিজ়ারিয়ান সেকশন যেন অ্যাভয়েড করা হয়। যত কষ্টই হোক, নরম্যাল ডেলিভারি সে চাইছে। রাখি কখনও কোনও ভারী জিনিস তুললে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে বিতান। তবু নিয়তির মতো একটা নাড়ি জড়িয়ে যায় একটা ভ্রূণের অব্যক্ত জীবনে। স্টিল-বার্থ হয় পলাশ কিংবা অরুন্ধতীর। বিতান তাকে শুশ্রূষার জন্য রেখে আসে মথুরাপুর চা-বাগানে। সেখানে রাখি একটা মহুয়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে, পাহাড় দেখে, মেঘ দেখে। একটা চিঠির কথা মনে পড়ে তার। পলাশদা, কী লিখেছিলে গো? আমার কোনও দিন জানা হবে না। তুমি ক্লাসে যখন অঙ্ক শেখাও, মনে কি পড়ে সেই চিঠির কথা? কী লিখেছিলে পলাশদা? আমার কোনও দিন জানা হবে না। জীবনে কত কিছু অজানা থেকে যায়। সেই কষ্টের কথা তুমি কতটুকু জানো পলাশদা? কোথায় যেন পড়েছিলাম যার-যার ক্রুশকাঠ তাকে নিজেই বহন করতে হয়। পলাশদা, আমার স্বপ্নের ভেতরে যে খুকু ছিল, সে আর নেই। এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই গর্ভের অন্ধকারে চিরদিনের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার স্বামী বিতান দত্ত চেয়েছিল আমাদের ছেলে হোক। আমার গর্ভে কিন্তু খুকু ছিল। নাড়ি, যার নাম অমরা, আমার শরীরের আর মনের সব সুধারসটুকু নিয়ে যে তিলে-তিলে গড়ে উঠছিল, এই পৃথিবী সে দেখতে পেল না। কী লিখেছিলে পলাশদা? আই লাভ ইউ? পলাশ, মি টু। তোমার অক্ষর আমার কাছে আসেনি, আমার অক্ষরও তুমি কোনও দিন জানবে না। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে উত্তরের বাতাস বয়ে যায়। লেপার্ডের বাচ্চাগুলো নালার ভেতরে খেলা করে। মহুয়া গাছে ফুল ফুটলে বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে। বিশাল হাতির মতো কালো মেঘ হিমালয়ান রেঞ্জের গায়ে ঘোরাফেরা করে। তখন আমার লম্বা একটা অঙ্কে-ভাল ছেলের কথা মনে পড়ে। আমার প্রথম অঙ্কটার ভুল উত্তর বেরিয়েছে পলাশদা। মৃত সন্তান ছিল আমার গর্ভে। নাড়ির ষড়যন্ত্রে ফুটফুটে মেয়েটা ফুটল না। ঝরে গেল।

"হেই অহল্যা, কী ভাবছিস?"

চমকে পাশে তাকিয়ে রাখি দেখল সোমরা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মাঝে-মাঝে সোমরা তাকে অহল্যা বলে ডাকে। সোমরার হাতে একটা ছপটি। যেন ছাগলের পাল নিয়ে সে এখনই তৃণভূমিতে যাবে।

"এই পাহাড় দেখছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"উঁহু মেয়ে, তোর মন খারাপ। আমার সঙ্গে চল, ঘুরে আসবি। মন ভাল হয়ে যাবে। চল, ছেলেবেলার মতো তোকে গল্প শোনাব। যেখানে আমাদের বাগানের পথটা জঙ্গলের দিকে ঘুরে গেছে, মনে হয় পাহাড় কত কাছে, সেই পথটা যেন কোন জঙ্গলে চলে গেছে। সেখানে অনেক ফুল, অনেক প্রজাপতি, বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হলেই ঘাসের উপর ফড়িংয়ের মেলা বসে। চল, সেখানে বসে আমরা গল্প করব।"

রাখিকে বাপের বাড়িতে রেখে এসে বিতান কিছু দিন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুধু সিগারেট টেনে গেল। মেয়ে ছিল রাখির গর্ভে। রাখি এক দিন বলেছিল, "দেখো, আমাদের খুকু হবে।"

ওর কথাই সত্যি হয়েছিল। নাম রেখেছিল, অরুন্ধতী। অজাত সন্তানকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা বোধ হয় ভগবানের পছন্দ হয়নি। কারও নজরও লাগতে পারে। এ সব রাখি মানতে চায় না, বিতান মানে। সব কিছু বিজ্ঞানের কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কত রহস্য এখনও মানুষের জ্ঞানের বাইরে রয়ে গেছে। কত বিস্ময়কর ঘটনা আজও ঘটে, বিজ্ঞান যার কূলকিনারা খুঁজে পায় না। রাখির অরুন্ধতীর আলো পৃথিবীতে পৌঁছনোর আগেই নিভে গেল। একা ঘরে চোখ থেকে একবিন্দু জল মুছে ফেলে বিতান। ফোন করে রাখিকে সাবধানে থাকতে বলে। ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। আরও কিছু দিন ওখানে থাকুক রাখি। কিছুটা স্বাভাবিক

হলে এখানে নিয়ে আসবে।

ক'দিন হল বিকেলের দিকে জ্বর আসছে বিতানের। কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করে না। খিদেই পায় না। রাখি থাকলে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। তার বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। কোনও মতে কলেজে গিয়ে ক্লাস নিয়ে চলে আসে। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে। কবিতা লেখার ডায়েরিতে ধুলো জমে।

সাত দিন বাদে রাত এগারোটায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠল বিতান। মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছু একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে। সারাদিন ব্যস্ততায় কেটে যাবে। নতুন কিছুর মধ্যে এনগেজড না হলে এই চঞ্চলতা কাটবে না। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। সর্বনাশ, পাড়ার দোকান এত ক্ষণে বন্ধ। যেখানে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে রাখত, সেখানে খুঁজবে বলে তার আলমারি খুলে অনেক ক্ষণ হাতড়াল। নেই, কোথাও এককুচিও তামাক নেই। এটা কী? বড় একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। তার তো নয়। নিশ্চয়ই রাখি রেখেছে। তার সিগারেটও লুকিয়ে রাখতে পারে।

বুকের মাঝখানে বিতান জড়িয়ে রেখেছে উলের ছোট্ট সোয়েটার, একজোড়া উলের মোজা, একই উলের সুন্দর একজোড়া জুতো, মাথার টুপি। এক্সপেক্টেড ডেট ছিল পঁচিশে নভেম্বর। এ শহরে তখন বেশ ঠান্ডা পড়ে যায়। আজ পনেরোই ডিসেম্বর। বেঁচে থাকলে আজ তার সন্তানের বয়স হত একুশ দিন।

শিবু মাইতির নম্বরে রিং করল বিতান। কিছু ক্ষণ বেজে যাওয়ার পর শিবু ধরল।

"হ্যাঁ স্যর, তা হলে ফাইনালি আমাদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে মনস্থির করলেন। কনগ্র্যাচুলেশন অ্যান্ড ওয়েলকাম স্যর। আমি তা হলে আপনার হাতে আমাদের পতাকা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে অ্যারেঞ্জমেন্ট করি? আলিপুদুয়ারের সভায় আমাদের রাজ্য কমিটির সম্পাদকের আসার কথা। চেষ্টা করব তার হাত দিয়েই আপনাকে আমাদের পতাকা তুলে দিতে।"

"সে করবেন, কিন্তু আপনি কী করে বুঝলেন আমি এত রাতে আপনাকে আমার সম্মতি জানানোর জন্য ফোন করেছি?"

"এটুকু বুঝতে না পারলে বৃথাই এত দিন পলিটিক্স করলাম। সাধারণ কথা হলে আপনি কাল সকালেই বলতেন। এত রাতে কল করতেন না। আমি শুয়ে পড়তে পারি, সে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আপনি ফোন করেছেন। অর্থাৎ আপনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় এখনই জানাতে চাইছেন। আপনার অসম্মতি আপনি অন্য কখনও জানাতে পারতেন, বা একদম নিশ্চুপ থাকলেই আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু বেশি রাতে ফোন করা মানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আর কেউ কি আপনার সিদ্ধান্তের কথা জানে?"

"না, এখনও কেউ জানে না। আপনারাও আশা করি এখনই ঘোষণা করছেন না?"

"না, আমরা পরে প্রেস ডেকে জানাব। আরও ছোটখাটো কিছু দলছুট চুনোপুঁটিও আসবে। কিন্তু আপনার ওজন আলাদা। শিক্ষিত মানুষ, তার উপর কবিতাফবিতা লেখেন। সেলিব্রিটি মানুষ।"

চুপ করে রইল বিতান। 'কবিতাফবিতা' শব্দটা তার কানে লাগছিল। পরে ভাবল শিবু মাইতির মতো অশিক্ষিত ধড়িবাজ লোক কবিতার মহিমা কী বুঝবে! ওদের কাছে সব কবিতাই ফবিতা। কিন্তু সে আস্তে-আস্তে কবিতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ফোন রেখে দিল বিতান। কপালে হাত দিয়ে দেখল হালকা গরম। টেবিলে মিনুর মা তার রাতের খাবার সাজিয়ে রেখে গেছে। খেতে ইচ্ছে করছিল না বিতানের। একটু নাড়াচাড়া করে সামান্য একটু মুখে দিয়ে উঠে পড়ল। ফোন বাজল, বিতান দেখল রাখির নাম। আজ সারাদিন ফোন করা হয়নি রাখিকে। নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

"হ্যাঁ, বলো। কেমন আছে শরীর? ওষুধগুলো ঠিক করে সময় মতো খাচ্ছ তো?"

"আমি ঠিক আছি। কালকে যে বলছিলে সামান্য জ্বর থাকছে সব সময়। আজ ডাক্তার দেখাবে। গিয়েছিলে?"

"কাল যাব। আজ এত আলসেমি লাগল, ঘুম থেকে বেলা করে উঠেই কলেজে দৌড়েছি। কাল ঠিক যাব।"

"শোনো, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও। মা অবশ্য বলছে আরও কিছু দিন বিশ্রাম নিতে। সে আমি ওখানে গিয়েও নিতে পারব। তুমি কাছে থাকলেই আমার ভাল লাগবে। এখানকার নির্জনতা আমার বুকের উপর চেপে বসছে। বাড়িতে শুধু আমি আর মা। এই সময় তোমার কাছে আমার থাকতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমাকে নিয়ে যাও প্লিজ়। আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব অনিয়ম করছ। দাঁড়াও, আমি গিয়ে তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। কাল কিন্তু ডাক্তার দেখাবেই।"

"রাখি, আমি...আমি নতুন পার্টিতে জয়েন করেছি।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল রাখি। তার সন্দেহ ছিল বিতান তার পুরনো পার্টি সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। কথাবার্তায় বুঝতে পারত। লোকটার ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার একটা প্রবণতা আছে। তার পুরনো পার্টিতে সে ক্ষমতা হারাচ্ছে বুঝতে পেরে ভেতরে-ভেতরে হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্ষমতা সম্পর্কে বিতানের এই মোহ রাখি অল্প দিনেই বুঝতে পেরেছিল। এখন এই শরীর নিয়ে আবার যদি পার্টি নিয়ে মেতে ওঠে, তবে বিছানায় পড়ে যাবে।

"এই শরীর নিয়ে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না এখন। ডাক্তার দেখিয়ে কী বললেন, আমাকে অবশ্যই জানাবে।"

মেডিসিনের একজন নামকরা ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল বিতান। সেখানেই দেখা গেল তার ওজন শেষ ওজন থেকে প্রায় ছ'কেজি কমে গিয়েছে। সব বলল বিতান। কথা বলতে-বলতে বা একটানা কাশির পর আউট অফ ব্রিদ হয়ে যাওয়ার কথা, খিদে কমে যাওয়ার কথা। ডাক্তারবাবু খুব ভাল করে পরীক্ষা করে আগে একটা ডিজিটাল এক্স-রে করতে বললেন চেস্টের। সেটা দেখে প্রেসক্রিপশন করবেন। কিছু রক্তের পরীক্ষা করতে বললেন। পরে দরকার পড়লে একটা সিটি স্ক্যান করতে হতে পারে।

বিতানের লাং-ক্যান্সার অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। থ্রি বি স্টেজের। প্রথমে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় ছোট-ছোট টিউমারগুলো, আস্তে-আস্তে নিয়তির মতো ছড়াতে থাকে। রোগী সাধারণ জ্বরের ওষুধ খায়, গলাব্যথার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক নেয়, হয়তো তখনও সিগারেট খেয়ে যায়। তার পর এক দিন ধরা পড়ে কালপক্ষী তার ধূসর ছায়া ফেলেছে লোকটার ফুসফুসে। এক দিন তার অমোঘ নখে তুলে নিয়ে যাবে এই জেগে থাকা পৃথিবী থেকে নৈঃশব্দের শূন্যতায়। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ক্রমশ পরিধির দিকে সরণ ঘটে লোভী মানুষের। স্বপ্নদেখা মানুষ ভাবে, 'আমারই কেন? আমারই কেন হল।' কত আশা অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হয় মানুষকে। কত সাধ, কত কামনাবাসনা, কত পাওয়া হয় না জীবনে।

প্রচণ্ড সিগারেটের পিপাসা পাচ্ছিল বিতানের। ধরাবে, কী ধরাবে না, ইতস্তত করছিল। বিতান বুঝতে পারছিল স্টেজ থ্রি থেকে লৌকিক বা অলৌকিক, কোনও ভাবেই তার ফেরার পথ নেই। আর কিছু দিন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সে দেখতে পাবে। রোজ সকালে তার মাথার কাছে জানলার কাচে একটা দোয়েল এসে ঠুকঠুক করে। সে না থাকলেও কি পাখিটা আসবে? সে না থাকলেও পূর্ণিমায় গোল চাঁদ রুপোলি আলোয় ভরে দেবে পৃথিবী। তার কলেজ যেমন চলছে, তেমনই চলবে। এই অনন্ত জীবনপ্রবাহ থেকে এক বিন্দু জল হারিয়ে গেলে অনন্তধারার কিছুই আসে যায় না। সব গিয়ে শেষ হয় কালের অনন্ত গর্ভে। সেখান থেকে এক বিন্দু সময় হারিয়ে গেলে বা এক ফোঁটা সময় যোগ হলে সেই মহাকালের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছুই হয় না। সে নিত্য,

সে ধ্রুব। বিতানের অস্পষ্ট মনে হল এ রকম একটা কবিতা এক দিন সে লিখেছিল। তবে কি কবিতায় কবিরা সত্য লেখে না? মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তার চোখে জল আসছে কেন? সে কি টাটায় যাবে বেঁচে থাকার আশায়, নাকি এখন একটা সিগারেট ধরাবে? ডিসিশন নিতে পারছিল না। রাতে ফোন এল রাখির। আগামী কাল রাখি চলে আসবে। তার ভীষণ বিতানকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। কী করবে এখন বিতান? রাখিকে বারণ করবে আসতে। তবে রাখি আরও নার্ভাস হয়ে যাবে। সে নিজেই শারীরিক, মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। ইচ্ছে করছে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। সেখানে কেউ চিনবে না অধ্যাপক বিতান দত্তকে। কেউ জানবে না লোকটার লাং-ক্যান্সার। কেউ বুঝবে না কত অপূর্ণতা নিয়ে তাকে চলে যেতে হবে। হিজ় ডেজ় আর নাম্বার্ড। ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে।

বেলা বারোটা নাগাদ ছোটভাই বিলু রাখিকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেল। তার জরুরি কাজ আছে। বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে রোদে বসেছিল বিতান। তার চোখের নীচে কালি পড়েছে। কালপক্ষী আঁচড় দিয়ে গেছে তার শরীরে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল তার শরীর। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল রাখি। বিতানকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। তার চোখের জল বিতানের বুক ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বিতানের মনে হল দাহ-নিবারণী ঠান্ডা চন্দনের প্রলেপ তার বুকের ভেতরে কেউ মাখিয়ে দিচ্ছে, মৃত্যুবাহী অর্বুদগুলো প্রশমিত হচ্ছে। পরম আশ্রয়ের মতো সেও জড়িয়ে ধরল রাখিকে।

"বলো, কী হয়েছে তোমার? ডাক্তার কী বলেছে?"

"কিচ্ছু হয়নি। তুমি এসে গেছ, এখন আর আমার কোনও ভয় নেই। কাছে থাকো, কাছে থেকো রাখি। আমি বুঝতে পারিনি আসলে তুমিই আমার শক্তির আধার। তোমাকেই চিরকাল চাই রাখি। আমাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরো, বড় শীত করছে গো।"

ক্ষমতার বিন্দু কখনও স্থির থাকে না। পরিধির দিকেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সরণ হয়। যে চেয়েছিল হাজার বছর বাঁচতে, যাঁর আক্ষেপ ছিল মানুষ কেন কচ্ছপের মতো দীর্ঘজীবী হয় না, সেই মানুষটা এখন তাঁর বৌকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। লোকটার কাঁধের উপর বসে আছে কালপক্ষী। তাঁর আয়ু থেকে ঠুকরে খাচ্ছে রক্তমাংস। বুকের ভেতরে ব্যথা টের পাচ্ছে বিতান। এত বাতাসের ভেতরে থেকেও আরও একটু বাতাসের জন্য বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছে বিতানের।

৮

"বড় মুশকিলে পড়েছি রে শম্পা। বড় মুসিবত।"

"স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়নি তোর? কাল রাতে অত ক্ষণ জেগে কী করলি তবে? আমি তো ভাবলাম তরতর করে তোর লেখা এগোচ্ছে। নিলুপিসির একটা ইন্টারভিউ নিবি বলেছিলি, কবে যাবি? আরও নাকি কয়েকটা কেস পেয়েছিস, সেগুলো রেকর্ডিং করবি না?"

"সে কিছুটা হয়েছে। কিন্তু লোকটার উপর ক্রাশ খেয়ে গেছি রে। বুড়ঢা বড় আশ্চর্য লোক মাইরি। এ রকম ইনার-আই খুব কম লোকের থাকে। আর যা সেন্স অব হিউমার। আমি মরে গেছি শম্পা।"

"সর্বনাশ। পারাবার পার হয় শেষে গোষ্পদে ডুবে মরলি। বৌ নেই লোকটার? বয়স কেমন?"

"ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেক দিন। আমার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের বড় মনে হয়। এত কেয়ারিং না, কী বলব। এ পর্যন্ত পাঁচ বার গেছি রোহণের বাড়িতে। আমার চোখের মুগ্ধতা বোধহয় বুঝতে পেরেছে। কিন্তু অনেক বলেও এখনও আমাকে 'আপনি' বলা ছাড়াতে পারিনি।"

"তুই মরেছিস সখী। শেষে বুড়ো ভামের সঙ্গে পিরিতে মজলি। লোকটাকে ভাল করে বুঝেশুনে এগোস। পাক্কা খেলুড়ে হলে আবার শক পাবি।"

"না রে। আমি লোক চিনতে পারি। এ সে রকম নয়। এ রকম পুরুষের জন্য মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কত কিছু যে শিখলাম এ ক'দিনে। লোকটার এস্থেটিক সেন্স বড় ভাল।"

"তাপুদাকেও তো ভাল করে চিনেই বিয়ে করেছিলি। বড় শিল্পী। এক দিন ছবির দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে। ঘরপোড়া গোরু তুই, সাবধানে ডিসিশন নিবি।"

"তাই হত। মদ আর মেয়ের নেশা ওকে শেষ করে দিল।"

"চল, এক দিন তোর সঙ্গে গিয়ে আমাদের জাম্বুকে দেখে আসি। আমার সখীর মনোহরণ করেছে, কে সেই মদনকুমার।"

"সে এক দিন যাস। হাতেকলমে কাজটা শুরু হোক। রোহণ বলেছে, এক দিন চা-বাগানে নিয়ে যাবে। মথুরাপুরে। চা প্রসেসিং দেখাবে। সিটিসি মানে জানিস? ক্রাশ, টিয়ার, কার্ল। সে দিন না হয় তুইও থাকিস।"

"নাঃ, তোদের জয়-রাইডে আমি হাড্ডি হতে চাই না। থাক, পরে কখনও দেখা যাবে। তুই কি সিরিয়াস?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না রে। তবে দুর্বলতা একটা এসেছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি বড় নির্বিকার। বুঝতেই পারছি না। রোজ ভাবি রাতে এক বার মেসেঞ্জারে কথা বলব। সাহসই পাচ্ছি না। কোনও ছেলে পেছন থেকে কোনও মেয়েকে দেখলেও মেয়েরা কেমন করে যেন বুঝতে পারে। অথচ এই লোকটা এত কথা বলছে, মজার গল্প করছে। ফাঁকা বাড়িতে শারীরিক ভাবেও কাছাকাছি আসছি, কিন্তু কোথাও একটা অদৃশ্য গণ্ডির ভেতরে নিজেকে রাখছে। সেই গণ্ডি আমি কিছুতেই পার হতে পারছি না।"

"দেখিস, বেশি চালাক ছেলেদের এটাও একটা কায়দা। উদাসী বাউলের মতো থেকে শিকার যেই হাতের মুঠোয় আসে, অমনিই তার বৈরাগ্যের মুখোশ খসে পড়ে। ভণ্ড সন্ন্যাসীর জটা খুলে পড়ে, বাঘের মতো মাংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

"সব কিছুই এত নেগেটিভলি নিচ্ছিস কেন? লোকটার সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবি লোকটা জেনুইন কি না।"

"সে তো আমি অবশ্যই দেখব। আবার যাতে ভুল না করিস, সেটা আমি ছাড়া কে দেখবে। আমি পারমিশন দেব, তারপর তুই ফারদার এগোবি।"

"ওরে আমার গার্ডিয়ান! 'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, মন বান্ধিবি ক্যামনে...'" সুর করে এক কলি গেয়ে উঠল বর্ষা।

চা-বাগানের উপর তথ্যচিত্র 'হিরণ্ময় নীরবতা' বর্ষাকে দেখিয়েছিলেন রোহণ। একটা শট ছিল বন্ধ চা-বাগানের পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের পাঁজর প্রকট। ওর মতোই একটা শীর্ণ চা গাছের বিবর্ণ পাতায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সেই অখণ্ড নীরবতায় হঠাৎ একটা ছাগলের তীব্র কর্কশ ডাক, যেমন শোনা যায় মাংসের দোকানে একটু আড়াল থেকে। শিউরে উঠেছিল বর্ষা। ছবি কী ভাবে কথা বলে, ছবি কেমন করে বার্তা পাঠায়, বুঝতে পারছিল। এ সবের মাঝেই ভয়েসওভারে রোহণ নিজের কণ্ঠে বলছিলেন কী ভাবে ইংরেজরা রাঁচি, পালামৌ, ময়ূরভঞ্জ, হাজারিবাগ থেকে আদিবাসীদের এনে বন্ডেড লেবার বানিয়ে দিত। আড়কাঠিরা গিয়ে ওদের এল-ডোরাডোর স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে আসত। মালিক আর ইউনিয়নের লিডারদের আঁতাঁত। বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা শুকনো নদীখাতে পাথর ভাঙছে এখন। কখনও আবার ব্যস্ত বাগানের কারখানা। পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে অভ্যস্ত হাতে দু'টি পাতা, একটি পাতা তুলে চলেছে দল বেঁধে। উৎসবে মাদল বাজছে, ওরা লাইন করে নাচছে।

ফেড-আউট, ফেড-ইন, প্যান, ডিজ়লভ, কোন অ্যাঙ্গেল থেকে শট নিলে সবচেয়ে বেশি জোরালো হবে, সব শিখিয়ে দিচ্ছিলেন রোহণ।

বর্ষা ভাবছিল সে অনুরোধ করলে তার এই কাজে কি রোহণ নিজে ক্যামেরা হাতে নেবেন না? যা হয় বলুক 'হ্যাঁ' কিংবা 'না', বর্ষা বলবে।

"খরচের কথা ভেবেছেন কিছু? আগে ফিল্ম ডিভিশনে প্রোজেক্ট জমা দিয়ে অ্যাপ্লাই করলে ওরা নিয়মকানুন মেনে স্যাংশন করত। এখন সেটা বন্ধ। এখন পিএসবিটি-র দপ্তরে জমা দিতে হয়। পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং ট্রাস্ট। ছবি হতে হবে ছাব্বিশ থেকে বাহান্ন মিনিটের মধ্যে। তাও প্রোপোজ়াল ওদের পছন্দ হতে হবে।"

"আমার সাধ্যের ভেতরে হলে নিজেই ফান্ডিং করব।"

"দেখুন, ক্যামেরাম্যানের চার্জ, ক্যামেরার ভাড়া, লাইটের দরকার হলে তার খরচ, মিউজ়িক আপনাকে রাখতেই হবে, মিনিমাম হলেও। কমেন্ট্রির সময় নয়, দৃশ্য দেখানোর সময় কী ফিল্ম নিঃশব্দ থাকবে? সাব-টাইটেল জুড়তেই হবে। শুটিংয়ের জন্য বাইরে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলে আর লোকালি সব শুট করলে খরচের অনেক ফারাক পড়ে যাবে। এডিটিংয়ের খরচও ভালই। সব দিক ভাবনাচিন্তা করে এগোন। আমি সঙ্গে আছি।"

"জানি আমি। হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার।"

সে দিন ওরা পাশাপাশি বসে ছবিটা দেখছিল। মাঝে-মাঝে দু'জনের শরীরের ছোঁয়া লাগছিল। ভাল লাগছিল বর্ষার। গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। সকালেও আকাশে মেঘ ছিল। আসার পথে বর্ষা ভাবছিল আজ যদি আবার তুমুল বৃষ্টি নামে, তবে বিপদে পড়বে। এক পলকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বর্ষা দেখল আকাশ আবার ঘন কালো মেঘে সেজেছে। পাহাড়ে বুনোহাতির মতো মেঘের দল থম ধরে অপেক্ষা করে আছে। বিষাদের মতো ম্লান আলোয় ভরে
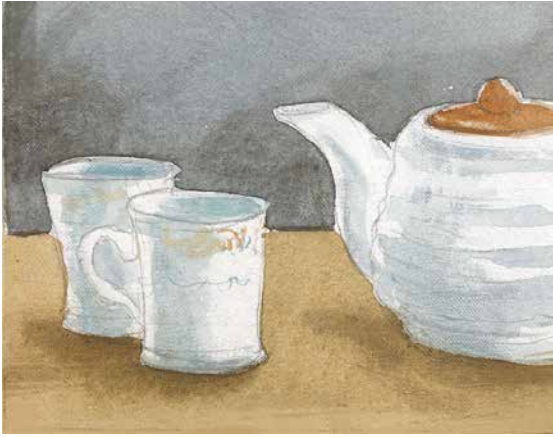
আছে পৃথিবী।

"ম্যাডাম, কেমন লাগল আপনার?"

ছবি শেষ হলে কম্পিউটার বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন রোহণ। অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল বর্ষা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রোহণ দাশগুপ্ত।

"বলব না," সরাসরি রোহণের চোখের দিকে তাকিয়ে বর্ষা বলল। চোখ নামাল না।

"স্যরি, আমি কি কোনও ভুল করেছি? কোনও অন্যায়? পছন্দ হয়নি ছবিটা?"

"না, সে সব কিছু নয়। কিন্তু আমি কি অন্যায় করেছি যে, এত বার বলার পরেও আমাকে 'তুমি' বলা যাচ্ছে না।"

খোলা জানলা দিয়ে বাইরের মেঘে-ঢাকা আকাশের দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রোহণ। বর্ষা দেখল বাইরের বিষাদ-আলোর ম্লান ছায়া পড়েছে রোহণের চোখেও। তিনি উদাস চোখে তাকিয়ে আছেন বাইরে।

"কী আসে যায় আপনি বা তুমিতে। আমি...আমি ঠিক পারি না।"

"ওকে স্যর। যতটুকু সাহায্য করেছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। অন্য কারওকে নিয়ে এক দিন না হয় মথুরাপুরে ঘুরে আসবেন। আমি জানি আমি খুব বাজে মেয়ে। ডিভোর্সিরা তো খারাপই হয়। আসি স্যর। এক বার প্রণাম করব স্যর, নাকি অসুবিধে আছে?"

প্রণাম করার জন্য নিচু হতেই বর্ষাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেললেন রোহণ, "এই, কী করছ। পাগল মেয়ে।"

"হুঁ, এত দিনে," রোহণকে জড়িয়ে তাঁর বুকে মাথা রাখল বর্ষা।

"কী, এত দিনে কী বর্ষা?"

"এত দিনে আমাকে তুমি বলা হল।"

"বাঃ, ভাববাচ্য তো ভালই বলো। আজ খুব বৃষ্টি হল, এটা ভাববাচ্যে বলো দেখি।"

"জানি না, যাও," আবার রোহণকে জড়িয়ে ধরল বর্ষা। আরও নিবিড় করে।

আস্তে-আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন রোহণ। বসলেন। বর্ষাও তার পাশে বসল। জানলা দিয়ে দেখল ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড় থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। জানলার পর্দা উড়ছে এলোমেলো।

"বর্ষা, এটা হয় না। ভাল করে ভেবে দেখো। আমাকে তুমি ভাল করে চেনো না, জানো না। সামান্য ক'দিন আমার সঙ্গে মিশেছ। আমাদের বয়সের কত ফারাক। আমার পাপপুণ্য, আমার বাহির-ভিতর, আমার ইতিহাস-ভূগোল, কিচ্ছু জানো না তুমি। সাধ করে কেন দুঃখ ডেকে আনবে। আমি...আমি, না বর্ষা, কেন তুমি আমার ভালবাসা চাও। আমি ফুরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ। ওই যে, উপরে তাকাও। ওই লম্বা ব্যাগের ভেতরে একটা এস্রাজ আছে। ভাঙা। আমিই ভেঙে ফেলেছিলাম। আমার বৌ বাড়িতে বসে এ সব ক্যাঁ-কোঁ না করে রেডিয়ো, টিভিতে অডিশন দেওয়ার জন্য রোজ বিরক্ত করত আমাকে। সবাই ছেড়ে গেছে। গান, আমার বৌ সুদেষ্ণা। টাকা থাকতে-থাকতে দুটো গাড়ি কিনেছিলাম। রেন্টালে পাহাড়ে চলে। আমারও ওতেই চলে। বাবা চলে গেলে আমাদের প্রপার্টি ভাগ হয়ে যায়। জমি, শহরে তিনটে বাড়ি, ব্যাঙ্কের ডিপোজ়িট। আমি ওদের সঙ্গে না থেকে আমার অংশ বিক্রি করে এখানে চলে এসেছিলাম। কোনও কাজ না করেও হেসেখেলে আমার জীবন চলে যাবে। আমার মায়ের নাম অনেকে জানে। তুমিও শুনে থাকতে পারো। চন্দ্রিমা দাশগুপ্তা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামকরা গায়িকা ছিলেন। মায়ের কাছে আমার গান শেখা। পরে মায়ের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতে আসতেন অসিতকাকু। আমি তাঁর কাছে নাড়া বাঁধলাম। মা আমাকে ওই এস্রাজ কিনে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ো না বর্ষা। কষ্ট পাবে। আমি একদম নিয়মছাড়া মানুষ। কেউ সুখী হয়নি আমাকে নিয়ে।"

"হ্যাঁ, চন্দ্রিমা দাশগুপ্তার নাম জানি। শান্তিনিকেতনে ছিলেন। গানও শুনেছি।"

"শুনেছ? তুমি আমার মায়ের নাম শুনেছ?" উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোহণের চোখদুটো, "আমার মায়ের একটাই এলপি রেকর্ড ছিল। সুদেষ্ণা এক দিন সেটা ডিসকাস থ্রোয়ের মতো করে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছিল। বাতাস কেটে-কেটে সেটা সাঁই সাঁই করে আকাশের দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। আমি এক থাপ্পড় মেরেছিলাম সুদেষ্ণাকে। আমার সঙ্গে নিজেকে কেন জড়াবে বর্ষা? এ খেলা মধুর হবে না।"

"তোমার কাছে খেলা মনে হল?"

"আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে। সত্যিই বর্ষা, সত্যিই এ সব? আমার কথা সব তো শুনলে!"

"আমার কথা শুনবে না? আমারও পাপপুণ্য, ইতিহাস-ভূগোল, কিছুই তুমি জানো না।"

মুচকি হাসলেন রোহণ, "সব না হলেও অনেকটাই জানি। প্রখ্যাত

চিত্রকর তপেশ রায়চৌধুরীর প্রাক্তন স্ত্রী। কলেজের অধ্যাপিকা। ট্রান্সদের নিয়ে ডকু বানাবে বলে পাগল। এক জন রুমমেটকে নিয়ে পিজি থাকে। ফুচকা ভালবাসে। আর কিছু?"

"ও মা! এ সব তুমি কোথা থেকে জানলে? নিশ্চয়ই আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করেছ। চোর-ডাকাত কি না, খারাপ মেয়ে কি না, এ সব জানবে বলে?"

"এবং আমার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে... সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার।"

"মানে? তোমার কোন জিনিস আমি চুরি করেছি?"

উঠে দাঁড়ালেন রোহণ। ঘরের ভেতরে কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করলেন। চঞ্চল দেখাচ্ছে তাঁকে। কী করে এত দ্রুত এসব ঘটে গেল। তিনি বুঝতে পারতেন বর্ষার মুগ্ধতা। সাবধানে থেকেছেন, অচঞ্চল রাখার চেষ্টা করেছেন নিজেকে। কখনও অসাবধানে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁরও কি একটুও টান তৈরি হয়নি? এক দিন তিনি ভেতরে চা বানাচ্ছিলেন, এ ঘরে বসে গুনগুন করে গান গাইছিল বর্ষা। একটু শুনেই রোহণ বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটার সুরের আন্দাজ খুব ভাল। ভেবেছিলেন বলবেন গলা ছেড়ে গাইতে। স্বাভাবিক সঙ্কোচে বলতে পারেননি। ভাল লেগেছিল তাঁর। আস্তে-আস্তে আসা-যাওয়া বেড়েছে বর্ষার। ভাল লাগার টুকরো-টুকরো মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার বেশি এগোতে ভয় পেয়েছেন রোহণ। কিছু দিন পাশাপাশি থাকলে সাময়িক একটা টান তৈরি হয়। সেই ভাল লাগাকে বিশ্বাস করে চিরদিনের সম্পর্কের কথা ভাবা বোকামি। বর্ষার এটা হঠাৎ ভাল লাগা। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে হয়তো ভুলেই যাবে বর্ষা। তা ছাড়া তাঁদের যা বয়সের ফারাক, এমন সম্পর্ক কী করে ভাববেন রোহণ। কিন্তু মেয়েটাকে এখন মনে হচ্ছে সিরিয়াস। কেন, কেন তাঁর মনেও আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠছে? কেন এই অবেলায় শরীরও জেগে উঠতে চাইছে? এ কোনও ছেলেখেলা নয়। মনের ভেতরে জমে রয়েছে কত বিষাদের মেঘ, কত নিরাশার বেদনা, বুকের ভেতরে রয়েছে রক্তপাতের স্মৃতি। কী করে তিনি সে সব ভুলে যাবেন?

"বর্ষা, আজ কী করে বাড়ি ফিরবে? বাইরে তাকিয়ে দেখো কী তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। এ বৃষ্টি সহজে থামার নয়। এক কাজ করো, তোমার বন্ধুকে ফোন করে দাও আজ ফিরতে দেরি হবে। তুমি আজ এখানেই খেয়ে যাও। আমি খিচুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি।"

"না-না, আমাকে ফিরতেই হবে। আজ রামুদা আসেনি, আমাকে ড্রাইভ করে ফিরতে হবে।"

"বুঝেছি, এখন ভয় করছে তোমার। আমার কাছ থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যাও। ছাতা দেব একটা?"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বর্ষা। তার পর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল রোহণকে। বাধা দিলেন না রোহণ।

"কেন, কেন আমাকে এ ভাবে কষ্ট দেবে তুমি। আমি আর পারছি না। তুমি কি ভাবছ আজ হঠাৎ আমি তোমাকে চাইছি? অনেক আগেই আমি মরে গেছি। ইউ, ইউ মাই ওল্ডম্যান, ইউ কিলড মি লাইক এনিথিং। নাও, আই শ্যাল কিল ইউ।"

দুম দুম করে রোহণের বুকে মারছে বর্ষা। বুকের কাছে জামা খামচে ধরছে। একটা বোতাম ছিঁড়ে কোথায় গড়িয়ে গেল।

"স্টপ বেবি, স্টপ।"

বর্ষার মাথায় হাত রেখে নিজের বুকে টেনে নিলেন রোহণ। এ বার হু হু করে কাঁদল বর্ষা। কত বার মুখ ঘষল রোহণের বুকে। বুকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন রোহণ।

"মিতা," আস্তে ডাক দিলেন রোহণ।

"কে মিতা?" অবাক হয়ে রোহণের দিকে তাকাল বর্ষা।

"তুমি আমার মিতা, আমার বন্ধু। মিতা, চলো এই বৃষ্টির ভেতরে আমরা ঘুরে আসি। মথুরাপুরের দু'পাশের ফরেস্ট দেখবে বৃষ্টিধোয়া হয়ে কেমন উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে। যাবে?"

"যাব। তুমি তো সঙ্গে আছ। এই, একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"মেসেঞ্জারে কিছু বললে রাগ করবে? উত্তর দেবে না? রোজ রাতে তোমার সঙ্গে মনে-মনে কত কথা বলি। সেগুলো আমি মরে গেলেও মুখে বলতে পারব না। তোমাকে চিঠি লিখব।"

"লিখো।"

৯

অ্যাবোড প্রিমিয়ার প্রোতে এডিটিংয়ের কাজ শুরু হবে। তার আগে শম্পা, বর্ষা আর রোহণ মিলে রাশপ্রিন্ট দেখে নিয়েছে। রোহণ বলেছিলেন নোটপ্যাড আর একটা পেন্সিল নিয়ে বসতে। বর্ষাকে রোহণ ফ্রেম দেখিয়ে বলে দিচ্ছিলেন কোথায় কী করতে হবে। শুরু হয়েছে বাঁশির আওয়াজে। পিলু রাগের উপর আলাপ। এটা রোহণের পরামর্শ। একটা বাঁশঝাড় প্রবল বাতাসে নুয়ে পড়ছে। শট ডিজ়লভ হয়ে গেলে সাধন হালদারের একটা স্টিল ফটো। রোহণ বলেছিলেন এখান থেকে কমেন্ট্রি শুরু হবে। ভয়েসওভার করবেন রোহণ নিজেই। এখান থেকেই গল্পটা শুরু হবে। কিন্তু কেউই স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কমেন্ট্রি বাংলা না ইংরেজি, কোন ভাষায় করবে। রোহণের ইচ্ছে ইংরেজিতে করার। তা হলে অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছবে। আসল বার্তা সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বিশেষ করে যখন এটা কোনও স্থানীয় সমস্যা নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা। বর্ষার ইচ্ছে ছিল বাংলায় হোক। কিন্তু রোহণের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছে ইংরেজিতেই ভাল। শম্পাও রোহণের সঙ্গে একমত হয়েছে।

সাধনের স্টিল ফটো জাম্প-কাট করে ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে আলকাপ দলের এক নাচিয়ে 'ছোকরা', আসরভর্তি দর্শক। তারা ছোকরার নারীসুলভ লাস্যময় নাচের সঙ্গে সিটি দিচ্ছে। ভয়েসওভার। আসলে কিশোর একটি ছেলে কী ভাবে হাস্যে-লাস্যে, চলনে-বলনে কিশোরী হয়ে ওঠে, তার শরীরের গড়ন, লম্বা চুল, হাতভর্তি কাচের চুড়ি, মিথ্যে স্তন, সব নিয়ে সে আসরে কেমন মায়া তৈরি করে, সেটা ধারাভাষ্যে থাকবে। ধারাবাহিক নয়। মাঝে-মাঝে আসরের গান, তবলা, বাঁশি, হারমোনিয়ামের সঙ্গতের উপর ক্যামেরা নিতে হবে। সেটা সামনাসামনি নয়, একটু দূর থেকে। তবেই মোড সফট থাকবে। ওই কিশোর কী ভাবে মনে-মনে নারী হয়ে যায়, দলের মাস্টার, অন্যান্য লোকও তার সঙ্গলাভের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, সে কথাও থাকবে। এই সঙ্গলাভে কোনও শারীরিক তৃপ্তি নেই, তবু সবার একটা মোহ জন্মে যায় ওই মিথ্যে নারীর জন্য।

অবাক হয়ে বিষয়টা শুনছিল শম্পা আর বর্ষা। শম্পা আজই প্রথম রোহণকে দেখল। খুব কৌতূহল ছিল তার। বর্ষা প্রেমে পড়েছে মানে লোকটার অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গুণ তো আছেই। চেহারা, চালচলনেও নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে। দেখল, তাই বটে। এমন পুরুষের জন্য মেয়েরা ঘরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বর্ষার দোষ নেই। কী অভিজাত চেহারা, কী ভয়েস। শম্পার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর আরও কিছু বলতে গিয়েছিল বর্ষা। রোহণ হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিলেন, "সব জানি। বন্ধুর কথা বলতে-বলতে তো আমার কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছ। সরি, কিছু মনে করবেন না। আসলে এত শুনেছি আপনার কথা, না দেখেও আপনার একটা স্কেচ আমি করে ফেলতে পারতাম।"

বর্ষা লক্ষ করল শম্পার চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

"সর্বনাশ, আলকাপের শুটিং করব কী ভাবে? তা হলে তো মুর্শিদাবাদে যেতে হবে। উফ, খরচ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। মাঝপথে

না ছেড়ে দিতে হয়,” এই দৃশ্যের কথা শুনে বর্ষা ঘাবড়ে গিয়েছিল।

আশ্বস্ত করেছিলেন রোহণ, “সে সব আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি ঠিক ফুটেজ জোগাড় করে নেব। জয় ইউটিউব ভরসা। এই নাচের দৃশ্যের শেষের দিক থেকে আমরা ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে এনজিও-র সেই বিদেশি ভদ্রলোকের ইন্টারভিউ শুরু করব। নোট করছ তো। নাচটা আস্তে-আস্তে ফেড-আউট হবে, ওই ফ্রেমেই একটা মন্দিরের ভেতরের ছবি। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। পুরোহিত আরতি করছে। এক বার কৃষ্ণ, এক বার রাধার ফেস ক্লোজ়-আপে নিতে হবে। নোট করো।”

“তার পর? যেগুলো শুট করা হয়েছে...”

“কিছু বাদ দেব, কিছু জুড়তে হবে। আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এডিটিং করে যাব। তার পর যেটা রাশপ্রিন্টে আছে, সাধনের ইন্টারভিউ, সেটা কিছুটা ওর নিজের ভয়েসে, বাকিটা অফ করে ডা. সামন্তের স্পিচটা এগিয়ে আনতে হবে। আজ আর ইচ্ছে করছে না। থাক, বাকিটা নিয়ে কাল বসব। আমার আন্দাজে দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। বোসো, ফুলমণি, ছিটো ছিটো চিয়া লিয়াও। এখানে আগে যে চা-বাগান ছিল সেখানে চা পাতা তুলত ফুলমণি থাপা। এখনও চা পাতা তোলে, কৌটো থেকে। সবুজ নয়, কালচে খয়েরি। কাল এসো না, আমার একটা জরুরি কাজ আছে। আমি বরং ফোন করব তোমাকে। পারলে আপনিও আসবেন।”

শম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন রোহণ।

“ইয়ে, আমাকে আপনি করে সম্বোধন না করলে ভাল হত। আপনি সব দিক দিয়েই অনেক বড়।”

“সে হবে। তা হলে বর্ষা, ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে? ঠিক কী ভাবে বক্তব্যের কন্টিনিউয়েশন রাখতে হয়, মেসেজটাও থাকবে, আবার হালকা একটা স্টোরিলাইনও থাকবে, সেটা মেনটেন করতে হবে। এবং নান্দনিক ভাবে। ভেবো না, হয়ে যাবে।”

বর্ষা বুঝল এডিটিংয়ের পর ছবিটা একদম পাল্টে যাবে। কী অসাধারণ শিল্পভাবনা রোহণের। বর্ষার ভাবনা থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে রয়েছে।

১০

নেটের ঠিক উপরে বল লিফট করছিল রতন। নিখুঁত লিফটিং। বিদ্যুৎগতিতে শূন্যে লাফিয়ে উঠে স্ম্যাশ করছিল পলাশ। প্রত্যেকটা স্ম্যাশ কামানের গোলার মতো গিয়ে পড়ছিল অপোনেন্টের কোর্টে। পলাশ আর রতনের জুটি সব টিমের কাছেই ভয়ের কারণ। পলাশের স্ম্যাশ ব্লক করার মতো নয়। পয়েন্ট আসবেই পলাশদের। হাইটের জন্য এক্সট্রা সুবিধের পুরোটা পলাশ উশুল করে নেয়। মনে হয় যেন লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ও দিককার কোর্টে প্লেয়ারদের পজ়িশন দেখার সময় পায় সে। তার পর দুর্বল জায়গায় আঘাতটা করে। এই ভলিবল খেলার নেশায় বিকেলের একটা প্রাইভেট কোচিংয়ের ব্যাচ ছেড়ে দিয়েছে পলাশ।

পাশের বাগান মগনবাড়ির সঙ্গে তাদের খেলা ছিল। দুই বাগান থেকেই অজস্র দর্শক এসেছে। টানটান উত্তেজনায় খেলা শুরু হয়েছে। মথুরাপুরের দর্শকরা দাঁড়িয়েছে মাঠের বাঁ দিকে। খেলা শুরুর আগেই মাঠ ভরে গেছে। পলাশদের আর-একটা প্লাস পয়েন্ট তাদের সার্ভিস। মাইকেল সরেনও বেশ লম্বা। ওর পাক-খাওয়া সার্ভিসগুলো থেকেও পয়েন্ট আসে ভালই। কখনও আবার বল শূন্যে তুলে লাফিয়ে এমন ভাবে সার্ভিস করে, রিসিভ করা বেশ কঠিন হয়। ফাইনালে উঠতে মথুরাপুরের কোনও অসুবিধে হয় না।

মাঠের পাশে রাস্তাটা একটু উঁচু, ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে বাগানের মেয়েদের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। আজ ফাইনাল খেলা, আজ রাখিকে বাড়ি থেকে খেলা দেখতে আসার পারমিশন দিয়েছে। অন্য দিনগুলোয় ছেলেরা যখন প্র্যাকটিস করে, বাগানের মেয়েরা বিকেলবেলায় ঘুরতে বেরিয়ে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেদের খেলা দেখে। সে দিনগুলোয় রাখির বাইরে বেরনোর অনুমতি নেই। আজ সে রঞ্জনা, ভানুমতীদের সঙ্গে খেলা দেখবে বলে উঁচু রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েছে।

কামানের গোলার মতো পলাশের স্ম্যাশগুলো মগনবাড়ির কোর্টে আছড়ে পড়ছিল, আর প্রবল চিৎকারে ফেটে পড়ছিল মাঠ।

“রাখি, পলাশদাকে দেখ, কী স্লিম ফিগার, আর কী দারুণ হাইট,” রাখিকে চোখ টিপে বলল রঞ্জনা।

“তোর না টিচার ছিল। স্যরদের সম্পর্কে এ সব বলতে নেই।”

“কেন, স্যর বলে কি দেবতা হয়ে গেছে নাকি? কী বল ভানুমতী?”

“একদম হিরো যস্তো। অমিতাভচ্চন।”

“না ভাই, আমি ওসব ভাবতে পারি না। পলাশদা আমাদের বাগানের গর্ব। পলাশদা না থাকলে মথুরাপুর কোনও দিন চ্যাম্পিয়ান হতে পারত?”

“তুই ভাই বাগানবাবুর সুন্দরী মেয়ে। তোর নজর কি আর আমাদের সঙ্গে মিলবে। সুন্দরী রাজকন্যার মতো তোকে দুর্গের ভেতরে রেখে দিয়েছে তোর বাবা-মা। বিকেলে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে পর্যন্ত বেরোস না। কবে ট্রাক্টরে করে, সরি, ঘোড়ায় চেপে এক রাজপুত্র এসে তোকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, সেটাই ভাবিস তুই। আমাদের ভাই রাজপুত্রের দরকার নেই, আমাদের সাদামাটা পলাশদাই ভাল। আমাদের হিরো, আমাদের অমিতাভচ্চন।”

“ধুস, আমি সে কথা বলেছি নাকি। আমার কি ইচ্ছে করে না বিকেলে তোদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে? ভানুমতীর মতো চুলে ফুল গুঁজে, তোর মতো সালোয়ার-কামিজ় পরে নদীর দিকে যেতে, পানিঝোরায় পিকনিকে যেতে। বাড়িতে অ্যালাউ করবে না।”

“আসলে কী জানিস, সুন্দরীরা বড় একা হয়ে যায়। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না, হাসতে পারে না। তোর হয়েছে সেই অবস্থা। নইলে বাগানের ছেলেদের তুই একাই ইচ্ছেমতো নাচাতে পারতিস।”

মাঠে প্রবল চিৎকারে ওদের কথা বন্ধ হল। প্রথম গেম মথুরাপুর জিতেছে একুশ-সাত পয়েন্টে। রাখির ইচ্ছে করছিল রঞ্জনাদের মতো ‘পলাশদা পলাশদা’ বলে চিৎকার করতে, আনন্দে লাফাতে। কিন্তু রাখি পারে না। একটা জড়তা তার আনন্দের প্রকাশকে আটকে দেয়। মনে হয় যদি বাবা দেখে ফেলে। বাড়িতে ফিরলে নিশ্চয়ই বকুনি

দেবে। বাগানের সাধারণ মেয়েদের মতো, মজদুরদের মতো সেও লাফাচ্ছে, বাবা ভাবতেই পারে না। আজ সবাই এসেছে খেলা দেখতে, নিশ্চয়ই বাবাও এসেছেন। সে শুধু হাততালি দিয়েছে আর হাসিমুখে দেখেছে রঞ্জনাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস।

দ্বিতীয় গেমও প্রত্যাশা মতোই মথুরাপুর জিতে নিল একুশ-এগারো পয়েন্টে। যখন মগনবাড়ি একটা করে পয়েন্ট পাচ্ছিল, তখন ও দিক থেকেও প্রবল চিৎকার উঠছিল। এক সময় বারো-এগারো করে ফেলেছিল ওরা। মথুরাপুরের বুক কাঁপছিল। এ বার ওরা এক জন নতুন স্ম্যাশার এনেছে। কয়েকটা দুর্দান্ত স্ম্যাশ করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। পলাশের কয়েকটা মার অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরিয়েও দিয়েছে। মাইকেল কয়েকটা সার্ভিস মিস করল। শেষ পর্যন্ত স্ট্রেট সেটেই জিতে তারাপদ রানিং ট্রফি জিতে নিল মথুরাপুর। খেলার শেষে ম্যানেজার রুক্মিণীপ্রসাদ সব প্লেয়ারদের নিয়ে ফটো তুললেন। নতুন একসেট জার্সি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তার পর কুলি লাইনের মজদুররা পলাশকে কাঁধে নিয়ে কোর্টের ভেতরেই নাচানাচি শুরু করল। আজ ওরা প্রাণভরে শুয়োরের মাংস আর হাড়িয়া খাবে। ফূর্তি করার জন্য টাকার আর্জি জানাবে ওরা। তখনও রঞ্জনারা নাচছিল। লজ্জা করছিল রাখির।

সবাই যার যার কোয়ার্টারে ফিরে গেছে। মাঠের পাশেই ঝাঁকড়া বকুলতলায় বসে আছে পলাশ আর রতন। ঘামে ভেজা জামা খুলে ঘাসের উপর মেলে দিয়েছে। পাহাড়ের দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছিল। আঃ, তখন কী আরাম লাগে। দ্রুত ঘাম শুকিয়ে আসে।

"পলাশ, আজ কিন্তু প্রচুর লোক হয়েছিল। অন্য বারের চেয়েও বেশি।"

"একদম। যাকে বলে খচাখচ ভরা হুয়া স্টেডিয়াম। খেলা শুরুর আগে আমি ভাল করে চার পাশে দেখছিলাম। রাখিকেও দেখলাম আজ খেলা দেখতে এসেছে।"

"সে কী, ওর বাবা ছাড়ল যে বড়! সত্যি, মেয়েটাকে একেবারে বন্দিনী বানিয়ে রেখেছে। আর মেয়েটাও এই বয়সেই এমন গম্ভীর মুখে চলাফেরা করে, কোনও ছেলে কথা বলতে সাহসই পায় না।"

"আমার কিন্তু মনে হয় এদের এক বার টোকা দিলেই চুরচুর হয়ে যায়। ওর কি ইচ্ছে করে না বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, বিকেলবেলায় সবার মতো বেশ সেজেগুজে এ দিক ও দিক একটু বেড়াতে। ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে। নিশ্চয়ই করে। গম্ভীর মুখ করে সে সব ইচ্ছেগুলোকে চেপে রাখে।"

"না রে, রাখি সত্যিই অন্য রকম। বহুত কড়ক আছে।"

"আরে রতন, রাখ তোর কড়ক। ঠিক মতো আর ঠিক জায়গায় ফুঁ দিতে পারলে সব বাঁশিই বাজে। ফুঁ দিতে জানতে হয়। এলোমেলো ভাবে ফুঁ দিতে গেলে না রহেগা বাঁশ, না বাজেগি বাঁশুরি।"

"তো একবার দেখা না তোর করিশমা।"

"চ্যালেঞ্জ নিচ্ছিস? আসলে আমার কী মুশকিল জানিস, প্রাইভেট টিউশন করে-করে এমন একটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে... এসব জানাজানি হলে এখানে থাকাই আমার মুশকিল হয়ে যাবে। সিরিয়াসলি হলে অন্য ব্যাপার। কিন্তু জাস্ট তোর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমার কথা প্রমাণ করতে যাওয়া রিস্কি।"

"তুই শুধু ওকে একবার বলে দেখা, 'রাখি, আই লাভ ইউ।' ব্যস, তা হলেই হবে।"

"অসম্ভব, আমি পারব না। যদি বলে, 'ছি ছি পলাশদা, আপনাকে আমি নিজের দাদার মতো দেখি,' যদি ওর বাবাকে বলে দেয়? আমি তো বাগানের সবার স্যর।"

"ঠিক আছে। ওকে একটা চিঠি দে তা হলে। নীচে নাম দিবি না। তবে আর ভয়ের কী আছে? শুধু আমাকে আগেই জানিয়ে দিবি, কখন কোথায় চিঠিটা দিবি। আমি ঠিক বুঝে নেব। তুই কিন্তু একটা কথা আমার কাছে চেপে গেছিস।"

"কোন কথা?"

"রাখির উপর তোর উইকনেস আছে। আমি বুঝতে পারি। রাখির প্রসঙ্গ উঠলে তোর চোখ-মুখ পালটে যায়। ওকে নিয়ে সবাই যখন খারাপ গল্প করে, হ্যা হ্যা করে হাসে, ওর ভারী ফিগার নিয়ে গন্ধি কথা বলে, তুই রেগে যাস। উঠে চলে যাস। দেখ পলাশ, ইশক, মুসক আউর বু—পেয়ার, মুসকুরানা আর গন্ধ, এ তিনটে জিনিস লুকনো যায় না।"

"আরে বাগানের সব ছেলেই মনে-মনে ওকে চায়। আমাকে আলাদা করে পাত্তা দেবে কেন? ও হল মথুরাপুরের আকাশের চাঁদ। আমরা সব বেঁটে বামন। ঠিক আছে খেলাই সই।"

খেলাচ্ছলেই রাখিকে চিঠি দিয়েছিল পলাশ।

১১

কালো মেঘ ছিঁড়ে কোথাও কোথাও ঘন নীল আকাশ উঁকি দিচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। উত্তরের পাহাড়ে এখনও কোথাও কোথাও মেঘ রয়েছে।

"বর্ষা, আমার কেমন ঘোর লাগছে। সব কেমন স্বপ্নের মতো, যেন ঘটনাগুলো কেউ ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে চালিয়ে দিয়েছে। সব সত্যি?" স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে রোহণ বললেন।

"সত্যি। অনেক কষ্ট দিয়েছ তুমি আমাকে। সন্ন্যাসীবাবার ধ্যানই ভাঙে না। এই শোনো, আমি তোমায় নাম ধরে ডাকতে পারব না। যদিও যতটা ভাবছ, ততটা ছোট নই। তবু, ইশ! আমি পারব না।"

"তবে কী বলে ডাকবে, 'হ্যাঁ গো, শুনছ?'"

"হুঁ।"

"একটা গান শোনাবে? তোমার গলায় ভারী সুন্দর সুরের আন্দাজ আছে। আমি শুনেছি।"

"কেন, লুকিয়ে কেন আমার গান শুনেছ?"

"বেশ করেছি। আমি কিন্তু 'তুই' ও বলতে পারি। তোকে আমার বেবি বলে ডাকতে ভীষণ ইচ্ছে করে। গল্প শোনাতে ইচ্ছে করে। আমার আবার ইচ্ছে করছে ভাঙা এস্রাজ সারিয়ে রেওয়াজ শুরু করতে। তোর গান ফলো করব। নে, একটা গান শোনা তো।"

কোনও সঙ্কোচ করল না বর্ষা। গলাটা একটু পরিষ্কার করে গান শুরু করল, "আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।।"

গলা মেলালেন রোহণ, "যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে ভালোবাসে আড়াল থেকে, আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।"

গাড়ির ভেতরে দু'জন চুপ করে বসে আছে। রোহণ মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে বর্ষার ডান হাত চেপে ধরছেন। পথের পাশে খয়েরি ভেজাপাতা পড়ে রয়েছে। কোথাও হয়তো এক টুকরো সাদা কাগজ অভিমান নিয়ে ক্ষয় হতে-হতে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

"তুমি আমাকে তুই বলবে না। সব সময় তুমি বলবে। তোমার মুখে তুমি শুনতেই আমার ভাল লাগে। আমার কেমন যেন সুখ হয়।"

"সে কেমন সুখ বর্ষা?"

"বলে বোঝানো যায় না। ছেলেরা একটু এ সব ব্যাপারে ভোঁতা হয়। ছেলেদের সুখ আর মেয়েদের সুখের ডেফিনেশন আলাদা। এমন কী প্রত্যেকটা মেয়ের ব্যক্তিগত সুখও আলাদা হয়। শরীর, মনের বাইরেও কিছু একটা আছে। ঠিক ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। শুধু ফিল করা যায়। তোমাকে বলে আমি বোঝাতে পারব না।"

"ঐশ্বরিক, অলৌকিক কিছু নাকি? তবে আমি নেই। এই জড়জগৎ আর জীবজগতের বাইরে আর কিছু নেই।"

"তবে তুমি কি এথিস্ট? আমারও এ সব নিয়ে তেমন কোনও বাড়াবাড়ি নেই। না, অলৌকিক কিছু নয়। আসলে মন বলে কোনও জিনিস তো নেই। আমাদের ভাবনাচিন্তা, আমাদের চেতনাই মন। সে সবের আধার আমাদের মস্তিষ্ক। মানে শরীরকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবা যায় না। এই মন তৈরি হতে শুরু করে মস্তিষ্ক একটু ডেভেলপড হতে শুরু করলেই। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা, পড়াশোনা, যাপন করা অভিজ্ঞতা জমা থাকে। কখনও কখনও যাপন-করা অভিজ্ঞতার বাইরেও কিছু একটা ফিলিংস হয়। নিশ্চয়ই তারও ব্যাখ্যা আছে। অতীন্দ্রিয় কারও নাম হতে পারে, বাট, ইট ডাজ়নট এগজ়িস্ট। কিছু-কিছু সুখ-দুঃখের উপরে-উপরে কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু সেই মন অনুভব করতে পারে। তোমার মুখ থেকে তুমি ডাক শুনলে আমার শুধু মনে নয়, বলতে এখন আর লজ্জা করছে না, একটা ফিজ়িক্যাল প্লেজ়ারও হয়।"

"পুরো ক্লাস-লেকচার নামিয়ে দিলে তো।"

"আমি শেখাব তোমাকে? বাদ দাও তো। এই পথে এর আগে তুমি অনেক বার এসেছ, না?"

"হ্যাঁ, চা-বাগান নিয়ে ডকু করার সময় এ দিককার দুটো বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানে অনেক বার আসতে হয়েছে। স্পষ্টই বুঝতে পারতাম কী ভীষণ কষ্টে আছে বাগানের কুলিকামিনের দল। কী অসহায় মুখগুলো। আগামী শীতের কথা ভেবে এখন থেকেই কুঁকড়ে আছে। জঙ্গলের অসহায় হরিণের মতো মৃত্যুর জন্য প্রতিবাদহীন অপেক্ষা শুধু। জানো, এখানে ওই জঙ্গলের ও পাশে একটা ছোট্ট নদী আছে। পানিঝোরা। টলটল করছে স্বচ্ছ সবুজ জল। বিকেলে ফরেস্ট থেকে হরিণ আসে জল খেতে। অনেকেই পিকনিক করতে আসে। নোংরা করে রেখে যায় জায়গাটা। আমি এক বার গিয়ে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম। একা একটা হরিণ এসেছিল জল খেতে। আমি স্থির হয়ে বসেছিলাম। বড়-বড় নিষ্পাপ দৃষ্টিতে আমাকে দেখল হরিণটা। আমি জানি ছবি তোলার জন্য সামান্য নড়াচড়া করলেই হরিণটা মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে। আমি ওর চোখ দেখছিলাম, কাকে বলে মৃগনয়নী। ছবি তুলতে পারিনি বলে কোনও আফসোস নেই। কত লোক আছে টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে অলৌকিক সূর্যোদয় দেখে না। শুধু ছবি তুলে যায়। মিতা, আমাদের এই সম্পর্কের কোনও হ্যাপি এন্ডিং হবে না রূপকথার মতো। তবে কেন মিছেই ভালবাসা..."

"তুমি সেফ খেলছ রোহণ। এই যা, নাম ধরে ডেকে ফেললাম," জিভ কাটল বর্ষা, "আমি কিন্তু সিরিয়াস। বেশি বাজে কথা বলবে না।"

"বর্ষা, ভালবাসলে ভালবাসার মানুষের উপর একটা অধিকারবোধ আপনা থেকেই জন্মায়। ছোট-ছোট শেকল তৈরি হয়। অনেক ইচ্ছেতে বাঁধন পড়ে যায়। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। সুদেষ্ণা আমাকে তার পছন্দের সুতো দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। বড় বেশি সাংসারিক ছিল। ছোট-ছোট লাভ-ক্ষতির হিসেব ছাড়া আর কিছু বুঝত না। মানুষের প্রাণের মাঝে কত রকমের সুধা থাকে, কোনও দিন তার খবর নেয়নি সুদেষ্ণা। শুধু হিসেবের সূক্ষ্ম কড়ি গুণে গেছে। তুমি যদি মনে করো আমি সেফ খেলছি, তবে এই সম্পর্ক আর এগোতে না দেওয়াই উচিত।"

একটা তেমাথার মোড়ে এসে গাড়ি থামালেন রোহণ। একটা পথ বাঁ দিকে ঘুরে মথুরাপুর চা-বাগানের দিকে চলে গেছে, ডান দিকের পথ শাল-শিমুলের জঙ্গলে ঢুকে গেছে। সামনের পথ একটু এগিয়েই নদীর ঘাটে শেষ হয়েছে। নদীর ও পারে পাহাড়।

"এসো, এখানে একটু দাঁড়াই।"

দরজা খুলে বাইরে এলেন রোহণ। বর্ষা বেরোল না। একটা পাথরের উপর বসে সিগারেট ধরালেন রোহণ। কী দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে রোহণকে। জিন্সের সঙ্গে একটা নীল-সাদা স্ট্রাইপড টি-শার্ট পরেছেন। দু'-তিনটে টান দিয়েই পা দিয়ে ঘষে ভাল করে সিগারেট নিভিয়ে দিলেন রোহণ। বর্ষা বেরোয়নি। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন রোহণ। কী হল বর্ষার।

"বর্ষা, নামবে না ?"

দরজা খুলে বর্ষার মুখের দিকে তাকিয়ে রোহণ দেখলেন তার দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে। চুপ করে রইল বর্ষা।

"কী হয়েছে বর্ষা, কাঁদছ কেন?"

"কী হবে তোমার সে কথা জেনে? তুমি যখন আমাদের সম্পর্ক রাখতে চাইছ না, তখন আমার হাসি-কান্নার খোঁজে তোমার কী দরকার? 'তুমি সেফ খেলছ' বলায় তোমার অধিকার বোধে হাত দিয়ে ফেলেছি। সরি গো।"

"তাই, না? ঠিক আছে, এ বার দেখো অধিকারবোধ কাকে বলে।"

বর্ষা কিছু বোঝার আগেই গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে টেনে বাইরে এনে বর্ষাকে কোলে তুলে নিয়েছেন রোহণ। পাঁজাকোলা করে উঁচুতে তুলে ধরে তাঁর ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছেন বর্ষার ঠোঁটে। বর্ষা টের পাচ্ছে থরথর করে কাঁপছে রোহণের সমস্ত শরীর। অসম্ভব তপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ঠোঁট। মনে হচ্ছে যেন খুব জ্বর আসছে তাঁর। রোহণের গলা জড়িয়ে ধরিয়ে ধরল বর্ষা। দুরন্ত একটা চুম্বন এঁকে দিল রোহণের ঠোঁটে। হু হু করে জ্বর আসছে তারও। মা গো! কী সুখ, কী লজ্জা।

"অ্যাই, ছাড়ো। কী সাহস। দিনদুপুরে খোলা জায়গায় কী করছ তুমি! কেউ দেখে ফেলবে।"

"বেবি, মাই বেবি, উমমম..."

"ঠিক আছে। এবার ছাড়ো, প্লিজ়। ডাকাত কোথাকার।"

বর্ষাকে সাবধানে নীচে নামিয়ে দিলেন রোহণ। এখন আর রোহণের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না বর্ষা। লজ্জা করছিল তার। রোহণ গিয়ে একটু দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসলেন। দ্রুত ফোন বের করে ক্যামেরা অপশনে গেল বর্ষা। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কয়েকটা শট নিল। একটা জুম করে শুধু মুখটা নিল। এটার নাম দেবে ভাবুকবাবু। র‍্যান্ডম কয়েকটা এ দিক সে দিকের ফটো নিল। যা ভাবছিল তাই, রোহণ সিগারেট ধরিয়েছেন। কালো একটা কুকুর কোথা থেকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছে। হঠাৎ কী দেখে নদীর দিকে দৌড়ে গেল। বর্ষা দেখল একটা ডাহুক লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওদিকের ঝোপে হেঁটে যাচ্ছে।

বর্ষার এক বার ইচ্ছে করছিল ঠোঁটে হাত বুলিয়ে নিতে। তার পর ভাবল, না থাক, ভাল লাগার রেশটুকু ওখানে লেগে রয়েছে। থাকুক।

"বর্ষা, এখানে এসো। আমার পাশে বোসো।"

"তুমি সিগারেট খেলে কেন, এখন তোমার জামাকাপড়ে নিকোটিনের গন্ধ লেগে রয়েছে।"

"আচ্ছা, একটু আগে গন্ধটা ভাল ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেল?"

লজ্জায় মাথা নিচু করল বর্ষা। বলতে পারল না তখন সেই গন্ধ উড়ে গিয়ে গিয়েছিল অন্য এক তীব্র বন্য গন্ধে, অন্য নেশায়। সে চিরকাল চুম্বনের সঙ্গে মদের গন্ধ পেয়েছে। সিগারেটের গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না। আজ রোহণের মুখে হালকা সিগারেটের গন্ধে তার অন্য রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। পাথরের উপর রোহণের পাশে গিয়ে বসল বর্ষা।

"আমাকে বেবি বলে ডাকতে তোমার ভাল লাগে, না? আমাকে বাচ্চা মেয়ে ভাবতে তোমার খুব ইচ্ছে করে, তাই না?"

"হুঁ, ইচ্ছে করে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিই। ইচ্ছে করে কোলের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে লালকমল-নীলকমলের গল্প বলি। লালকমলের আগে নীলকমল জাগে, আর জাগে এই তরোয়াল...এ কী হাসছ কেন?"

"ইচ্ছে করে তোমার বুড়ো সাজার একটা প্রবণতা আছে। দু'নম্বর, তোমার ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স আছে। তোমার চেয়ে অনেক কমবয়সি মেয়েদের কথা ভাবতে তোমার ভাল লাগে। তাদের নিয়ে ফ্যান্টাসি

তোমাকে বেশি তৃপ্তি দেয়।"

"আমার নেশা হচ্ছে মিতা। এক বার এই মথুরাপুর বাগানেই রাজা আমাকে মহুয়া খাইয়েছিল, তেমনই নেশা-নেশা লাগছে। বর্ষা, তোমাকে বুকের ভেতরে, একেবারে ভেতরে রেখে দেব আমি।"

"মহুয়া কি মদ? আর কোনও দিন খেয়ো না।"

"আমার ডকু করার সময় কত বার আশপাশের চা-বাগানগুলোয় এসেছি। মহুয়া গাছ দেখেছ কোনও দিন? বাগানবাবুর বাড়ির সামনে একটা মহুয়া গাছ ছিল। চলো, ওই গাছের নীচে দাঁড়াবে। তোমার একটা ফটো নেব। ক্যাপশন দেব, মহুয়াসুন্দরী।"

একটা আদিবাসী মেয়ের দল গল্প করতে-করতে যাচ্ছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলাবলি করে খুব হাসছিল ওরা।

"সুন্দরী না পচা। চলো।"

"তোমার নিজের চোখের দিকে কোনও দিন ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ? কী অতল দিঘির মতো শান্ত, গভীর কালো জলের নির্জনতা।"

গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে কিছু ক্ষণ যাওয়ার পর পথের বাঁ পাশে একটা কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়ালেন রোহণ। বাড়িটার গেটের সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছ। বর্ষা আন্দাজে বুঝল এটাই মহুয়া গাছ।

"নামো, এই যে এটাই মহুয়া ফুলের গাছ। একদম মাতাল করা গন্ধ। গরমের সময়ে ফোটে। শুকনো করে ইস্ট, চিনি মিশিয়ে ফারমেন্টেশন করে তৈরি করে। ফুল ফুটলে জঙ্গলের জন্তুরা এসে খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। ওই গাছটার পাশে দাঁড়াও তো। হুঁ, মুখটা আর একটু বাঁ দিকে ঘোরাও। একটু নীচে নামাও। ব্যস, ব্যস, ইস্মাইল প্লিজ়।"

ফিক করে হেসে ফেলল বর্ষা।

"গুড, একদম ন্যাচারাল এসেছে। এখন নয়, পরে দেখাব।"

এক জন মহিলা, বর্ষাদের বয়সিই হবে, এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। খুব রোগা, চুলগুলো এলোমেলো। সাধারণ একটা শাড়ি পরা। কিছু জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। বর্ষার মনে হল মুখটা খুব পরিচিত। কারও মুখের সঙ্গে মিল আছে। ইউনিভার্সিটির রাখির সঙ্গে মিল আছে। রাখি ছিল একদম ডলপুতুলের মতো। প্রচণ্ড ফর্সা, টানা-টানা নাক, চোখ, মুখ। কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুলের গোছা। এই মহিলাকে দেখে মনে হয় এক সময়ে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। এখন রং পুড়ে গেছে, চুলে রুপোলি ঝিলিক, খুব রোগা। দেখে মনে হয় অসুস্থ। কোথাও শাঁখা-সিঁদুরের চিহ্ন নেই।

"কিছু বলবেন?"

রোহণই এগিয়ে গেলেন। বর্ষা এসে গাড়ির পাশে দাঁড়াল।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনারা আসার সময় কোথাও একটা কাগজ পেয়েছেন? নীল রঙের। চার ভাঁজ করা। একটু ভেজা-ভেজা।"

"না, মানে আমরা তো অনেক দূর থেকে আসছি। অত খেয়াল করিনি।"

বর্ষা আর রোহণ তাকাতাকি করল। আকুল প্রশ্ন ফুটে রয়েছে মহিলার চোখে। ঘ্যাস ঘ্যাস করে মাথা চুলকে নিল মহিলা। চুলে অনেক দিন বোধ হয় চিরুনির ছোঁয়া পড়েনি। বর্ষার দেখে মনে হল। নিশ্চয়ই উকুন। সর্বনাশ, এদিকে উড়ে আসবে না তো!

"কত লোককে জিজ্ঞেস করি, নীল রঙের চার ভাঁজ একটা কাগজ। কেউ দেখেনি। কোথায় যে গেল। কেউ বলতে পারে না। আমার যে খুব দরকার। আসলে এখানেই কোথাও আছে, আমিই খুঁজে পাচ্ছি না। নদীর ও পারে যাবেন না, কাল রাতেও হাতি এসেছিল।"

বিড় বিড় করে নিজের মনে কথা বলতে-বলতে মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটু এগিয়ে আবার ফিরে এল, "আচ্ছা, আকাশের কোন দিকে অরুন্ধতী ওঠে বলতে পারেন? আমি না, চিনতে পারি না। যাই, চিঠিটা যে কোথায় গেল..."

"চলো ফিরে যাই। আমাকে আবার ফিরতে হবে। মহিলার কোনও দরকারি চিঠি হারিয়ে গেছে। হয়তো অনেক দিন আগে। এখনও খুঁজে চলেছে। মনে হল মাথায় কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।"

"হুঁ, কত কিছু হারিয়ে যায় আমাদের। গানের খাতা, প্রিয় কলম, কত গানের অন্তরা আর শেখা হয় না। মানুষ সারাজীবন খুঁজে ফেরে সেই পরশপাথর। কবে যে আনমনে নিজেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, নিজেই জানে না।"

রোহণের হাতের মুঠো নিজের মুঠোয় নিল বর্ষা। চেপে ধরল। মনে-মনে বলল, 'রোহণ, যা হারিয়ে যায়, সেটা আর ফিরে আসে না। আজকের সূর্য আর কাল উঠবে না, আজকের নদীর জল বয়ে গেলেই পুরনো হয়ে যায়। কিন্তু কাল আবার নতুন সূর্য ওঠে, নদীতে গড়িয়ে আসে নতুন জলের ধারা। তাকে গ্রহণ করো রোহণ। নইলে আমাদের বেঁচে থাকা বৃথা।'

এত ক্ষণ ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছিল। এখন আবার ফাঁকগুলো ভরাট হয়ে আলো কমে এসেছে। মনে হচ্ছে অকালসন্ধ্যা নেমে আসছে চরাচর জুড়ে। ওরা কেউ কোনও কথা বলছিল না। বর্ষা রোহণের বাঁ দিকের কাঁধে মাথা রাখল।

"মিতা..."

"বলো সখা..."

"সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় করলে নিমন্ত্রণ, ওগো খেলার সাথী?"

"ইমন, তুমি আমার সন্ধ্যাবেলার ইমন। গাও সখা, পূরবীতে গাও, 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে, ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে...'"

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা খাওয়াদাওয়া

কাফেক্ষেত্র কলিকাতা

প্রিয় কাফের অন্তরঙ্গ উষ্ণতাও কি শহরের একটা পরিচয়? কাফে মানে ঘরের বাইরে স্বাচ্ছন্দ্যের উঠোন নাকি অদম্য পরকীয়া প্রেমের বারান্দা? কফির কাপের ফেনায় যেন আস্ত একটা পৃথিবী আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে কলকাতা! খবর নিলেন ঋজু বসু

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে— আকাশে, মাটিতে, মাটির নীচে,
না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে এই কলকাতায় রয়েছে
...রয়েছে কবোষ্ণ নদী নিরবধি এবং নারী দুরতিক্রম্যা,
আছে সদ্য যুবকের জন্য পার্ক ও রেস্তরাঁ, সদ্য যুবতীর জন্য যুবক,
এবং উভয়ের জন্য শব্দের মৌচাকে তৈরি ভারত-বিশ্রুত কফিহাউস।

কলকাতার গত জন্মে লেখা হয়েছিল এ কবিতা (কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী)। সেই ভারত-বিশ্রুত ঠিকানার দশা দেখলে আজ অস্বস্তিও হয় বইকি! আজকের কফিহাউসও অনেকের জীবন জুড়ে আছে। নতুন প্রেম, ব্রেকআপে সে মুখর। তবু অনেক বছর বাদে বহু দেশ ঘুরে শহরে ফেরা দুই বন্ধু কিন্তু দেখা করার জন্য সব সময়ে পুরনো ঠিকানায় ফেরে না। ফেসবুকের বন্ধু বৃত্তে ঢেঁড়া পিটিয়ে খবর নেওয়ার পরে এমন দু'জন সে দিন বালিগঞ্জের এক গলির ছাদে টেবিল খুঁজে নিলেন। যোধপুর পার্ক, হিন্দুস্তান পার্ক, ল্যান্সডাউন বা সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বেশ কয়েকটি ঠিকানার মধ্যে বাছতে অবশ্য ভালই মাথা খাটাতে হয়েছিল। শেষমেশ ছাদে বসে সূর্যাস্ত দেখার লোভটাই জিতল। সঙ্গে কুলীন কফির সংস্পর্শও অতি গুরুত্বপূর্ণ। কফিহাউসের কালচে ইনফিউশন বা বাজারের ইনস্ট্যান্ট কফির যুগ পেরিয়ে এই স্পেশ্যালিটি সিঙ্গল অরিজিন কফির যুগে পা রাখার

পঞ্চমের আড্ডায় কাফের আরামদায়ক অন্দরসজ্জা

'ভালো বাসা' বাড়িটির একতলা জুড়ে সেজে উঠেছে বুনাফিল কাফে

পর্বান্তরে কলকাতার কত কিছু পাল্টে গেল।
হিন্দুস্তান পার্কের বাগান ঘেরা সদা ব্যস্ত দ্য ওয়াইজ আউল এর ম্যানেজার হিন্দোল বসু শোনালেন, "অন্য পাড়া বাদ দিন! এই ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক থেকে গোলপার্ক, কিলোমিটার দেড়েকের রেডিয়াসেই কম করে ৫৭টা কাফের রাজত্ব। যোধপুর পার্ক ধরলে দেড়শো ছাপিয়ে যাবে।" সবার কফি বা খাবারই উঁচু জাতের নয়। তবে সত্যিই কয়েক হাত অন্তর মুখোমুখি বা পাশাপাশি কাফে। কেউ কেউ ঝাঁপ গুটিয়েছে। কিন্তু নতুন উদ্যমে শুরু করেছে আরও অনেকে। সাধারণত দিল্লিবাসিনী কাজের সূত্রে দেশবিদেশের নানা শহরে চরকিপাকে ব্যস্ত জনৈক কর্পোরেট কর্ত্রী বলছিলেন, "বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ের পাব-বিলাসের জৌলুস থাকলেও একেলে ছিমছাম কাফেয় ক্রমশ একটা চরিত্র গড়ে উঠছে কলকাতার। অনেকটা প্যারিস বা বার্লিনের সঙ্গে মিল। কিংবা কোনও শান্ত হিলস্টেশনের আমেজ।" এই সব নতুনের পাশে সাবেক কফিহাউসকে ম্লান লাগে। কিন্তু তারও একনিষ্ঠ অনুরাগীরা রয়েছেন। আবার কফিহাউস থিম মাথায় রেখে শহরের অন্য প্রান্তে রমরমিয়ে চলছে নিউটাউন কফিহাউস। দক্ষিণ কলকাতার দেখাদেখি সল্টলেক, নিউটাউন, বেহালাও খুঁজে নিচ্ছে কফি টেবিলের অন্তরঙ্গ পরিসর। এমনকি সিঁথি, বরাহনগর, বিরাটি, ব্যারাকপুরেরও নাম উঠছে কাফে-মানচিত্রে। কালিম্পং, শান্তিনিকেতন বা দুর্গাপুরেও মনের মতো কাফে খুঁজে না-পেলে অনেকেরই উইথড্রয়াল সিনড্রোম দেখা দেয়!

উঠোন থেকে আউটহাউস

পুজোর সময়ে কলকাতার ব্যস্ত মোড়, ঘিঞ্জি গলি, নামজাদা পার্ক বদলে যায় বিচিত্র জ্যামিতির মণ্ডপে। এও অনেকটা তেমনই। হিন্দুস্তান পার্কের 'ভালো-বাসা' বাড়িটা যেমন সটান ঘড়ির কাঁটাই উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এই সে দিন নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সদ্য নোবেল-ভূষিত অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন সে-বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী। বাংলার সংস্কৃতি জগতের কয়েক প্রজন্মের ইতিহাসগাথা মিশে বাড়ির চৌহদ্দিময়। নবনীতার মা-বাবা রাধারানি-নরেন্দ্র দেবের স্মৃতিমাখা বাড়ি আজ নতুন করে সজীব। দোতলাটা গৃহকর্ত্রীবিহীন, প্রায় ফাঁকা। অতিমারির ঝাপটার মধ্যেও একতলা জুড়ে সেজে উঠেছে ঐতিহ্যের সুরভিমাখা এক কাফে। হেরিটেজ সম্পত্তি এক ফোঁটা ভাঙাভাঙি না-করেও বাড়ির ওই অংশের বহু বছরের বন্ধ কিছু জানালা খুলে দিয়েছেন কাফের রূপকার সোনিকা দে। সাদা ধবধবে কাফেয় সাবেক কলকাতার আসবাব, মার্বেল টপ টেবিল। বাটালি কাজের সূক্ষ্ম সাজসজ্জা। দরজায় সেকালের গোলাকার নকশা। এই বুনাফিল কাফেয় ঢুকে আবেগে আত্মীয়দের ভিডিয়ো কল করেন কোনও কোনও বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি প্রেমিক প্রবাসিনী। কয়েক বছর আগে রাসবিহারীর মোড়ের কাছে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে হয়ে-ওঠা 'মাড কাফে'র মধ্যেও কলকাতার চলমান ঐতিহ্য। অতীত ও সমকালের বোঝাপড়া।
ভালো-বাসা-র পাশেই কলকাতার আর এক ঐতিহ্য সাউথ ইন্ডিয়া ক্লাব। তারও নবজন্ম, শহরের জনপ্রিয়তম কফি-ঠিকানা গাছগাছালি ঘেরা রোস্টারির রমরমায়। ওই পাড়ায় সিয়েনা কাফের বাড়িটিতে বসবাসকারী ভদ্রমহিলাও কয়েক বছর হল বিদেশে চলে গিয়েছেন।

হিন্দুস্তান পার্কের বাগান ঘেরা সদা ব্যস্ত দ্য ওয়াইজ আউল

টার্কিশ কফি, কালিটা, পোরওভার, সাইফন, ফ্রেঞ্চপ্রেস ও এরোপ্রেস (বাঁ দিক থেকে); ছবি: দেবর্ষি সরকার

কফির বিন প্রকাশ্যেই দরকারমাফিক নানা মাত্রায় রোস্টিং হচ্ছে। জলে ফুটিয়ে 'ব্রু'-এর রকমারি কসরতও দেখতে পাবেন।

এর পরেই কাফের সেজে ওঠা।
এই কাফেক্ষেত্র ছেড়ে একটু বালিগঞ্জমুখো হওয়া যাক। বালিগঞ্জ পার্কের ছিমছাম গলিটায় পেল্লায় বহুতলের উল্টোদিকের একটি ধবধবে ছাদের আভিজাত্য পাড়াটায় আলাদা মাত্রা জুড়েছে। বহুতলের ফ্ল্যাট মালিকেরা হেসে বলেন, আপনাদের কাফের জন্য ফ্ল্যাটের দাম আরও বেড়ে গেল। ক্রাফ্ট কফি এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে ঢুকলেই চোখের সামনে কন্নড়দেশের চিকমাগালুরের পাহাড়ি গাঁয়ের কফিশুঁটির আড়ত। কফির বিন প্রকাশ্যেই দরকারমাফিক নানা মাত্রায় সেঁকা হচ্ছে (রোস্টিং)। জলে ফুটিয়ে 'ব্রু'-এর রকমারি কসরতও দেখতে পাবেন। আপনি কফিরসিক না-হলেও ওই কফি-ঠেকের ছাদটা অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। আম, বট থেকে রকমারি পাতাবাহার, বোগেনভিলিয়া, এমনকি খুদে খুদে চেরিফুলের ঝোপখচিত ছাদটায় বৃষ্টি পড়লেও অনেকে টেবিল ছেড়ে উঠবেন না। হাতের কফির কাপ ওড়না বা রুমালে ঢেকে প্রাণ ভরে ভিজে নেবেন। কাচের ঘরে বসে বৃষ্টি বা সূর্যাস্তের আমেজ নেওয়া তো আছেই। কেজো দিনের সকালের ওয়ার্ক ফ্রম হোমে অফিস-মিটিং, ক্লায়েন্ট মিটিং বা সপ্তাহান্তের ফুরফুরে সান্ধ্য মৌতাতে সচরাচর ফাঁকা থাকে না এ কাফের টেবিল। তবে মজাটা হল, এই ছাদ-বাড়ি নাকি কিছু দিন আগেও পাশের প্রাসাদোপম ভবনের আগাছা ভরা 'সার্ভেন্টস কোয়ার্টার' ছিল। গৃহকর্তা বিলি বোসের থেকে তা নিয়েছেন ক্রাফ্ট কফির পার্টনারেরা।
বাগবাজার থেকে বিজয়গড়, কাফের নেশায় এমনই বদলে যাচ্ছে কলকাতার ঘরদুয়ার। দেশপ্রিয় পার্কে মহারাজা-র কচুরির গলির দ্য ডেলি কাফের কাচ মোড়া ভিতর ঘরটিও (গ্লাস রুম) তেমনই সার্থক এক কফিমণ্ডপ।

কাফে ও ইতিহাস

বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাসেও বাঙালি মধ্যবিত্তের কফিতৃষ্ণা মেটানোর দলিল। নায়িকা স্বাতীর পাণিপ্রার্থী মজুমদার তাঁর কাঙ্ক্ষিত কুটুম্বকুলকে মেট্রোয় সিনেমা দেখিয়ে টেরিটিবাজারের চিনেপাড়ায় ডিনারে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের সেই কলকাতায় দারুণ মেজাজি জার্মান ইহুদি মালিকের কফিশপও নাকি অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকত। নৈশভোজ শেষের অত্যাবশ্যক কফিপানের জন্য স্বাতী ও তার দিদি-জামাইবাবুদের তাই ফ্রাউ কাউফমানের কফিশালায় নিয়ে যায় মজুমদার। সম্ভবত তখনকার মেলা ইহুদি ভরা ধর্মতলায় ছিল সেই ঠেক। কফির স্বাদ কেমন জানার জো নেই। তবে হিটলারের যুগে কলকাতায় জার্মান ইহুদির বসবাস-কাহিনিতে

গ্রিলড হালুমি চিজ় উইথ এগজ়টিক ভেজিটেবলস

ক্রাফট কফির ধবধবে ছাদের আভিজাত্য

রোমাঞ্চিত হতেই হয়।

এ দেশের কফিবোর্ডের হাতে কফিহাউসের পত্তন মোটামুটি ওই সময়েই ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে। এলগিন রোড়ের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিষ্ক্রমণের খবর তখন সবে জানা গিয়েছে। কফিহাউসের পথ চলা দ্রুত কলকাতার ইতিহাসেরও টাইমলাইন হয়ে উঠবে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় কফিহাউসের রোজনামচায় মিশে জীবনানন্দ দাশ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লোভনীয় কেক, চিজ়কেক, কোল্ড ব্রুয়ের সম্ভার

মৃত্যুদিন, সত্যজিতের পথের পাঁচালী-র রিলিজ়, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ বা খাদ্য আন্দোলনে পুলিশি লাঠির অভিঘাত, ১৯৬৪-র গোলমালে সিঁড়ির নীচের সিগারেট দোকানদার ইসমাইলকে বাঁচানোর আবেগ। একেলে কফিশপেও পারিপার্শ্বিক ঘটনার আঁচ পড়ে। তবে মূল সুরে টুকরো টুকরো অন্তরঙ্গ আখ্যানের প্রাধান্য। বছর দশেক আগে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে খানিকক্ষণের 'মি টাইম'এর খোঁজে ডোভার লেনের বারিস্তায় বসতেন একলা মা, এক মধ্য ত্রিশোত্তীর্ণা। তখনও কলকাতায় স্টারবাক্স নেই। আমেরিকাবাসের সুবাদে স্টারবাক্সের কফিতে তিনি আসক্ত। বিবাহ বিচ্ছেদের আগে জীবনের খুব খারাপ একটা সময়েও চাকরি আর সুখহীন গৃহকোণের ফাঁকে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা ছিল সেই কফিশপ। পরে জীবনে নতুন খুঁজে পাওয়া বন্ধুকে প্রথম ডেটে কফিশপটিতেই ডেকে পাঠাবেন মেয়েটি।

বছর দশেক ধরে রমরমিয়ে চলা যোধপুর পার্কের 'আবার বৈঠক'ও এমন বহু সম্পর্ক হয়ে ওঠা বা ভাঙাগড়ার সাক্ষী। কাফেয় দীর্ঘ প্রেম পর্বের পরে বরকে সন্তান আসার সুখবর দিতেও প্রিয় কাফেকেই বেছে নেওয়ার নজির রয়েছে। গোলপার্কের ট্রাইব কাফে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত অতিথি এক যুগলকে আইবুড়ো ভাত খাইয়েছিলেন। কোভিড যুগের 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' কালচারের পটভূমিতেও ঝরঝরে ওয়াইফাই সমৃদ্ধ কাফে নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, জয়া আহসান থেকে রাজনীতির অনেক মেজো, সেজো কারবারিও মুখোমুখি বসিবার কেজো মিটিং পছন্দের কাফেয় সারেন। আবার রিসার্চ পেপার রেডি করতে বা ইয়ারফোন গুঁজে ভার্চুয়াল অফিস মিটিংয়ে বসতেও বাড়ির চেয়ে কাফেই অনেকের জন্য সরেস।

কফিহাউসের সোনালি অতীত প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলেছেন, তাঁদের ছাত্রদশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের পড়াশোনার পরিপূরক ছিল কফিহাউসের আলোচনা ও বিতর্ক। আজকের কফিশপের অভিজ্ঞতা জরুরি বিভিন্ন বয়সের কাছেই। মনের অসুখ ও অবসাদে ধ্বস্ত এক তরুণী হয়তো কাফের পরিবেশেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। বাড়ি বিক্রির সময়ে বইয়ের কালেকশন প্রিয় কাফেকে দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন কোনও মুগ্ধ প্রবীণ। তাৎক্ষণিক কোনও রাজনৈতিক প্রতিবাদে শামিল নাও হতে পারে কফিশালা। কিন্তু বই প্রকাশ, আলোচনা সভা, গানবাজনার আসরেও কথা বলে ওঠে তার রাজনৈতিক সত্তা।

কফির দোসর ফিশ অ্যান্ড চিপস

বিফ স্টেক অ্যান্ড ফ্রাইজ়

মাশরুম এগ বেনেডিক্ট

আগে উৎকর্ষ কফির হদিস মিলত ওবেরয় গ্র্যান্ডের লা তেরাসের মতো কফিশপেই। তাতে দাপট ব্রাজিল, কলম্বিয়ার কফির।

গরিমা মাসের উদ্‌যাপনে বা সারা বছরই সমপ্রেমীদের জন্য শহরের নিরাপদতম স্থানের মধ্যে পড়বে কাফেগুলি।
‘তিথিডোর’-এর ফ্রাউ কাউফমান নেই। তবে আজকের কলকাতায় দেখা মিলবে ঝরঝরে বাংলা বলা দক্ষিণ কোরীয় গিন্নি ওকসু ইমের। অজয়নগরে তাঁর ছিমছাম নিবেদন ‘কাফে টোভ’। বেকারি কাফে ‘দ্য কিংস বেকারি’র একাধিক আউটলেটের নেপথ্যে থাকা ইয়ুক সিয়োকও কোরিয়ার সোল থেকে কলকাতায় এসেছেন। আবার আমেরিকান যুবক গ্র্যান্ট ওয়ালশের পরিশ্রমের ঘামও এ শহরে মিশেছে ‘এইটথ ডে কাফে’র তিনটি আউটলেটে দাঁড় করাতে। খবরাখবর নিয়ে গ্র্যান্ট দেখেন, ভাল কফির জোগানে

কফিতেও শিল্প

সুস্বাদু পর্ক বেলি স্লাইডার

দ্য ডেলি কাফের ছিমছাম অ্যামবিয়েন্স

ট্রাইব কাফের রংবাহারি অন্দরসাজ

ভারতের অন্য বড় শহরগুলির তুলনায় পিছিয়ে কলকাতা। তাই এখানেই বিপুল সম্ভাবনা। সে সব বছর সাতেক আগের কথা। অতঃপর কেরল, কর্নাটকের বাছাই করা কফিবাগানের উৎকর্ষ দানা, নানা কিসিমের ব্রু পেশ করে শুরু হল তাঁর কফিসাধনা। সঙ্গতে নিজেদের তৈরি টাটকা বেগেল, সাওয়ারডো প্রমুখ পাউরুটি ইত্যাদি। কলকাতার অভিজ্ঞতা পুঁজি করে গ্র্যান্ট এখন তাইল্যান্ডেও কাফে খুলছেন। তিনি গর্বিত, কলকাতার এইটথ ডে বিশ্বের সেরা কাফেগুলোর সঙ্গেই পাল্লা দেবে।

ইনফিউশন টু কোল্ড ব্রু

দেড় দশক আগে পার্ক স্ট্রিটে নেসকাফে-র চিলতে কফিঘরের কথা মনে আছে তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পড়ুয়া স্যাব্রিনা দে-র। সস্তায় এক কাপ কফি নিলে এক ঘণ্টা বসা যেত। কোনও দিনও ৪৫-৫০ মিনিটের মাথায় উঠে কফির কাপ রিফিল করতে গেলে টেনে বসিয়ে দিত সহপাঠীরা। ততদিনে সিসিডি মডেল ঢুকে পড়েছে কলকাতায়। তবে উৎকর্ষ কফির হদিস মিলত ওবেরয় গ্র্যান্ডের লা তেরাসের মতো পাঁচতারা কফিশপেই। তাতে দাপট বেশি ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকার কফির। বারিস্তার সৌজন্যেও ভাল কফি অনেকের অনাস্বাদিত জিভের আড় ভাঙতে থাকে। ক্যাপুচিনো, লাতে, আমেরিকানো নামগুলো মেশে আমাদের প্রাত্যহিক লব্জে।

দক্ষিণ ভারতে আরাকু, কুর্গ বা মালাবারের কফি বিনসের প্রতি আমাদের মোহের জন্ম ওই সময়েই। এখন তকাই শুনলে অনেকেরই হযবরল-র বদলে ব্লু টোকাই কফিচেনকে মনে পড়ে। এইটথ ডে, রোস্টারি আসার পরে কিন্তু বারিস্তায় ব্যবহৃত লাভাসা কফিকেও অনেক সময়ে পানসে লাগছে। সরাসরি নির্দিষ্ট কফিবাগান থেকে কফি কেনার প্রবণতা বেড়েছে কাফেয়। তাতে চাষিরাও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎগতিতে শহরের প্রথম সারিতে আসা কাফেরা অনেকেই দাবি করে, দক্ষিণ ভারতের অমুক বাগান থেকে আসা তাদের কফিই এক্সক্লুসিভ। তবে ক্রাফ্ট কফিতে কফিবিন সেঁকা ও কফি তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশ্যে। ফ্রেঞ্চপ্রেস, এরোপ্রেস, সাইফন, পোরওভার, কালিটা— আলাদা সরঞ্জামে 'ম্যানুয়াল ব্রু' শৈলীর ফসল, আলাদা স্বাদের কফি। মধুর তিক্ততা বা প্রখরতার তারতম্যে তারা যেন এক-এক জন আলাদা মানুষ। আগে কদাচিৎ বিদেশে কারও হাত ঘুরে স্টারবাক্সের কফিগুঁড়ো এলে বর্তে যেত কলকাতা। এখন এই চায়ের দেশে পছন্দসই লাইট, ডার্ক বা মিডিয়াম রোস্ট কফি বিন অনায়াসে হাতের মুঠোয়। বিভিন্ন কফি সরঞ্জাম নিয়ে জ্ঞানেও বাঙালি ঢের দড় হয়েছে।

কফি-স্বাদ ভাল লাগলেও কলকাতার গরমে কফির থকথকে উষ্ণতায় যাঁরা পিছু হটেন তাঁদের জন্য সুখবর হল কোল্ড ব্রু। ক্র্যানবেরি, বেদানা বা অন্য ফলের স্বাদের ঠান্ডা কফিও তপ্ত দুপুরে তৃষ্ণার শান্তি। সেক্টর ফাইভে ভেড়ির ধারে 'সুচালি'জ আর্টিজান বেক হাউস' বা দেশপ্রিয় পার্কে 'দ্য ডেলি কাফে'-য় ব্লু টোকাইয়ের কফিরই ব্যবহার। ক্যানবন্দি ঠান্ডা কফিও সেখানে মজুত। কফির খোসা ক্যাসকারার সুশীতল তরলও আজকাল ব্রাত্য নয়। ক্যাফিনবিহীন ডিক্যাপ কফিও সহজে মেলে প্রথম সারির কফিশপে। দ্য ডেলি কাফে আবার রকমারি ফ্যাটযুক্ত কিটো কফিও রেখেছে। স্বাদ বদলাতে সয়া মিল্ক, আমন্ড মিল্ক, কোকোনাট মিল্কের ভিগান কফিও চাখা যায়। কোন খাবারের সঙ্গে কোন কফিটা যাবে, সেও এক জরুরি সিদ্ধান্ত। ক্রাফ্ট কফিতে মাটন স্লাইডারের সঙ্গে কী জমবে, পুছতাছে ফার্মেন্ট করা কফি 'কাফুচা'র কথা জানা গেল। স্বাদে কিছুটা

ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম

কর্ন চিজ় বল

আইসড মেপল লাতে

কাফে'-র শ্রেয়সী পালও সল্টলেক, নিউটাউন, যোধপুর পার্কে তিনটে শাখা খুলে ফেলেছেন। চকলেট তৈরি, বেকিংয়ে তিনি দক্ষ। সেই সঙ্গে সামলাচ্ছেন পারিবারিক ছাপা ও বই বাঁধাইয়ের মস্ত ইউনিট। তাঁর স্বপ্নের পরের স্টেশনও ঠিক। সামনের দু'তিন বছরেই পুণে, বেঙ্গালুরুর পরে কাফে নিয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় যেতে চান। দিদি মেলবোর্নে। প্রিয় শহর মেলবোর্নের নামেই কাফের নাম রেখেছেন শ্রেয়সী। 'দ্য ডেলি কাফে'-র তরুণী কর্ণধার উর্বশী কানোই ইতিমধ্যে মুম্বইয়েও নিজের কাফে সামলাচ্ছেন। মারোয়াড়ি মেয়ে উর্বশীর কাছে কোনও ধরনের আমিষ নিয়েও ছুঁতমার্গ নেই। এ সব কাফেয় খাবারের বৈচিত্রও কলকাতার সেরা রেস্তরাঁর গোত্রে পড়বে। উর্বশী বলেন, ''লোকে এখন ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার— দিনভর জুতসই ভাল খাবার খোঁজে। কিন্তু রেস্তরাঁর চেয়ে কাফে-র ঘরোয়া পরিবেশ পছন্দের।'' তুলতুলে স্টেক থেকে ভাল স্যামন, হ্যাম খচিত এগ বেনেডিক্টের টানেও ডেলি বারবার হাতছানি দেয়।
দিল্লিতে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের চাকরি ছেড়ে শহরের উত্তরে সিঁথিতে 'ফুডপাথ কাফে' খোলা অরিজিৎ সাহাও স্পর্ধার একটি নাম। কফিতে নজর দিলেও তাঁর আবেগ আবার কলকাতার স্ট্রিট ফুড ঐতিহ্য নিয়ে। শিল্পা চক্রবর্তী, সঞ্জয় রায়চৌধুরী, পিনাকী ঘোষের স্বপ্নগুলো আবার অন্য রকম। এইচআর বা আইটি কনসালট্যান্টের বর্ম খুলে সৃজনশীল কিছু করার নেশাই তাঁদের কফির জগতে টেনে এনেছে। গোলপার্ক, সল্টলেক, বেহালায় ডানা মেলা ট্রাইবে কিন্তু কফিটাই সব নয়। কফির মানে আপস নেই কিন্তু নিছক কাফে হয়ে তাঁরা থাকতেন চান না। তাই বছরে দফায় দফায় মেনু থেকে সাজসজ্জায় এক-একটা থিমে বাঙালির প্রাণের কোনও আবেগ ট্রাইবে মেলে ধরেন। সত্যজিৎ রায়, কমিকস থেকে ১০০ বছরের সিনেমা— নানা বিষয় ঘুরেফিরে আসে। সেই সঙ্গে এ কাফে জুড়ে শিল্পপ্রেমীদের জন্য চমৎকার সব ক্যানভাসের আর্টস্পেস। ন'হাজার বইয়ের লাইব্রেরি, যার সংগ্রহ পুরোটাই সুহৃদদের অবদান। অতিমারির ঝাপটা সামলে ওঁরাও মাথা উঁচু রেখেছেন। কলকাতার কাফের গায়ে লেপ্টে থাকা গল্পে জুড়ে যাচ্ছে একটা ভারতবর্ষও। কলকাতাকে উঁচু জাতের কফিবিনের গন্ধ চেনাতে পটনার নিশান্ত সিংহের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। বিহারের যুবক দক্ষিণ ভারতের কফিকে পর পর হায়দরাবাদ, কলকাতা, নয়ডায় রোস্টারিতে মেলে ধরছেন। একদা রোস্টারির সঙ্গে যুক্ত কোন্নগরের ছেলে দীপরাজ দাস এবং পটনার অভিনব কুমার কলকাতায় ক্রাফ্ট কফির স্বপ্নও ফেরি করছেন।

স্বাদ বদলাতে সয়া মিল্ক, আমন্ড মিল্কের ভিগান কফিও চাখা যায়। কোন খাবারের সঙ্গে কোন কফি যাবে, সেও জরুরি সিদ্ধান্ত

ওয়াইনের মতো কাফুচা। বোতলবন্দি পানীয়ের সঙ্গে ওয়াইন গ্লাস এল। কাফে কর্তৃপক্ষের মতে, ভারী মাংসের সঙ্গে সেটাই জমবে।

কাফে এবং কয়েক জন

দু'মাসের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সোনিকা দে-র ব্যবসায় নামার ইচ্ছেতে বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তা দুলাল দে বা বর পারমিক দাস কেউই সায় দেননি। কিন্তু একরোখা মেয়ে তাতে দমবার পাত্রী নন। বিয়ের গয়না বেচে কলকাতায় অনেকটাই অচেনা ওয়াফলসের কারবার শুরু করলেন সোনিকা। 'ক্রেজি ফর ওয়াফল্‌স'-এর সাফল্যে বুক বেঁধেই এখন 'বুনাফিল কাফে'-র পতাকা ওড়াচ্ছেন।
অকালে মা, বাবাকে হারানো কলকাতা কন্যা 'দ্য মেলবোর্ন

কাপ দিয়ে যায় চেনা

এই তরুণদের স্বপ্নের পাশে পেনশনহীন মধ্য যাটে নতুন ইনিংসে মেতেছেন রংগন চক্রবর্তীও। তাঁর 'কাফে কলকাতা ৩২'-এর ময়দান আবার ঝকঝকে দক্ষিণ কলকাতার একটু বাইরে। গত শতকের আধা মফস্‌সল

ক্র্যানবেরি অ্যান্ড কফি

বেকন র‍্যাপড চিকেন

কফির সঙ্গে রেড ভেলভেট কুকি

একান্তে সময় কাটাতে চাইলে ঠিকানা হতে পারে কোনও কাফে

রিফিউজি কলোনির দেশ বিজয়গড়। জনৈক বন্ধুর বাড়ির একতলায় গড়ে ওঠা কাফের পরিসরটি কলেজ স্ট্রিটের বই কেনাকাটি থেকে বাঙালি রান্নার উৎকর্ষে শিকড়ের যোগ ধরে রেখেছে। ক্রিম ও কফির নিখুঁত মাত্রায় কোল্ড কফি বিশারদ অরিজিৎ চক্রবর্তী বীরভূমের অজয় নদের দেশের ছেলে। কাজ শিখেছেন বিভিন্ন বারিস্তায় ঘুরে। আবার বিজয়গড়ের কাফেয় বাঙালি স্বাদের গ্রিন চিলি পর্কে তাক লাগিয়ে দেওয়া নৈহাটির সুকান্ত থান্ডারের মন্ত্রদীক্ষা সল্টলেকের এক চিনে রেস্তরাঁয়।

কর্নাটকের কফি বাগানের চাষি থেকে গ্রাম বাংলার পাড়াগেঁয়ে যুবক এমন কত জনকে মিলিয়ে দেয় কফির কাপ। ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে এইচআইভি পজ়িটিভ মানুষদের নিয়ে সচল কাফে পজিটিভ। ‘পঞ্চমের আড্ডা’য় আর ডি বর্মণের নস্ট্যালজিয়া। সিয়েনা কাফে বা বালিগঞ্জের দেশজ-এ বাংলার লোকশিল্প

সামগ্রীরও বিপণি। কফির কাপের ফেনায় মিশে কত অগুনতি স্বপ্নের বুদ্বুদ। ব্যবসার দৃষ্টিকোণে কাফে মানেই কিন্তু সিদ্ধিলাভের ফর্মুলা নয় আজকের ভারতে। সিয়েনার শেফ-কাম-কর্তা অরণি মুখোপাধ্যায় তর্ক করেন, “ইউরোপে কাফে বলতে লোকে যা বোঝে তাতে কফি, মেন কোর্স, স্ন্যাকসের সঙ্গে ভাল ওয়াইন, বিয়ারও থাকে। তা না হলে কাফের টেবিল পিছু রোজগার বাড়বে না।” সিসিডি সাম্রাজ্যের উত্থানপতন অনেকেই দেখেছেন। মুম্বইয়ের ইরানি কাফে, কলকাতার সাবেক কেবিন, মিষ্টির দোকানের ইতিহাসেও নানা বাঁক। তবু কিছু মানুষ এ শহরেও আছেন, বয়স বাড়লেও একবারটি প্রিয় কাফেয় না-গেলে যাঁদের দিনটায় ফাঁক থেকে যায়। টানটা পরকীয়া প্রেমের মতোই তীব্র। একটা যুগের বাংলা উপন্যাসে খুচখাচ বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে জীবনের একটা বারান্দার সঙ্গে তুলনা করা হত। প্রিয় কাফে মানে নিজের সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের উঠোন। তা একযোগে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা-র ঘড়ার জল এবং দিঘিরও জল। এ দিঘিতে মন তো সাঁতার দেবেই, রোজকার ব্যবহারেও কাফে ছাড়া গতি নেই। কফি ছাড়া শূন্য লাগে...

ছবি: সর্বজিৎ সেন

দ্য মেলবোর্ন কাফের তাকলাগানো অন্দর ও বাহির

কাফে কলকাতা ৩২ খেয়াল রেখেছে মধ্যবিত্তের পকেটের প্রতি

পূজা পর্যায়ে...

শাড়ি হাতে নেওয়ার ক্ষণ থেকেই সখ্য তৈরি হয় তার সঙ্গে। জরির পাড়ে, সুতোর বুনটের স্পর্শে তা গভীর হয়। পুজোর মরসুমে এই বন্ধুতা তো চিরকালীন। অভিনেত্রী **সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের** শারদসাজে সঙ্গী **ঈপ্সিতা বসু**

সমুদ্রনীল

নীলচে চেক গাদোয়ালের সঙ্গে পান্না সবুজের উপরে সোনালি জরির পাড় ও আঁচল। আধুনিক কাটের ব্লাউজ়ে সাজ সম্পূর্ণ। সঙ্গতে কুন্দন গয়না।

‘মুক্তো’বিহঙ্গ

প্রিন্টেড সিল্কের মোটিফে বেগুনি ও গেরুয়া রঙের ব্যবহার। ডিপ-নেক ব্লাউজ়ে, গলায় মুক্তোর হারে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে সাজ।

ব্লাউজ়: অনুশ্রী মলহোত্র
জুয়েলারি: স্টাইল অ্যাডিক্ট বাই উজ়মা ফিরোজ়, প্রিটিয়স

চৌখুপি

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ইক্কতে। রং ও প্যাটার্নের খেলায় এই শাড়ি হয়ে উঠেছে আরও মোহময়ী।

ব্লাউজ়: অনুশ্রী মলহোত্র
জুয়েলারি: স্টাইল অ্যাডিক্ট বাই উজ়মা ফিরোজ়, প্রিটিয়স

রানিকাহিনি

কাতান বেনারসিতে মুঘল বুটি। মুঘল আমলে কিন্তু এই নকশা ফুটিয়ে তুলতে সোনা ও রুপোর জরি ব্যবহার করা হত। ব্লাউজ়েও রয়েছে জরির কাজ।

জুয়েলারি: স্টাইল অ্যাডিক্ট বাই উজ়মা ফিরোজ়, প্রিটিয়স

কে তুমি নন্দিনী!

বেনারসি হলেও শিফনের প্রাণজুড়ানো আরাম। হালকা রঙের জমিতে পেজ়লি মোটিফ। পাফ-হাতায় আধুনিক সাজ।

ব্লাউজ়: অনুশ্রী মলহোত্র
জুয়েলারি: স্টাইল অ্যাডিক্ট বাই উজ়মা ফিরোজ়, প্রিটিয়স

অগ্নিশিখা

উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে ভেঙ্কটগিরির জমি জুড়ে। বুটি ও মিনাকারিতে তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। অক্সিডাইজ়ড গোল্ডে সাজ সম্পূর্ণ।

সন্ধ্যার মেঘমালা

ক্রেপ শাড়িতে ফুলেল মোটিফ। সঙ্গত করছে প্রাণবন্ত হাসি

ব্লাউজ়: অনুশ্রী মলহোত্র
জুয়েলারি: জ্যাজ়ি জুয়েলারি, বিধান সরণি

শাড়ি: আনন্দ, কুইন্‌স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ছবি: দেবর্ষি সরকার
মেকআপ: ভাস্কর বিশ্বাস
হেয়ার: কুশল মল্লিক
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
ফুড পার্টনার: দ্য ডোলচে ভিটা, ইবিজ়া
লোকেশন ও হসপিটালিটি: ইবিজ়া দ্য ফার্ন রিসর্ট অ্যান্ড স্পা

বিজয়ওয়াড়ার কনকদুর্গা

পুণ্যসলিলা কৃষ্ণা নদীতে অবগাহন ও ইন্দ্রকিলা পর্বতের শিখরদেশে সোনার দুর্গাকে দর্শন করার মন নিয়ে গিয়েছিলাম বিজয়ওয়াড়ায়। দেবীর মূর্তি অনবদ্য। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ার সময়ে দেবীর রোম এখানে পতিত হয়েছিল... তীর্থের সে অভিজ্ঞতা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে

অন্ধ্রপ্রদেশের রমণীয় পার্বত্য পরিবেশে কৃষ্ণাবেন্বা যেখানে সগৌরব প্রবহমানা, সেখানেই বিজয়বাটিকার ইন্দ্রকিলা পর্বতের শীর্ষদেশে কনকদুর্গার অধিষ্ঠান। বিজয়বাটিকা এখন নামের পরিবর্তন করে প্রথমে বেজোয়াদা, পরে বিজয়ওয়াড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৫৪ সালে আমার তেরো বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজ মেলে চেপে বিকেল চারটে নাগাদ প্রথম এসেছিলাম বেজোয়াদায়। তবে ট্রেন থেকে নামা হয়নি। জানালার

কনকদুর্গা মন্দির

কনকদুর্গা মন্দিরের প্রধান দরজা

ইন্দ্রকীল এখানে এক পাহাড়ের রূপ ধরে অনন্তকাল অবস্থান করতে থাকেন। এবং দেবীও স্থায়ী ভাবে রয়ে যান এখানে।

ফাঁক দিয়েই আশপাশের ছোট বড় বেশ কয়েকটি পাহাড়ের রমণীয় দৃশ্য দেখেছিলাম। ট্রেন ছাড়লে বিস্ময়দৃষ্টি মেলে পার হয়েছিলাম নীলবর্ণা কৃষ্ণা নদী। তখন ওই বয়সে ওর মহিমা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলাম না। বড় হয়ে সব কিছু জানার পরে এই জায়গাই আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান হয়ে উঠল। তাই এসেছি এখানে বারেবারে। শৈলশিখরে কনকদুর্গার অষ্টভুজা রম্যমূর্তি দর্শন করে ধন্যাতিধন্য হয়েছি।

ভাইজাগ যেমন বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ যেমন চেন্নাই, অতীতের বিজয়বাটিকাও তেমনই বিজয়ওয়াড়া। চেন্নাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে এই স্থানটি কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটি তালুক বা শহর। প্রাচীন একটি শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, অনেক আগে এই স্থানটির নাম ছিল রাজেন্দ্রচোলাপুরম।

অতীতের কথা থাক। একটু বড় বয়সে যখন আমি ইচ্ছে অনুযায়ী ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখনই কৃষ্ণা নদীতে অবগাহন ও ইন্দ্রকিলা পর্বতের শিখরদেশে সোনার দুর্গা বা কনকদুর্গাকে দর্শন করার মন নিয়ে চলে এলাম বিজয়ওয়াড়ায়। সঙ্গে আমার বড় মেয়ে চতুর্দশী ইন্দ্রাণীও ছিল। স্টেশনের কাছাকাছি একশো টাকায় একটি ঘর পেয়ে, এক লজে উঠলাম। এর পর স্নানাদিকৃত্য শেষ করে, আহারাদির পর ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রাম নিলাম একটু। বিকেলের দিকে রওনা হলাম কৃষ্ণাবেণীর দিকে। দূরত্ব তিন কিলোমিটার। স্টেশনের দিক থেকে নদীতে যাওয়ার জন্য ঘনঘন বাস আছে। অন্য পরিবহণও আছে অনেক।

যাই হোক, আমরা এক সময়ে কৃষ্ণা ঘাটে এসে দু'চোখ ভরে নদীর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। দারুণ আকর্ষক ঘাট। ঝকঝকে তকতকে ঘাটের সিঁড়িগুলো। এখানেই তৈরি করা হয়েছে কৃষ্ণা নদীর উপর প্রকাশম ব্যারেজ। ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে টলটলে জলের এক বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। এর মধ্যস্থলে রয়েছে ভবানী দ্বীপ। আমরা কৃষ্ণা নদীর জল স্পর্শ করে চুপচাপ বসে এখানকার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। আজ আর স্নানের পরিকল্পনা নেই, কারণ স্নান তো করেই এসেছি। স্নান করব আগামীকাল। এখানে স্নান, দান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ... সবই পুণ্যের কাজ। কৃষ্ণা তো যেমন তেমন নদী নয়, এই পুণ্যসলিলা হল পঞ্চগঙ্গার একটি। যেমন ভাগীরথী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা। এর আবার পাঁচটি নাম। কৃষ্ণগঙ্গা, কৃষ্ণসমুদ্ভবা, কৃষ্ণবেম্বা ও কৃষ্ণাবেণী। মহাভারতে আছে, 'সদা নিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীং।'

কৃষ্ণা ঘাট ও প্রকাশম ব্রিজের পাশেই একটি মনোরম উদ্যান আছে। আমরা কিছুক্ষণ সেই উদ্যানে ঘুরে বেড়িয়ে, পাশেই ইন্দ্রকিলা পাহাড়ে চললাম কনকদুর্গার মন্দির দেখতে। ইন্দ্রকিলা পাহাড়কে ইন্দ্রকিলাদ্রিও বলেন অনেকে। শোনা যায়, সে কালে ইন্দ্রকীল নামে এক যক্ষ দেবী দুর্গার উপাসনা করে দেবীর মন জয় করেন। দেবী তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি সব সময়ে তাঁর কাছে-কাছেই থাকবেন। ইন্দ্রকীল তাই এখানেই একটি পাহাড়ের রূপ ধরে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করতে থাকেন। এবং সেই থেকে দেবীও স্থায়ী ভাবে রয়ে যান এখানে। সকলের মতে, জাগ্রতা দেবীর কাছে কোনও প্রার্থনা করলে দেবী তা অচিরেই পূরণ করেন।

ইন্দ্রকিলা পাহাড়ের আর এক নাম অর্জুনকোণ্ডা। কেননা, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে এখানে অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এক সময়ে। সেই যুদ্ধে অর্জুন জয়লাভ করেন বলেই এর নাম হয় অর্জুনকোণ্ডা। আবার অনেকে এ-ও মনে করেন, কিরাতরূপী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ এখানেই হয়েছিল।

সে যা-ই হোক, আমরা আর এদিক-সেদিক না করে নীচের গোপুরম পার হয়ে পর্বতারোহণ শুরু করলাম। এ পথে বাসও চলে। তবে বাসবাহনে না গিয়ে হাঁটাপথেই প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে মন্দির অভিমুখে রওনা দিলাম। এখান থেকে কৃষ্ণা নদীর এপার-ওপার সহ বিজয়ওয়াড়ার দৃশ্য অপূর্ব। অজস্র টিলা পাহাড়-সহ কৃষ্ণার ব্যারেজটিও দারুণ সুন্দর দেখায়।

এক সময়ে পূজাসামগ্রীর রংবেরঙের ফুলের দোকান পার হয়ে আমরা উপরে উঠলাম। স্বর্ণাভাযুক্ত মন্দির চোখে পড়ল। দর্শনার্থীর ভিড়ও ছিল অনেক। আমরা আরও একটি গোপুরম পার হয়ে, সমগ্র মন্দিরের স্বর্ণকান্তি দেখে অভিভূত হলাম। কত সোনা! চোখ যেন

ধাঁধিয়ে যায়। দর্শনের জন্য পাঁচ টাকা করে টিকিট কাটতে হল। এর পর দেবীর পূজার জন্য কুড়ি টাকা দিয়ে বৈজয়ন্তী মালাও কিনে নিলাম। পুরো দক্ষিণ ভারত জুড়ে এই মালার প্রচলন খুব।
ধীরে ধীরে লাইন এগোতে লাগল। এক সময়ে দর্শন করলাম স্বর্ণদুর্গাকে। দেখে মন ভরে গেল। দেবীর মূর্তি অনবদ্য। আমাদের দেওয়া বৈজয়ন্তী মালাও পুরোহিতের সৌজন্যে দেবীর গলায় শোভা পেতে লাগল। এতটা সৌভাগ্য আমরা আশা করিনি।
দেবীর স্বর্ণরূপের দিকে তাকালে দৃষ্টি যেন ফেরানো যায় না। শোনা যায়, দেবী যখন ইন্দ্রকীল যক্ষের সামনে স্বরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে স্বর্ণাভ দ্যুতি প্রকট
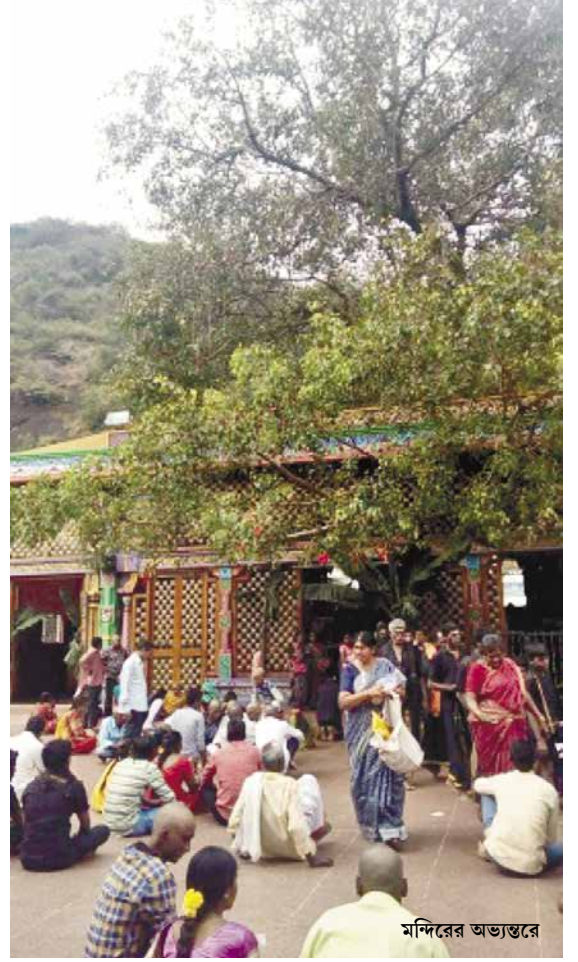
মন্দিরের অভ্যন্তরে

স্বর্ণদুর্গার মূর্তি কোন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। বলা হয়, এটি স্বয়ম্ভূ মূর্তি এবং এটি একটি উপপীঠ।

হতে হতে একটি জ্যোতির্মণ্ডলে পরিণত হয়েছিল। হরজায়া পার্বতী ছিলেন অগ্নিস্বরূপা। অসাধারণ রূপবতী তিনি। সেই পার্বতী যখন হিমশৈলে দুর্গম নামে অসুরকে বধ করে 'দুর্গা' নামে অভিহিত হন, তখন থেকেই স্বর্ণাভ দ্যুতিতে ভরে ওঠেন তিনি। তার পর তাঁকে শান্ত করার জন্য দেবগণ অনেক স্তবস্তুতি করে স্ব-রূপে নিয়ে আসেন। এর পর তিনি ইন্দ্রকিলে অবস্থান করতে থাকলে সেই রূপই তিনি ধরে রাখেন বরাবরের জন্য। দেবতারা 'স্বর্ণদুর্গা' নামে অভিহিত করেন তাঁকে। তাই তিনি 'কনকদুর্গা'।
এখানে এই স্বর্ণদুর্গার মূর্তি কোন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ঠিক ভাবে জানা যায় না। সবাই বলেন, এটি স্বয়ম্ভূ মূর্তি, এবং এটি একটি উপপীঠ। সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হওয়ার সময়ে দেবীর রোম এখানে পতিত হয়েছিল। দেবী এখানে চণ্ডনায়িকা। দেবীর ভৈরব চণ্ডেশ্বর। রোজই গড়ে এখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোক এসে থাকেন। এই পাহাড়ে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গুহামন্দির আছে। তাদের মধ্যে মল্লেশ্বর প্রধান। গুহামন্দিরে যে সব দেবদেবী বিরাজ করছেন, তাঁরা
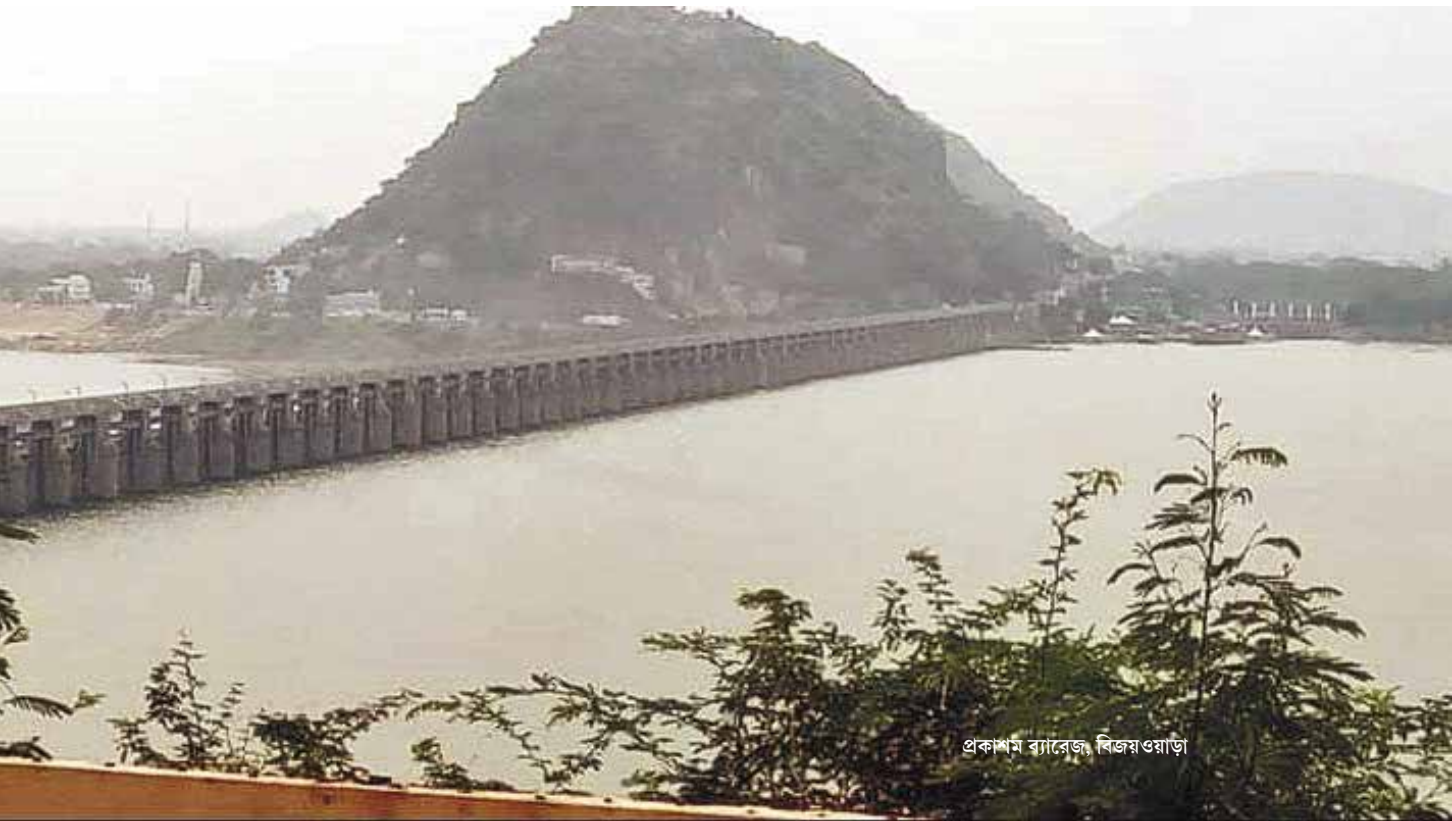
প্রকাশম ব্যারেজ, বিজয়ওয়াড়া

সন্ধেবেলায় মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কৃষ্ণবেম্বা, প্রকাশম ব্রিজ সমেত যেন ঝলমলিয়ে ওঠে সমস্তটা। শুরু হয় কনকদুর্গার আরতি।

সবাই মূল্যবান অলঙ্কাররাজিতে সুসজ্জিত।
দেখতে দেখতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এল। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কৃষ্ণবেম্বা, প্রকাশম ব্রিজ সমেত ঝলমলিয়ে উঠল সমস্ত। শুরু হল কনকদুর্গার আরতি। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। আরতি শেষে প্রসাদ পাওয়ার আনন্দই আলাদা। বড় বড় সাইজ়ের বুন্দিয়ার লাড্ডু বেশ কয়েকটা কিনে, ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। তার পর সোজা আমাদের লজে এসে বিশ্রাম।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে যখন উঠলাম, তখন শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে। প্রথমেই আমরা ফ্রেশ হয়ে, চা-পর্ব শেষ করে নিলাম। তার পর কৃষ্ণাবেম্বায় যাওয়ার জন্য বাইরে আসতেই, ঘাটে যাওয়ার বাস পেয়ে গেলাম। আজ সারাটা দিন নদীর তীর ধরে ঘুরব, প্রকাশম ব্রিজের এপার-ওপার করব, আর পাহাড়ে উঠে কনকদুর্গা মন্দিরের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে আরও যদি কিছু দেখা যায়, সেই
চেষ্টা করব।
বাস থেকে নেমে কৃষ্ণবেম্বার আশপাশে যখন ঘোরাঘুরি করছি, ঠিক তখনই মঙ্গলগিরির একটি ফাঁকা বাস এসে পড়ল বিজয়ওয়াড়ার স্ট্যান্ড থেকে। মঙ্গলগিরি হল পূর্বঘাট পর্বতের এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে আছে পানকলা শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহস্বামীর মন্দির। এখান থেকে দূরত্ব মাত্র ন'কিলোমিটার। ভাড়া পাঁচ টাকা। এই পথে পড়ে ওন্দাপল্লির গুহামন্দির। আমরা অবশ্য ওন্দাপল্লির পথে না গিয়ে কোণ্ডাপল্লির দিকেই এগোতে থাকলাম। শুনেছি, এখানকার কাঠের পুতুল নাকি খুব বিখ্যাত। তবে আমরা কোণ্ডাপল্লিতেও গেলাম না। আমাদের গন্তব্য মঙ্গলগিরি, যার প্রাচীন নাম মঙ্গলারাজপুরম। মঙ্গলগিরিতে যখন পৌঁছলাম, তখন গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠল মন। মঙ্গলগিরি পর্বতের পাদদেশে যে ছোট্ট জনপদটি, সেটি এমনই সুন্দর যে মন কেড়ে নেওয়ার মতো। মঙ্গলগিরি হল চেন্নাই প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জেলায় গুন্টুর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে পর্বতগাত্রে খোদিত নরসিংহ স্বামীর (বিষ্ণুর) দু'টি মন্দির আছে। একটি মঙ্গলগিরির পাদদেশে ডান দিকে, অপরটি বাঁ দিকে পাহাড়ের মাথায়।
পাহাড়ে ওঠার আগে প্রথমেই বাঁ দিকে সুন্দর একটি শিবমন্দির দর্শন করলাম। এর পর ৬০০ সিঁড়ি অতিক্রম করে শুরু করলাম পর্বতারোহণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরেণুধন্য এই তীর্থদর্শনের আশা আমার মনে বহু দিন ধরেই ছিল। এত দিনে সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে। পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে ওঠার পরে ডান দিকে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ দর্শন করলাম। এখানে শ্রীচৈতন্যের চরণচিহ্ন আছে। বাঁ দিকে আছে দুর্গামন্দির। উপরের মন্দিরটি পানকলা লক্ষ্মী-নৃসিংহস্বামীর। তবে ইনি সোজা কথায় 'পানকলা নরসিংহ' নামেই খ্যাত। ইনি প্রত্যহ গুড়ের পানা (শরবত) ছাড়া অন্য কোনও প্রসাদ গ্রহণ করেন না। তাই অন্য কোনও ভোগও দেওয়া হয় না বিগ্রহকে। এখানকার স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই বিগ্রহকে যিনি ভক্তিভরে শরবত ভোগ দেন, বিগ্রহ তাঁর শরবত পুরোপুরি পান করেন। কিন্তু যাঁর মনে কোনও সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকে, তাঁর শরবত ঠাকুর অল্প পান করেন। শুধু তা-ই নয়, শঙ্খ দিয়ে যখন এই শরবত বিগ্রহকে পান

করানো হয়, তখন এমন একটা শব্দ শোনা যায়, যা শুনে মনে হয় বিগ্রহ বুঝি সত্যিই শরবত পান করছেন।

আমরা পাহাড়ের উপরে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে একটি গুহায় পাথরে খোদাই করা মূর্তি। দর্শনে মন ভরে গেল। পূজারির দল পাঁচ টাকা করে গুড়ের শরবত যাত্রীদের কাছে বিক্রি করছেন। ভক্তরা সেই শরবত কিনে পান্ডাদের হাতে দিলে, পান্ডারা তার অর্ধেক বিগ্রহকে পান করিয়ে বাকি অর্ধেক ভক্তকে প্রসাদ হিসেবে ফেরত দিচ্ছেন। তবে শরবত পান করানোর সময়ে কোনও শব্দ কিন্তু শুনতে পেলাম না। কালের পরিবর্তনে হয়তো অনেক কিছুই হয়। যাই হোক, নরসিংহ দেবকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। স্বয়ং মহাপ্রভু, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার— তিনি এসে যখন এঁকে দর্শন করে গিয়েছেন, তখন আমি তো ধন্যাতিধন্য! শুনলাম, তাঞ্জোরের মহারাজা এই মন্দিরে একটি বহুমূল্য বেদি উৎসর্গ করেছেন। সেটি দর্শন করে নীচে নামলাম।

পাহাড়ের নীচে এসে আর এক বিশাল মন্দির দর্শন করলাম। এর গোপুরমটি আস্ত একটি পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে। এত বড় গোপুরম সারা ভারতে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এখানকার মন্দিরে আছেন দ্রোণ নৃসিংহস্বামী। এখানেও প্রবেশ কর দিতে হয়। তবে উপরের মূল মন্দিরের চেয়েও নীচের এই মন্দিরটি অনেক আকর্ষণীয়। অনুসন্ধানে জানলাম, মঙ্গলগিরিতে মোট পাঁচটি গুহামন্দির আছে। বিষ্ণুকুণ্ডীদের রাজত্বকালে এই গুহামন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল। তবে সে সব যে কোথায়, তা অজানাই রইল আমাদের কাছে। দর্শন শেষে ফিরে এলাম কৃষ্ণাবেম্বায়।

ফিরে এসে একটু জলযোগ সেরে কৃষ্ণা নদীতে ডুব দিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করলাম। স্বচ্ছসলিলা কৃষ্ণার প্রবাহে দেহ শীতল ও মন আনন্দময় হয়ে উঠল। এর পর আমরা গতকালের মতোই আবার হাঁটাপথে কনকদুর্গার মন্দিরে চললাম। যাত্রাপথে 'আকান্না-মদন্না' নামের দু'টি গুহা চোখে পড়ল। গতকাল এ দু'টির দিকে মনোযোগ দিইনি। আজ এই গুহাদু'টির সামনে এবং পাহাড়ে ওঠার পথের ধারে বিভিন্ন স্থানে এ দেশীয় বংশীবাদকেরা বাঁশি বাজিয়ে সুরের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। তাঁদের বংশীবাদনের সুরে আমোদিত হয়ে উঠল মন। লোকমুখে শুনলাম, এই ইন্দ্রকিলা পাহাড় আসলে সঙ্গীতকলা চর্চারও একটি পীঠস্থান।

যাই হোক, উপরে উঠে গোপুরম পেরোতেই চালুক্যরাজ দ্বিতীয় আম্মারাজার আমলে দশম শতাব্দীতে তৈরি স্বর্ণময় মন্দির দর্শন করে চোখের তৃষ্ণা মেটালাম। এর পর মন্দির চত্বরে বেশ কিছুটা সময় ঘোরাফেরা করে, দর্শন করলাম কনকদুর্গাকে। আর অনেক বেলা পর্যন্ত মন্দিরে থেকে শেষে অবতরণ করলাম
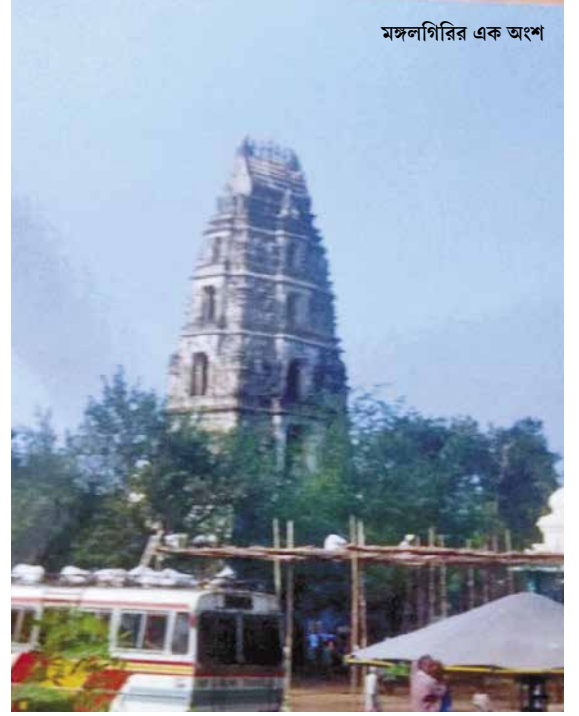
মঙ্গলগিরির এক অংশ

কৃষ্ণা ঘাটে।

এর পর দেবী কনকদুর্গার আশীর্বাদ আমি অন্য ভাবে পেলাম। যখনই মন টানত, একাকী যাওয়া শুরু করলাম ওখানে। দৈবক্রমে আমার ছোট মেয়ে, জামাই ও নাতনি হায়দরাবাদের বানজারা হিলসের বাসিন্দা হয়ে গেল। ফলে যাতায়াতের পথে বিজয়ওয়াড়া হয়ে উঠল আমার আরও কাছের। ভারত সরকার প্রদত্ত ২০১৭ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমির 'বাল সাহিত্য পুরস্কার' পেলাম এই বিজয়ওয়াড়াতেই। এমনটা যে হবে, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এ বার আর সস্তার হোটেলে নয়। ফাইভ স্টার হোটেলের আটতলার জানালায় দাঁড়িয়ে পর্বতশিখরে অধিষ্ঠিতা কনকদুর্গার মন্দির অনিমেষ নয়নে দর্শন করব, এমনটা ভাবিনি কখনও। সত্যি, স্বর্ণদুর্গার কৃপায় কী না হয়! আমার এই কামনাবিহীন দুর্লভ সৌভাগ্যের মূলে যিনি— তিনি হলেন ইন্দ্রকিলাদ্রির কনকদুর্গা। তাঁকে সহস্রকোটি প্রণাম!

‘পরম’আনন্দে

অন্ধকার কাটিয়ে আশার আলো দেখেছেন। অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনা তিনটি ক্ষেত্রেই নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন **পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়**। তাঁর জীবনের পরমপ্রাপ্তির গল্প শুনলেন **দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ**

কেন? এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন ফিচার করা হচ্ছে? প্রতিবেদক প্রশ্ন ছোড়ার আগেই পাল্টা প্রশ্ন... কেন, কী বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলার পরেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও প্রশ্ন করলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। যেন বুঝে নিতে চাইলেন নিজের অবস্থান। জেনে নিলেন মিডিয়ার কাছে তাঁর কাজের গ্রহণযোগ্যতা। নিজের অবস্থান যাচাই করে পদক্ষেপ করার প্রবণতাই হয়তো তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাঁর মতে, খবরে অনেকেই থাকেন। কিন্তু কার কাজ কতটা ছাপ ফেলছে, সেটাই বিবেচ্য।

তাই অতিমারি পর্বে টলিউডের অধিকাংশ অভিনেতা যখন কাজের অপেক্ষায় বসে, তখন তিনি কলকাতা-মুম্বই উড়ানের নিয়মিত যাত্রী। লকডাউনের কয়েক মাস বাদ দিলে গত দু’বছরে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ততম অভিনেতার নাম পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। যদিও তিনি শুধু অভিনয়ের গণ্ডিতে আটকে নেই। পরিচালনা-প্রযোজনা দুই জার্সিতেই নিজেকে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন।

এই মানিয়ে নেওয়ার কাজটা সহজ ছিল না। ইন্ডাস্ট্রির বাতিলের খাতায় নামটা হয়তো উঠেই যেত। যদি না তিনি ‘অন্ধকূপ’ থেকে বেরোতেন।

তৈরি করে নিলেন নিজের কক্ষপথ

কেরিয়ারে ব্যাডপ্যাচ সকলের আসে। পরমব্রতরও এসেছিল। ২০১৫-তে পরিচালিত ছবি ‘লড়াই’ ফ্লপ করল। অন্য দিকে ‘রোগা হওয়ার সহজ উপায়’, ‘হেমন্ত’

পুরীতে বাবা মায়ের সঙ্গে

’৯৭-এ পাঠভবন স্কুলে

ব্যর্থ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে না। সেই ঘুরে দাঁড়ানোর আগের পর্বের কথাগুলো বলছিলেন পরমব্রত। তিনি কিচ্ছু ভোলেন না। সাল-তারিখ ধরে করে বলে দেন, কবে তাঁর কোন ছবি ব্যর্থ হয়েছে। মনে রেখে দিয়েছেন, কারা সেই সময় তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। ‘‘আমার খারাপ ফেজ় চলেছিল ২০১৫-র জানুয়ারি থেকে ২০১৭-র জানুয়ারি পর্যন্ত। ‘লড়াই’ না চলায় ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম। তার পর ‘গ্ল্যামার’, ‘বাবার নাম গান্ধীজী’ চলল না। ‘বাস্তু-শাপ’ একটু চলল। ‘সিনেমাওয়ালা’ প্রশংসিত হল। কিন্তু সেখানে পরানদাকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিয়েই বেশি হইচই হল। তার পর অঞ্জনদার (দত্ত) ‘হেমন্ত’ ডিজ়াস্টার হল। এর পরেই দেখলাম, লোকে আমাকে খরচের খাতায় ফেলে দিল। সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল যাদের বন্ধু ভাবতাম, তারা দেখলাম আমার ব্যর্থতায় বেশ পুলকিত হচ্ছে। ছবিগুলো না চলার দায় পুরোপুরি আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে বলা হল, ‘পরমকে দিয়ে চলছে না।’ ২০১৬-র পুজো রিলিজ় ‘জুলফিকার’ সফল হল। কিন্তু আমার কথা তেমন আলোচনা হল না। ওই পুজোতেই রিলিজ় করেছিল ‘চকোলেট’। ডাহা ফেল করল ছবিটা। শুনলাম ‘ওই দেখো, পরমের আরও একটা ছবি ফ্লপ।’ দেখলাম বড় পরিচালকেরা আর আমাকে নিয়ে ছবি ভাবছেন না। তার মধ্যে এই প্রশ্নটাও উঠল আমি কেন ছবি ডিরেক্ট করছি?’’

ওই সময়েই এক শুভাকাঙ্ক্ষী প্রযোজক পরামর্শ দেন মুম্বইয়ে কাজের চেষ্টা করতে। তত দিনে পরমব্রত বলিউডে ‘কহানি’ (২০১২) ছাড়াও অল্পবিস্তর কাজ করেছেন। ২০১৭-য় অনুষ্কা শর্মার প্রযোজনায় ‘পরী’র প্রস্তাব পেলেন। ছবিতে অনুষ্কা নিজেও রয়েছেন। টলিউডের মাতব্বরেরা এ বার একটু নড়েচড়ে বসলেন। এর মধ্যেই অভিনেতা বাংলাদেশে ‘ভুবনমাঝি’ করছেন। সায়ন্তন ঘোষালের ‘যকের ধন’ মন্দ চলেনি। ‘সমান্তরাল’এ তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৮তে ‘পরী’ মুক্তি পেল। তত দিনে চারপাশের মানুষজনকে ভাল মতো মেপে নিয়েছেন অভিনেতা। মুখের হাসি ধরে রেখে গায়ে চাপিয়ে নিয়েছেন উদাসীনতার বর্ম। বলছিলেন, ‘‘ওই সময়টা থেকে আমি নিজেকে অ্যালুফ করা শুরু করলাম। কারও সম্পর্কে কোনও বৈরিতা কিন্তু পোষণ করিনি। কারণ এটা আমার কাজের জায়গা। মুম্বইয়ে কাজ করলেও, এই জায়গাটা ছেড়ে নয়। আমার শিকড় এখানে। ঠিক করে নিয়েছিলাম নিজের মতো করে অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা সবটাই করব। ধীরে ধীরে আমাদের প্রযোজনা সংস্থা রোডশোর কাজ শুরু করলাম। অরিত্র (সেন), সুপ্রিয়দা (সেন) ছোট ছোট টিম করে কাজ করতে লাগলাম...’’

পরমব্রত নিজের কক্ষপথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সাফল্যও

পরমব্রত নিজের কক্ষপথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সাফল্যও আসছিল। কিন্তু তার পর অতিমারি এসে ধাক্কা দিল

আসছিল। তার পর অতিমারি এসে ধাক্কা দিল। করোনা ভাইরাস বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিকে কাবু করে ফেলল। কিন্তু ওই যে একটা দরজা বন্ধ হলে অন্য দরজা খুলে যায়। সিনেমা হলের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিল। এ দিকে ওটিটি মাধ্যম ডালপালা মেলল। আঞ্চলিক অভিনেতা, থিয়েটার অ্যাক্টররা ওটিটি কনটেন্টের মুখ্য চরিত্রে নজর কাড়তে লাগলেন। হিন্দিতে ‘বুলবুল’, ‘রাম প্রসাদ কী তেরভি’, ‘কৌন প্রবীণ তাম্বে?’ করে ফেললেন পরমব্রত। রবিনা টন্ডনের সঙ্গে নেটফ্লিক্স ওয়েব সিরিজ় ‘আরণ্যক’ তাঁকে হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা শক্ত মাটি দিয়েছে। আগামী দিনে তাঁকে নিখিল আডবাণীর ‘মুম্বই ডায়েরিজ়...’-এর সিজ়ন টু, সুধীর মিশ্রর ছবিতে তাপসী পান্নুর বিপরীতে, অ্যামাজ়ন প্রাইমের ওয়েব সিরিজ় ‘পিআই মিনা’তে দেখা যাবে। অন্য দিকে ‘সোনার পাহাড়’ এবং ‘অভিযান’এ পরিচালক পরমব্রত সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। ‘‘আমাদের স্বভাব হল, যতক্ষণ না বাইরে থেকে কেউ স্বীকৃতি পায়, এখানে তাকে পাত্তা দেওয়া হয় না। এটাই বাঙালির হীনমন্যতা,’’ মন্তব্য পরমব্রতর।

প্রথম কাজ ‘হাফ চকলেট’
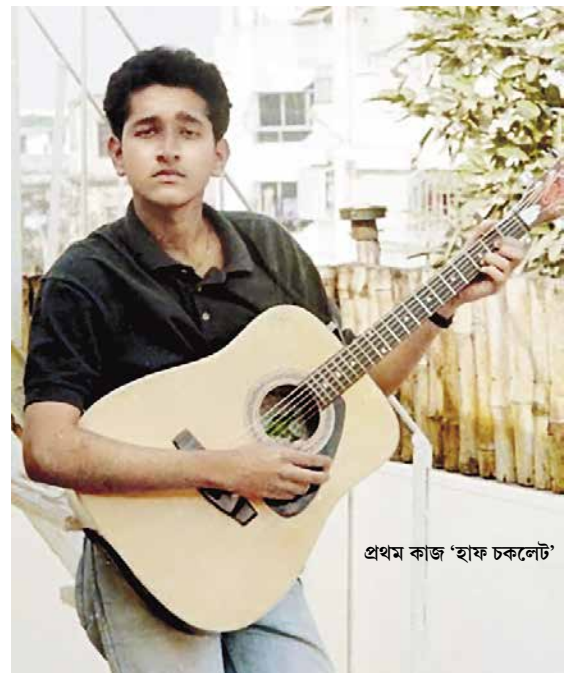
'দ্বিতীয় পুরুষ' ছবিতে রাইমা ও পরমব্রত

পরমব্রত সব সময়েই তাঁর প্রেমকাহিনির জন্য চর্চিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছাত্রী মহলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন

মা-বাবাই তৈরি করে দিয়েছেন তাঁর মনন

অভিনেতা হিসেবে তিনি সমাদৃত হলেও, পরমব্রত কোনও দিন অভিনয় করতে চাননি। সবটাই শুরু হয়েছিল ছেলেখেলার স্তরে। মা সুনেত্রা ঘটক, বাবা সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়— দু'জনেই সাংবাদিক, চিত্র সমালোচক। তাই ফিল্মি দুনিয়ার লোকজনের সঙ্গে পরিচিতিটা ছোটবেলাতেই হয়ে গিয়েছিল পরমব্রতর। কোন সময়ে মনে হল অভিনয়ই করতে চান? ''সচেতন ভাবে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিইনি। যেমন চলছিল 'হাফ চকলেট', 'মানসী', 'শেষকৃত্য', 'চেনা মুখের সারি', 'অন্তরালে'... কলেজ করতে করতে এই সব করছিলাম। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' করার পরে মনে হল শুধু পকেটমানির জন্য কাজ না করে, একটু সিরিয়াস হওয়া যাক।'' বাড়ি থেকে উৎসাহই পেয়েছিলেন। বয়স কুড়ির গণ্ডি পেরোনোর আগেই বেশ কিছু সিরিয়াল, টেলিফিল্ম করা হয়ে গিয়েছিল পরমব্রতর। তার মাঝেই তাল কাটল। বাবাকে হারালেন। ''যদি খুব সৎ ভাবে উত্তর দিই, আমার সিরিয়াল করাটা মা-কে সাহায্য করেছিল। এই নয় যে, মা একা চালাতে পারতেন না। কিন্তু আমার নিজের খরচ, শখ-আহ্লাদগুলো আমি চালিয়ে নিতাম।''

বাবা-মা দু'জনেই চাকরিরত হলে বাচ্চাদের যে টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, পরমব্রতও তার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। দোলনা স্কুলে পড়তেন, সেখানকার ক্রেশে থাকতেন। ছোটবেলার অনেকটা সময়েই দিদার বাড়িতে কেটেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর ছোটবেলা ভীষণ ভাবে বাবা-মা কেন্দ্রিক ছিল। বলছিলেন, ''আমি যে মা-বাবার স্ট্রাগলের অংশ হয়ে যাচ্ছি, সেটা ওঁরাও বুঝতেন। তাই ছুটির দিনগুলোয় সব খামতি পুষিয়ে দিতেন। যে সময়টুকু আমরা তিনজন একসঙ্গে কাটাতাম, ভীষণ বৈচিত্রপূর্ণ হত। হয়তো গল্পের বই পড়ছি বা স্কুলের পড়া একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি। একসঙ্গে বসে টেলিভিশনে প্রণয় রায়ের 'ওয়ার্ল্ড দিস উইক' দেখছি। বাড়িতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার চলছে, সেটা উপভোগ করতে শেখানো হচ্ছে। নন্দন, গোর্কি সদনে ভাল সিনেমা এলে দেখতে যাওয়া। আর বইমেলা যাওয়া তো মাস্ট ছিল। হয়তো কম সময় দিতেন, কিন্তু যেটা দিতেন তা আমার আজকের ভিত তৈরি করে দিয়েছে।''

কাঁকুলিয়ার বাড়ির উল্টো দিকের একফালি মাঠে তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল বস্তির ছেলেরা। তারা বাড়িতেও আসত। বসত ক্যারামের আসর। পরমব্রতর কথায়, ''বাবা-মা আপত্তি করেননি। আমি যাতে বখে না যাই, সেটা দেখার দায়িত্ব ওরা নিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের সঙ্গে মেশার স্বাধীনতাটাও দিয়েছিলেন।''

দোলনা, পাঠভবনের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুলের ঘেরাটোপ পেরিয়ে এ বার অন্য রকম স্বাধীনতা। বন্ধুরা যে ক্লাসিকগুলো দেখার কথা বলছে, সেগুলো পরমব্রতর অনেক দিন আগেই দেখা। তাঁর পড়ে ফেলা বইয়ের তালিকাও বয়সের বেড়া মানেনি। পরমব্রত হাসতে হাসতে বলছিলেন, ''কলেজে গিয়ে আমার বই পড়া, সিনেমা দেখা কমে গিয়েছিল। কারণ বন্ধুরা যেগুলো পড়ছে বা দেখছে, সেগুলো আমি অনেক আগেই সেরে ফেলেছি। তখন বেলেল্লাপনা করতে বেশি উৎসাহী ছিলাম!''

মা না বাবা, কে বেশি কাছের ছিলেন? ''বাবাকে হয়তো বেশি কাছে পেতাম না। কিন্তু মানসিক সংযোগ একটা ছিল। গানের প্রতি ভালবাসা আমার বাবার জন্যই তৈরি হয়েছে। তবে মায়ের সঙ্গে অনেক বেশি কানেক্টেড ছিলাম।'' পরমব্রত নামটা রেখেছিলেন তাঁর মা। এমন খটমট নাম নিয়ে স্কুলে বেশ অপ্রস্তুত হতে হয়েছে তাঁকে। কেরিয়ারের যে অন্ধকার সময়টার কথা বলছিলেন তিনি, পরিস্থিতি হয়তো ততটা খারাপ হত না, যদি মাকে না হারাতেন। ২০১৬তে মা-র চলে যাওয়াটা পরমব্রতকে মানসিক ভাবে অনেকটাই একলা করে দিয়েছিল। কারণ তিনি শুধু তাঁর মা ছিলেন না, পরম বন্ধুও ছিলেন।

চর্চিত ও বিতর্কিত প্রেমজীবন

বন্ধুর মতো মা পেয়েছিলেন বলেই হয়তো, তাঁর প্রেমজীবনের 'কাণ্ডকারখানা'র জন্য বাড়িতে 'ধোলাই' খাননি! পরমব্রত সব সময়েই তাঁর প্রেমকাহিনির জন্য চর্চিত থেকেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছাত্রী মহলে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তত দিনে টিভির পর্দা তাঁকে সেলেব্রিটি তকমা দিয়েছে। মেয়েরা টুপটাপ প্রেমে পড়ত। তিনিও ছয় মারার কোনও সুযোগ ছাড়তেন না। সেই সব প্রসঙ্গ তুলতেই অভিনেতার মুখে অনাবিল হাসি।

প্রেমের বাউন্সারও সামলেছেন। চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে পরমব্রত 'পাকা ছেলে'র আখ্যা পেয়েছেন। স্বস্তিকা

ইকার সঙ্গে

'অভিযান' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পরিচালনা

মুখোপাধ্যায়, রাইমা সেনের সঙ্গে সম্পর্ক 'টক অব দ্য টাউন' হয়েছে। বাড়িতে মা কিছু বলতেন না? বকুনি খাননি? ‘‘প্রথম দিকে খেয়েছি। আমি আসলে এত স্ক্যান্ডেলাস প্রেম করেছি যে সেগুলো স্বাভাবিক বকুনির পর্যায়ে পড়ত না। মা তেমন মানুষ ছিলেন না যে তুলকালাম করবেন। খুব সিরিয়াস আলোচনা চলত। জানতে চাইতেন, আমি কী ভাবছি, কী করতে চাই। বলতেন, ‘‘আমার নীতিগত আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বাস্তব দিকগুলো ভেবে সিদ্ধান্ত নেবে।’’ অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রেম করেছেন বলেই হয়তো সেগুলো আরও বেশি চর্চিত হয়েছে। বিদেশি বান্ধবী ইকা শাউটেনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের লম্বা ইনিংস অবাক করেছিল অনেককেই। ইকার সঙ্গে সম্পর্কের পর থেকেই প্রেমজীবন আড়ালে রাখতে পছন্দ করতেন পরমব্রত। হয়তো উল্টো দিকের মানুষটা তারকাবৃত্তের বাইরে বলেই। ইকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কে ছেদ পড়েছে। দু'জনের রাস্তা আলাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে মুখ খোলেননি পরমব্রত। যেমন মুখ খোলেননি সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে তৈরি হওয়া 'গসিপ' প্রসঙ্গেও। পরমব্রতর কথায়, ‘‘২০১০-'১১ সালের পর থেকে আমার ব্যক্তিগত জীবন আড়ালেই রেখেছি। এখনও সেটাই করতে চাই। এটা প্রকাশ্যে আনার বিষয় নয়। সোশ্যাল মিডিয়া, পিডিএ-তে বিশ্বাস করি না আমি।’’ তাঁর কাছে প্রেমের সংজ্ঞা কী? ‘‘যে বয়সে আমি এখন পৌঁছেছি, সেখানে প্রেম মানে শান্তি। সেটা না হলে, প্রেম করার মানে হয় না।’’ তাঁর কথায় কি কোনও ইঙ্গিত ছিল? হাসির আড়ালে এড়িয়ে গেলেন প্রসঙ্গটা। সেটল করার কথা ভেবেছেন? ‘‘যা হওয়ার বছর খানেকের মধ্যে হবে।’’ এই 'বছর খানেক' কথাটা অবশ্য সকলে অনেক বছর ধরেই শুনছেন।

অভিনেতা না পরিচালক পরমব্রত?

তাঁর আসল আগ্রহ ছিল পরিচালনাতে। সেই কারণেই ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি গিয়ে ফিল্ম অ্যান্ড টিভি প্রোডাকশন নিয়ে মাস্টার্স করেছিলেন। তবে পরিচালক পরমব্রতর জার্নি শুরু হতে সময় লেগেছিল। তাঁর কথায়, ‘‘অভিনেতা হিসেবে আমি দ্রুত পরিণত হয়েছি। অভিনেতা সত্তা আমাকে সাফল্য, পরিচিতি, অর্থ দিয়েছে।

অভিনয়ের মতো পরিচালনাও প্র্যাকটিসের ব্যাপার। 'অভিযান' থেকে বুঝেছি, আই অ্যাম ভেরি গুড ইন হ্যান্ডলিং পারফরমেন্সেস

'পরি'তে কাজ করেছেন অনুষ্কা শর্মার বিপরীতে

বিদ্যা বালনের সঙ্গে কাজ করেছেন 'কহানি' ছবিতে

রবিনা টন্ডন, রোহন সিপ্পি ও পরমব্রত

আমার জীবনে দুটো ওয়াটারশেড মোমেন্ট। বিদেশে পড়াশোনা করতে চলে যাওয়া ও মুম্বইয়ে কাজ শুরু করা

কিন্তু পরিচালক হিসেবে আমার পরিণত হতে বেশি সময় লেগেছে।'' ২০১১ সালে তাঁর প্রথম পরিচালনা 'জিও কাকা' নিয়ে চর্চা হয়েছিল। 'হাওয়া বদল' বাণিজ্যিক ভাবে সফল হলেও, সেটি মৌলিক কাহিনি ছিল না। 'লড়াই' চূড়ান্ত ব্যর্থ। এর পর অনেকটা বিরতি দিয়ে ২০১৮তে 'সোনার পাহাড়'-এর নির্দেশনা দিলেন তিনি। পরিচালক পরমব্রত যে বদলেছেন, তা স্পষ্ট হয়েছিল এই ছবিতে। আরও এক ধাপ এগোলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'অভিযান' দিয়ে। পরমব্রতর কথায়, ''অভিনয়ের মতোই পরিচালনাও প্র্যাকটিসের ব্যাপার। 'অভিযান' থেকে বুঝেছি, আই অ্যাম ভেরি গুড ইন হ্যান্ডলিং পারফরমেন্সেস। চাল দেখে বুঝতে হবে, তা দিয়ে বিরিয়ানি, পোলাও না কি ফেনা ভাত হবে। তেমনই কোনও অভিনেতা কী পারে আর পারে-না, এটা আমি বুঝতে পারি।'' মুম্বইয়ে তিনি কাজ করেছেন কর্ণেশ শর্মা, রোহন সিপ্পি, নিখিল আডবাণী, সুধীর মিশ্রর সঙ্গে। হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে কি পরিচালক-অভিনেতা হিসেবে আরও বেশি পরিণত হলেন? ''আমার জীবনে দুটো ওয়াটারশেড মোমেন্ট আছে। এক, বিদেশে পড়াশোনা করতে চলে যাওয়া। দুই, মুম্বইয়ে কাজ করতে শুরু করা। কমফর্ট জ়োনের বাইরে বেরিয়ে কাজ করা আলাদা আত্মবিশ্বাস দেয়। সেখানে প্রো-অ্যাক্টিভ হতে হয়েছে আমাকে। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ যেমন আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, তেমনই নিজের সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যায়নও আমরা করতে পারি। মুম্বইয়ে কাজ করে এই বদলগুলো আমার মধ্যে হয়েছে। কিন্তু বলিউড আমার সিনেমার সেন্সেবিলিটি বদলায়নি।''

রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ নেই

বদলায়নি তাঁর রাজনৈতিক সেন্সেবিলিটিও। নিজেকে তিনি রাজনৈতিকমনস্ক ব্যক্তি বলেই মনে করেন। কিন্তু দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান না। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি সমর্থন কি দলীয় রাজনীতি নয়? ''আমি রাজনীতি ও ইতিহাস সচেতন মানুষ। আমাদের দেশে বা রাজ্যে অন্ধের মধ্যে ঝাপসা বাছা ছাড়া উপায় থাকে না। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমার মনে হয়েছিল, একটা পক্ষ নেওয়া দরকার। আমি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বিরোধী। তাদের আটকানোর জন্য তৃণমূলকে বেছেছিলাম। কারণ আর কোনও অপশন আমার চোখে পড়েনি। তার মানে আমি তৃণমূল হয়ে যাইনি। অনেক ইসুতেই শাসকদলের বিরোধিতা করেছি। দরকার পড়লে ফের করব।'' জোর দিয়ে বললেন, তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেখা যাবে না। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে তিনি লালায়িত নন। তাঁর পছন্দ শুটিং ফ্লোরের নেতাগিরি। ''আমি আমার স্বাধীন মতামত হারাতে চাই না। আমি চাই না, আমার পাশে চারজন বাউন্সার এলএমজি নিয়ে ঘুরুক। এগুলো আমাকে কিক দেয় না,'' অকপট পরমব্রত। পারিবারিক সূত্রে তিনি ঋত্বিক ঘটক, মহাশ্বেতা দেবীর আত্মীয়। বাড়িতে বামমনস্ক রাজনীতির আবহাওয়াই ছিল। কিন্তু কলেজ জীবনেও পরমব্রত সরাসরি রাজনীতি করেননি। শাসকদলের কাছকাছি থাকলে কিছু সুবিধে পাওয়া যায়। তিনি আগামী বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান হবেন, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। ''কী হবে বলুন তো কিফের চেয়ারম্যান হয়ে? যাঁরা এগুলো বলছেন, তাঁরা হয়তো জানেন না, এই উৎসবের সঙ্গে আমার গত পঁচিশ বছরের সম্পর্ক। বাবা-মায়ের হাত ধরে নন্দনে যেতাম আমি। আর সুবিধেটাই বা কী নেব? কাজের ক্ষেত্রে কোথাও আটকালে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেই তো ফোন করব না কি,'' তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনা। এক সময়ের বন্ধু রুদ্রনীল ঘোষ এখন বিজেপি সদস্য। জানালেন, ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও এখনও তিনি রুদ্রনীলকে বন্ধুই ভাবেন। কোনও কট্টর বিজেপি সমর্থককে নিজের ছবিতে নেবেন? ''প্রয়োজন পড়লে নিশ্চয়ই নেব। কাজের জায়গায় সকলে সমমনস্ক হবেন, এমনটা আশা করা যায় না। কিন্তু আমার যে নিজস্ব বৃত্ত, যেখানে আমি মন খুলে কথা বলি, সেখানে তাঁরা কোনও দিন প্রবেশ করবেন না।''

অভিনীত পছন্দের চরিত্র—

'হেমলক সোসাইটি'র আনন্দ কর
'চতুষ্কোণ'-এর জয়ব্রত
'হারকিউলিস'-এর হারু
'সিনেমাওয়ালা'র প্রকাশ
'সমান্তরাল'-এর সুজন
'পরি'র অর্ণব

আগামীর লক্ষ্য

পরমব্রত মনে করেন, কেরিয়ারের ব্যাডপ্যাচটা তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল। নয়তো বদ্ধ গণ্ডি থেকে বেরোতে পারতেন না। পাশাপাশি তিনি এটাও জানেন যে, তাঁকে নিয়ে এখনও চর্চা চলে। তবে তার ধরন বদলেছে। ''এখন বলা হয়, 'ও এত কিছু করবে কেন?' কারা আমার নামে বলে, আমি জানি। কিন্তু সেগুলো ঝেড়ে ফেলি। তাদের যেমন কিছু খামতি আছে, আমারও আছে। আমিও তাদের বিচার করি, তারাও আমাকে করে। কোথাও দেখা হলে গল্প করি। ভালও লাগে, কারণ এদের সঙ্গেই তো আমার বড় হওয়া।'' এটাও স্পষ্ট করে দিলেন, সে অর্থে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর ঘনিষ্ঠবন্ধু কেউ নেই। সকলেই পরিচিত মাত্র। অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনা নিয়ে ২০২১-'২২ যে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তাঁর কেটেছে, চান আগামী দিনেও যেন ততটাই চাপ থাকে। আসলে 'চাপ'টা তিনি উপভোগ করছেন। তার সঙ্গে সযত্নে লালন করে চলেছেন নিজের ভিতরকার উদাসীনসত্তাটা। ওটাই পরমব্রতকে মনে করিয়ে দেয় তাঁর আগামীর ব্রত।

অন্য কিন্নরের কথা

কখনও মেঘ-বরফের খেলা, কখনও আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বরফের ফুল। দুধসাদা জমিতে যেন রোদ-অভ্র। রূপোর মোড়কে গাছ। ঘন নীল আকাশ ছুঁয়ে বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে পাইনের বন। সাদা ক্যানভাসে আমরা যেন লাল-নীল-হলুদ কয়েক ফোঁটা রং... লিখছেন **সায়ন্তনী ভট্টাচার্য**

দিদুর খাটের তলায় একটা লোহার ট্রাঙ্ক ছিল। বেশ অনেক পুরনো, রহস্যময় গন্ধমাখা। হাতে সেলাই করা আসন, নানা রঙের উল, কাঁটা, সুতো... আরও এটা-ওটা। আর সেই সঙ্গে কতকগুলো বই। তাতে ছিল— কাতিউশা।

খুব ছোটবেলার আবছা স্মৃতি। সময়ের ফেলে যাওয়া সব ধুলোময়লা দু'হাতে সরিয়ে যেটুকু মনে পড়ে, কাতিউশা একটি বাচ্চা মেয়ে। সোভিয়েত দেশের মেয়ে। গোলাপের পাপড়ির মতো লাল তার গায়ের রং। পরনে সাদা-লাল টিউনিক ফ্রক, পায়ে কালো জুতো। মাথায় একটা কালো টুপি। তার ফাঁক দিয়ে বয়ে গিয়েছে সোনালি ঢেউ খেলানো চুল। হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আকাশ থেকে তার মুখে-গায়ে-মাথায় ঝরে পড়ছে 'বরফের ফুল'। আমার জন্মের আগের বেরোত তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার ওই পত্রিকা। নাম ছিল সোভিয়েত নারী। ছোটবেলায় যত বার মামার বাড়ি যেতাম, একই বই বারবার নেড়েঘেঁটে দেখতাম। চোখ বুজে কল্পনা করতাম, কেমন হত যদি...

রোজ একটু একটু করে স্বপ্নগুলোকে জুড়েছি/ যেখানে যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল/ রোজ একটু একটু করে বড় হয়েছে ওরা/ একদিন হঠাৎ, সত্যি হয়ে গিয়েছে ওরা...

কাট টু— ২০২২ সাল। আমি এখন তিরিশের তরুণী। বেশ অনেক বছর চাকরি করছি। ঘুরতে ভালবাসি। সময় সুযোগ পেলেই বেরিয়ে

পড়ি। পাহাড় আমার সবচেয়ে প্রিয়। পাহাড়ে যাওয়া মানে যেন ঘরে ফেরা। এ অনুভূতি বলে বোঝানোর মতো নয়। তবে এতবার যাওয়া হলেও কাতিউশার মতো করে বরফ দেখা হয়নি। রাস্তার ধারে বরফ জমে থাকতে দেখেছি, বরফের চাঁই দেখেছি। ট্রেকিংয়ের সৌজন্যে গ্লেসিয়ার বা বরফের নদীর উপর দিয়েও হেঁটেছি। পর্বতের বরফে ঢাকা পাস ক্রস করেছি। কিন্তু কাতিউশার মতো বরফের বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি।

মনে আছে, গত বছর জুলাই মাসে অন্য একটি ট্রেকে হিমাচলে গিয়েছিলাম। রাত নেমেছিল। কিচেন টেন্টের উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে ট্রেকাররা। গান-গল্প-আড্ডা চলছে। আক্ষেপ করে সেখানে এই কথাটাই বলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঋতম (ট্রেকিংয়ের বন্ধু) বলেছিল, সামনের শীতে চলে যাও কুফরি ট্রেক। বরফ দেখার সব সাধ মিটবে। সঙ্গে কিছু ছবি দেখিয়েছিল। সত্যি, দ্বিতীয় বার ভাবিনি। স্থির করে ফেলি, পরবর্তী গন্তব্য এটাই।

কুফরি মানে শিমলার কাছে যে কুফরি আছে, তা কিন্তু নয়। কুফরি বললে মূলত ওই জায়গার কথাই সকলে ভাবে, বেশ জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট। এই ট্রেক হল কুফরি-মুলিং ভ্যালি। পুরোপুরি অন্য জায়গা। হিমাচল প্রদেশের কুলু ও মানালির মাঝে রাইসন নামে এক ছোট্ট জনপদ। এই রাইসন থেকে কিছুটা উপরে উঠলে শুরু হয় কুফরি ভ্যালির পথ।

ট্রেকিংয়ের প্রথম দিন। বরফ পড়ছে, তার মধ্য দিয়ে কুফরির পথে

রাইসনকে বলা হয় কুলু ভ্যালির কিন্নর (স্থানীয় উচ্চারণে কিন্নৌর)। কারণ, একে তো এর স্বর্গীয় সৌন্দর্য। সেই সঙ্গে কিন্নরের বহু মানুষের বাস এখানে। অতীতে এক সময়ে কিন্নর থেকে অনেকে চলে এসেছিলেন রাইসনে। এই শহরের ধার দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিয়াস। নাম না জানা এই শহরে তেমন পর্যটকের ভিড় নেই। চারপাশের সকলেই প্রায় স্থানীয় মানুষ। সদা হাস্যময়। কারও মুখে তেমন দুঃখ-কষ্ট কিংবা চিন্তার ছাপ দেখিনি। অল্পই চাহিদা, যার যা আছে, তাতেই সবাই খুশি। এখানে চারপাশে আপেল, নাসপাতি, পিচ ও অন্যান্য ফলের বাগান। তার মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি। কারও কারও বাগানে সাদা টেবিল-চেয়ার সাজানো। আর যে দিকে চোখ যায়, যে কোনও দিকে... যেন বিশাল সিনেমা হলের পর্দা জুড়ে হিমালয়। সবুজ পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘ ভাসছে। আরও উপরে তাকালে ক্রমশ সফেদ হয়েছে রং। শ্বেতশুভ্র রুপোর মুকুট পরে দাঁড়িয়ে হিমালয়। তাতে সোনা রোদ পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।
''ওই যে, ওখান থেকে শুরু হবে ট্রেক,'' আঙুল তুলে দেখালেন বুদ্ধিজি। ঠিক কোথায় যে দেখালেন, বুঝতে পারিনি। শুধু দু'চোখ মুগ্ধ হয়ে আটকে ছিল কোনও এক অজানা ঠিকানায়। বুদ্ধিজি আমাদের স্থানীয় গাইড। ওঁর বাড়ি এই রাইসনেই। এক দিন ওঁর বাড়িতে থেকে, আশপাশটা ঘুরে অ্যাক্লাইমেটাইজ়েশন। পরের দিন শুরু অভিযান। এই ফাঁকে বলি, আমার ট্রেকিং দলের ক্যাপ্টেন কিংশুক চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার একটি ট্রেকিং সংস্থার সর্বেসর্বা। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র কিংশুকের নেতৃত্বে এই ট্রেকিং। সঙ্গে কলকাতার আর এক পর্বতারোহী অতনু পাঠক ও স্থানীয় গাইড বুদ্ধি সিংহ নেগি। আমাদের ট্রেকিং দলে ছিল তিনটি মেয়ে— শুচিস্মিতা, রেজিনা ও আমি। ছেলেদের মধ্যে সৌরভ, অনির্বাণ, রামাদিত্য ও অর্পণ। ছোট দল। কোভিডের জন্য শেষ মুহূর্তে বেশ কয়েক জন আসতে পারেনি।

ট্রেকিংয়ের জুতো এমনিতেই বেশ বড়সড়। তা-ও পা ফেলতেই প্রায় পুরোটা ঢুকে যাচ্ছিল বরফে।

২০২২ সালের ২২ জানুয়ারি সকাল সকাল ট্রেকিং শুরু। আগের রাতেই গোছগাছ শেষ করে রাখা ছিল। রাইসনে শূন্যর নীচে তাপমাত্রা। বাসিন্দারা জানান, দিন কয়েক আগে বরফ পড়েছে। আমরা অবশ্য পাইনি। কিন্তু যেখানে যাব, সেখানে তাপমাত্রা মাইনাসের অনেক নীচে থাকবে। গাইডরা কলকাতাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক মানে, অনেক। এই ট্রেকিংয়ে উচ্চতা খুব বেশি নয়। সর্বোচ্চ উচ্চতা মুলিংয়ের, ৯ হাজার ফুট। কিন্তু আসল প্রতিকূলতা হল তাপমাত্রা। মাইনাসের অনেক নীচে থাকবে পারদ। অতএব বলে দেওয়া হয়েছিল, হাইপোথার্মিয়া থাকলে একেবারে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যে এ রকম হবে, তা গাইডরাও বুঝতে পারেননি! যা হোক, শুরু হল অভিযান।
সে দিন সকাল থেকে বৃষ্টি। কনকনে ঠান্ডায় আরও হাড়কাঁপানো দশা। তবে দু'তিন স্তর গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে, তার উপর ফেদার জ্যাকেট পরে আর তেমন ঠান্ডা লাগছিল না। পায়ে উলের মোজা। হাতে গ্লাভস। উত্তেজনায় ফুটছিলাম আমরা। রাইসন থেকে দুটো গাড়িতে তোলা হল আমাদের রুকস্যাকগুলি। পাহাড়ের গা জড়িয়ে ওঠা আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা দিয়ে বেশ অনেকটা উপরে উঠবে গাড়ি। তার পর সেখান থেকে হাঁটা শুরু হবে। গন্তব্য আরও উপরের পাহাড়। গাইডরা জানালেন, নীচে বৃষ্টি হচ্ছে মানে উপরে বরফ পড়ছে।

কুফরি ভ্যালির সেই কাঠের বাড়ি। এর পাশেই আমাদের টেন্ট ফেলা হয়েছিল

বরফের মধ্যে শীতকালের ট্রেক মানেই কিন্তু বরফ পড়া দেখতে পাওয়া যাবে, এমন নয়। এটা অনেকটা এ রকম, বর্ষাকাল মানেই রোজ বৃষ্টি হবে, তা তো নয়। তবে সম্ভাবনা বেশি। ফলে আশা-আকঙ্ক্ষার দোলাচলে আলো দেখালেন গাইডরা। গাড়ি চলতে শুরু করল মেঘ ভেঙে। জানালার কাচে চোখে আটকে যায়, বাইরে অপার সৌন্দর্য, যা ভাষায় কখনও প্রকাশ করতে পারব না। এখনও স্বপ্নের মতো চোখে লেগে...

গাড়ি থেকে যেখানে নামলাম, সেখানেও বৃষ্টি হচ্ছে। এ বার ফাইনালি তৈরি হওয়ার পালা। যে যার পিঠে চাপিয়ে নিলাম রুকস্যাক। তার সঙ্গে আটকানো হল টেন্ট ম্যাট। স্লিপিং ব্যাগ যে যারটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। জলের বোতল মোটামুটি হাতের কাছে। হাতে ট্রেক পোল। তিন জন পোর্টার ছিলেন দলে। টেন্ট, আগামী চার দিনের খাওয়ার রসদ, রান্নার জ্বালানি, এ সব তাঁদের পিঠে।

শুরু হল পথ চলা। পাহাড়, তার গা জড়িয়ে জঙ্গল, তার মাঝে সরু পথ। ঝরা পাতায় ঢাকা। বৃষ্টিতে বেশ পিচ্ছিল। ফলে সাবধানে পা ফেলে উঠতে শুরু করলাম আমরা। এখন পুরো রাস্তাটাই চড়াই। তবে উচ্চতা খুব বেশি নয়। ফলে শ্বাস নিতে তেমন কষ্ট নেই। প্রকৃতি ও চারপাশের শোভা দেখতে দেখতে হাঁটা। কেউ একটু এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে। এক-দু'জন গান ধরল।

এক-এক জায়গায় এসে রাস্তা একটু চওড়া হচ্ছে, ফের সরু। একটা-দুটো বাড়ি এখনও চোখে পড়ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, কোনও এক গাঁয়ের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা। জনবসতি এ বার শেষ হওয়ার পালা। তার পর শুধু আদিম পাহাড় আর জঙ্গল।

এক জায়গায় হঠাৎ গায়ে এসে পড়ল একটা সাদা ফুল। তার পর আর একটা। তার পর আবার, এক মুঠো ফুল কেউ আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড় যেন স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, অসংখ্য 'বরফের ফুল'!

আনন্দে বাচ্চাদের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, "বরফ পড়ছে, স্নোফল।" বরফের ফুলগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে। যেন একটা স্নো গ্লোবের ভিতরে ঢুকে পড়েছি আমরা। আর তার পর গ্লোবটাকে কেউ খুব করে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। চারপাশে, আকাশে-বাতাসে ভাসছে 'স্নোফ্লেকস'।

যত এগোচ্ছি, তত বেশি। গোড়ায় রাস্তার ধারে ধারে জমেছিল বরফ। তার পর ক্রমশ সব সাদা। হাওয়ার গতিবেগ বাড়তে থাকল, সঙ্গে তুষারপাত-ও।

এ বারে আর রাস্তার ধারে শুধু বরফ নয়, গোটা পথটাই বরফে ঢাকা। ট্রেকিংয়ের জুতো এমনিতেই বেশ বড়সড়। তা-ও পা ফেলতেই প্রায় পুরোটা ঢুকে যাচ্ছিল বরফে। প্রথমে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। বরফের নীচে কোথায় পা পড়ছে, সেটা উঁচু-নিচু কেমন বোঝার উপায় নেই। আন্দাজে পা ফেলা। ওই কারণে হাঁটার পদ্ধতিটা এমন— প্রথমে ট্রেক পোল বরফে গাঁথতে হবে। তার পর সামনের পা ঠিক জায়গায় পড়েছে কি না বুঝে নিয়ে, পিছনের পা সামনের দিকে এগোনো। ক্রমশ ব্যাপারটা অভ্যেস হয়ে গেল।

এক-একটা জায়গায় একেবারে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে হাঁটা। একেবারে সরু চলার পথ। বাঁ দিকে পাহাড়ের ঢাল, যার গা ঘেঁষে যাচ্ছি আমরা। আর ডান দিকে খাদের মতো অতলে নেমে গিয়েছে পাহাড়। বরফ আর বরফ। পিছনে এক জন হড়কে পড়ল। তবে নীচে পড়েনি। কিংশুক সতর্ক করল, সাবধান! নীচে পড়লে হয়তো বড় চোট লাগবে না। কিন্তু বরফের স্তূপে পড়লে সেখান থেকে উপরে ওঠা আরও কষ্টের। তা ছাড়া বরফের নীচে ডালপালা ধারালো হয়ে থাকলে তাতেও রক্তারক্তি হতে পারে। ফলে এমন ঢালগুলো সাবধানে পার করতে হবে।

হাঁটার শুরুতে অনেকে গান ধরেছিল, সেটা এখন নেই। একটু জোরে শ্বাস পড়ছে সকলের। প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটার একটা ধকল থাকে। গা গরম হয়ে যায় তাতে। এক-এক জায়গায় খুব খাড়াই পাহাড়। তবে ক্লান্তি এলেও থামা যাবে না। ট্রেকিংয়ের এটাই নিয়ম। থেমে গেলেই শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করবে। এক মিনিট দাঁড়াও, অল্প জল খাও, আবার হাঁটতে থাকো...

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এত কষ্ট করে কেন যাওয়া! এই বিষয়টা তাঁদের কাছে যতটা বিস্ময়ের, আমাদের মতো পাহাড়প্রেমী মানুষের কাছে পাহাড়ে না-যাওয়াটাও ততটাই বিস্ময়ের। যাঁরা যায়, সকলেই শারীরিক ভাবে দারুণ ফিট, এমনও নয়। কারও কোমরে অস্ত্রোপচার হয়েছে, কারও হৃদ্‌যন্ত্র কিছুটা কমজোরি, কারও পায়ের হাড় ভাঙা। কিন্তু মনের জোর অদম্য। আর নিয়মিত শারীরিক কসরত, যোগব্যায়াম, সাঁতার... এমন চর্চাগুলো সকলেই প্রায় করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাড়তি বিপদ ঋতুস্রাব। তাকে সঙ্গী করেও হাঁটতে হয় কখনও। কিন্তু সেই সব কষ্ট গায়ে লাগে না। পাহাড় ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাটা এমনই।

সে দিন আমরা যত এগোচ্ছিলাম, বরফ পড়া ক্রমশ বাড়ছিল। বরফের ফুল আর নেই, মাঝে মাঝে বরফের গোলা পড়ছে। কিছু জায়গায় হাঁটু অবধি বরফে ঢুকে যাচ্ছে। এ বারে বুঝতে পারছিলাম,

বরফের মধ্যে দিয়ে গন্তব্যের পথে
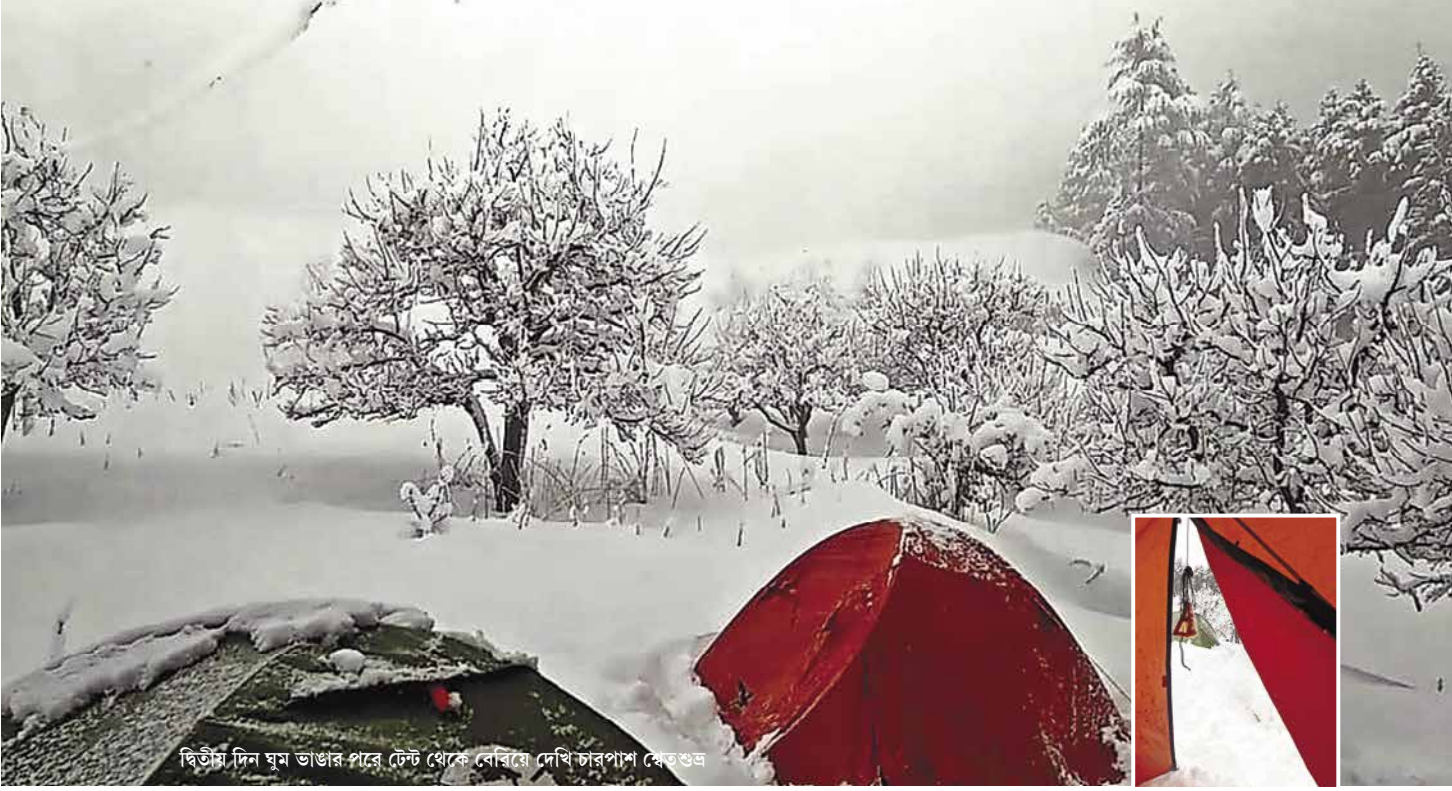
দ্বিতীয় দিন ঘুম ভাঙার পরে টেন্ট থেকে বেরিয়ে দেখি চারপাশ শ্বেতশুভ্র

উপরের বরফের চাপে নীচের বরফস্তর জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের পা যে অবধি ঢুকছে, তারও নীচে অনেকটা বরফ। মাঝেমধ্যেই কেউ না কেউ পড়ে যাচ্ছিলাম, টাল সামলাতে না পেরে। তবে ঝুরো বালির মতো বরফে ব্যথা লাগছিল না। মাথার টুপির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা চুলে বরফ জমছিল। ছেলেদের গোঁফে বরফকুচি।
এক জায়গায় এসে পাইন, দেবদারুর জঙ্গল শেষ হল। সামনে অনেকটা ফাঁকা উপত্যকা, যেন বরফের নদী। উঁচু-নিচু ঢাল, তাতে আপেল গাছ। গাইডরা জানালেন, এটা আপেল বাগান। যদিও বোঝার উপায় নেই। গাছে পাতা নেই, ফল নেই। শুধু শুকনো ডালপালা হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে। তাতে এখন বরফের ফুল-পাতা। যেন রুপোর মোড়কে গা ঢেকেছে তারা।
চারপাশের ছবিটা এখন সাদা-কালো। মাঝে বিন্দু বিন্দু রং নিয়ে আমরা। লাল-নীল জ্যাকেট, রঙিন রুকস্যাক... বিশাল সাদা ক্যানভাসে কয়েক বিন্দু রঙের ছিটে।
পাঁচ ঘণ্টারও বেশি হাঁটা হয়ে গিয়েছে আমাদের। সেই যে বরফ পড়া শুরু হয়েছে, থামেনি। এ বারে ঝড়ের মতো শুরু হল। চোখে-মুখে এসে বরফ এমন ভাবে পড়ছে, দেখতেও অসুবিধা হচ্ছে। মেঘলা, আধো অন্ধকার। শোঁ শোঁ আওয়াজ করে হাওয়া বইছে। হাঁটা আরও কঠিন হল। এবং প্রায় কোমরের কাছাকাছি বরফ। সামনে আমাদের পোর্টার ও গাইডরা বরফ ভেঙে রাস্তা করে দিল। সেই পথ ধরে এগোলাম আমরা।
দূরে একটা কাঠের বাড়ি দেখা গেল। ঠিক হল ওর পাশে টেন্ট হবে। ফাঁকা জায়গায় টেন্ট করা সম্ভব নয়। তুষারঝড় হচ্ছে, যাকে বলে ব্লিজ়ার্ড। টেন্ট উড়ে যাবে। ফলে একটা আড়াল চাই। বাড়িটা অবধি পৌঁছতে আরও আধঘণ্টা লেগেছিল। গিয়ে দেখি, পোর্টাররা আগুন জ্বালিয়েছেন। প্রথম কাজ আগুনের চারপাশে বসে পড়া। জুতো-মোজা সব ভিজে। আগুনের পাশে রেখে সেগুলোকে শুকানো। ব্যাগ থেকে বার করে শুকনো উলের মোজা পরে নিলাম সকলেই। একসঙ্গে দু'জোড়া।
আগুনের পাশ থেকে এক মুহূর্ত সরার উপায় ছিল না। রাঁধুনি ভাইয়েরা এসে চা দিলেন। সেটা গলায় পড়তে কিছুটা আরাম। যে

আপেল গাছে পাতা নেই, ফল নেই। শুধু শুকনো ডালপালা হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে। তাতে এখন বরফের ফুল-পাতা।

কাঠের বাড়ির কথা বললাম, সেটা বন্ধ। শীতকালে এই অঞ্চলে জনমনিষ্যি থাকতে পারে না। অগত্যা বাড়ির সামনের ছাওয়াটায় আমরা আস্তানা নিলাম। বাইরে কিচেন টেন্ট খাটানোর কোনও উপায় নেই। ওই ছাওয়ার নীচেই রান্নার ব্যবস্থা হল। পাশে আগুন জ্বেলে বসলাম। বাইরে ঝড় ক্রমেই বাড়ছে।
রাতে শোয়ার জন্য ওই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই টেন্ট খাটানো শুরু হল। বরফের বিছানায় শোয়া। বরফ পিটিয়ে পিটিয়ে যতটা সম্ভব প্লেন করা যায়। জায়গাটা সমান করে তার উপর টেন্ট ফেলা হল। শোয়া হবে ম্যাটের উপর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে। ঘোরের মতো লাগছিল। এমন পৃথিবী কখনও দেখিনি!
এ বারে এক আগন্তুকের আবির্ভাব। যে কোনও পাহাড়ি ট্রেকে মানুষের সঙ্গী হয়ে যায় কোনও না কোনও কুকুর। একেবারে দুর্গম পথ না হলে তারা সব সময়ের সঙ্গী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়। কিন্তু গত চার-পাঁচ ঘণ্টায় কোনও সারমেয় চোখে পড়েনি। বরফের উপর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে হঠাৎ এক জন উপস্থিত। বড়সড় চেহারা, লোমে ঢাকা। চারপায়ে হাঁটে বলে বরফে ঢুকে যায়নি। না হলে চারপাশে এখন ৪-৫ ফুট বরফ। আমাদের দেখে সে কী উৎফুল্ল! বাঙালি ট্রেকিং দল, নামকরণও বাংলায় হল। ভোলা। পরের ক'টা দিনের সঙ্গী হয়ে গেল সে। পুরো ট্রেকিংয়েই ভোলা সঙ্গে ছিল আমাদের।
সন্ধেবেলায় চাউমিন হল। তার আগে ফলও দেওয়া হয়েছিল। চা আসছে বারবার। রাতে হল গরম খিচুড়ি। আগুন জ্বেলে শুরু হল গান-বাজনা। স্থানীয় হিমাচলি গাইড শোনালেন গা ছমছমে পাহাড়ের পরিদের গল্প। আমাদের সাবধান করা হল, রাতে টেন্ট থেকে যেন
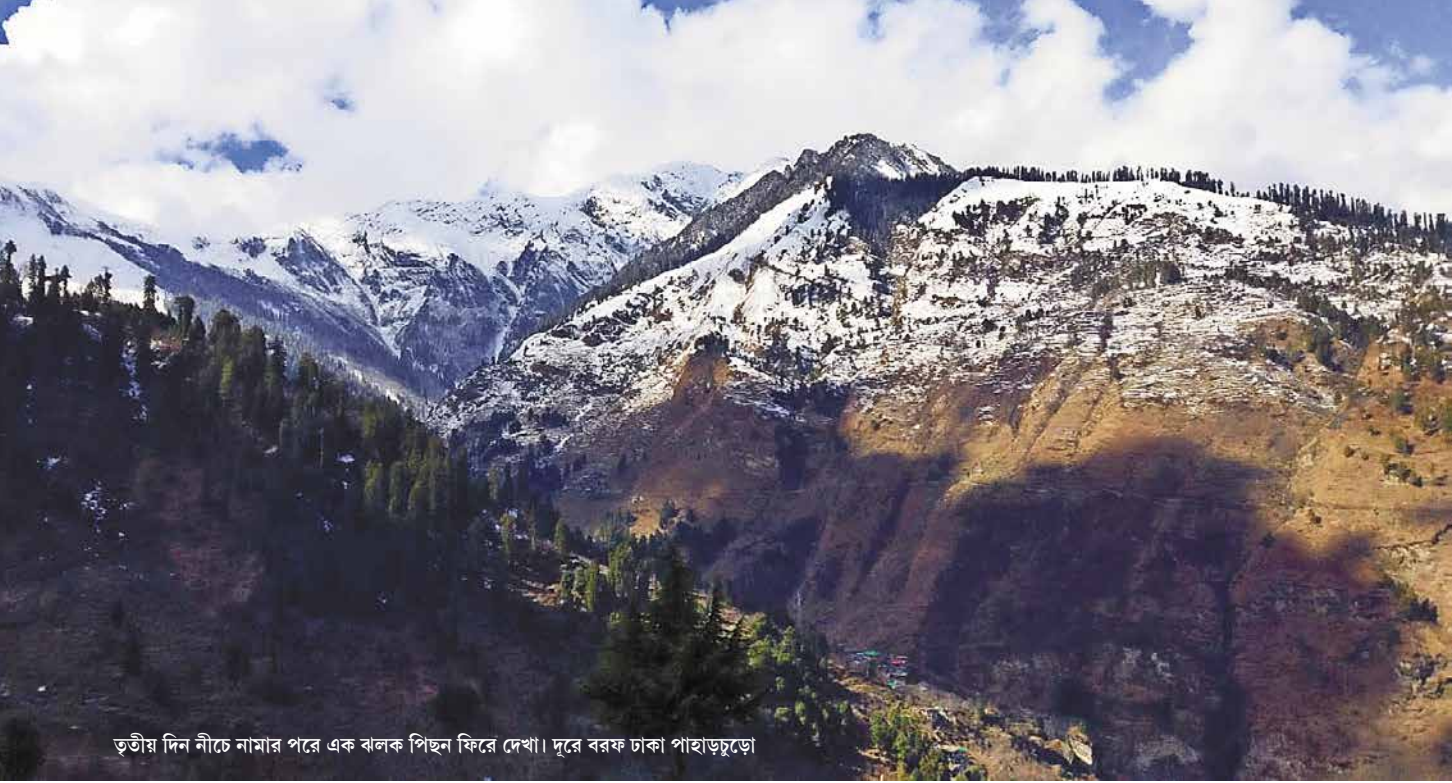
তৃতীয় দিন নীচে নামার পরে এক ঝলক পিছন ফিরে দেখা। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়চুড়ো

কেউ একা না বেরোই। জিন-পরি না এলেও এই এলাকা ভালুকের! ঝড় থামেনি। রাত সাড়ে আটটা। অর্পণ জানাল, তাপমাত্রা মাইনাস ২২। টেন্টে ঢুকে পড়তে বললেন গাইডরা। সেই সঙ্গে নির্দেশ, সারা রাত মাঝেমাঝে টেন্ট ঝাড়তে হবে। না হলে বরফ বেশি জমে গেলে টেন্ট ভেঙে পড়তে পারে। আমি, শুচি আর রেজিনাদি এক টেন্টে। শুচি সবচেয়ে ছোট। আমি আর রেজিনাদি স্থির করলাম, দু'জনে পালা করে টেন্ট ঝাড়ব। এমনিতেও ঘুম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সারা রাত মাঝেমাঝে ডেকে গেল ভোলা। অনেক মানুষ আধো ঘুমে, কিন্তু কান সতর্ক।

সকালের দিকে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। রেজিনাদি ডাকতেই উঠে পড়লাম। বাইরে তখনও নাগাড়ে বরফ পড়ছে। ঝড় আর হচ্ছে না। ১৮ ঘণ্টা একটানা স্নোফল। গাইডদের চোখেমুখে এ বারে একটু দুশ্চিন্তা দেখলাম। বুদ্ধিজি এসে জানালেন, তিনি চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখে এসেছেন। আমাদের আরও উপরে ওঠার কথা, মুলিংয়ে। কিন্তু যাওয়া মুশকিল। বুদ্ধিজি জানালেন, চারপাশে ৬ ফুটের কাছাকাছি বরফ। উপরে অন্তত ১০ ফুট বরফ হবে। ওতে হাঁটা যাবে না। হামাগুড়ি দিয়ে চারপায়ে যাওয়ার মতো করে যেতে হবে। সোজা হাঁটলে স্রেফ বরফে ডুবে যাব সবাই।

তুষার ঝড়ের মধ্যে এগোচ্ছে আমাদের দল

অতএব রুট বদলাতে হবে। কিংশুক-পাঠকদা ঠিক করল, আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাওয়া হবে। কাল পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত। পরের দিনও টানা তুষারপাত। আমরা কয়েক জন আশপাশে বরফের মধ্যে হাঁটতে বেরোলাম। কিছুটা উপরে উঠলাম। রেজিনাদি, রামাদিত্যদা টেন্টের কাছে থাকল। এক-দেড় ঘণ্টা বরফে দাপাদাপি করে আবার যথাস্থানে ফেরা।

শুনেছিলাম, বরফের মধ্যে নাকি বিষাদ আছে। ছবিতে যত সুন্দর, ব্যাপারটা ততটাও নয়। ২৩ তারিখ সন্ধেবেলা তেমনটাই লাগতে শুরু করেছিল। ঝুপঝুপ করে বরফ পড়ার আওয়াজে যেন মনখারাপের সুর। তার পর এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বন্দি হয়ে থাকা। গাইডরা জানালেন, এটা নাকি স্বাভাবিক। পাহাড় দুঃখের, কষ্টেরও। তবুও এক অপার আকর্ষণ।

তবে সবচেয়ে চিন্তার, কালও যদি স্নোফল না থামে! খাবার রসদ ফুরোচ্ছে। কাল এগোতেই হবে কোনও দিকে। দুশ্চিন্তা নিয়ে সকলে এগোল টেন্টের দিকে। দিনের বেলা মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। এখন আবার মাইনাস ২০-২২!

সকালে ঘুম ভাঙতেই টেন্টের বাইরের চেন খুলে উঁকি মারলাম। "রেজিনাদি, রোদ উঠেছে," চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। নীল আকাশ। বরফের গায়ে রোদ-অভ্র। খালি চোখে তাকানোর উপায় নেই। জুতো-মোজা পরে চোখে সানগ্লাস এঁটে বেরিয়ে এলাম টেন্ট থেকে। খুব আনন্দ, আজ আমরা এগোতে পারব। দূরে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণি।

কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি। এমনিতে ট্রেকিংয়ে পাহাড়ি নদী থেকে জল ভরে খাওয়া হয়। এখানে শুধু বরফ। উপরের বরফ সরিয়ে ভিতরের পরিষ্কার বরফ গামলায় ফুটিয়ে সেই জল খাওয়া, রান্নায় ব্যবহার করা হয়। আনাজপাতি,

শেষ দিন ফলের বাগান দিয়ে নামছে দল

চাল, ডাল, ম্যাগি, ডিম এ সব সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শৌচাগার পুরোপুরি প্রাকৃতিক। আমাদের সঙ্গে কোনও টয়লেট টেন্ট ছিল না। অনেক সংস্থা নিয়ে যায়, কিন্তু বিষয়টা অস্বাস্থ্যকর। কারণ একটা টেন্টের ভিতরে গর্ত খুঁড়ে একই জায়গায় সকলের শৌচকর্ম! তার চেয়ে প্রকৃতির আড়ালই ভাল।

আবার অভিযানে ফিরি। বুদ্ধিজি জানালেন, বরফ পড়া থামলেও, রোদ উঠলেও মুলিং আমাদের যাওয়া হবে না। বরফ অনেক, আমরা ডুবে যাব। তা ছাড়া কুফরির এই ট্রেক-রুট বুদ্ধিজি ও কিংশুকের আবিষ্কার। এ পথে অন্য ট্রেকিং দল এখনও আসে না। ফলে বিপদে পড়লে বাঁচানোর জন্য কেউ থাকবে না। অতএব নতুন রুটে হাঁটা। উপরে আর না উঠে মাটিশিলা দিয়ে আমরা নীচে নামব। মাটিশিলায় এক দিন টেন্ট করে সেখান থেকে ফের রাইসনে ফিরব। এ বারে শুধুই অধঃপথে গমন। আবার পাইন-দেবদারুর জঙ্গল শুরু হল। ঢাল বেয়ে নামা। এ সময়ে বেশি সাবধান হতে হয়। কারণ পা মচকানোর ভয় খুব বেশি। আর এ ক্ষেত্রে তো বরফের নীচে কোথায় পা পড়ছে বোঝার উপায় নেই। কিছু জায়গায় কোমর অবধি ঢুকে যাচ্ছে শরীর। আজ চারপাশের শোভা অন্য রকম। সব রং যেন সোনা-রোদে উজ্জ্বল। নীল আকাশের শোভা অবর্ণনীয়। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর বরফ কিছুটা কমে গোড়ালি পর্যন্ত হল। সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে আমাদের দল। ধীরে ধীরে বরফ কমতে লাগল। ক্রমে আরও কম। কেমন যেন ছেড়ে চলে আসার পালা। জঙ্গলও শেষ হবে এ বার। দূরে গ্রাম দেখতে পেলাম। মাঝেমাঝেই পিছন ফিরে দেখছিলাম, কী যেন ফেলে এসেছি!

সৌরভ-অনির্বাণ-অর্পণরা তখন কিছুটা পিছনে। আমরা একটু এগিয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। জঙ্গল শেষ। খুব বোকার মতো শোনাবে, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে একটা লম্বা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরি আমি। বিদায়বেলায় জড়িয়ে ধরা। আমার বিশ্বাস, ও বুঝেছিল। মাটিশিলা পৌঁছেছিলাম আরও এক ঘণ্টা পরে। বাড়িঘর কম, কিন্তু আছে। একটা ফাঁকা জায়গায় পাঁচটা টেন্ট পড়ল। আমরা জিনিসপত্র রেখে হাঁটতে বেরোলাম। সামনেই একটা ঝর্না। সেখানে এসে দাঁড়ালাম। তার পর খাদের ধারে বসলাম সবাই। ভোলা এখনও আমাদের সঙ্গে। সকলেই কিছুটা স্বস্তিতে। এখানে আর বরফ নেই। বরফে পা ফেলতে ফেলতে আঙুলগুলোয় সকলেরই কম-বেশি ব্যথা হয়েছিল। জুতোর বর্ম ভেদ করে জমে যাচ্ছিল হাড়। ফ্রস্ট বাইটের ভয় কাটাতে এ সব ক্ষেত্রে সব সময় পা সচল রাখতে হয়। হাত-পায়ের আঙুল ক্রমাগত নাড়াতে হয়, যাতে গরম থাকে।

এ বারে শুধুই অধঃপথে গমন। ঢাল বেয়ে নামা। এ সময়ে বেশি সাবধান হতে হয়। কারণ পা মচকানোর ভয় খুব বেশি।

বরফ না-পড়ার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি আমাদের। এ বারে বৃষ্টি শুরু হল। ঝুরো বরফ নয়, কাচের মতো বরফ বৃষ্টি। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে স্বচ্ছ বরফের কুচো হয়ে যাচ্ছিল। আবার টেন্টে ঢুকে পড়লাম আমরা। লুডো নিয়ে গিয়েছিল এক জন। খেলা চলল। সেই সঙ্গে আড্ডা-গল্প। গরম গরম পকোড়া এল। পরে স্থানীয় পোর্টাররা পাহাড়ি গান শোনালেন। আনন্দ-হইচইয়ে আরও একটা রাত পেরিয়ে গেল।

চতুর্থ দিন। ২৫ জানুয়ারি। রাইসনে ফেরা। এ দিন অনেকটা হাঁটা। আর বরফ নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পথও অন্য রকম। ফলের বাগানের ভিতর দিয়ে নামব আমরা। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে পথ খুব পিছল। তা-ও আবার ঢাল বেয়ে নামা। খুব সাবধানে এগোতে থাকলাম আমরা। দীর্ঘ রাস্তা। একের পর এক ফলের বাগান। এত ঠান্ডায় কোনও গাছে ফল নেই। তা-ও কী সুন্দর। মাঝেমাঝে ছোট কাঠের বাড়ি। এমন একটা বাড়িতে দাঁড়িয়ে খানিক বিশ্রাম নিলাম। ভরে নিলাম জলের বোতলও। বাড়ির গৃহকর্ত্রী দাওয়ায় বসে মেশিনে কিছু বুনছিলেন। এগিয়ে এসে কথা বলে গেলেন। কোথা থেকে এসেছ... এমন কিছু। এ দিকটায় এক-একটা জায়গা কাশ্মীরের মতো দেখতে। সে কথা বলতে স্থানীয়রা বললেন, "এ তো কিন্নর! স্বর্গের সৌন্দর্য। এ-ও এক ভূস্বর্গ।"

এ লেখা পথের বাঁকেই শেষ করছি। সে দিন অনেকটা পথ হাঁটা ছিল। সঙ্গে চার দিনের ক্লান্তি। রাইসনে ফিরে ওই শূন্যের নীচে ঠান্ডাতেও গরম জল পেয়ে স্নান করেছিলাম। শরীর এতটুকু খারাপ হয়নি। সব বাড়িতেই পাহাড়ি চিমনি আছে। তার পাশে বসে গরম-তাত পুইয়ে নিয়েছিলাম। বুদ্ধিজি ও তাঁর স্ত্রী বাবা-মায়ের মতোই স্নেহ করেন। নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিলেন আন্টি। এই পাহাড়ি মেঠো ভালবাসাও চিরকাল মনে থেকে যাবে।

ভার্যাদের কৃষ্ণভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাগ্য

কৃষ্ণ চরিত্রমাত্র নন, চিরন্তন জিজ্ঞাসাও। মহাভারতে তিনি জীবনমার্গের দিশারি, পুরাণে তিনি লীলাময়। তাঁর স্ত্রী নিয়ে রয়েছে নানা আখ্যান। আবার একই সঙ্গে তিনি রাধাপথের প্রেমিক পথিক। লিখছেন **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্যের স্ত্রী বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া চাপমূলক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'অন্য' নন, অনন্য। তাঁর আমাকেও দরকার। জীবাত্মা না থাকলে পরমাত্মার প্রেম মিছে হয়ে যায়। ভাবাকুলতায় এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে গাঁ উজাড় হওয়ার জোগাড়! কৃষ্ণের ঘরে বসত করেন কয় জনা? কৃষ্ণ নিজে জানাচ্ছেন না, তাঁর ক'জন স্ত্রী। মহাভারত কয়েকটা নাম দিচ্ছে। তবে, ঢেলে নাম সরবরাহ করছে মহাভারত-পরবর্তী পুরাণেরা। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সে সব পৌরাণিক 'উপন্যাস' উড়িয়ে দিয়ে একটি নামে স্থির হচ্ছেন— রুক্মিণী। কিন্তু এত কাল ধরে চলে আসা বিশ্বাসের কী হবে? কী হবে অষ্টভার্যা তত্ত্বের? এবং যাঁকে নিয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সব কাব্যকাহিনি, যিনি বাঙালির নিভৃত প্রেমের দেবী, কী হবে সেই শ্রীরাধার?

এই কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশের আগেই বেরোনোর পথ করে রাখা জরুরি। না হলে প্রাণে মারা পড়ে কৃষ্ণের জীব। সে পথ কল্পনার। যে কবিকল্পনায় কৃষ্ণের স্ত্রী-সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে, সেই কবিকল্পনাকে সমর্থন-অসমর্থন করতে হলেও আশ্রয় নিতে হবে কল্পনারই। মোদ্দা কথা, হে পাঠক, এ লেখা কাল্পনিক। বলা মঙ্গল, অতিকাল্পনিক। আরও একটি জরুরি কথা, এ লেখা কোনও ভাবেই মহাকাব্য বা পুরাণ বা লোককথার বন্দিত সাহিত্যগুণ, নন্দিত কবিত্বশক্তি, স্পন্দিত সমাজেতিহাস বা মন্দ্রিত ধর্মভাবনার

সমালোচনা করার সাহসমাত্র রাখে না। সে ঔদ্ধত্য কাম্য নয়। তবে, কৃষ্ণগহ্বর অতলই।
কৃষ্ণগহ্বরে ঢোকার বিপদ মনকে আচ্ছন্ন করতেই কানের কাছে বাউল বললেন, 'শ্যামসায়রে নাইতে যাবি, গায়ের বসন ভিজবে ক্যানে!' কিঞ্চিৎ সাহস পাওয়া গেল। সাহস জোগাচ্ছেন স্বয়ং শ্রীগোবিন্দও। রাধাকে তাঁর বলা একটি বাক্য, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে স্ত্রী-ধাঁধার সব উত্তর। রাধাকে বলছেন— 'তুমি না-থাকলে আমি কৃষ্ণ আর তুমি থাকলে আমি শ্রীকৃষ্ণ।' রাধা সেই শ্রী। গল্পকথা রচনা করতে গিয়েও কবিত্বের মাধুর্যে পুরাণকারেরা এই 'শ্রী' ভাবনাটিকে ভোলেননি। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের আগে অবধি রাধার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। না মহাভারতে, না বিষ্ণুপুরাণে, না হরিবংশে, না ভাগবত পুরাণে। নাই থাক, এ লেখাকে কৃষ্ণের স্ত্রীসন্ধানে শ্রীরাধার শরণ নিতেই হবে। সেই জটজটিল পর্বে ঢোকার আগে আমরা বরং প্রচলিত ভাবনায় কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের নয়) অষ্টভার্যার সন্ধানে বার হই।
সন্ধানের তিনটি পথ। প্রথমটি মহাভারত। আগে দেখে নেওয়া যাক রাজশেখর বসু কী বলছেন— ''সকল দেশেই কুম্ভীলক বা plagiarist আছেন যাঁরা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশি দেখা যায়। এঁরা কবিযশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুজে দিয়েই কৃতার্থ হন... কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম করিয়েছেন... কেউ বা গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রত-উপবাসাদির ফল বা স্ত্রীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, কেউ বা আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্ত্যক্ত হয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পুথির ভিতর পাওয়া যায় তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য'।'' এ কথন অতিসত্য ও প্রমাণিত। তবে, মূল মহাভারতে কৃষ্ণ মোটের উপর স্পষ্ট। সেখানে তাঁর মূল কাজ 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতায় বর সেজে বিয়ে করে বেড়ানো নয়, জীবনপথের দিশা দেখানো।
দ্বিতীয় পথ পুরাণের। প্রচুর পুরাণ। পুরাণে-পুরাণে বহু মিল, বহু অমিল এবং পারম্পর্যহীনতার সৌজন্যে আঠারো-ঘা বিপন্নতা।
তৃতীয় পথটি তুলনায় সহজ— সোপ-সিরিয়ালের পথ। সেখানে ইচ্ছেমতো যাচ্ছেতাই করা যায়। কৃষ্ণকে দিয়ে ভৌম্যাসুর বা নরকাসুরের সঙ্গে রাধার বিয়ের বন্দোবস্ত করা যায় বা ইচ্ছেমতো স্ত্রী-সংখ্যা বাড়ানো-কমানো যায়। তবে, কৃষ্ণের স্ত্রী বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাসকথার উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের অবলম্বন আপাতত শাস্ত্রপুরাণই। মহাভারত-পরবর্তী বহু পুরাণের মধ্যে কালনিরিখ মেনে মূলত বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এবং দিশা বঙ্কিমচন্দ্র।

আদিপর্ব

কৃষ্ণকাহিনির এই অংশ মোটের উপর চেনা, যদিও ব্যতিক্রম আছে। বাড়ির পাশে আরশিনগর। সেখানে বেশ কয়েক ঘর পড়শির বাস। তাঁরা গোপালক। আগে এঁরা মথুরার কাছে এ-এলাকারই ঘোষপল্লিতে থাকতেন। কিন্তু নিষ্ঠুর রাজা কংস সদ্যোজাত বা শিশু পুত্রসন্তান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সৈন্য পাঠিয়ে দিনরাত তছনছ করা হচ্ছে ছায়া সুনিবিড়ি শান্তির নীড় গ্রাম। তেমনই এক রাতে সম্মাননীয় গোপকর্তা নন্দ শিশুপুত্রকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হলেন। সেই ঝড়ের রাতে নির্জন-সুন্দর এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি। সে নির্জন-সুন্দরের নাম বৃন্দাবন। পাশেই কুলকুল রণনে
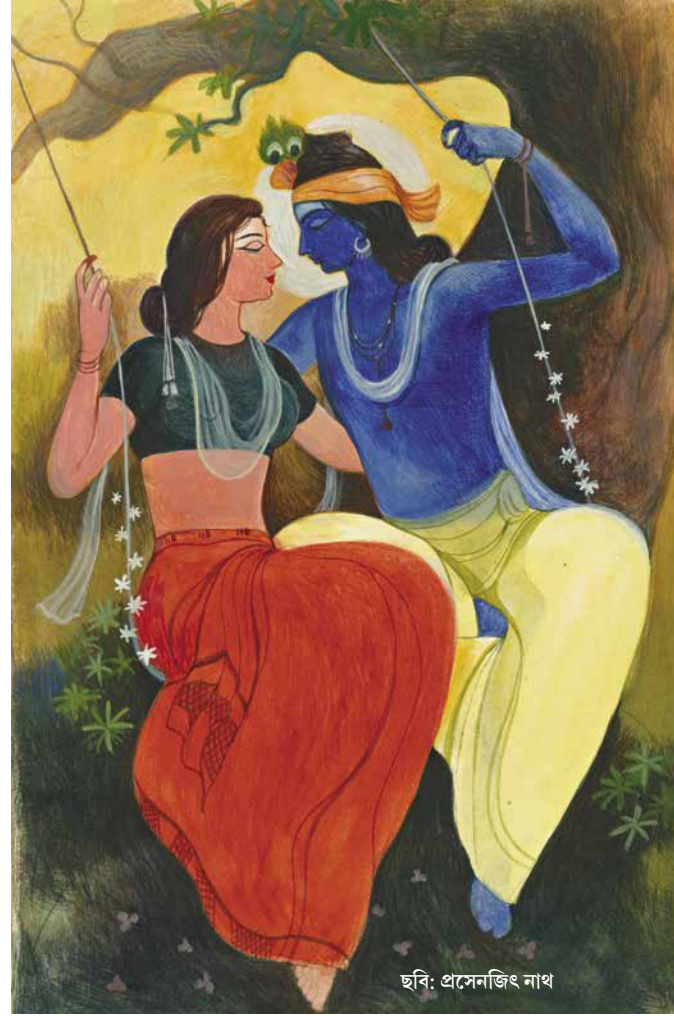
ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

খানিক পরে কয়েকটি অল্পবয়সি তরুণীর সঙ্গে দেখা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটির নাম রাধা। রাজা বৃষভানুর কন্যা।

বহমান নদী। খানিক পরে কয়েকটি অল্পবয়সি তরুণীর সঙ্গে দেখা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটির নাম রাধা। রাজা বৃষভানুর কন্যা। মেয়েরা নদীতীরে ব্রত পালন করতে যাচ্ছিলেন। এই বৃষভানু নন্দের সুপরিচিত। তিনিই বৃষভানুর বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। রাধাকে সে-কথা জানালেন আলাপে। নন্দের শিশুটি খিদের জ্বালায় পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে। তাঁদের আঁচলে বাঁধা গুড়-বাতাসার দিকে নজর তার। রাধা আদর করে গাল টিপে কোলে তুলে নিলেন শিশুটিকে। পাঠান্তর— নন্দ এক বিকেলে সরোবরের ধারে বসেছিলেন শিশুপুত্র কানাইকে নিয়ে। বাকি কাহিনি মোটের উপর একই। এ-কাহিনি আবারও ফিরে আসবে, অন্য প্রতিমায়।
এই শিশুই খানিক বড় হয়ে 'বলবীর্য লভি' বৃন্দাবন কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। গোপেরা ততদিনে বৃন্দাবনেই তাঁদের বাস তুলে এনেছেন। কাহিনির গতি বাড়ালে এই বৃন্দাবনেই কানাইয়ের পুতনাবধ,

এই বৃন্দাবনেই কানাইয়ের পুতনাবধ ননীচুরি, মাটি খাওয়া, কালীয়দমন প্রভৃতি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বাল্য-কৈশোর কীর্তি।

ননীচুরি, মাটি খাওয়া, কালীয়দমন প্রভৃতি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বাল্য-কৈশোর কীর্তি এবং অতি-সামান্য কিছু কালের মধ্যেই সম্পর্কে মামি (এক পাঠে রাধার ততদিনে বিয়ে সম্পন্ন কৃষ্ণের মামা রায়ান বা আয়ান ঘোষের সঙ্গে, পাঠান্তরে রাধা তখনও অবিবাহিত) রাধার প্রেমে পড়া, নৌকাবিহার-পর্ব, বুড়িমা বড়ায়ির কাছে রাধার কান্না, ননদিনীর ফেলুদাগিরি, রাসলীলা, বৃষ্টির রাতে নূপুর খুলে সঘনবনছায়ে নির্মিত কুঞ্জে কৃষ্ণমিলন আর কিছুকাল পরে কৃষ্ণের আত্মপরিচয় প্রাপ্তি, কারাগারে আসল মা-বাবা দেবকী-বসুদেবের দুর্দশার কথা জানা, কংসের নির্দেশে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাওয়া এবং আর ফিরে না-আসা, রাধার একা হয়ে যাওয়া (পাঠান্তর— কৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার ঢের পরে আয়ানের সঙ্গে রাধার বিয়ে) ইত্যাদি।

কথা ও কাহিনি

এ পর্যন্ত কৃষ্ণের স্ত্রী কই? সাধারণ পাঠে নেই। থাকাটা চাপেরও। কারণ, সর্বার্থে গুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও সম্ভবত তখনও লৌকিক কৃষ্ণের বিয়ের বয়স হয়নি আর অলৌকিক ভাবে থাকলেও সে-প্রসঙ্গ পরে। মথুরায় এসে কৃষ্ণকে বহু প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হল। এবং শেষ পর্যন্ত কংসকে পরাজিত করে দেশে শান্তি ফেরানো। না, কৃষ্ণ রাজা হলেন না। কংসের বাবা উগ্রসেনকে মুক্ত করে তাঁকেই রাজা হিসাবে ঘোষণা করলেন। নিজে রইলেন সমাজ-অধিনায়কের পদে। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত দ্বারকায়। কৃষ্ণের এই বীররস-পর্বেই বিয়ের সানাই বাজতে শুরু করল মহাকাব্যে, পুরাণে। মহাভারতে কৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে নাম আছে রুক্মিণী, সত্যভামা, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, জাম্ববতীর। সঙ্গে যদিও 'অন্যা' শব্দটি রয়েছে। পরে পুরাণে-পুরাণে নামে-বেনামে বেড়েছে স্ত্রী-সংখ্যা। নিজেদের বহুবিবাহের আকাঙ্ক্ষাই বোধ হয় পুরাণকারেরা কৃষ্ণকে দিয়ে মেটাতে চাইলেন। সে সব কল্পকাহিনি কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত ভাবে প্রবিষ্ট হল মহাকাব্যেও। এল অষ্টভার্যা বা বহুভার্যা তত্ত্ব।

অতিপ্রচলিত অষ্টভার্যার সঙ্গেই আগে পরিচয় সেরে ফেলা যাক। সে পরিচয় আধুনিক উইকিপিডিয়া-পুরাণেও আছে। তবে লিখিত মূল পুরাণগুলিতে আছে ঢের বেশি। প্রচলিত কাহিনি ও লোককথায় কৃষ্ণের আট স্ত্রীর নাম— রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা, ভদ্রা। কিন্তু মোটেই এত সরল পাটিগণিত নয় কৃষ্ণের স্ত্রীভাগ্য।

কৃষ্ণের প্রথম এবং প্রধান স্ত্রী রুক্মিণী। তিনি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মেয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন— 'তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন।' কিন্তু গোল পাকালেন কৃষ্ণের ঘোর শত্রু জরাসন্ধ। ভীষ্মকের কান ভাঙালেন। ভগ্নকর্ণ ভীষ্মক মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন আর এক কৃষ্ণশত্রু শিশুপালের সঙ্গে। বিয়ের আয়োজন শুরু হল। আমন্ত্রণ পেলেন না কৃষ্ণের আত্মীয়-পরিজন বা যাদবেরা। রুক্মিণী গোপনে কৃষ্ণকে বার্তা পাঠালেন কিছু একটা করতে। কৃষ্ণ বুঝলেন, 'হরণ' বিনে গতি নেই। এই 'হরণ' বিষয়ে বঙ্কিম লিখেছেন— 'সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল— এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ'। বিয়ের দিন রুক্মিণী মন্দির থেকে বেরোনোর সময় কৃষ্ণ তাঁকে হরণ করলেন এবং রথে তুলে দ্বারকামুখী হলেন। সহজ হল না। ভীষ্মক এবং জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনী পিছু নিল। ঘোর যুদ্ধ। জয়ী হলেন দ্বাপর যুগের শ্রীমান পৃথ্বীরাজ কৃষ্ণই। রুক্মিণীকে দ্বারকায় এনে সাড়ম্বর বিয়ে সারলেন। প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে মহাভারতের মূল পর্বে রুক্মিণী-প্রসঙ্গ থাকলেও হরণের কথা নেই। শিশুপালবধ-পর্বে শিশুপাল ও কৃষ্ণের তুমুল কথা-কাটাকাটিতেও রুক্মিণী হরণের উল্লেখ নেই। হরণের বিবরণ দিচ্ছে বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশ।

কৃষ্ণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রী জাম্ববতী ও সত্যভামা। পুরাণকারেরা এই পর্ব থেকেই গোল পাকাতে শুরু করলেন। জাম্ববতী আর সত্যভামার কাহিনি এক সুতোয় গাঁথা এবং কাহিনি গড়ে উঠেছে একটি মণিকে ঘিরে, যার নাম স্যমন্তক। এই মণি পেয়েছিলেন এক যাদব, যাঁর নাম সত্রাজিৎ। সমাজাধিপতি কৃষ্ণ মনে করেছিলেন, এ-মণি রাজা উগ্রসেনেরই প্রাপ্য। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আশঙ্কায় এ বিষয়ে তৎপর হননি। যদিও ভয় পেলেন সত্রাজিৎ— যদি কৃষ্ণ মণিটি কেড়ে নেন! নিজের কাছে না-রেখে সত্রাজিৎ তাঁর ভাই প্রসেনকে রাখতে দিলেন সেই মণি। ফুলবাবু প্রসেন আবার সেই মণি ধারণ করেই গেলেন মৃগয়ায় এবং পড়লেন সিংহের খপ্পরে। ব্যতিক্রমী এবং বাজার-সচেতন সিংহ প্রসেনকে প্রাণে মারলেও খেল না। বরং মণিটি মুখে নিয়ে প্রসেনের মৃতদেহ ফেলে রেখে চলে গেল। যাওয়ার পথে সেই জহুরি সিংহের দেখা জাম্ববান নামে এক ভল্লুকের সঙ্গে। এ বার জাম্ববান সিংহকে মেরে মণির মালিক। বয়স্ক ভল্লুক। কারণ, এই জাম্ববানই নাকি রামায়ণের কালে রামসেনার একজন। প্রসেন মারা যাওয়ায় যাদবদের অনেকে কৃষ্ণকেই মণিচোর এবং খুনি ঠাওড়াল। কৃষ্ণ সবার সন্দেহ দূর করতে নিজে বনে গেলেন এবং প্রসেনের মৃতদেহের পাশে সিংহের পদচিহ্ন দেখালেন। যাদবদের ভ্রম ঘুচিল। কৃষ্ণ ভালুকের পায়ের ছাপও দেখতে পেলেন। সেই ছাপ অনুসরণ করে উপস্থিত হলেন একটি গুহায়। জাম্ববানের সন্তানের ধাত্রীর হাতে দেখা গেল স্যমন্তক। কৃষ্ণের যুদ্ধ শুরু জাম্ববানের সঙ্গে। পরাজিত ভল্লুকরাজ। মণি ছাড়াও উপঢৌকন হিসাবে জাম্ববানের কাছ থেকে কৃষ্ণ পেলেন জাম্ববানের মেয়ে

জাম্ববতীকেও। কৃষ্ণ মণি ফেরত দিলেন সত্রাজিৎকেই। তবে, সত্রাজিৎ কৃষ্ণকে 'খুশি' করার জন্য নিজের মেয়ে সত্যভামাকে সম্প্রদান করলেন। অর্থাৎ, এক মণিকাণ্ডে কৃষ্ণের জীবনে নতুন দুই স্ত্রী-সমাগম। তাঁদের এক জন ভল্লুক, অন্য জন মানুষ। কৃষ্ণ সত্যভামাকে বিয়ে করায় সত্যভামার প্রেমপ্রার্থীরা কুপিত হলেন, সত্রাজিৎকে খুন করলেন আর মণি-পর্বও দীর্ঘায়িত হল, যার জেরে দাদা বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণের বিস্তর ভুল-বোঝাবুঝি হল এবং সে মণি নানা হাত ঘুরে আবার দিনের আলোয় এলে সত্যভামা ও বলরাম দু'জনেই তা পেতে আগ্রহী হলেন। যদিও কৃষ্ণ তাঁদের কাউকেই সেই মণি নিতে দিলেন না। মণি রাখতে দিলেন তাঁর সখা তথা সম্পর্কে পিতৃব্য অক্রূরকেই, যে অক্রূরও সত্যভামার অন্যতম প্রেমার্থী। এ সব অবশ্য অষ্টভার্যা-অভিযানের সরাসরি অংশ নয়। এই কাহিনি বিষ্ণুপুরাণের। যদিও হরিবংশে নতুন চমক। সেখানে শুধু সত্যভামাকেই কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করছেন না সত্রাজিৎ, তাঁর আরও দুই মেয়ে ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনীকেও সম্প্রদান করছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণের স্ত্রী-সংখ্যা বেড়ে চার। মূল মহাভারতে সত্যভামা নেই, যে সব অংশে আছে, তাদের প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়। তবে, পুরাণে-পুরাণে কৃষ্ণের স্ত্রী ক্রমবর্ধমান। এবং কোনও পুরাণই নির্দিষ্ট থাকতে পারেনি স্ত্রী-সংখ্যার বিবেচনায়। একই পুরাণের নানা পর্বে নব-নূতন স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটছে, পুরনো স্ত্রীর নবনামকরণ হচ্ছে। পুরাণকারের করাঙ্গুল ছাপিয়ে উপচে পড়েছে কৃষ্ণের স্ত্রীভাগ্যের রেণুমাধুরী।

যেমন, বিষ্ণুপুরাণ রুক্মিণী ছাড়াও একবার কৃষ্ণের আরও সাত জন স্ত্রীর নাম দিচ্ছে, আর একবার আট। সে-হিসেবে স্ত্রীরা হলেন— রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, রোহিণী, সুশীলা, লক্ষ্মণা (পাঠান্তরে লক্ষণা)। আবার অন্য অধ্যায়ে সন্তানদের নাম-সূত্রে যোগ হচ্ছে নতুন কৃষ্ণভার্যার নামও। যেমন, শৈব্যা, মাদ্রী। পাওয়া যাচ্ছে নতুন নাম জালহাসিনীও। বিভ্রম হল, এই সব স্ত্রী বিষয়ে বিশদ তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। অতি অল্প। যেমন, নগ্নজিতের মেয়ের নাম সত্যা বা সুশীলা মদ্ররাজার মেয়ে। আরও চমক, এখানে পাণ্ডুপত্নী হিসাবে পরিচিত মাদ্রীকেও কৃষ্ণের স্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও কৃষ্ণ সম্পর্কে পাণ্ডবদের মামাতো ভাই। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এবং পরে উদ্ভিন্ন স্ত্রীদের সামান্য কয়েক জনের বিষয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু কাহিনি থাকলেও উল্লেখযোগ্য নয় এবং পরস্পরবিরোধী। বঙ্কিম-কটাক্ষ— কৃষ্ণের এই সব স্ত্রী 'কাব্যের অলঙ্কার'।

প্রথমে হরিবংশ রুক্মিণী ছাড়া আরও ন'জনের নাম দিচ্ছে কৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে— কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিণী, মাদ্রী সুশীলা, সত্যভামা, জালহাসিনী লক্ষ্মণা এবং শৈব্যা। এখানে জানা গেল, জালহাসিনী ও লক্ষ্মণা একজনই। কিন্তু মাদ্রী সুশীলার কী বিচার? মানে, মদ্ররাজার মেয়ে। এই হরিবংশেই অন্য অধ্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে আরও কিছু কৃষ্ণপত্নীর নাম— সুদত্তা, পৌরবী, সুভীমা। সে তালিকায় রুক্মিণী ছাড়া স্ত্রী-সংখ্যা ১১। আবার, সন্তানদের নাম দেওয়ার সময় তাঁদের মায়ের সূত্রে বাড়ল কৃষ্ণের স্ত্রী-সংখ্যা। আবির্ভাব ঘটল নতুন পাঁচ নামের— সুদেবা, উপাসঙ্গ, কৌশিকী, সুতসোমা, যৌধিষ্ঠিরী।

মহাভারত-উল্লিখিত নামগুলো ধরে এবং বাকি পুরাণে 'কমন' নাম কাটছাঁট করে বঙ্কিমচন্দ্র ২২ জন কৃষ্ণভার্যার একটা তালিকা পেশ করেছেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে উদ্ধৃতির সারাংশ— 'মহাভারতে আছে— ১) রুক্মিণী, ২) সত্যভামা, ৩) গান্ধারী, ৪) শৈব্যা, ৫) হৈমবতী, ৬) জাম্ববতী। মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু 'অন্যা' শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩ ছাড়া এই কয়েকটা নামও পাওয়া যায়— ৭) কালিন্দী, ৮) মিত্রবিন্দা, ৯) সত্যা নাগ্নজিতী, ১০) রোহিণী, ১১) মাদ্রী, ১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনী। বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা... তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায় ১৩) কালিন্দী, ১৪) রোহিণী, ১৫) সভীমা, এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই ১৬) সুদেবা, ১৭) উপাসঙ্গ, ১৮) কৌশিকী, ১৯) সুতসোমা, ২০) যৌধিষ্ঠিরী এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা ২১) ব্রতিনী, ২২) প্রস্বাপিনী।'

এক মণিকাণ্ডে কৃষ্ণের জীবনে নতুন দুই স্ত্রী-সমাগম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জন ভল্লুক, অন্য জন মানুষ।

এর পরে বঙ্কিম লিখছেন— 'আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট।' আরও লিখছেন 'ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব (পাঠান্তরে মৌষলপর্ব) ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত... এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন... জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে লেখা আছে— দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী। হরিবংশে এইরূপ— সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী... অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই... সত্যভামা ও সত্যাও এক... এখন আট জন পাই। যথা— ১) রুক্মিণী, ২) সত্যভামা, ৩) জাম্ববতী, ৪) শৈব্যা, ৫) কালিন্দী, ৬) মিত্রবিন্দা, ৭) মাদ্রী, ৮) জালহাসিনী লক্ষ্মণা।'

'শেষ নাহি যে'

অশেষ কৃষ্ণের স্ত্রীগণ। এমনই লীলা। আগের জনেরা ছাড়াও রয়েছেন কৃষ্ণের আরও বহু স্ত্রী। বিষ্ণুপুরাণ বলছে— 'ভগবতোহপ্যত্র মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্'। অর্থাৎ কৃষ্ণের মোট ১৬ হাজার ১০০ স্ত্রী। মতান্তরে, ১৬ হাজার সাত। এঁদের মধ্যে ষোলো-হাজারি কাহিনিটি ভিন্ন। তাঁরা নরকাসুরের হাতে বন্দি মেয়েরা। পৃথিবীপুত্র নরকাসুর দেবতা, গন্ধর্ব আর মানবের
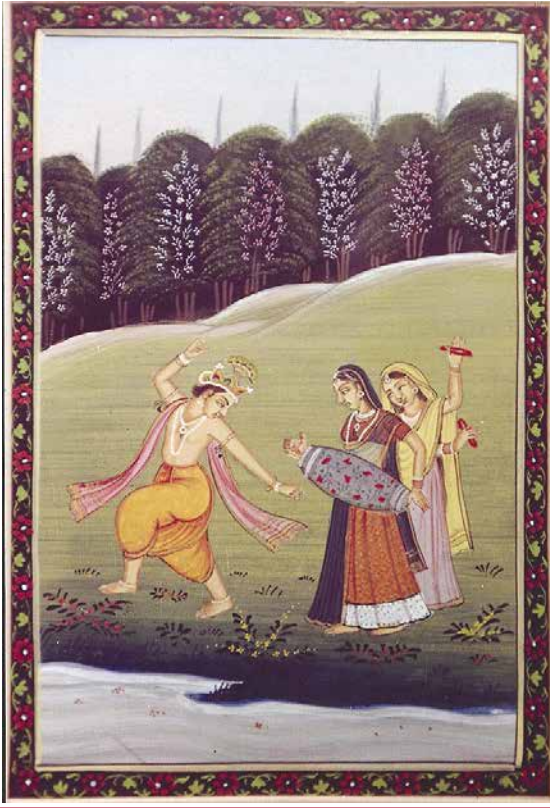
পুরাণকারেরা কৃষ্ণের জন্য এত পাত্রী দেখলেন কেন, বিয়ে দিলেন কেন? কারণ পুরাণকারদের রতিচর্চাই প্রেয় ছিল।

কন্যাদের চুরি করে প্রাসাদবন্দি করেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের দুর্গঘেরা দুর্গম প্রাসাদ ভেদ করে প্রবল যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ সেই মেয়েদের উদ্ধার করলেন। তাঁরা কৃষ্ণে মনপ্রাণ নিবেদন করলেন এবং তাঁকে জীবনস্বামী হিসাবে প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন।

যদিও নরকাসুরের এই কাহিনির কোনও পারম্পর্য নেই। নানা পুরাণকথা অনুযায়ী, এই নরকাসুর ভিত্তিগত ভাবে বিষ্ণুর (অবতার-তত্ত্ব অনুযায়ী এক অর্থে কৃষ্ণেরই সন্তান। বরাহ অবতার বিষ্ণু জলমগ্ন পৃথিবীকে যখন উদ্ধার করেন, তখন বরাহ আর পৃথিবীর মিলনে জন্ম হয় নরকাসুরের। অন্য দিকে, নরকাসুর রাজা যে প্রাগজ্যোতিষপুরের, সেই একই রাজ্যের রাজা ভগদত্তকে আবার কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে প্রাণ দিতে দেখা যায়। মানে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রসসূত্র বিপন্ন হল। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এর তিন সূত্র— স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যও মাঠে মারা পড়ল। স্থান গোলালো, কাল ক্যালেন্ডার হারাল, ঘটনা নানামাত্রিক হল।

বঙ্কিম গোটা বিষয়টিকে 'আষাঢ়ে' গল্প বললেন। তাঁর বিশ্বাস, রুক্মিণীই কৃষ্ণের একমাত্র স্ত্রী। তিনি মহাভারত উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশ আর 'অনৈসর্গিক' কাহিনির ওই ষোলো হাজার মেয়ে অপ্সরাদের অংশ। তাই কৃষ্ণের অনন্ত বিবাহের সারবত্তাহীনতাকে চিহ্নিত করতে বঙ্কিম মজুত করছেন মোক্ষম অস্ত্র। তাঁর কথায়— 'বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।'

ধর্মোপজীবীরা অবশ্য মনেও করেন, সবই ভগবানের ইচ্ছে। যুক্তিটি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। পত্রে পুত্র জন্মালে ইচ্ছায় নয় কেন!

ব্রজমাধুরী, ব্রজগোপী

প্রশ্ন হল, পুরাণকারেরা কৃষ্ণের জন্য এত পাত্রী দেখলেন কেন, বিয়ে দিলেন কেন এবং অগুন্তি সন্তানাদির জন্ম দেওয়ালেন কেন? কারণটি সহজ। পুরাণকারদের রতিচর্চাই প্রেয় ছিল। সে রতি কামার্থ, ক্রীড়ার্থ নয়। এ প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয় পুরাণে কৃষ্ণের গোপিনী-লীলায় মন দিলেই। অথর্ববেদের উপনিষদগুলোর মধ্যে 'গোপালতাপনী'তে কৃষ্ণের গোপগোপী-প্রসঙ্গ আছে। তবে তা কোনও ভাবেই বলিউডি হিন্দি ছবির কোরিয়োগ্রাফির 'একস্ট্রা' নতর্কীদের মতো নয়। প্রধান গোপী হিসাবে যাঁর নাম পাওয়া যায়, তিনি গান্ধর্বী। তবে, গোপগোপীর অর্থ এখানে কেলিসঙ্গী নয় মোটেই। তাঁরা অবিদ্যা কলা। এই অবিদ্যা কলা হেয় করার মতো বিষয়ও নয়। তা আদি জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ, গোপগোপীপ্রিয়। জগৎ-কুতুহলই গোপগোপীর সূচক। কৃষ্ণ উত্তরকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা। সে উদ্ধারকাজের পথ রতিক্রিয়া, 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' বা বিয়ে— কোনওটিই নয়। বরং, রক্ষাদিশা, জ্ঞানমার্গ। এই জ্ঞানমার্গ লিঙ্গ-নির্বিশেষ বিতরিত। সেখানে কৃষ্ণও 'পুং' নন, তিনি 'ভগবান স্বয়ম্' এবং 'পুরুষং অনন্তম্', পুরুষকার। 'গোপালতাপনী'তে কৃষ্ণের রাসলীলা, কেলি, রোম-রোমাঞ্চিত বা হরমোন-হরষিত বর্ণনা নেই। নেই বরিষণ-মুখরিত কুঞ্জবনে কৃষ্ণসন্নিধানে রাধার বুকের আঁচলখানি ঝড়ে যায় উড়ে যায় গোছের 'শিশুদিগের জন্য নিষিদ্ধ' কোনও 'সিন' (দৃশ্যার্থে)। সে সব এল পুরাণে। এল সাদা বাংলায় ভোগ। কিন্তু তা হতে পারত মানুষের স্বাভাবিক প্রেম, স্বভাবজাত কামনা, প্রিয়জনকে জড়িয়ে থাকার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা বা হারিয়ে ফেলার শঙ্কা। না, তা হল না। কারণ, ভেবে দেখা হল না, কোনও বালক বা সদ্য-কিশোরের পক্ষে সম্ভব কি না অগণন গোপী-সহকারে রতিমগ্নতা কিংবা উল্টোটাও। রম্ ধাতুর উদ্ভাসে নির্মিত 'রতি' শব্দের অর্থ যে 'খেলা'ও, সে-কথা পুরাণকারেরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। বুঝেও মানেননি মিলন শব্দের মায়া। তাই নাবালক কৃষ্ণের বয়স গুলিয়ে দিয়ে বয়সের কারণে কামকেলিতে অপারগ হওয়াগ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনেননি। সেই অবিবেচনাকেই তাঁরা তথাকথিত শাস্ত্র বানিয়ে তুলেছেন এবং সে-সবের চিতাভস্ম ধারণ করে উপমহাদেশের এক বড় অংশকে আজও ধর্মান্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুরুষতন্ত্র আর সংকীর্ণ ধর্ম-রাজনীতি।

মাঝখান থেকে গোল্লায় গিয়েছে প্রেম, মুখ থুবড়ে পড়েছে ভক্তিবাদও। হ্যাঁ, মহাভারতে তাঁর বস্ত্রহরণের সময় কৃষ্ণকে 'গোপীজনপ্রিয়' নামে স্মরণ করছেন দ্রৌপদী। তবে, সে 'গোপী' গোপসমাজের মেয়েদের বন্ধু অর্থে সম্মানে-কুর্নিশে প্রযুক্ত। এ ছাড়া মহাভারতে গোপীপ্রসঙ্গ নেই। থাকলে সভাপর্বে কৃষ্ণকুৎসার সময় চরিত্রের দোষ তুলে কৃষ্ণকে তুলোধোনা করতে ছাড়তেন না শিশুপাল। গোপী-আমদানি অনেক পরের।

এ বার আমরা বরং ঘুরে আসি পুরাণকথার সেই মধুক্ষরা কুঞ্জকাননে, যেখানে কৃষ্ণ তরুণী গোপিনীদের সঙ্গে লীলারত। রাসলীলা। মহাভারত-পরবর্তী বিষ্ণুপুরাণে লীলা ঢুকেছে অপেক্ষাকৃত মার্জিত আদিরসে। তবে একেবারে অনুপস্থিত নয় ভক্তিরস। সময় যত গিয়েছে, আদিরসচিন্তার বিবর্তন ঘটেছে কিছুটা। হরিবংশে কাম

ক্রমপুঞ্জীভূত এবং ভাগবত পুরাণে অবিস্মরণীয় সূক্ষ্মতায় ভক্তিযোগ বা পরম কবিত্বে মাহাত্ম্যবর্ণনার পাশাপাশি তা বেশ খানিক পত্রপুষ্পে বিকশিতও।

‘অধরে মুরলী ধরি’ রাসলীলা

ফুল্লকুসুমিত শারদ রাত। পাশে নীল যমুনার জল। বালক বা সদ্য-কিশোর কৃষ্ণ রাসলীলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গীতবাদ্য শুরু হল। কৃষ্ণ গান ধরলেন। গোপীরা পরিবারের বাধা উপেক্ষা করে বা গোপনে, স্বামী-বন্ধু-পরিজন ছেড়ে বনমধ্যে কৃষ্ণের কাছে এলেন। কৃষ্ণকে ঘিরে নাচতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন। প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁদের অনন্তকাল বলে মনে হল। গোপীদের অনেকে কৃষ্ণকে ছুঁতে উদ্‌গ্রীব হলেন। কেউ কেউ জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণকে, চুম্বন করলেন— ‘কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্’। বিষ্ণুপুরাণে এ ছাড়া আর একবারই গোপীরা দেখা দেন, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়ার সময়। তাঁরা তখন কৃষ্ণছিন্ন অবস্থার কল্পনায় বিমর্ষ। হরিবংশে গোপীরা রাসলীলায় প্রায় বিষ্ণুপুরাণেরই আয়না। তবে পারদ চড়া। এখানে অবশ্য ‘রাস’ শব্দ বদলে হয়েছে ‘হল্লীষক্রীড়নম্’। এখানেও কৃষ্ণ গোপিনীসঙ্কাশে প্রস্ফুটিত। সুসজ্জিত, মাল্যভূষিত, চন্দনচর্চিত এবং কথাসরিৎসাগর। সে কিশোরবালকের উচ্চারণে শিহরিত গোপিনীরা। তাঁরা অপাঙ্গে কৃষ্ণলীন, তাঁরা দেহমনে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ‘গ্রথিতসীমন্তা রতিশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ/চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্’। রতিনন্দিত গোপিনীদের সিঁথিবদ্ধ কেশদাম আলুলায়িত হয়ে বুকে বিস্রস্ত হতে লাগল। এই ধরনেরই ‘পারি না, কাকা’ গোছের বর্ণনায় মুখর এই পুরাণ। যদিও উল্টো প্রান্তের নাগরের তখনও গোঁফ গজায়নি।

তবে বঙ্কিম-কথিত ‘উপন্যাস’-এর সব রেকর্ড ভেঙে দিল বঙ্কিমেরই প্রিয় ভাগবত পুরাণ। অবশ্যই সেখানে কবিত্ব অবিসংবাদী এবং ভক্তিও। তবু রয়েছে কামের ইঙ্গিতও। এই পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায়ের রাসলীলায় গোপীদের বাঁশিতে ডেকেছে কে? স্বয়ং কৃষ্ণ। গোপীরা সমবেত হলে কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময়-পর্ব সেরে, পতিসেবাই পরমধর্ম উল্লেখ করে ঘরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশকার। যদিও গোপীরা ফিরলেন না। জানালেন, অনিত্যরতি কৃষ্ণেই তাঁদের হৃদয় সমর্পিত। এ বার শুরু রাসলীলা। এই লীলামাহাত্ম্য এবং গোপীদের কৃষ্ণের জন্য মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়ানোয় বিলক্ষণ কামগন্ধ। সে সুগন্ধের উৎসারে কৃষ্ণও কম উৎসাহী, বলা যায় না। ভাগবত পুরাণেই সর্বপ্রথম কৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্র হরণে রত। যদিও পুরাণকার তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কর্মফল বিষয়ে কৃষ্ণের পর্যবেক্ষণও। ব্রজগোপীরা মোটেই সে দিন হোরি খেলতে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন ব্রত পালন করতে। নদীর তীরে পোশাক খুলে রেখে অবগাহনে নেমেছিলেন। কৃষ্ণ সে-সব টপাটপ তুলে নিয়ে কদমগাছে স্থিত। গোপীরা পড়লেন ঘোর বিপাকে। অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। কৃষ্ণ নাছোড়। বড়জোরি করেছে কানহাই। কৃষ্ণের দাবি বেণীর সঙ্গে মাথা। আকাঙ্ক্ষা— গোপীদের লজ্জাবোধ কৃষ্ণার্পিত হোক। শেষ অবধি সেটাই ঘটল। আগে কামের দ্রুত্ তারানা বাজিয়ে এখানে পুরাণকার কৃষ্ণের মুখে কিছু তত্ত্বকথা বসালেন। বললেন, কৃষ্ণপ্রেম আদতে কামের পরিসমাপ্তি। গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাস— রাতে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ব্যাস, আবারও দ্রুত্ তারানা বেজে উঠল পরের দৃশ্যের জন্য। কিন্তু ভাগবতকার সচেতন। কৃষ্ণলীলার অন্তরঙ্গ বর্ণনার পাশাপাশি ভাবটি ধরে রাখছেন গীতায় উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বাণীর। যার সার— কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাই তাঁর পাপ নেই। পাপ-ভাবনা নেই গোপীদেরও। কারণ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা খণ্ডিত মনে উপপতি হিসাবে কৃষ্ণকে বরণ করলেন, কৃষ্ণ তাঁদের প্রতি পতিত্ব মান্য করলেও
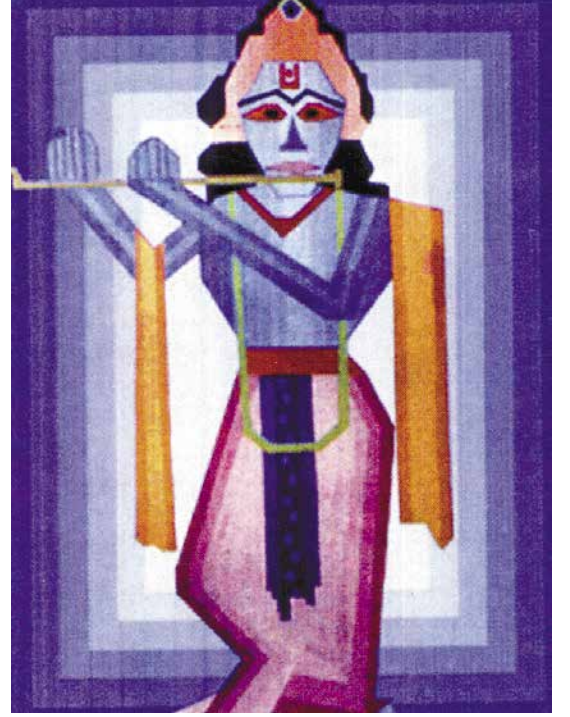
কৃষ্ণ যা ছিলেন, যা হইয়াছেন এবং যা হইবেন— তার জন্য গোপী-পর্ব জরুরি। গোপী না হলে বৃন্দাবন-পর্ব শেষ হয় না।

প্রাণবল্লভকে পেলেন না তাঁরা, তাঁদের পাপ রইল না। আবার যাঁরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর মেনে পতিভাবে ব্রতী হলেন, তাঁরাও পাপ-ভাবনার ঊর্ধ্বে রইলেন। এই কৃষ্ণই মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে বলেছেন— ‘মামেকং শরণং ব্রজ/অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ’— আমায় শরণ করে চলো, আমি তোমায় সব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক কোরো না। আবার কৃষ্ণ এ কথাও বলেছেন— ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্’— যে আমায় যে রূপে প্রস্তাবনা করে, আমি সেই রূপেই ধরা দিই। রামপ্রসাদী ভাবার্থে— ‘যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজি’। ভাববত পুরাণকার মোক্ষম জায়গায় গীতা মনে করিয়ে দেন এবং নির্ভাবনায় গোপীরাও কৃষ্ণের শরণ নেন।

একটা কথা মনে আসা স্বাভাবিক। কৃষ্ণের স্ত্রী বিষয়ে অনুসন্ধানে খামোকা গোপীদের কথার এত বিবরণ কেন? কারণ, কৃষ্ণ যা ছিলেন, কৃষ্ণ যা হইয়াছেন এবং কৃষ্ণ যা হইবেন— তার জন্য গোপী-পর্ব জরুরি। গোপী না হলে বৃন্দাবন-পর্ব শেষ হয় না, রাধার আবির্ভাব ঘটে না এবং মথুরার কৃষ্ণের ঘাড়ে পুরাণকারেরা একের পর এক বৌ চাপাতেও পারেন না।

‘তোমারে করিব রাধা’

রাধা আসছেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। এখানে রাধা-কৃষ্ণ পরকীয়া করেননি। তাঁরা দোঁহে মিলে এক। ‘সোলমেট’। আদি ব্রহ্মবৈবর্ত মেলে না বলেই পণ্ডিতেরা জানান। তবে পরের ব্রহ্মবৈবর্ত অন্য ভাবে কৃষ্ণের দেবত্বকে সূচিত করে। এখানেই কৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ।
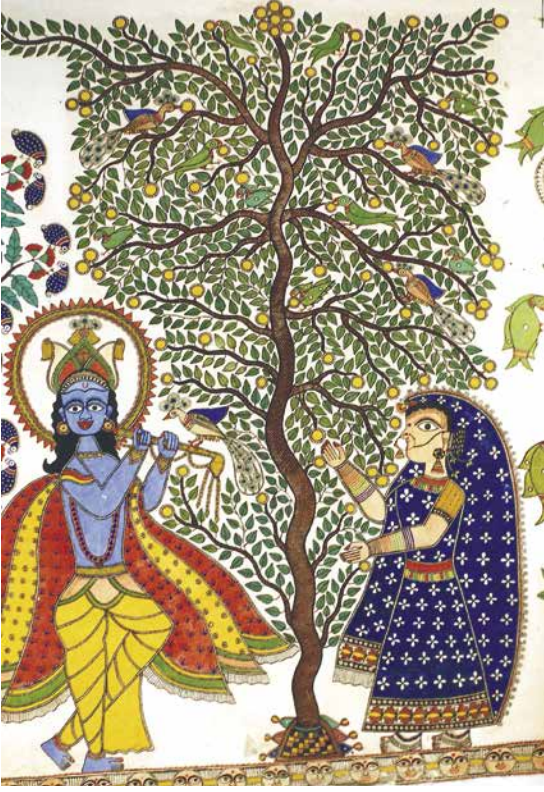
এখানে শ্রীকৃষ্ণ লীলাপর্বে বা প্রেমপর্বে বালক বা কিশোর নন। এখানে কাহিনির নতুন বাঁক। বাকি পুরাণ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মানলেও ব্রহ্মবৈবর্ত মানে না। এ পুরাণে কৃষ্ণই বিষ্ণুর স্রষ্টা। দু'জনেরই বাস গোলোকে। তবে, শ্রীরাধা ও গোপগোপী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাস রাসমণ্ডলে আর বিষ্ণু গোলোক-স্তরের ঢের নীচে বৈকুণ্ঠে বসবাস করেন লক্ষ্মীর সঙ্গে। খানিক বাইবেলের মতো বা রবীন্দ্রকবিতা— 'চোখ মেললুম আকাশে, জ্বলে উঠল আলো'— কৃষ্ণের নয়ননেত্রপাতে প্রথমে তৈরি হল রাসমণ্ডল। তার পর তিনি রাসের 'রা' মেলালেন 'ধাতুর 'ধা'-এর সঙ্গে। আবির্ভাব রাধার। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকারের সম্ভবত লক্ষ্য ছিল, রাধা-কৃষ্ণকে ভগবান স্বয়ম্ এবং ঈশ্বর অনন্তম্ স্বীকার করেও মাটির পৃথিবীর মানবী-মানবের আলিম্পনে আঁকবেন। তাই প্রথমে তাঁদের বাকি দেবদেবীর ঊর্ধ্বে স্থাপন করা এবং পরে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমঘটিত টানাপড়েনের কাহিনি, প্রেমের ঈর্ষা আর অভিশাপের কাহিনি জুড়ে মর্তে টেনে আনা। বলা ভাল, মর্তে টেনে এনে জয়দেব-সহ বৈষ্ণব কবিদের হাতে সযত্ন তুলে দেওয়া। বাকি পুরাণ যখন কৃষ্ণের অগুনতি স্ত্রী নিয়ে নিজেরাই মাথা খারাপ করে ফেলছে, তখন ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যস্ত থাকছে পরবর্তী এক সাহিত্যসভ্যতার জন্মসূত্র রচনায়। হয়তো অজান্তেই, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটছে। এখানেই কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরোনোর ক্ষণিক পথ, খানিক আলো।

তবে, এই পুরাণেও কৃষ্ণের রাধাভিন্ন অন্য নারীসঙ্গের বিবরণ আছে। তবে তা পূর্বাশ্রমের। রাসমণ্ডলে রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী গোপিনী ছিলেন। নাম বিরজা। তিনি কৃষ্ণকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়ায় অভিমান হয় রাধার। সে-ঘরে চড়াও হতে হাজির হন রাধা। দরজা আটকে দাঁড়ান দারোয়ান শ্রীদামা। ততক্ষণে ভয়ে বিরজা গলে জল, গলে নদী। কৃষ্ণ আশীর্বাদ করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন। এখানে ক্ষণ-মহূর্তকে অনাদি-অনন্ত বলে না-ধরলে কাহিনির খেই হারাতে হয়। কৃষ্ণের 'কৃপা'য় বিরজার সাত সন্তানের জন্ম হল। কিন্তু সন্তান তো মিলনপ্রমাণ। তাই মাতৃ-অভিশাপে তারা সাত সমুদ্রে রূপান্তরিত হল। কিন্তু বাঙালির কবিঠাকুর বলেছেন, 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে'। ঘটল সেটাই। সব জেনে ক্ষিপ্ত রাধার অভিশাপ— মর্তে গিয়ে থাকতে হবে কৃষ্ণকে। এই শাপ-পর্ব লম্বা হল। রাধা শ্রীদামাকে অভিশাপ দিয়ে অসুরজন্ম নিতে আদেশ করলেন আর শ্রীদামাও রাধাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, রাধাকে মর্ত্যে গিয়ে রায়ান বা আয়ান ঘোষের বৌ হয়ে দুখিনীর জীবন কাটাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনে যাওয়ার 'স্ক্রিপ্ট' সাফল্যের সঙ্গে পেশ হল। এর পরে একটিমাত্র প্রসঙ্গ ছাড়া এ লেখার আর ব্রহ্মবৈবর্তের প্রয়োজন নেই। কারণ, তার পরের ললিত রাধাকৃষ্ণে আমরা 'ডুবি অমৃতপাথারে/...নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা'। সেখানে 'প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে' গীতগোবিন্দমের মায়া নিয়ে, বৈষ্ণব কবিদের রেণু মেখে। সেই একমাত্র প্রসঙ্গটি বৃন্দাবন লীলার। তা জরুরি এই কারণে যে, এই প্রথম সাবালক এবং পূর্ণ যৌবনের সুষম প্রেম দেখা যাচ্ছে। সেটিও কাহিনি একটি। এবং সে কাহিনিতে মর্তে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করবেন একটি মেয়েকে। মেয়েটির নাম শ্রীরাধা। এই প্রথম মাটির ওম-জারিত কোনও পুরাণে কৃষ্ণের নতুন স্ত্রী-সংযোগ। এবং রাধা এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের অনেকের রচনায় রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী হয়েও কৃষ্ণপ্রেমে লীন বলে চিহ্নিত হলেও এই পুরাণে রাধা কৃষ্ণেরই বিয়ে করা বৌ।

বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দেখাচ্ছে, কৃষ্ণের বেশ কিছু আগে রাধা মর্তে জন্ম নেওয়ায় তিনি কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়। তিনি যখন যৌবনে, কানাই তখন শিশুবালক। নন্দ এবং শিশুকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেখা হওয়ার বাকি কাহিনি এখানেও ফিরে আসে। তবে অন্য ভাবে। যার ইঙ্গিত রয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দমের প্রথম শ্লোকে, যা বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের খানিক অনুরণন। এ পুরাণকাহিনি অনুযায়ী, একদিন নন্দ শিশুপুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে গোচারণে গিয়েছিলেন। সরোবরের জল খেয়ে বিশ্রাম করতে বটগাছের তলায় বসলেন দু'জন। সেই সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল। চারদিক কালো করে এল। শুরু হল বজ্রপাত আর তুমুল বৃষ্টি। এ সবই সংঘটিত হল শিশু কৃষ্ণের আদিসত্তার মায়ায়। নন্দ ভয় পেলেন। কী করবেন শিশুকে নিয়ে এখন! এমন সময়ে সেখানে ঘটনাচক্রে এলেন নবযৌবনা রাধা। নন্দ ভরসা খুঁজে পেলেন দুর্যোগের মধ্যে। রাধার কাছে তাঁর জানা কৃষ্ণসত্যটি প্রকাশ করে জানালেন, তিনি জানেন রাধা আর কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয়। বললেন, 'হে ভদ্রে, তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ করো। যথায় সুখী হও, যাও।' একই সঙ্গে অনুরোধ করলেন দৈব মনোরথ পূর্ণ হওয়ার পর 'আমার পুত্র আমাকে দিয়ো'। ঠিক এখানেই স্মরণ করা যায় গীতগোবিন্দমের শুরু— 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈনক্তং/ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়'— আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ। অন্ধকার হয়ে এসেছে তমালঘেরা বনভূমি। রাত্রিও হয়ে এল। কানাই ভয় পাচ্ছে। রাধা, তুমি ওকে ঘরে নিয়ে যাও। কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন রাধা।

এর পরে জাদুশলাকা স্পর্শ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের। কিছু দূর হেঁটে গিয়ে রাধা স্মরণ করলেন গোলোকের রাসমণ্ডল। ভেসে উঠল তাঁদের চেনা পরিসর। স্বমূর্তি ধারণ করলেন কৃষ্ণও। রাধাকে বললেন, গোলোকে স্থির হওয়া কথার বাস্তবায়ন হবে। তাঁদের এই আনন্দকথার মধ্যেই আবির্ভাব ব্রহ্মার। তিনি স্থির করলেন, এখনই মাটির বাঁধনে বাঁধতে হবে দু'জনকে। কন্যাকর্তা হয়ে বেদবিধি মেনে

ব্রহ্মা কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে দিলেন রাধার।
অর্থাৎ এই পুরাণে কৃষ্ণের আরও এক স্ত্রীর আগমন। এখানে রাধার আয়ান ঘোষের সঙ্গে বিয়ে বিষয়ে কার্যত কিছু নেই। বৈষ্ণব কবিরা এই রাধাকৃষ্ণকে তাঁদের আরাধ্য করলেও কালে কালে বাংলা পদাবলিতে আবিভার্ব আয়ান ঘোষের। ক্রমে রাধার কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টিও অবসৃত। তাঁরা রয়ে গেলেন প্রেমের চিরকাঙাল অথচ চিরবিচ্ছিন্ন প্রেমের চিরকালীন প্রতিনিধি হিসাবে। সেখানেও রাসলীলা এল, সমাজ এল, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এল। পূর্বরাগে উচাটন হয়ে উঠল মন, মিলনে নামল তৃষ্ণার শান্তি, বিরহে হা-ক্লান্ত হল দেহ, ক্রমে ভাবসম্মিলনের পথে এগিয়ে চলল মধুর দুই চরিত্র। কিন্তু নিছক কাম নয়, নয় নিছক সম্ভোগ বা সেকালের পুরুষাধিকারে স্ত্রীবৃদ্ধির চেনা ছক। বরং ঘটল শ্রীবৃদ্ধি। নতুন কিছু পাওয়া গেল। শান্তরস বা দাস্যরস নয়, খানিক বাৎসল্যরস আর খানিক সখ্যরসে ভেজা পাত্র উপচে গড়িয়ে পড়ল মধুররসের ধারা। যে পথে এসে দাঁড়াবেন শ্রীচৈতন্য, যে পথে হাঁটতে শুরু করবেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা।
বঙ্কিমচন্দ্র যদিও জয়দেবদের প্রেমভাবনার চেয়ে ভাগবত পুরাণের ভক্তিবাদকে উঁচুতে রেখেছেন। তাঁর মতে, 'যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব'। তবে তিনিও মানেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী অদ্বৈতবাদী বেদান্ত দর্শন আর ঈশ্বরহীন কপিলের প্রকৃতিবাদী সাংখ্য দর্শনের মিশেলে তৈরি বৈষ্ণবধর্ম। সেখানে বিষ্ণুবাদ নয়, বৈষ্ণবীবাদই ধর্মসূত্র।
তাই 'মদনধর্ম্মোৎসব'ও ভক্তিবাদই। তবে, সে ভক্তি আশিরনখ নারীবাদী এবং সেখানে কাঁটাতার নেই পরমাত্মা-জীবাত্মার দুই মনোদেশের মধ্যে।

নিকষিত হেম

বাঙালির কাব্যে, পূর্ব ও মধ্য ভারতের আখরে রাধা-কৃষ্ণ উদ্দাম প্রেম করে থাকলে বেশ করেছেন। কারণ, তাঁরা নিকষিত হেমের সন্ধানী। শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ ঈপ্সিত প্রেমটি প্রথম করছেন জয়দেবে। এই প্রথম 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' কাতর আর্তি জানাচ্ছেন তাঁর শ্রীমতীর কাছে— 'দেহি পদপল্লব মুদারম্'। এই প্রথম শ্রীরাধা তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-সনে পিরিতি করছেন চণ্ডীদাসে। এই প্রথম বিদ্যাপতির কলমে ভিজে গিয়ে 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে' রেখেও হৃদয় জুড়োতে পারছেন না। 'গোপালতাপনী' বা উপনিষদের উপগ্রহ পুরাণকথায় আমাদের ঘরের মেয়ে রাধার নামগন্ধ নেই। মাত্রাহীন কামকীর্তন থাকলেও কৃষ্ণের বন্ধু রাধা অনুপস্থিত বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ বা ভাগবত পুরাণে। কারণ, পুরাণকারেরা আত্মরতির সন্ধান করছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্তারা, যাঁদের মহাগুরু স্বয়ং জয়দেব, তাঁরা রাধাভাবে জারিত। তাঁদের 'মন উচাটন নিশ্বাস সঘন'।
'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন'। রাধাভাবে জারিত আর এক আনন্দময় মানুষের লেখা। রবীন্দ্রনাথের। হ্যাঁ, এর পরও রয়েছে এই পঙ্‌ক্তিও— 'বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি।' কিন্তু এই 'ভোগ' মোটেই পুরাণকারদের কামভাবনার রতিভোগ নয়। রবীন্দ্রনাথ আরও এক আস্তর এগোলেন— 'চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন! তাঁহার প্রেম 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা'। তাই বিরহানলে চণ্ডীদাসের রাধা বলেন— 'মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন/তোমারে করিব রাধা/পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব/দাঁড়াব কদম্বতলে'।
পদাবলি সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণের পাশে তাঁর শ্রীরাধা ছাড়া আর কোনও মেয়েকে দেখতে রাজি নয়। মধ্যে যে সব চন্দ্রাবলীদের আবির্ভাব, তাঁরা লোককথা সূত্রে, পালাগান সূত্রে এবং খানিক কীর্তনের নাটকীয়তায় নির্মিত। মূল ছবিটি রাধাকৃষ্ণেরই এবং মূল চরিত্র রাধাই। সেখানে কেউ রাধাকেই রুক্মিণী ভাবতে পারেন, রুক্মিণীকেই রাধা। অষ্টসখী-সহ এঁদের সবাইকে লক্ষ্মী ভাবতে পারেন কেউ। ভাবতে পারেন, কৃষ্ণের এই সব স্ত্রীই আদতে হ্লাদিনী বা হলাদিনী শক্তি, যেখানে ভগবান বিষ্ণু নিজেকে আস্বাদন করার জন্য নিজেকেই ভেঙে দুই হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্বের নানা স্তরে নানা কিছুই ভাবা যেতে পারে। আবার আকাশ খুশি মাটির বাঁশি শুনেও। বাঁশিরও নানা ফের। সুরসংযোজনার প্রযুক্তিতে নানা সংখ্যার ছিদ্র তাতে। কোথাও অষ্টভার্যার ইঙ্গিতে আট, কোথাও সাত, কোথাও অন্য-অন্য। কিন্তু পাখির ডাক যেমন কূজন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনির স্থায়ী রণন 'রাধা'। সে রাধা সমাজের সাধারণ ছাঁচের ঊর্ধ্বে এক শিল্পভাবনা। সে শ্রীরাধা কোনও ধর্মতত্ত্ব, কোনও পুরাণের নিগড়ে বন্দি নন। এই কৃষ্ণকাহিনিই, এই 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'ই বাঙালির প্রাণের আরাম। পুরাণকথার কল্পনাকুঞ্জের নিমন্ত্রণপত্রটি বাঙালি গ্রহণ করেনি। বাঙালি কবি নজরুল ইসলাম চান, 'বনে নয় শ্যাম, মনোমাঝে যেন নূপুর বাজে'।
বহু পথ পেরিয়ে এসে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালি পেয়েছে তার ধর্মমন্ত্র, প্রেমের আখর— 'আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন, মিলনমাধুরী যুগলমুরতি'।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

বাঙালি পেয়েছে তার ধর্মমন্ত্র, প্রেমের আখর— 'আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন, মিলনমাধুরী যুগলমুরতি'

(উদ্ধৃতির পুরনো বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত)

প্রায় হারিয়ে যেতে বসা কীর্তনের প্রবাহ আবার শ্রোতার মনের আরশিতে ধরা দিয়েছে তাঁর কণ্ঠের লালিত্যে। কীর্তনশিল্পীর পাশাপাশি বিধায়ক পরিচিতিও যোগ হয়েছে তাঁর নামের পাশে। **অদিতি মুনশি**র সঙ্গে আলাপচারিতায় **পারমিতা সাহা**

‘কেত্তন’ থেকে কীর্তন
অথ অদিতি কথা

সন্ধ্যা ঘনাত যখন পাড়ায় পাড়ায়, তখন বাগুইআটির দক্ষিণপাড়ায় এক ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছাদ ভরে উঠত সুরের আলোয়। পাড়া জুড়ে লোডশেডিংয়ের নীরবতা। কিন্তু এ আবাসের বাসিন্দারা কেউ গলা ছেড়ে গাইছেন, কেউ তবলায় তাল তুলছেন, কেউ মনেই সুর ভাঁজছেন... বাড়ির কচিকাঁচারাও শামিল গানভুবনে। তখন এফএম-এ হালফিলের গানের রমরমা হলেও এ বাড়িতে ভোর থেকে রাত হয় রাগাশ্রয়ী গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতির সুরালোকে। এহেন পরিবারের এক কন্যে অদিতি মুনশির মধ্যে সঙ্গীতের শিকড় তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি পরিণত হওয়ার আগেই ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সুর-তাল-হারমোনিয়ামের নিগড়ে বাঁধা তাঁর ছেলেবেলা। কীর্তনের প্রতি মোহ জন্মেছে পরবর্তীতে, তার পিছনেও রয়েছে পারিবারিক যোগ। তখনও অবশ্য মন্দির বা ঠাকুরবাড়ির ঘেরাটোপেই বন্দি কীর্তন, সেখানে তা ‘কেত্তন’।

সরস্বতীর আরাধনায়

অনুষ্ঠানের শোভা বাড়াতে কিংবা গানের অভিজাত সমাজে তার স্থান কোথায়? প্রায় হারিয়ে যেতে বসা গানের এ ধারা আবার শ্রোতার মনের আরশিতে ধরা দিয়েছে অদিতির কণ্ঠের লালিত্যে, উচ্চারণের পটুতায়। কিন্তু সরগমের আরোহণ-অবরোহণের মতো যাঁর জীবনেও ওঠানামা অবিরত, তেমনই এক অষ্টাদশীর পক্ষে এমন বিচিত্র পছন্দের রসদ জুগিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। ছিল না তাঁর পরিবারের পক্ষেও। তবুও কী ভাবে সম্ভব হল এই মিলন?
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে নিত্যদিনের চাওয়াপাওয়ার সঙ্গে অল্প অল্প আপস করে ছোটরা যেমন বেড়ে ওঠে, অদিতিরও তেমন ভাবেই বড় হওয়া। তবে তফাত এক জায়গায় ছিল, সেটা বাঙালিয়ানায়, বাড়ির পরিমণ্ডলে। ‘‘বাচ্চাদের এখন রাইমস শোনানো হয়, আমার ছোটবেলাতেও হত, কিন্তু বাবা আমাকে ছড়ার গান শোনাত। জপমালা ঘোষ শোনাত। এখানে আমার বেড়ে ওঠাটা ভিন্নতর। বাংলা সংস্কৃতির প্রতি টান গভীর হয়েছে। বাড়িতে মা, কাকিমা, জেঠিমা এদের দেখেও সাবেকিয়ানাটা মনে চিরস্থায়ী। বাড়িতে সকাল সন্ধে পুজো হত, আমাদের প্রত্যেক ভাইবোনকে প্রার্থনা করতে হত। আজও স্নান করার পরে মনে হয়, কতক্ষণে ঠাকুর প্রণাম করব,’’ বললেন অদিতি। এখন অবশ্য তাঁর পরিচিতি কীর্তন গায়িকার আবর্তে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি বিধায়কও। কথা হচ্ছিল তাঁর গানের স্কুলে বসে। বাগুইআটিতেই একটি ফ্ল্যাটে সাজিয়েছেন তাঁর স্বপ্নের স্কুল।

বলি ষোলো আনা দে, না দিলে পার করি না

ফ্ল্যাটের ইন্টিরিয়রে আধুনিক রুচির সঙ্গে মিশেছে অদিতির আধ্যাত্ম ভাবনাও। মা সরস্বতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানা বিভঙ্গের মূর্তি শোভা পাচ্ছে অন্দরে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগেরও ঝলক মেলে। ঢিলেঢালা প্যান্ট আর ওভারসাইজ়ড টি শার্ট পরে সোফায় আরাম করে বসে বললেন, ‘‘প্রথম গান শেখা মায়ের কাছে। ছোটবেলায় মা রেওয়াজ করতে বসলে আমি গাইতে শুরু করতাম, অবশ্য সেটা ‘গান’ কম, চিৎকার বেশি (হেসে)। আমার দিদা খুব ভাল ভক্তিগীতি গাইত, মামাবাড়ি গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা শুনে, গান তুলে আমার সময় কেটে যেত। সকলে বলত আমার গলায় সফট সং খুব ভাল

> বাড়িতে পুজোর পরে প্রত্যেক ভাইবোন প্রার্থনা করতাম। আজও স্নান করার পরে মনে হয়, কতক্ষণে ঠাকুর প্রণাম করব।

খোলে। তবে যদি ‘কীর্তন’ এর কথা বলেন, তা হলে তার শুরু মাধ্যমিকের সময় থেকে। আমার অ্যাডিশনাল পেপার মিউজ়িক ছিল, শিখতে হত পদাবলি কীর্তন। তখন আমি শেখা শুরু করি স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, আমার প্রথম প্রথাগত শিক্ষাগুরু।’’ মায়ের মতো অদিতির বাবার গলাতেও সুরের বসত। প্রথাগত তালিম না থাকলেও মেয়ে যখন গাইছে, কোথাও সুরে ভুলচুক হলে খাতায় লিখে রাখতেন মণীন্দ্রনাথ মুনশি। বাবার এই ‘নজরদারি’র কাছে ঋণ তো ইহজন্মের।
পড়াশোনার কারণে কীর্তনের সঙ্গে যোগাযোগ, কিন্তু তার পর এই গানের মধ্যে যেন অকূল পাথারের খোঁজ। যদিও তখনও অবধি শেখা হয়েছে ‘দেখলাম চিকণকালা গলায় মালা..’, কিন্তু কোথাও গেলে অনুরোধ আসত ওই কীর্তনটাই শোনানোর জন্য। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে ঠিক করলেন, এবার পড়াশোনা করবেন গান নিয়েই। বাড়ি থেকে বাধা কোনও দিনই ছিল না, শুধু জোর দেওয়া হত ভালবেসে বিষয়টাকে জানার প্রতি। রবীন্দ্রভারতীতে পড়তে গিয়ে দেখলেন সামনে গানের ভুবন। কথা বলতে বলতে অদিতির হাত চলে যায় চুলে। কপালে ছাপিয়ে আসা কোঁকড়া চুল এখন অবশ্য সাঁল-র দৌলতে ‘স্ট্রেট’। ‘‘তখন থেকেই বিভিন্ন রকম গানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও শেখা। তিমিরবরণ ঘোষের কাছে পুরাতনী বাংলা গান, কঙ্কণা মিত্রের কাছে কীর্তন শিখেছি। তার পরে আমার গুরুমা সরস্বতী দাসের কাছে কীর্তন শিক্ষা শুরু হয়। পাশাপাশি চলেছে ক্লাসিক্যাল, নজরুলগীতি, তবলা, শ্রীখোলের তালিম।’’ মন চাইছে তখন কীর্তনের রূপসাগরে ডুব দিয়ে কাঁচাসোনার খোঁজ পেতে। বিষয়টা নিয়ে মাস্টার্স করতে। অভিভাবকদের মনে প্রশ্ন, পড়া তো যায়, কিন্তু পেশা কী হবে?

গানের স্কুলে কচিকাঁচাদের সঙ্গে

ঠিক করেছিলাম মঞ্চে কীর্তন গাইব, যে দিন শ্রোতারা সম্মানের সঙ্গে তা শুনবেন। তা না হলে কীর্তন আমার পেশা হবে না।

পরিবারের হাল ধরতে মেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। ''তখনও বাবার সমর্থন পেয়েছিলাম। যখন আমি শিখেছিলাম, সেটা কীর্তন কম, কেত্তন ছিল বেশি। আমার বিষয়ের নামটা শুনলেই সকলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাত। যেন এটা আবার পড়ার বিষয়! একটা অস্বস্তি হত। গান নিজগুণে তো শ্রেষ্ঠ, তাই ঠিক করেছিলাম সে দিনই আমি মঞ্চে কীর্তন গাইব, যে দিন সামনে বসে থাকা মানুষেরা সম্মানের সঙ্গে শুনবেন। সেটা না হলে কীর্তন আমার ভালবাসা হয়েই থাকবে, পেশা হবে না। কিন্তু কী ভাবে যেন সবটা এক হয়ে গেল,'' শিল্পী তখন আনমনা। সরু, লম্বা আঙুল অজান্তেই নেড়ে চলেছে শরবতের গ্লাসে রাখা চামচ।

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়...

অদিতির জীবনে এই 'এক হয়ে যাওয়া'র পিছনে রিয়্যালিটি শো 'সারেগামাপা'র ভূমিকা অনেকটা। ''আমি আর বাপি বলতাম, ওখানে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, আমি কিছুতেই সুযোগ পাব না। কিন্তু মা বলত, গিয়ে দ্যাখ না, তোর তো হারানোর কিছু নেই। মায়ের ইচ্ছেতেই এর আগে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হবে না আমার। তাই ওখান থেকে আসা চিঠিটা দু'দিন খুলিনি। তার পর মায়ের খুব বকুনি খেয়ে চিঠিটা খুলি। দেখি, সুযোগ পেয়েছি অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে কীর্তনে গ্রেডেশন করার! কীর্তন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে তৎকালীন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছিলাম। ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছিলাম... সে সময়েই টিভিতে একদিন সারেগামাপা-র অডিশনের বিজ্ঞাপন মায়ের চোখে পড়ে,'' তাঁর রিনরিনে গলার স্বরে যেন সুর খেলে যায়। প্রতিযোগিতায় গাওয়ার জন্য নির্বাচিত হলেও বাধা তখনও ছিল। শুনলেন, যত দিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেন, তত দিন বাড়ি যাওয়া চলবে না। দিনরাত চলবে প্রশিক্ষণ। কিন্তু তাঁর বাড়িতে না থাকা মানে একটা আয় বন্ধ হয়ে যাওয়া। সেটা মেনে নেওয়া অদিতির পক্ষে ছিল ভীষণ মুশকিল। ''কিন্তু তখন শোয়ের পরিচালক অভিজিৎ সেন বলেন, তুমি যদি এখানে একশো শতাংশ দিতে পারো, তা হলে তোমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না, আর সঙ্কটেও পড়তে হবে না। তার পর সব কিছু কেমন যেন স্বপ্নের মতো হয়ে গেল! এত মানুষের ভালবাসা পাব কল্পনাও করিনি। ঈশ্বরের কাছে আমি চিরঋণী,'' নিষ্পাপ চোখে তখন স্মৃতির আনাগোনা।

এর পর অদিতির সামনে আগল খুলে দিল অন্য এক জগৎ, যেখানে 'কীর্তনশিল্পী' কথাটা প্রথম শুনতে পাওয়া, মঞ্চের সামনে মুগ্ধ শ্রোতার ঢল... ''তথাকথিত 'কমার্শিয়াল' মঞ্চেও পারফর্ম করেছি, যেখানে আমার পরে সুখবিন্দর সিংহ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতার পরে প্রথম অনুষ্ঠান ছিল অসমের বিশ্বনাথ চারলি-তে। সেখানে দেখেছি, সাউন্ড বক্সের স্ট্যান্ড সরিয়ে বক্স ধরে চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে, যাতে ওই জায়গাটুকুও নষ্ট না হয়! বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অনুষ্ঠান

গানই তাঁর অক্সিজেন

করতে গিয়েছি, সকাল এগারোটা থেকে ওখানে মানুষেরা বসে আছেন। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন ভিড় সামলানোর জন্য। একই রকম উচ্ছ্বাস দেখেছি, সিঙ্গাপুর, ইউকে, ইউএস, অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠান করতে গিয়েও। সব যেন স্বপ্ন।''

তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো, আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে

লাবণ্যময়ী অদিতির জন্য বিয়ের প্রস্তাবেরও কমতি ছিল না। দেবরাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব তখনই এসেছিল। কিন্তু দুই পরিবারের ফারাক বিস্তর। বাগুইআটির মুনশি বাড়িতে যেখানে নিপাট গানবাজনার আবহ, জ্যাংরার চক্রবর্তীরা সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী পরিবার। তা হলে এই গাঁটবন্ধন হল কী ভাবে? ''একেই বোধহয় বলে কপাল! দুটো চাহিদা ছিল আমার পরিবারের। দূরে বিয়ে দেওয়া হবে না, আর গানটা যেন চালিয়ে যেতে পারি। দুটোই এক্ষেত্রে সম্ভব ছিল। দেবরাজের সঙ্গে দেখা করে মনে হল, 'রাজনীতির লোক' সম্পর্কে আমার মনে যে ছবিটা ছিল তার সঙ্গে যেন মিলছে না। খুব সাধারণ একটা মানুষ। রুচিশীল এবং গুছিয়ে কথা বলে, যেটা ভাল লেগেছিল,'' বলতে বলতে হাতের সোনার বালাটা নাড়াচাড়া করছিলেন অদিতি। শাখা-পলা-বালা, সিঁথিতে সিঁদুর... নিপাট সাবেক ছবি ফুটে ওঠে তাঁর অবয়বে।
২০১৮ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর দেবরাজ যতটা হইহই করে বাঁচতে ভালবাসেন, অদিতি ততটাই অন্তর্মুখী। ''বেড়াতে গেলে দেবরাজ কোনও কিছু বাদ দেবে না, সব দেখতে হবে, লোকাল কুইজ়িন খাবে।

দেখলাম চিকণকালা গলায় মালা... অদিতির প্রিয় গান

পুরস্কার নিচ্ছেন তৎকালীন রাজ্যপালের হাত থেকে

কীর্তন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যপালের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছিলাম। ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছিলাম।

আর আমি খুঁজি বাঙালি খাবার। একদম বাইরের খাবার ভালবাসি না। হনিমুনে সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলাম। আমাদের তো বিয়ের আগে খুব একটা কথা হয়নি, তাই পরস্পরের পছন্দ-অপছন্দ বিশেষ জানতাম না। যাই হোক, ওখানে গিয়ে আমার এত ঘুরতে ভাল লাগছিল না, একটা জায়গায় গিয়ে একদম চুপ করে বসে ছিলাম। তখন ও বুঝতে পারল ঘোরাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে গেলে আমি ছবি তুলতে ভীষণ ভালবাসি। তখন বর হচ্ছে আমার মডেল,'' তাঁর চোখে হাসি খেলে যায়। সেই সঙ্গে আরও একটা গোপন কথা জানালেন অদিতি। বিয়ের পর থেকে গত চার বছরে এক দিনের জন্যও তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়নি। বিষয়টা তাঁকেও অবাক করে, ''আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের তো ঝগড়া হয় না, তা হলে কি আমাদের মধ্যে ভালবাসা নেই? লোকে বলে প্রেমের বিয়েতে দু'জনে ভাল বন্ধু হয়। কিন্তু আমাদের তো সম্বন্ধ করে বিয়ে। বিয়ের পরে আমার যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, যেমন সিনেমা দেখা, বাইরে খাওয়া, সেটা দেবরাজের কারণেই,'' অদিতি-দেবরাজ আজ পরস্পরের বেস্ট ফ্রেন্ড।

সেই নারী, হাতে তরবারি

অদিতি মুনশির বিধায়ক পরিচয়কে নতুনই বলা যায়। গত বছর রাজ্যসভা নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া অবাক করেছিল অনেককেই। কিন্তু কী ভাবে উঠে এসেছিল তাঁর নাম? পরিবার থেকে কি এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল? ''একেবারেই তা নয়। এরকম ইচ্ছাও কখনও প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু একটা কথা মনে হত, ভগবান যখন আমাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দিয়েছেন, তখন নিজের মতো করে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করতাম ২০১৫ সাল থেকেই। তাই হঠাৎ করেই যখন দল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তখন মনে হল, দেখা যাক কী হয়,'' প্রত্যয়ী অদিতি। আসলে পারিবারিক রোজনামচাতেই যখন রাজনীতির ওঠাবসা, তখন তার প্রতি 'ভয়' বা 'অস্বস্তি' সময়ের সঙ্গে কেটে যাওয়া স্বাভাবিক। ''আমার বর ও শ্বশুরমশাইকে দেখে মনে হল, এরকম মানুষেরাও 'রাজনীতি'র সংজ্ঞার মধ্যে যখন পড়েন, তখন ধারণাটা বদলে গেল। আমাদের বাড়িতে দিনরাত বহু মানুষ আসছেন তাঁদের সমস্যা নিয়ে, বিশেষ

অদিতি যতটা অন্তর্মুখী, দেবরাজ ততটাই হইহই করতে ভালবাসেন

আমার বর ও শ্বশুরমশাইকে দেখে মনে হল, এরকম মানুষও ‘রাজনীতি’র সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন, তখন ধারণাটা বদলে গেল।

করে অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা। যেন একটা সভা! তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, সাহায্য করা, বিপদে ছুটে যাওয়া, কোভিড পরিস্থিতিতে যে ভাবে আমার বরকে ওর টিম নিয়ে কাজ করতে দেখেছি... সেই ইয়ুথফুল এনার্জি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। রাজনীতিতে ভাল মানুষ না এলে সেটা ভাল হবে কী ভাবে?’’ প্রভাবশালী শ্বশুরবাড়ির সাহায্য কি রাজনীতির অলিন্দে আপনার অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে? একটু ভেবে বললেন, ‘‘দেখুন, আমাদের দু’জনের কাজের জায়গাটা আলাদা। কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করি না। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি কোনও কিছু বুঝতে না পারি, তা হলে অভিভাবকসুলভ সাহায্য পাই সব সময়েই।’’

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অদিতি এখন চক্রবর্তী পরিবারের ‘ফেস’ বললে অত্যুক্তি হবে না। ভোটের ময়দান হোক বা রাজনৈতিক র‍্যালি, সমাবেশ... সব জায়গাতেই তাঁর সতেজ উপস্থিতি। সেই জায়গা থেকে সম্পর্কে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজন কখনও অনুভব করেছেন? সুরেলা কণ্ঠস্বর আচমকা চড়ার দিকে, ‘‘সম্পর্ক ভাল রাখতে গেলে ব্যালান্স করতে হয় নাকি? সম্পর্ক ঠিক তখনই থাকবে, যখন আপনি ব্যালান্স করবেন না। আমি আমার মতো, সে তার মতো। সম্পূর্ণ আমিকে যখন অন্যজন মানিয়ে নেবে, তখনই সম্পর্ক পরিপূর্ণতা পায়।’’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আপনার গান ভালবাসেন। কেমন সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে? ‘‘ওঁকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে দিদি ভাবতে বেশি পছন্দ

রিসেপশনের দিন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

করি। উনি আমার সঙ্গে যতবার কথা বলেছেন, অভিভাবকের মতো মনে হয়েছে,'' গলা আবার খাদে নেমে এসেছে, কিন্তু তাতে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের জোর। ''একটাই আক্ষেপ, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে রাজনীতিটা চলছে, সেটা একটু অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয়, কেউ খুব খারাপ একজন মানুষ, তা হলেও তাঁর চেয়ারের গুরুত্ব রয়েছে। আমি কারও প্রতি সেই ভাষাই প্রয়োগ করব, যেটা আমার শিক্ষা অনুমতি দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিধায়ক বলে বিরোধীপক্ষের কাউকে সম্মান দেব না, সেটা আমার শিক্ষা নয়। এটা বর্তমান রাজনীতির অবনমন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন সম্মাননীয় মানুষ। এখানে আমি কোনও ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলছি না, তাঁর পদের কথা বলছি। কোনও ভাষা প্রয়োগের আগে ভাবা জরুরি কোন পদের উদ্দেশে তা ব্যবহার করছি। পদের একটা সম্মান আছে, সেই গরিমাকে নষ্ট করা উচিত নয়,'' দলের প্রতি তাঁর বার্তা স্পষ্ট। রাজনীতিতে আসা অদিতির বেশি দিন নয়, কিন্তু এ নারীর মধ্যে সংশয় নেই রাজনৈতিক ভাবধারা নিয়ে।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের

ছোটবেলা থেকেই লড়াই করে বড় হয়েছেন অদিতি। একটা গানের স্কুল খোলা ছিল স্বপ্ন, এখন এটাই তাঁর জগৎ। এর পিছনেও একটা ভাবনা কাজ করেছে। ''বহু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এটা যদি আগে জানতাম, তা হলে হয়তো আর একটু এগোনো যেত। তাই বাকিদের সেই জায়গাটা দিতে চাই। অনেক দিন ধরে সঞ্চয় করে তবে স্কুলটা গড়তে পেরেছি। এখানে শুধু কীর্তন নয়, ভয়েস ট্রেনিং করানো, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখানো হয়। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ওয়ার্কশপও করান ছাত্রছাত্রীদের,'' আলগোছে চোখের উপর নেমে আসা চুল সরালেন। তাঁর ডানহাতে পোখরাজের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ভাগ্যে বিশ্বাস করেন? হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এটা মা-বাবার কথায় পরা। তবে আমার জীবনে যা যা হয়েছে, তাতে ভাগ্যকে বিশ্বাস করতেই হয়।''

আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে দিদি ভাবতে বেশি পছন্দ করি। উনি যতবার কথা বলেছেন, অভিভাবকের মতো মনে হয়েছে।

বিধায়কের দায়িত্ব সামলানো, গানের স্কুল, নিজের অনুষ্ঠান সবকিছু সামলান কী ভাবে? ''এটাও নির্ভর করছে নিজস্ব ভাবনার উপরে। মানুষের উন্নতি করা, সুখে দুঃখে পাশে থাকা, এটা যদি রাজনীতি হয়, তা করতে বেশি সময় লাগে না। আমার অফিসে বয়স্ক মানুষেরা এসে বলেন, 'দিদিভাই ভাল আছ?' 'মা ভাল আছ?' আমি জিজ্ঞেস করি, আপনার সমস্যা কী? উত্তর আসে, 'কোনও সwমস্যা নেই, তোমাকে দেখতে এলাম।' এ ভাবেই কাজটা করে যেতে চাই। চেষ্টা করেছি সরকার সকলের জন্য যে সুযোগসুবিধা দিয়েছে, সেটা যেন সত্যিই সকলের কাছে পৌঁছে যায়, মাঝপথে হারিয়ে না যায়। রাজনীতি আমার পেশা নয়। আমি মানুষের পাশে থাকতে ভালবাসি। তবে আমার আসল অক্সিজেন হল গান।''

জীবনের উদ্দেশ্যগুলো বরাবরই তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার। সেটা কীর্তনে মন-প্রাণ দেওয়া হোক বা রাজনীতিতে পদার্পণ। তাঁর দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি...

প্লেব্যাকেও কীর্তন

অদিতির প্রথম প্লেব্যাক 'তুষাগ্নি' ছবিতে। তার পর বহু সিরিয়ালে গেয়েছেন। 'গোত্র' এবং 'বিসমিল্লা' ছবিতে কীর্তন গেয়েছেন। নতুন ছবি 'কথামৃত'তেও কীর্তন গাইবেন অদিতি মুনশি।

অনল অতল

অভিজিৎ তরফদার

একরকম জোর করেই নিয়ে গেল সপ্তর্ষি।

"একবার গিয়েই দেখ না। খারাপ লাগবে না। অন্য রকম।"

পৌঁছে হকচকিয়ে গেল অক্ষর। এত মানুষ?

ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহ অক্ষরের নেই। কী হবে জেনে? তার চেয়ে যেমন আছি তেমন থাকাই ভাল।

অক্ষর বলেছিল, "ভাগ্য-টাগ্য আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে। আর সত্যিই যদি ভাগ্য বলে কিছু থাকে, তা কখনো পাল্টানো যায়?"

সপ্তর্ষি জবাব দিয়েছিল, "যায়। গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব পরিবর্তন করে মানুষ নিজের ভাগ্য পাল্টাতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের জ্যোতিষীর পরামর্শ।"

"জ্যোতিষীর আবার সত্যি-মিথ্যে আছে নাকি?"

"অবশ্যই আছে। মিথ্যে-জ্যোতিষীতে বাজার ছেয়ে গেছে। সত্যি জ্যোতিষী হাতে গোনা।"

"যেমন?"

“যেমন... যে-জ্যোতিষীর কাছে তোকে নিয়ে যাচ্ছি।”

“আমি... জ্যোতিষীর কাছে? পাগল? আমি হাত-টাত দেখাতে পারব না।”

“তোকে কিচ্ছু দেখাতে হবে না। দেখাব আমি। তুই পাশে বসে থাকবি। বেরিয়ে এসে বলবি, কেমন লাগল।”

সেই ভাবেই অক্ষরের আসা। লোকে যেভাবে সিনেমা-থিয়েটার-ম্যাজিক শো দেখতে যায়। অজানা জিনিসের প্রতি কৌতূহল। এবং খানিকটা সময় কাটানো।

জায়গাটা কলকাতার বাইরে। তবে যোগাযোগব্যবস্থা খুব ভাল। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছনো যায়। ফলে কলকাতার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও ভিড়-দূষণ-শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে থাকা সম্ভব। প্রকৃতি এখানে উদার। ফুলভারে আনত গাছের সাক্ষাৎ প্রায়শই মেলে।

শাস্ত্রীমশাইয়ের আখড়ায় ঢুকে সত্যিকারের অবাক হল অক্ষর। আজকাল অবাক না হতে হতে মানুষ বিস্ময়বোধই হারিয়ে ফেলেছে। এখানে অবাক করার সমস্ত উপকরণই হাজির।

এ যেন শহরের মধ্যে শহর।

একদিকে মন্দির। খোলকরতাল বাজছে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে জাঁকজমক করে। জনতা ভিড় করে আরতি দেখছে। অন্য দিকে খাবার স্টল। নামমাত্র দক্ষিণায় লুচি আর বোঁদে পরিবেশন হচ্ছে স্টলে। সেখানেও জনসমাগম কম নয়। ভেতরে পায়ে-চলা পথ। পথ যেখানে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই জ্যোতিষার্ণবের বিশাল কাট আউট। ভক্তির স্রোত বইছে সর্বত্র।

সপ্তর্ষি গদগদ-গলায় জিজ্ঞেস করল, “কেমন দেখছিস?”

অক্ষরকে চুপ করে থাকতে দেখে ঠেলা দিল, “বললি না, কেমন দেখছিস?”

দায়-এড়ানো ভঙ্গিতে অক্ষর জবাব দিল, “ভালই তো!”

সপ্তর্ষি সন্তুষ্ট হল না, বলল, “শুধু ভালই তো?”

“দেখছি, বিপণন কাকে বলে। একটা মাল বাজারে আনলেই চলে না। তা খাওয়াতে গেলে যা লাগে তার নাম মার্কেটিং।”

জবাবে খুশি না হয়ে সপ্তর্ষি বলল “চল, ভেতরে যাই। টার্ন চলে গেলে আবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।”

যে-তিনতলা বাড়িটায় শাস্ত্রীমশাইয়ের চেম্বার, তার একতলায়

রেজিস্ট্রেশন এবং ওয়েটিং হল।

দোতলায় কনসালটেশন রুম। তিনতলায় জ্যোতিষী থাকেন। অক্ষরের প্রবল ইচ্ছে হল তিনতলায় গিয়ে দেখে কতখানি অ্যামেনিটিজ়-এ তিনতলার ভদ্রাসনখানি সাজানো। ইচ্ছেটা সপ্তর্ষির কাছে প্রকাশ করতে সপ্তর্ষি যে-দৃষ্টিতে তাকাল, ত্রেতা যুগ হলে নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেত অক্ষর।

সপ্তর্ষি যখন রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছিল, উঁকি মেরে অক্ষর দেখল, দক্ষিণার টাকায় অক্ষরের আধমাসের সংসারখরচ হয়ে যেত। সপ্তর্ষির সিরিয়াল ছয়। তিন জন করে ওপরে উঠছে। প্রথম তিন জন চলে গেছে। পরের তিন জনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে আর একবার অঙ্কটা ঝালিয়ে নিল অক্ষর। দিনে দশটা সেশন। প্রত্যেক সেশনে পনেরো জন। সপ্তর্ষি সাত নম্বর সেশনের ছ' নম্বর মুরগি। অর্থাৎ প্রতিদিন একশো পঞ্চাশ জনকে বধ করেন জ্যোতিষশাস্ত্রী। একশো পঞ্চাশকে রেজিস্ট্রেশনের অ্যামাউন্ট দিয়ে গুণ করে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল অক্ষরের। সারা জীবন গাধার খাটনি খেটেও শাস্ত্রীমশাইয়ের একদিনের উপার্জনকে ছুঁতে পারবে না অক্ষর।

মন-খারাপ করা চিন্তা সরিয়ে রেখে ওয়েটিংরুম-এর অন্যান্যদের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। মুখোমুখি যে স্বামী-স্ত্রী বসে আছেন, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, স্বামীর দৃষ্টি ঘোলাটে, মাঝেমাঝেই জল চাইছেন, ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে ঢেলে জল খাওয়াচ্ছেন স্ত্রী, অক্ষর কল্পনা করে নিল, স্বামী নিশ্চয়ই অসুস্থ। দুরারোগ্য কোনও অসুখ। ডাক্তার জবাব দিয়েছেন। সব চিকিৎসাই শেষ। বাকি আছেন জ্যোতিষী। তাঁকে ধরে গ্রহের দোষ খণ্ডন করিয়ে আয়ু যদি কিছুটা বাড়ানো যায়।

দরজার পাশে ছেলের হাত ধরে যে-প্রৌঢ় বসে আছেন, তাঁকে দেখে অক্ষরের যার কথা মনে পড়ে গেল তার নাম মগনলাল মেঘরাজ। তফাতের মধ্যে, মগনলালের চেহারায় আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আর এই মানুষটার ওই জিনিসটাই লিক করে বেরিয়ে গেছে। দু'খানা চোখ বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। সাফারি সুট-এর তিন আর চার নম্বর বোতামের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা ভুঁড়ি বেয়ে গলগল করে নেমে আসছে ঘামের স্রোত। অথচ করারও কিছু নেই, কারণ ফ্যান থাকলে স্পিড বাড়ানো যেত, সেন্ট্রাল এসিতে সেই প্রভিশন অনুপস্থিত। বাঁ হাতখানা ছেলের হাতের ওপর শক্ত করে বসে আছে। ডান হাতে একখানা শৌখিন ছড়ি। দুটো হাতই কাঁপছে। একবার ছড়িখানা হাত থেকে ফস্কে নীচে পড়ে গেল, ছেলে নিচু হয়ে কুড়িয়ে দিল। কিন্তু যে ভাবনাটা অক্ষরকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল তা হল, দু'হাতের দশ আঙুলেই তো পাথর বসানো আংটি। জ্যোতিষী যদি আরও কিছু প্রেসক্রাইব করেন সেগুলো পরা হবে কোথায়?

সপ্তর্ষির নাম ধরে কেউ ডাকল। সপ্তর্ষি উঠে দাঁড়াল। লিফট আছে। সিঁড়িও। অন্যরা লিফটের দিকে এগোলো। সপ্তর্ষির সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল অক্ষর।

ও হরি! ভেবেছিল দোতলায়ও বোধহয় তিন জন। কোথায় কী? এ তো মেলাতলা! পাঁপড়ভাজা বিক্রিটাই বাকি! এক বিশাল হলঘরে সারি-সারি চেয়ার। তিনখানা চেয়ার খালি হলে নীচ থেকে লোক তুলে গাদানো হচ্ছে। তবে এখানে বিনোদনের ব্যবস্থা মজুত। টিভি চলছে। বোতাম টিপে মেশিনে জল খাওয়ার বন্দোবস্তও বিদ্যমান।

টিভির পর্দায় চোখ রাখল অক্ষর। আর দেখতে শুরু করেই হাসি পেয়ে গেল।

এক স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। একমাত্র মেয়ে। দেখতে-শুনতে ভাল। অনার্স গ্র্যাজুয়েট। অথচ কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না। যেখানেই সম্বন্ধ করা হয় কোনও না কোনও ফ্যাকড়া ওঠে, আর বিয়ে ভেঙে যায়। পরিবারটির অবস্থা খারাপ নয়। টাকা-পয়সা কোনও ব্যাপার নয়। অথচ বিয়েটা হতে হতেও হয় না। শেষ অবধি খোঁজ পেলেন শাস্ত্রীজির। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই রত্নধারণের পরামর্শ দিলেন জ্যোতিষী। ছ'মাসের মধ্যে বিয়ে।

হাসি চাপতে-চাপতে অক্ষর দেখল অনেকেই বড়-বড় চোখ করে টিভির গল্প গিলছে। আচ্ছা, আজকালকার মেয়েরা বাবা-মায়ের মুখ চেয়ে বসে থাকে? আর যদি থাকেও, বর-বউ জুটিয়ে দেবার এত চ্যানেল, এত রাস্তা, বিয়ে হচ্ছে না হতে পারে? বস্তাপচা গল্প। আর সেটাই ফেঁদে কীভাবে মানুষকে বোকা বানানো যায় তার রাস্তা!

হঠাৎ একজন দু'খানা ফর্ম নিয়ে উপস্থিত। কীসের ফর্ম? চোখ বুলিয়ে দেখল। এক পিঠে ঠিকুজি-কুলজি। অন্য পিঠে শাস্ত্রীমশাইয়ের জন্য প্রশ্ন। প্রথম পাতায় যা-যা লিখতে হবে তা পড়ে ফেললে জ্যোতিষী কেন, পাড়ার ভবা পাগলাও ক্যান্ডিডেট সম্বন্ধে যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবে। সপ্তর্ষি মন দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করছে দেখে অক্ষর তার কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

প্লাস্টিকের চেয়ারে কি ছারপোকা হয়? এতদিন জানা ছিল, কাঠের চেয়ার ছাড়া ছারপোকা বাসা করে না। সেটা যে ভুল আজ তার প্রমাণ মিলল। আর মোটা প্যান্ট-এর কাপড় যে ছারপোকাদের দাঁতের কাছে নিতান্তই শিশু সেটাও হাড়ে হাড়ে টের পেল। একা ছারপোকা নয়, মশাও। যতবার হলের দরজা খুলে বাইরে থেকে লোক ঢুকছে বা ভেতরের লোক বাইরে যাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে শ'দেড়েক মশাও ঢুকছে বা বেরচ্ছে। রক্ত খেয়ে যাদের পেট বোঝাই তারা গৃহত্যাগ করছে। ঢুকছে ক্ষুধার্ত মশার পাল। ঢোকামাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে অপেক্ষমাণ মানুষের ওপর। অসহায় ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল ওপরে মশা নীচে ছারপোকাদের পেটে রক্ত চালান করতে করতে অপেক্ষা করছে কখন শাস্ত্রীজি দয়া করে পক্ষপুটে আশ্রয় দেবেন।

অবশেষে ডাক পড়ল। সপ্তর্ষি সামনে, পেছন পেছন অক্ষর, একটা প্যাসেজ পার হয়ে ঢুকল। মাঝারি সাইজ়ের ঘর। আর ঢুকেই তাজ্জব। এ তো হীরকরাজা!

মাথায় জরি-বসানো উষ্ণীষ, ঝলমলে চোগা চাপকান, দশ আঙুলে পাথরশোভিত আংটি, পায়ে নাগরা জুতো, সিংহাসনের আদলে তৈরি একটা চেয়ারে বসে মাঝবয়সি একজন মানুষ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

অক্ষর দেখল চারপাশে টিমটিমে আলো। আশেপাশে কী আছে ভাল করে নজর পড়ে না। একটাই জোরালো আলো ওপর থেকে ফোকাস করা আছে জ্যোতিষশাস্ত্রীর মুখের ওপর। থিয়েটারে যেমন হলের চৌহদ্দি অন্ধকারে রেখে ঠিক যেটুকু দেখানো দরকার সেটাই আলোকিত করা হয়। অক্ষর চোখ এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে দেখল একজন সুশোভিত মহিলা শাস্ত্রীজির কাছেই বসে আছেন। আরও একজন আছেন ঘরে। তাঁর সামনে ল্যাপটপ। চোখ ল্যাপটপের পর্দায় ঘোরাফেরা করছে। চন্দনের গন্ধ ঘরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করছে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে। তার ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছে যাচ্ছে ঘর অবধি।

অক্ষরের মনে হল খুব যত্ন করে এই ঘরের অন্তঃপ্রকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। যাঁরা করেছেন, তাঁদের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

ভদ্রমহিলাই প্রথম মুখ খুললেন।

"বলুন কী সমস্যা নিয়ে এসেছেন জ্যোতিষার্ণবের কাছে।"

সপ্তর্ষি মুখ খুলতে যাচ্ছিল, শাস্ত্রীজি ডান হাতখানা 'থেমে থাক' ভঙ্গিতে ওপরে তুললেন। সপ্তর্ষিও 'হাঁ-মুখ' বন্ধ করে ফেলল।

খসখসে গলার স্বর, কিন্তু উচ্চারণ পরিষ্কার, শাস্ত্রীজি বলতে শুরু করলেন, "আপনার তো সেই প্রপার্টি-ডিসপিউট। বাড়ি-জমির মালিকানা নিয়ে গন্ডগোল।"

অক্ষর দেখছিল, অসাধারণ অভিনয়। সপ্তর্ষি আগেও এসেছে। তা ছাড়া তার কাছ থেকে প্রশ্নের ছলে সব কিছুই জেনে নেওয়া হয়েছে। সপ্তর্ষির ফিল-আপ করা ফর্ম আগেই এসে গেছে ল্যাপটপের কাছে। ল্যাপটপ সমস্ত ইনফরমেশন সপ্তর্ষি ঘরে ঢোকার আগেই জ্যোতিষীকে সাপ্লাই করেছে। বাকিটা হাত তোলা এবং চোখ বন্ধ করে, যেন দেখতে

পাচ্ছেন এমন ভাব করে, সপ্তর্ষিকে শোনানো। অক্ষরের হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল।

সপ্তর্ষি ততক্ষণে লুটিয়ে পড়েছে। জ্যোতিষীর পায়ের কাছে মাথা, সপ্তর্ষি এটুকুই বলতে পারল, "আপনি সর্বদ্রষ্টা। এখন কী করলে সুরাহা হয় সেটাই বাতলে দিন।"

শাস্ত্রীজি চোখ খুললেন না।

বলে চললেন, "যতদূর মনে হচ্ছে প্রপার্টি আপনার ঠাকুরদার। মালিক আপনার বাবা, কাকা আর পিসি। ...কী, ঠিক বলছি?"

"একদম, একদম ঠিক।"

"ঠাকুরদার দুই ছেলের সন্তানরা প্রপার্টি বিক্রি করে দিতে চান। বাবা-কাকা বেঁচে আছেন?"

"কাকা নেই। বাবা না থাকারই মতো। কাউকে চিনতে পারে না।"

"তার মানে যা কিছু সিদ্ধান্ত আপনার আর কাকার ছেলেকে নিতে হবে। কিন্তু বাদ সেধেছেন পিসি।"

"পিসি আর তার ছেলে-মেয়ে।"

"তাঁরা রাজি হলে তবেই প্রপার্টি বিক্রি করা যাবে।"

"সেখানেই মুশকিল। পিসিকে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। পিসির ছেলেমেয়েরাও মা-অন্ত প্রাণ। মা না রাজি হলে তারাও 'হ্যাঁ' বলছে না।"

"পিসির এখন বয়স কত?"

"পঁচাত্তর তো পেরিয়েছেই।"

"ক'টা দিন অপেক্ষা করা যায় না?"

"ততদিনে আমাদেরও বয়স বেড়ে যাবে। কে বলতে পারে আমাদের মধ্যেও হয়তো মতের অমিল দেখা দিল। তাছাড়া টাকার সবারই প্রয়োজন। অফারও পাওয়া যাচ্ছে খুব ভাল।"

"হুম" বলে এতক্ষণে চোখের পাতা খুললেন জ্যোতিষী। তারপর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করলেন।

ভদ্রমহিলা সপ্তর্ষিকে বললেন, "কাজটা সহজ নয়।"

"জানি," সপ্তর্ষি বলল, "সহজ নয় বলেই তো শাস্ত্রীজির কাছে আসা। একমাত্র উনিই উদ্ধার করতে পারেন।"

"শুধু রত্ন ধারণ করলে হবে না।"

"বলুন কী করতে হবে?"

"যজ্ঞ করা প্রয়োজন।"

"করব যজ্ঞ," জেদি গলায় সপ্তর্ষি জবাব দিল।

"যজ্ঞের খরচ আছে।"

"কেমন খরচ?"

"নীচের কাউন্টার থেকে জেনে নেবেন। তাছাড়া শাস্ত্রীজি যাবেন-আসবেন, তার রাহাখরচ। অ্যামাউন্টটা কম নয়।"

"কাজ উদ্ধার হলে খরচ করতে আমরা তৈরি।"

পাশ থেকে ল্যাপটপ জিজ্ঞেস করলেন, "কোন থানা যেন আপনার?"

সপ্তর্ষি থানার নামটা বলল। ল্যাপটপে এন্ট্রি হল থানার নাম।

আবার প্রশ্ন: "ওসির নাম জানেন?"

ঘাড় নাড়ল সপ্তর্ষি।

এতক্ষণে ছবিটা পরিষ্কার হল অক্ষরের কাছে। যজ্ঞ হবে, যজ্ঞের নামে যা টাকা আদায় হবে তার একটা ভাগ পৌঁছে যাবে ওসির কাছে। 'না'-কে 'হ্যাঁ' করাতে পুলিশের চেয়ে করিৎকর্মা আর কে আছে? পিসি রাজি হবেন। ক্রেডিট নিয়ে বেরিয়ে যাবেন জ্যোতিষী।

ঘণ্টা বাজল। সঙ্কেত। তাদের টার্ন শেষ।

উঠে দাঁড়াল সপ্তর্ষি। পাশাপাশি অক্ষরও।

জ্যোতিষশাস্ত্রী অক্ষরকে দেখিয়ে বললেন, "সঙ্গে কে?"

"আমার বন্ধু। ও জ্যোতিষ বিশ্বাস করে না। আমিই জোর করে সঙ্গে এনেছি," সপ্তর্ষি জবাব দিল।

এই অবধি বলে, হঠাৎ কী হল, অক্ষরকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে গেল জ্যোতিষীর কাছে। তারপর ওর ডান হাতখানা শাস্ত্রীজির সামনে মেলে ধরে বলল, "একটু দেখবেন, ওর ভাগ্যে কী আছে?"

হকচকিয়ে গিয়েছিল ঘরের সবাই।

"এ কী করছেন, ওইভাবে কি দেখানো যায় নাকি?" বলতে বলতে ভদ্রমহিলা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন ওদের দিকে। শাস্ত্রীজিও, দেখে বোঝা যাচ্ছিল, অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন। ওদিকে সপ্তর্ষি নাছোড়। অক্ষরের হাতখানা শক্ত করে ধরে মেলে রেখেছে শাস্ত্রীজির সামনে।

একরকম বাধ্য হয়েই অক্ষরের হাতের রেখায় চোখ বোলালেন জ্যোতিষী। একটা আতসকাচ দিয়ে কীসব দেখলেন। তারপর শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখুন, হস্তরেখা বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। দরকার কোষ্ঠী। একমাত্র কোষ্ঠীবিচারই অভ্রান্ত তথ্য দিতে পারে।"

"তবু, যেটুকু দেখলেন?" সপ্তর্ষি ছাড়ার পাত্র নয়।

অক্ষরের চোখে চোখ রাখলেন জ্যোতিষী।

"আপনার বয়স এখন কত হল?"

"উনপঞ্চাশ পূর্ণ করেছি। এগোচ্ছি পঞ্চাশের দিকে।"

অক্ষরের চোখ থেকে চোখ সরালেন না জ্যোতিষী।

খসখসে গলায় উচ্চারণ করলেন, "আপনার হস্তরেখা বলছে, জীবনের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি আপনি দেখে যেতে পারবেন না। আয়ুরেখা হঠাৎই থেমে গিয়েছে। আর একবছরও আয়ু নেই আপনার।"

২

শুরুরও আগে একটা শুরু থাকে। সেটাই এবার বলে ফেলা যাক।

ছোটবেলায় পড়া একটা গল্প অক্ষরের বরাবরের পছন্দ। গল্পটা এইরকম: হাত দেখে একজনকে জ্যোতিষী বলেছিল, "তোমার তো ভাগ্যরেখাই নেই।" "ভাগ্যরেখা না থাকলে কী হয়?" প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিষী জানিয়েছিল, "ভাগ্যরেখা না থাকলে সেই মানুষকে দুর্ভাগ্য তাড়া করে।" খাপ থেকে তরোয়াল বের করে এক টানে ভাগ্যরেখা তৈরি করে জ্যোতিষীর সামনে রক্তাক্ত হাতখানা মেলে ধরে সেই ব্যক্তি বলেছিল, "এইবার?" নিজের ভাগ্যরেখা শুধু নয়, ভাগ্যও তৈরি করেছিল সেই স্বনামধন্য মানুষ।

মা যখন কপাল চাপড়ে বলত, "সবই আমার ভাগ্য! নইলে মানুষটা অমন টক করে চলে যায়?" রাগ হয়ে যেত অক্ষরের। মার সঙ্গে গলা ফুলিয়ে তর্ক করত।

"ভাগ্য ভাগ্য কোরো না তো! হতে পারে হাই প্রেশার ছিল। কিংবা ব্লাড শুগার। তা থেকেই হার্ট অ্যাটাক।"

মা জবাব দিত, "ওসব তো কত মানুষেরই থাকে। দেখেছিস তারা সব অমনি করে চলে যায়? বলা নেই কওয়া নেই, অফিসে গেল সুস্থ মানুষ, ফিরল অন্যদের কাঁধে চেপে!"

আর একটু বড় হয়ে মা-র অভিমানের জায়গাটা ধরতে পারত অক্ষর। মা যেন বলতে চাইত, "যাবার আগে একবার বলেও গেলে না? ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবলে না একবারও?"

তবে অন্তত যে লেখাপড়ায় লবডঙ্কা হয়েও বাবার চাকরিটা পেয়েছিল তাতে ভাগ্যের হাত খানিকটা থাকলেও থাকতে পারে। নিজের যোগ্যতায় কিছু জুটিয়ে নেবে এমন এলেম অন্তুর ছিল না। এটা তো ঠিক, বড় ছেলে হিসেবে অক্ষরেরই পাওয়ার কথা ছিল চাকরিটা। অক্ষর নিজেই বলেছিল, বাবার চাকরি অন্তুকে দেওয়া হোক। কারণ, অক্ষরের বিশ্বাস ছিল, নিজের যোগ্যতাতেই সে কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে।

নিজের ক্ষেত্রে ভাগ্যকে মাথা গলাতে দেয়নি অক্ষর। একটি উপযুক্ত চাকরির জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলেছিল। চাকরিটা যখন

সত্যিই পেল, মাকে গিয়ে প্রণাম করতে মাথায় হাত রেখে মা বলেছিল, "আমি জানতাম।"

এই যে ভাগ্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা, এবং সেটা মুখ ফুটে বলে ফেলা, তার জন্য বিপদেও যে পড়তে হয়নি তা নয়।

একটি প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের জন্য অনেকরকম প্রোগ্রাম করে। অনেকবারই ডাক এসেছে, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একবার আমন্ত্রণ আর ঠেকানো গেল না। যেতেই হল অক্ষরকে।

ভূত-ওঝা-কুসংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন সংগঠনের নেতারা। অক্ষর চুপচাপ বসে শুনছিল। মঞ্চে ওঠার ইচ্ছা তার ছিল না। একরকম জোর করেই তাকে মঞ্চে তুলে বলা হল দু'-চার কথা বলতে। একটু দ্বিধা করে অক্ষর শুরু করল।

"আপনারা জানেন, ভূত-ওঝা বাদ দিলেও হাজারটা কুসংস্কারে আমাদের রোজকার জীবন ভর্তি হয়ে থাকে। বেরনোর সময় হাঁচি পড়লে বড়রা বলেন, দু' দণ্ড বসে যা। ভাদ্রমাসে কোথাও গেলে পই পই করে বলে দেওয়া হয়, সংক্রান্তির আগেই যেন ফিরে আসা হয়। বিয়ের সময় ব্লাডগ্রুপ না মিলিয়ে, রক্তে থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা না করিয়ে, করা হয় কোষ্ঠীবিচার।

অত দূরে যাবার দরকার কী? আজকের অনুষ্ঠানে সভামঞ্চে যেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বসে আছেন, খেয়াল করে দেখুন, তাঁদেরও অনেকের হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে আংটি, আর আংটিতে লাগানো আছে বিভিন্ন গ্রহরত্ন। কোনও-না-কোনও গ্রহের দোষ কাটাচ্ছে এক-একটি পাথর। এই সমস্ত পাথর ধারণ করা হয়েছে কোনও জ্যোতিষীর নির্দেশে।"

সভায় যেন বোমা ফাটল। অক্ষর তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করে নেমে আসামাত্র কত তাড়াতাড়ি তাকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা যায়, তাই নিয়েই উদ্যোক্তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য ওই প্রতিষ্ঠানের আর কোনও সভায় তার ডাক পড়েনি।

সহকর্মীদের মধ্যে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়, সব জায়গাতেই অক্ষর গলা ফাটায়। কেউ ভাগ্যের কথা তুললেই তাকে তুলোধনা করে। আর জ্যোতিষের প্রসঙ্গ একবার উঠলে হল। যে তুলেছে তাকে কচুকাটা না করা অবধি অক্ষরের শান্তি নেই।

কেউ যদি ভুল করেও বলেছে, "মানুষ যখন জন্মায়, তখনকার গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সেই মানুষটার ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে?" অক্ষর লাফিয়ে উঠেছে, "তাহলে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মেছিলেন, এমন তো হওয়া অসম্ভব নয়, পৃথিবীর কোনও না কোনও প্রান্তে সেই সময়েই আরও কেউ জন্মেছে। সেও রবীন্দ্রনাথ হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ আছে?"

বিশ্বাস এমন এক বস্তু যা যুক্তির ধার ধারে না। স্বভাবতই সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই আলোচনাটা অমীমাংসিত থেকে গেছে।

কিন্তু এতদিনে এমন একটা ঘটনা পাওয়া গেল, যা বিরোধীপক্ষের অবস্থান মজবুত করল।

কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে।

দুই যমজ ভাইয়ের একজন থাকে শিকাগো শহরে। অন্যজন আমস্টারডামে। হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে মারা যায় আমেরিকার ভাই। আশ্চর্য ব্যাপার, আমস্টারডামে থাকা ভাইয়েরও ঠিক একই সময়ে স্ট্রোক হয়। এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই তারও মৃত্যু হয়। কাগজটা নিয়ে স্টাফরুমে সবাই অক্ষরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, "এইবার? এটার কী ব্যাখ্যা?"

অক্ষর নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিল। তারপর বলল, "এ তো ছোটবেলায় পড়া সেই বিখ্যাত উপন্যাস।"

"ওসব উপন্যাস-টুপন্যাস বুঝি না। যমজ সন্তান। একই ভাগ্য তারা বয়ে বেড়িয়েছে। জন্মতে। মৃত্যুতেও। এটাকে তুই ভাগ্য বলবি না?"

"না, বলব না। বরং এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করব, দু'জনেরই জন্মগত কোনও অসুখ ছিল। এমন অসুখ, যাতে ভবিষ্যতে স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়ে। অসুখটা যেদিন আত্মপ্রকাশ করল, সেদিনই স্ট্রোক। তা থেকে মৃত্যু।"

"একই দিনে একই সময়ে দু'জনের অসুখটা আত্মপ্রকাশ করল। সেটাকে কী বলবি?"

"কাকতালীয়।"

বন্ধুরা যখন জবাব খুঁজছে, ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়ল অক্ষর, "তাছাড়া যমজ সন্তানেরা কখনও একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয় না। একটি সন্তান জন্মানোর কিছুক্ষণ পর আসে দ্বিতীয় সন্তান। সুতরাং দু'জনের জন্মসময় এক নয়। আর জন্মসময় এক না হলে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবও এক হওয়া সম্ভব নয়।"

সমরেশ গলা তুলল, "সে তো নর্মাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে। সিজ়ার করে হওয়া বাচ্চারা তো একসঙ্গেই জন্মায়। এই দু'জন নিশ্চয়ই সিজ়ার করে জন্মানো।"

সবাই হইহই করে উঠল। অক্ষর গম্ভীর গলায় বলল, "ওদেশে আমাদের মতো কথায় কথায় সিজ়ার করার রেওয়াজ নেই। বেশির ভাগ বাচ্চা নর্মালই হয়। দেখিসনি ব্রিটেনের রাজবাড়িতেও নর্মাল ডেলিভারিতেই বাচ্চা হচ্ছে!"

আলোচনাটা ওখানেই থেমে গেল।

কিন্তু একটা সংশয়ের বুদ্বুদ অক্ষরের ভেতরে তৈরি হল। বুদ্বুদটা ফেটে যাবার পরিবর্তে ক্রমশ বাড়তে থাকল। কিছু প্রশ্ন, কিছু অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা অক্ষরকে তাড়া করে ফিরতে লাগল।

গ্রহ-নক্ষত্র, তাদের প্রভাব সত্যিই কি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাকি সবটাই অন্ধ বিশ্বাস? বিশ্বাস অন্ধ, কিন্তু যুগ-যুগ ধরে চর্চিত এই শাস্ত্রটির পুরোটাই কি অবিশ্বাস? জ্যোতিষ যদি ভ্রান্তই হয়, কেন এত অসংখ্য মানুষ জ্যোতিষের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে? এবং যেসব মানুষ জ্যোতিষে বিশ্বাস করে তাদের সকলেই যে অশিক্ষিত কিংবা কুসংস্কারে আক্রান্ত তা-ও মেনে নিতে কষ্ট হয়।

এইসব প্রশ্ন অক্ষর যখন ভেতরে ভেতরে নাড়াচাড়া করছে, ভাবল একবার পড়াশোনা করে দেখলে তো হয়, সত্যিটা কী?

আর পড়াশোনা করার ব্যাপারে অক্ষরের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা কলেজ স্ট্রিট, সেখানকার পুরনো বইয়ের দোকান।

তখনই অক্ষরের দেখা হয়ে গেল সপ্তর্ষির সঙ্গে।

বইপাড়ায় গেলে পুরনো বইয়ের দোকানগুলোয় ঢুঁ মারা অক্ষরের বহুকালের অভ্যেস। কত যে হিরে জহরত ওইসব বইয়ের স্তূপে লুকিয়ে আছে যে না দেখেছে সে বিশ্বাস করতে পারবে না। অক্ষরের মনে আছে একদিন হাঁটকাতে হাঁটকাতে হাতে এসেছিল সমরেশ বসুর *বিবর*। মলাট উল্টে প্রথম পাতায় চোখ রাখতেই থমকে গিয়েছিল। "কল্যাণীয়া চিনুকে" এইটুকু লিখে সই করেছেন স্বয়ং সমরেশ বসু। বইটা হাতে নিয়ে কী করবে ভাবছে, দোকানের মালিক হেসেছিলেন, "কী দেখছেন? সত্যিই ওটা সমরেশ বসুর সই। যিনি পেয়েছিলেন তাঁর কাছে ওটা পুরনো বইয়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই কেজি দরে বিক্রি করে দিতে হাত কাঁপেনি।"

আজকেও বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল কেউ তাকে লক্ষ করছে। চোখ তুলে দেখল, সত্যিই মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক তার মুখের দিকে একমনে তাকিয়ে আছেন। অক্ষর ঘুরে তাকাতে একটু দ্বিধা করে বললেন, "সরি, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি অক্ষর?"

অক্ষর ভাল করে দেখতে যেতেই কাঁচাপাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ির আড়াল থেকে বছর পঁচিশ আগের এক যুবককে দেখতে পেল।

"সপ্তর্ষি না?"

তারপরেই দুই বন্ধুর দু'জনকে জড়িয়ে ধরা, এবং অক্ষরকে একরকম টানতে টানতে সপ্তর্ষির দোকানে নিয়ে যাওয়া।

সপ্তর্ষিদের পাবলিশিং হাউস এবং লাগোয়া বইয়ের দোকান একসময় লোকে একডাকে চিনত। কলেজ স্ট্রিটে যে-ক'টা প্রকাশনা সংস্থা বনেদিয়ানা দাবি করতে পারে, সপ্তর্ষিদেরটা তার মধ্যে প্রথম সারিতে। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে সবাই যখন চাকরিবাকরি খুঁজছে, সপ্তর্ষি তখন অন্য কিছুর কথা না ভেবে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেছিল। সেই সময় কলেজ স্ট্রিট চত্বরে এলে অক্ষর দেখাও করেছে সপ্তর্ষির সঙ্গে। আস্তে আস্তে দু'জনের রাস্তা আলাদা হয়েছে। দেখা সাক্ষাৎও কমে এসেছে। আজ হঠাৎ দেখা হতে পুরনো বন্ধুত্ব যেন উথলে উঠল।

দোকানে পৌঁছে দমে গেল অক্ষর। এ কী হতশ্রী চেহারা! আগে সামনে বই ডাঁই করা থাকত। ভেতরেও তিন-চারজন কর্মচারী হিমশিম খেত কাজ তুলতে। সপ্তর্ষি এত ব্যস্ত থাকত, অক্ষরের মতো বন্ধুরা দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবে সে অবকাশ মিলত না। বাধ্য হয়েই বন্ধুদের আসা কমে গিয়েছিল।

আজ মনে হল ভাঙা হাটের চেহারা। বইয়ের পাহাড় উধাও। কর্মচারীও একজনে এসে ঠেকেছে।

হাসল সপ্তর্ষি।

"কী দেখছিস?"

ইতস্তত করল অক্ষর। কী বলবে ভেবে পেল না। তারপর শব্দগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলল, "এই... মানে... অনেকদিন আগে এসেছিলাম তো, ...অনেক পরিবর্তন... সেগুলোই..."

"মেলাতে পারছিস না, তাই তো? তার আগে বল, কী খাবি? চা-কফি? অন্য কিছু?"

"আরে আরে, তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। তোর সঙ্গে দেখা হল এতদিন পর... আগে একটু গল্প করি।"

"পুঁটিরামের কাঁচাগোল্লা খেতে ভালবাসতি তুই। দাঁড়া, তোর জন্য আগে কাঁচাগোল্লা আনাই।"

সবেধন কর্মচারীটিকে কাঁচাগোল্লা আনতে পাঠিয়ে মুখোমুখি বসল সপ্তর্ষি, "ওর সামনে সব আলোচনা করা যাবে না। তাই পাঠিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলি, দোকান অনেক পাল্টে গিয়েছে। পাল্টাবে না কেন বল? ব্যবসার সেই রমরমা তো আর নেই।"

"কেন, পাবলিশিং বিজ়নেস খারাপ চলছে বলে তো শুনিনি।"

"তুই খবর রাখিস না। বাংলা প্রকাশনা ব্যবসার এখন হাঁড়ির হাল। একটার পর একটা প্রকাশনা সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই অন্য ব্যবসায় ডাইভার্ট করে যাচ্ছে।"

"কী এমন হল যে হঠাৎ..."

"হঠাৎ নয়। হচ্ছিল একটু-একটু করে। আমাদের মতো কেউ-কেউ ধরতে পারিনি। প্রথম তো সব কিছু ডিজিটাল হয়ে গেল। মেশিন এসে জায়গা নিল পুরনো প্রেস-এর। অথচ প্রেস এককালে ছিল সোনার খনি। বিদ্যাসাগর চল্লিশ বছর বয়সের পর কোনও চাকরি করেননি। তাঁর পাহাড়প্রমাণ খরচের সবটাই মিটিয়ে গেছে প্রেস আর বই বিক্রির উপার্জন। এখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।"

কাঁচাগোল্লা এসে গিয়েছিল। অক্ষরের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে কর্মচারীটির দিকে ফিরে সপ্তর্ষি বলল, "অনিল, কাগজের সাপ্লাই আজ আসার কথা ছিল, এখনও তো দিয়ে গেল না। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে?"

কর্মচারীটি চলে গেলে ফেলে আসা কথার লেজ ধরল সপ্তর্ষি, "আমরা ভরসা করে বসেছিলাম পাঠ্যবইয়ের। স্কুল কলেজে যেসব বই লাগে সেগুলো। সরকার সেগুলোও নিজের হাতে নিয়ে নিল। যেটুকু ব্যবসা ছিল তাও গুটনোর মুখে।"

"গল্পের বই? বাংলা সাহিত্য?"

"কেউ পড়ে? আগে পার এডিশন এগারোশো কপি ছাপা হত। এখন তিনশো কপি বেরলেই ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। পরের জেনারেশন বাংলা পড়ে না। বাবা-মায়েরা বাড়ি গয়না বন্ধক রেখে ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছে। তারা বাংলা বই ছুঁলে হাত ধুয়ে শুদ্ধ হয়। বাংলা সাহিত্য, কী আর বলব, ভবিষ্যতে কেজি দরে বিক্রি হবে।"

"কী করবি তাহলে?"

"টাকা ঢাললে ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অল্পস্বল্প নয়। বেশ কিছু টাকার দরকার। কে দেবে টাকা?"

"ব্যাঙ্ক দেবে না?"

"ব্যাঙ্কও চালাক হয়ে গেছে। সিকিওরিটি ছাড়া লোন দেয় না।"

"নেই কোনও সিকিওরিটি?"

"আছে একটা। অ্যানসেসট্রাল প্রপার্টি। কেনার জন্য টাকা নিয়ে লোক হাত বাড়িয়ে আছে। কিন্তু ফ্যাকড়া বাধিয়েছে পিসি। পিসি বেঁকে বসেছে।"

"কেস করে দে।"

"পাগল? কেসের ফয়সালা হতে একশো বছর লেগে যাবে। তা ছাড়া আইন বলছে, যে-কোনও সম্পত্তির প্রত্যেক মালিক একমত না হলে সেটা বেচা যায় না।"

"তাহলে উপায়?"

"এক জ্যোতিষীর সন্ধান পেয়েছি।"

"জ্যোতিষী! তুই ওসবে বিশ্বাস করিস?"

"করি একটু-আধটু।"

"জ্যোতিষী তোকে সম্পত্তি পাইয়ে দেবেন?"

"কী করবেন বলতে পারব না। তবে অনেকেই ফল পেয়েছে।"

"জ্যোতিষী কি পিসিকে মেরে ফেলবেন? তন্ত্রসাধনা? দেখিস খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়িস না যেন।"

"আরে না না। ওসব কিছু নয়। সময়টা খারাপ যাচ্ছে। শনির দশা বলে না? সেটাই। জ্যোতিষী সেটাই কাটিয়ে দেবেন।"

সপ্তর্ষির কর্মচারীটি ফিরে এসেছিল। আজ আর কাগজের সাপ্লাই আসবে না জেনে সপ্তর্ষি উঠল। কর্মচারীকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বলে অক্ষরের সঙ্গে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত এল।

"দেখেছিস, এতদিন পর দেখা। কোথায় একটু গল্প করব, খোঁজখবর নেব তোর সংসারের, তা নয়, নিজের কথাই সাতকাহন করে বলে গেলাম।"

অক্ষর প্রবোধ দিল, "তা কেন? বন্ধুদের মধ্যে সুখদুঃখের কথা হবে না? দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়ালে তবে না বন্ধু?"

"ঠিক আছে। ফোন নম্বরটা দে। যোগাযোগটা নতুন করে হল, সেটাই কথা। এদিকে এলে অবশ্যই আসবি। আর ফোন করলে ধরিস।"

হাত নেড়ে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অক্ষর ভাবল, তাহলে সপ্তর্ষিও ভাগ্যে বিশ্বাস করে? অক্ষরের ক্রমশ মনে হচ্ছে, ভাগ্যান্বেষী মানুষ সংখ্যায় বাড়ছে। কিন্তু তার কারণ কী? আত্মবিশ্বাসের অভাব?

এ সবই মাসখানেক আগের কথা। তার পরই সপ্তর্ষির সঙ্গে অক্ষরের জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া।

৩

একটা খালি চেয়ার দেখে বসতে বসতে ঘড়ি দেখল— ন'টা বাজতে দশ। ঠিক সময়েই এসেছে। চেম্বার ন'টা পর্যন্ত। ঘর খালি হতে সওয়া ন'টা। তারপর একা দীপ্ত। এবং মুখোমুখি অক্ষর।

এটাই দীপ্তর পছন্দের সময়। অক্ষরেরও। পিছুটান থাকে না। খানিকক্ষণ আড্ডা মারা যায়। রাজনীতি। খেলা। ছোটবেলার গল্প। স্কুলের স্মৃতি। শেষটাই টানে বেশি। ভবিষ্যতের অ্যাকাউন্টে থাকা দিনের সংখ্যা যত কমে আসছে, অতীত যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। খেলার মাঠ, দুষ্টুমি, মাস্টারমশাইদের পিছনে লাগা। গল্পটা দু'জনের

একজন শুরু করে। অন্যজন শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে। সময় হু-হু করে কেটে যায়। গজেন, বাইরে বসে নাম ডাকে যে, তিন-চারবার মুখ দেখায়, বারদশেক কাশে। বাধ্য হয়েই উঠতে হয়।

অক্ষরকে দেখে গজেন হাসল। হাসিতে যতখানি হৃদ্যতা, আশঙ্কার মেঘ তার চেয়ে কম নয়। গজেনকে দিয়ে মাঝেমাঝে চা-শিঙাড়া আনায়। ফেরত পয়সা গুনে নেয় না। তাই হৃদ্যতা। আশঙ্কা, আজও ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

চোখ দিয়ে অক্ষর জিজ্ঞেস করল, ক'জন? গজেন ডান হাতের দেড়খানা আর বাঁ হাতের দুটো আঙুল দেখাল। দেড়খানা মানে একজন ভেতরে ঢুকেছে; বাইরে রয়েছে একজন। এরা রোগী। তারপর রিপোর্ট দেখানোর মক্কেল। রিপোর্ট দেখাতে ভিজিট লাগে না। তাই বাঁ হাত।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভেতরের জন বেরিয়ে এলেন। শেষ রোগী, একাই এসেছেন, ভেতরে ঢুকলেন। রিপোর্ট দেখাতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের দিকে তাকাল অক্ষর।

একজন, কর্পোরেট-কর্পোরেট চেহারা, দামি মোবাইল মাঝেমাঝেই বেজে উঠছে, কল রিসিভ করতে বাইরে যাচ্ছেন, ফিরে আবার সিটে বসছেন। গজেনের দিকে তাকিয়ে সিগনাল পেয়ে ফোনটা সুইচ অফ করলেন। বোঝা গেল রিপোর্ট দেখানোয় তাঁরই টার্ন এক নম্বরে।

দ্বিতীয় যে দু'জন ঘরের অন্য পাশে কাঠ হয়ে বসে, থমথমে মুখ, তাদের দিকে চোখ পড়তে অক্ষরের কেমন যেন লাগল। হাতে কোনও রিপোর্ট নেই। মা-ছেলে পাশাপাশি। ছেলের হাত শক্ত করে ধরে আছেন মা। ছেলে মাঝেমাঝেই জল খাওয়াচ্ছে মাকে। আর বলছে, "অত ঘাবড়ানোর কী আছে? তোমার যা বলার বলবে। ডাক্তারবাবু তো খেয়ে ফেলবেন না।" মা ঘাড় নাড়ছেন। আর নিজেকে যেন মনে মনে

তৈরি করছেন।

ভিতরের রোগী বাইরে এলেন। প্রথম রিপোর্টিং ভিতরে গেলেন। মা-ছেলের— মোটামুটি সম্পর্ক সেটাই সাব্যস্ত করে নিয়েছিল অক্ষর— মধ্যে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করল অক্ষর। ছেলে মায়ের হাত ছাড়িয়ে একবার বাইরে গেল। ফিরে আর বসল না, মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গজেনের ইশারা পেয়ে হাত ধরে মাকে তুলল। ছেলেকে ধরে পা টেনে টেনে মা ভিতরে ঢুকলেন।

ডাক্তারের চেম্বার। দরজা বন্ধই থাকে। রোগীরা তাদের গোপন কথা ডাক্তারের কাছে কবুল করে। তা বাইরে না-বেরনোই সঙ্গত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এত উচ্চগ্রামে কথা হচ্ছিল যে, বাইরে থেকে প্রতিটি বর্ণ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। অবশ্য দীপ্তর গলা নয়, শোনা যাচ্ছিল মা-ছেলের কণ্ঠস্বর।

পুত্র: "ডাক্তারি হচ্ছে? বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব, শালা!"

মাতা: "অনেক ভরসা করে আপনার কাছে এনেছিলাম ডাক্তারবাবু। এমন ফল ফলবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পুত্র: "ছাড়ো তো মা! শুয়োরের বাচ্চাকে নিয়ে এখন কী করব ওইটুকু শুধু বলে দাও। বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি।"

মাতা: "এখন আর করে কী হবে বাবা? মানুষটাই যেখানে রইল না। সে কি আর ফিরবে?"

পুত্র: "না মা। এসব ডাক্তারকে ছাড়তে নেই। এ আরও মানুষ খুন করবে। তার আগে আমিই বরং..."

এই অবধি শুনে গজেন উঠল। দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এবার শুরু হল বাছা বাছা গালাগাল। খিস্তির স্রোতে ডাক্তারকে প্লাবিত করে সসন্তান মা বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে বলছেন, শুনতে পেল অক্ষর, "গু-খেকোর ব্যাটা একটা কথাও বলল না দেখলি? বলবে কী? বলবার মুখ আছে? খুনি! বদমায়েশ!" ছেলেও মায়ের পিঠে হাত রেখে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "একবার হ্যাঁ বলো মা। তারপর এর কী গতি করি দেখে নিয়ো। হাত-পা ভেঙে আদিগঙ্গায় যদি ফেলে না আসি তো আমার নাম ভোম্বল সরকার নয়।"

গজেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চোখের ইঙ্গিতে অক্ষরকে ভেতরে যেতে বলল। কী করা উচিত ঠিক করতে না পেরে অক্ষর সন্তর্পণে দরজা ঠেলল। আর দীপ্তর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল।

অক্ষর কী এক্সপেক্ট করেছিল?

চোখমুখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো, দীপ্ত অক্ষরের দিকে তাকিয়ে বলবে, "আমি খুব আপসেট রে অক্ষর। তোর সঙ্গে কথা বলার অবস্থায় নেই। অন্যদিন আসিস, গল্প করব।"

অক্ষর নিজেকে তৈরি রেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বলবে, "ঠিক আছে ঠিক আছে। অন্য কোনওদিন আসব। আসার আগে নাহয় ফোন করে নেব।"

তার বদলে দেখল, হাসি হাসি মুখে দীপ্ত তার দিকে তাকিয়ে বলছে, "কী রে, ঘাবড়ে যাসনি তো? এরকম সিচুয়েশন মাঝেমাঝেই আমাদের ফেস করতে হয়। রান্না করতে গেলে যেমন তেলের ছিটে লেগে হাতে ফোসকা পড়ে, এ-ও তেমনই। প্রফেশনাল হ্যাজ়ার্ড।"

চেয়ারে বসতে-বসতে অক্ষর— তখনও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি— বলল, "বলিস কী? এইরকম ভোকাবুলারি? হজম করতে হয়?"

"না হজম করে উপায়? প্রতিবাদ করতে গেলে তো ঠ্যাঙানি খেতে হবে। ছেলেটাকে দেখিসনি? রাস্তার লোফার। একটা কথাও উচ্চারণ করলে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিত।"

"তাও ঘটে নাকি?"

"আমার এখনও জোটেনি, বন্ধুবান্ধব অনেকেই আছে যাদের ভাগ্য অতখানি সদয় নয়। মাথা ফেটেছে, দু'-চারটে রিব ফ্র্যাকচারও হয়েছে। কোর্ট-কাছারি তো লেগেই রয়েছে।"

"কেসটা কী?"

গজেনকে ডেকে খাবার আনতে বলল দীপ্ত। সঙ্গে দুটো আইসক্রিম। "মাথা ঠান্ডা করার সবচেয়ে ভাল উপায় পেট ঠান্ডা করা," বলে অক্ষরের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ, কী বলছিলি? কেসটা কী? কেস হচ্ছে ওই লোকটার বাবা। এখন চন্দ্রবিন্দু।"

"মানে মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, সুইসাইড। আর তার জন্য নাকি আমিই দায়ী।"

"কী করেছিলি তুই?"

"মদ খেতে বারণ করেছিলাম।"

"সেই জন্যই সুইসাইড?"

"সেই জন্যই সুইসাইড। কী করি বল? অ্যালকোহলিক সিরোসিস। লিভার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যতই বারণ করি, বলে, ওটা বাদ দিয়ে যা বলার বলুন। যা ওষুধ দেবেন, খাব। শুধু ওটুকু আমাকে চালিয়ে যেতে দিন।"

"তারপর?"

"ছ' মাসে তিনবার হাসপাতালে ভর্তি হল। যমে-মানুষে টানাটানি। প্রতি বারই ফিরিয়ে আনলাম। শেষ যেবার দেখাতে এসেছিল, সঙ্গে বউ আর ছেলে।"

"আজ যে-দু'জন এসেছিল?"

"হ্যাঁ। তাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মদ আর ছোঁবে না। ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। আজকাল মদ-ছাড়ানোর অনেক সেন্টার হয়েছে। তার ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন। আত্মহত্যা।"

"আর তার জন্য তুইই দায়ী?"

"দায়ী নই তো কী? নিয়মিত মদ খায় যারা তারা মদ বন্ধ করলে উইথড্রয়াল সিম্পটম হয়। ছাড়ানোর একটা প্রক্রিয়া আছে। সাজেস্ট করেছিলাম। শোনেনি। যে-কারণেই মারা গিয়ে থাকুক, দায় তো কারও ঘাড়ে চাপাতেই হবে। আগে কেউ মরলে আত্মীয়স্বজন দোষ চাপাত ভগবানের ঘাড়ে, ঠাকুর, তোমার মনে এই ছিল? এখন আরও সহজ ঘাড় জুটেছে, আরও সফট টার্গেট— ডাক্তার।"

"তার মানে রোগীর ক্ষতি হবে জানলেও তাকে কিছু বারণ করা যাবে না? সে যা ইচ্ছে করবে?"

"বারণ যদি না করা হয়, রোগী যা ইচ্ছে করে এবং মারা যায়, তাহলেও কিন্তু ডাক্তারের দোষ। এগোলেও বিপদ, পিছোলেও। যেদিকেও যাও, ডাক্তারের ঘাড় থেকে দোষের অপবাদ নামছে না।"

"তাও ডাক্তারি করছিস?"

"এখনও করছি। কতদিন পারব জানি না।"

"কেন করছিস?"

"শুনবি সেই গল্প? একটা অল্পবয়সি মেয়ে, বারবার প্যারালিসিস হয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা কম। কেন কম? সেটাও ধরে দিলাম, একটা গ্ল্যান্ডের অসুখ। চিকিৎসা হল। সেরে গেল। বিয়ে হল। বাচ্চা হল। বাচ্চাকে নিয়ে দেখা করতে এল। ... সেদিন মনে হল, আরও কিছুদিন ডাক্তারিটা করি। যতদিন না কেউ লাশ আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। অথবা মেডিক্যাল কাউন্সিলে কেস করে রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল করিয়ে দেয়।"

"তোর এলেম আছে। আমি হলে কবে ছেড়ে-ছুড়ে..."

"পালাতিস? পারতিস না। একবার যে এই প্রফেশনে ঢুকেছে, সে নিজে কোনওদিন পালায় না। ঘা খেতে খেতেও থেকে যায়।"

গজেন খাবার এনেছিল। সঙ্গে আইসক্রিম। সাজিয়ে দিয়ে উসখুস করছিল। দীপ্ত বলল, "ঠিক আছে, এবার বাড়ি যাও।" তাও গজেন দাঁড়িয়ে আছে দেখে পকেট থেকে একশো টাকা বের করে গজেনকে দিল। নোটটা মাথায় ঠেকিয়ে বেরিয়ে গেল।

গজেনের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে দীপ্ত গলা নামিয়ে বলল, "কী করবে বল তো টাকা দিয়ে?"

ঘাড় নাড়ল অক্ষর, "জানি না।"

"চুল্লুর ঠেক-এ যাবে।"

"জেনেশুনেও টাকা দিলি?"

"না দিলে বাড়ি ফিরে বৌ আর বাচ্চাগুলোকে প্যাঁদাবে।"

"আর লিভার খারাপ হলে তারা যে পথে বসবে।"

"দুটোই খারাপ। একটা বর্তমান, অন্যটা ভবিষ্যৎ। বর্তমানটা দেখা যাচ্ছে। ওটাকেই ভোট দিলাম।"

"বাদ দে, আইসক্রিমের ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে অক্ষর বলল, "আজ কিন্তু তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

আঙুলের উল্টোপিঠে আইসক্রিম লেগেছিল। চেটে নিয়ে দীপ্ত বলল, "কারও অসুখ?"

"হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ?"

"ব্যক্তিটি কে?"

"যে তোর সামনে বসে আছে।"

"তুই? তোর অসুখ? কী আবার অসুখে ধরল তোকে?"

আইসক্রিম আর প্লেটটা একপাশে সরিয়ে রেখে জল খেল অক্ষর। বেসিনে হাত ধুলো। তারপর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "উনপঞ্চাশে পা দিলাম। দেখতে দেখতে হাফ-সেঞ্চুরি। তোর কী সাজেসশন? কলকব্জাগুলো কেমন চলছে একবার দেখে নেওয়া উচিত নয়?"

"আলবাত উচিত। ডাক্তার হিসেবে যদি অ্যাডভাইস চাস, বলব একশো ভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত।"

"আর বন্ধু হিসেবে?"

"কী করে অ্যাডভাইস দিই বল? নিজেরটাই তো পরীক্ষা করাইনি!"

"বলিস কী? নিজের কিছুই চেক করাসনি?"

"প্রেশারটা মাঝেমাঝে দেখি। নর্মাল। শুগার একবার করিয়েছিলাম। বছর দশেক আগে। ঠিকই ছিল। ব্লাড গ্রুপ 'ও পজ়িটিভ'। বাকি যা যা আছে, গোল্লা। কোনওদিন চেক করাইনি।"

"কেন রে? চেক করিয়ে নেওয়াই তো ভাল।"

"ভাল তো অনেক কিছুই। রাত না জেগে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া ভাল। সাতসকালে উঠে শরীরচর্চা করা ভাল। আইসক্রিম না খাওয়া ভাল। পরস্ত্রী সুন্দরী হলে না তাকানো ভাল। ...ক'টা ভাল আর মানতে পারলাম জীবনে?"

"নিজেরটা করাসনি, সেটা তোর ব্যাপার, আমার কি করিয়ে নেওয়া উচিত নয়?"

"কিছু কি ফিল করছিস? দুর্বলতা? অবসাদ? খিদে কমে যাওয়া? জোরে হাঁটলে বুকের মধ্যে চাপ-চাপ ভাব?"

"এতক্ষণ কিছু ফিল করিনি। বললি বলে মনে হচ্ছে ওর সব ক'টাই আমার হয়।"

"ঠিক আছে। প্রেশারটা দেখে দিচ্ছি। আর লিখে দিচ্ছি কিছু ছোটখাটো পরীক্ষা। যেগুলো না করালেই নয়।"

প্রেশার চেক করে একগাল হাসল দীপ্ত, "একশো কুড়ি-আশি। টেক্সট-বুক বিপি," তারপর খসখস করে প্যাডে কয়েকটা পরীক্ষা লিখে বলল, "এগুলো করিয়ে নে।"

"ব্যস? ওতেই সব কলকব্জার নাড়িনক্ষত্র বোঝা যাবে?"

"না, যাবে না। তা যদি চাস, আজকাল কর্পোরেট হাসপাতালগুলোতে হয়েছে, 'হোলবডি চেক আপ', তা-ই করিয়ে আয়।"

"হোলবডি! মানে পুরো শরীর? করালে নিশ্চিন্ত?"

"নিশ্চিন্ত কিছুতেই নয়। নিশ্চিন্ত হতে গেলে গোটা শরীরের এমআরআই করতে হবে।"

"তাহলে সেটাই লিখে দে।"

প্যাড থেকে কলম তুলে অক্ষরের মুখের দিকে তাকাল দীপ্ত, "তোর কী হয়েছে বল তো? কেন এতসব করাতে চাইছিস? কিছু মনে হচ্ছে?"

দীপ্তর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল অক্ষর। বলল, "কিছু হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ?"

"তাই যদি বলিস, আজ তোর শরীরের স্ক্যান করালেই নিশ্চিন্ত হতে পারবি তা তো নয়। আমার এক ভিআইপি রোগী, উত্তরবঙ্গের এমএলএ, ছ'মাস আগে পেটের আলট্রাসাউন্ড করিয়েছিলেন, ব্যাং নর্মাল। সেদিন এলেন, পেটে ব্যথা। রিপিট আলট্রাসাউন্ড— ক্যানসার।"

হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল অক্ষরের। কোনও রকমে বলল, "মারণ রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে নিস্তার নেই বলছিস?"

"তা তো বলিনি। সব রোগেরই চিকিৎসা আছে। যার চিকিৎসা নেই তার নাম ভয়। অসুখের ভয়। মৃত্যুভয়। ওটা মন থেকে হটা।"

বারান্দায় থেবড়ে বসে আচার দিয়ে মুড়িমাখা খাচ্ছিল অক্ষর। কুলের আচার। কুলের সিজ়ন পার হওয়ার মুখে বড় থালায় কুল শুকোতে দিত মা। গুলতি নিয়ে দু'ভাই পাহারা দিত। আচার তৈরি হলে বয়ামে ভরে আবার রোদ্দুর। শেষ পাতে এক খাবলা আচার পড়লে বাকি ভাতটুকু উঠে যেত।

মা জানে অক্ষরের আচার-প্রীতির কথা। সন্তানের পছন্দ-অপছন্দ মায়েরা ভোলে না। অক্ষর যখনই আসে পাতে আচার দেখতে পায়।

মুড়ি খেতে-খেতে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। এখানে কাগজ পৌঁছতে বেলা হয়। কাগজের খবর এমনিতেই বাসি। বেলা হলে আরও ভেপসে যায়। মনে আছে, ছোট থাকতে কাগজ এলে কাড়াকাড়ি করে পড়ত। তখন অবশ্য কাগজ মানে খেলার খবর আর অরণ্যদেব-গোয়েন্দা রিপ। বেশি সময় দেওয়ার উপায় ছিল না। দেরি করে স্কুলে পৌঁছলে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বরাদ্দ। তাও ক্লাসের মধ্যে নয়, বারান্দায়। যাতে আসতে-যেতে সকলের চোখে পড়ে।

বারান্দা থেকে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করল অক্ষর। ভুল করে। ছোটবেলায় বারান্দায় বসলে ঘুড়িসুদ্ধ আকাশ, কাঁটাসুদ্ধ বাবলাগাছ, উড়ন্ত চিল সবই হাতের কাছে পাওয়া যেত। বারান্দা ঘিরে ফেলার পর ওরা দূরে সরে গেছে। বারান্দা ঘেরার মতলবটা অন্তুর, "স্পেসটা কেমন ইউটিলাইজ় করা যায় দেখেছিস?" অক্ষর জবাব দেয়নি। বারান্দায় পাঁচিল তুললে গাছ-আকাশ-পাখি এরা যে দূর হয়ে যায় অন্তুকে বোঝানো যাবে না। কারও কারও জীবনে এইসব জিনিস বাহুল্য। পাঁচিল তারা তুলবেই। এখন পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে আকাশ খুঁজতে হয়।

অন্তু বেরিয়েছিল। বাজারের থলিটা রান্নাঘরে নামিয়ে অক্ষরের কাছে এসে বসল। মাটিতেই। বাবু হয়ে। তারপর যে-কথাগুলো বলবার জন্য আসা, সেগুলো শুরু করল। কাগজের পাতা থেকে চোখ সরাল না অক্ষর। তবে কান পাতল।

"ওপরে একটা ঘর তুললাম।"

দেখেছে অক্ষর। কাল সন্ধেবেলা আবছা লক্ষ করেছিল। আজ সকালে ছাদে ওঠার নাম করে দেখে এসেছে। সিমেন্টের কাজ কমপ্লিট। দরজা-জানলা বসানোটুকুই বাকি।"

সেটাই বলল অন্তু।

"পুরো হয়নি। কাঠের কাজে হাত দেওয়া যায়নি এখনও।"

অন্তু এদিক-ওদিক তাকাল। কীভাবে শুরু করবে ঠিক করতে পারছিল না। মনস্থির করে আবার শুরু করল।

"যা দাম সব কিছুর! সিমেন্ট-লোহা-ইট। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। কাঠের কথা না বলাই ভাল। ভাল কাঠ সোনার চেয়েও দামি। কীভাবে যে ম্যানেজ করব!"

অক্ষর আর থাকতে না পেরে মুখ খুলল, "কী দরকার ছিল অনর্থক নতুন কনস্ট্রাকশনের? এমনিতেই বাজারের যা অবস্থা।"

অন্তু অবাক হবার ভান করল।

"বলছিস কী দাদা? দরকার ছিল না? কেউ এলে শুতে দেবার পর্যন্ত জায়গা হয় না। আজ হোক কাল হোক ঘরটা বানাতেই হত।"

'কেউ'-টা মনে-মনে ভরাট করে নিল অক্ষর। 'কেউ'-এর মধ্যে অক্ষর পড়ে না। অক্ষরের ঘরটা এমনিতে বন্ধ থাকে, অক্ষর এলে খোলা হয়। বীথি আর ছেলেমেয়েরা বহুকাল হল এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে 'কেউ' কারা?

অন্তুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এলে তাদের যে অসুবিধা হয়, সেই কথাটা অন্তুর কানে তুলেছে। সরাসরি নয়, তুলেছে অন্তুর বউ রিংকির মাধ্যমে। রিংকি বুদ্ধিমতী। ঘর তোলার আগে দাদার পরামর্শ নিতে গেলে যদি 'না' হয়ে যায়? তাই অন্তুকে বুঝিয়েছে, আগে কাজ খানিকটা এগিয়ে নাও, তারপর বোলো। খরচাপাতির কথাটাও তখনই পেড়ো। তখন কি অক্ষর বলতে পারবে, যে অবধি বানিয়েছিস থাক, আর এগোতে হবে না? বলবে দরজা-জানলা বসাতে হবে না? নাকি তৈরি ঘর ভেঙে ফেলতে বলবে?

অক্ষর মনে-মনে রিংকির বুদ্ধির প্রশংসা করছে, অন্তু ফেলে আসা কথাগুলো আবার ধরে ফেলল।

"তাছাড়া টোটন বিশ্বাসের লোক পেছনে পড়ে আছে। তাদেরও কিছু না ঠেকালেই নয়।"

"টোটন বিশ্বাস কে?"

"পার্টি।"

"কোন পার্টি?"

"সব পার্টি। যখন যারা ক্ষমতায় থাকে। সবারই টোটনকে দরকার।"

অক্ষরের কেমন সন্দেহ হল, কনস্ট্রাকশনটা বেআইনি। অন্তুর পক্ষে সবই সম্ভব।

"ঘর তোলবার আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে প্ল্যান স্যাংশন করিয়েছিলি?"

"প্ল্যান জমা দিয়েছি। ওদের তো আঠারো মাসে বছর। স্যাংশনের জন্য এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করছি, তখনই বিশ্বাসের লোকের সঙ্গে দেখা। ওরাই বলল, কাজ শুরু করো, এদিকটা আমরা দেখছি।"

অক্ষর এরকমই কিছু আন্দাজ করেছিল। দু'-নম্বরি রাস্তায় একবার পা দিলে এ লাইনে ধুরন্ধর না হলে বেরিয়ে আসা শক্ত।

অক্ষর কিছু বলছে না দেখে অন্তু পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

"এখন উভয় সমস্যা। ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটি হুড়কো দিচ্ছে, প্ল্যান ছাড়া কনস্ট্রাকশন শুরু করলে কী করে? এদিকে বিশ্বাসের দল কৌটো বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাল না ছাড়লে তারা আর এগোতে দিতে রাজি নয়।"

অক্ষর চুপ করে রইল। কথাটা মিথ্যে নয়। যে যার হিসাব বুঝে নেবে এটাই দস্তুর।

এবারে ধৈর্য হারাল অন্তু। একটু গলা চড়িয়ে বলল, "কিছু একটা বল? চুপ করে থাকলে হবে?"

অক্ষর ভাবল বলে, ঘর তোলার আগে পরামর্শ করেছিলি? এখন বিপদে পড়ে টাকা চাইতে এসেছিস! কথায় কথা বাড়বে। মা'র কানে উঠলে কষ্ট পাবে। তার চেয়ে যেটা সহজ সেটাই বলল।

"আমারও টানাটানি যাচ্ছে রে!"

দু' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে অক্ষরের দিকে তাকিয়ে রইল অন্তু। দাদা-বৌদির ডবল ইঞ্জিনের সংসার, সেখানেও টানাটানি? মাইনে দেয় সরকার। ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানোর আগেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে। দাদা কি ভাবছে অন্তুটা গাড়োল?

অক্ষর চোখ সরিয়ে নিল।

"টাপুর ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে। এ রাজ্যের বাইরে। অনেক টাকার ব্যাপার। এখনই তোকে হেল্প করতে পারব না।"

টাপুর সর্বভারতীয় পরীক্ষায় যোগ্যতা দেখিয়ে একটা ভাল ইনস্টিটিউটে সুযোগ পেয়েছে। কলেজটা দক্ষিণ ভারতে। ক্যাপিটেশন ফি লাগবে না। কিন্তু অত ভেঙে বলার মানে হয় না। ডাক্তারি। তার ওপর সাউথ ইন্ডিয়া। মানেই লক্ষ-লক্ষ টাকার ব্যাপার। অন্তুর মাথা থেকে সেই ধারণাটা সরাতে চায় না অক্ষর। তাতে কথায় কথায় দাদার কাছে হাত পাতাটা কমবে।

খানিকক্ষণ বসে রইল অন্তু। কী জবাব দেবে ঠিক করে উঠতে পারল না। রিংকির শিখিয়ে দেওয়া ডায়ালগের স্টক শেষ হয়ে গেছে। পরেরগুলো আবার জেনে নিতে হবে। "যাই, রান্না কতদূর এগোল দেখে আসি। তুই কি আজই চলে যাবি?" বলে উঠে গেল।

অক্ষর আর অন্তুর। পিঠোপিঠি দুই ভাই। নাম রেখেছিলেন মা'র এক দাদামশাই। সেকালের পক্ষে আধুনিক, সন্দেহ নেই। বাবার

সরকারি চাকরি। অভাববোধ ছিল না। মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল, যতদিন না ভরদুপুরে সহকর্মীরা বাবাকে এনে হাজির করল। বাবাকে বলা অবশ্য ঠিক নয়, কারণ বাবা যে আর অফিস যাবে না মা'র বুক-ফাটা কান্না আর কলিগদের চোখের জলই তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

কাজ করতে করতে মৃত্যু। নিকটাত্মীয় কেউ চাকরি পাবে এমন একটা নিয়ম তখনও বলবৎ ছিল। অক্ষর তখনও গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেনি, অন্তু লেখাপড়ার পাট তুলে রেখে লোচ্চামিতে হাত পাকাতে শুরু করেছে, এই যখন পরিস্থিতি, মা চেয়েছিল অক্ষর চাকরিটা নেয়।

অক্ষর 'না' বলেছিল।

কেন না বলেছিল অক্ষর?

অক্ষর বুঝতে পারছিল, অন্তুর কিছু হবার নয়। তখন তখনই একটা চাকরির জোয়াল কাঁধে না চাপিয়ে দিলে অন্তু উচ্ছন্নে যাবে। এটাও জানত, সে নিজেরটা ঠিকই ম্যানেজ করে নিতে পারবে। ক্লাস ফোর হয়ে জয়েন করল অন্তু। পরে ক্লারিকাল গ্রেড পেয়ে গেল।

অন্তু কি অক্ষরের প্রতি কৃতজ্ঞ?

উত্তরটা: না।

অন্তু চাকরিটা তার অধিকার বলেই ধরে নিয়েছে। তাও যেটুকু সংশয় ছিল, ওর বউ সেটাও ঘুচিয়ে দিয়েছে। মা যতদিন আছে ততদিনই অপেক্ষা করবে অন্তু। তারপর ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাড়ির সবটাই দখল করবে। অক্ষরের ঘরও তখন আর অক্ষরের থাকবে না।

মিলি এল বেলা করে। অন্তুর চেয়ে আটব ছরের ছোট মিলি। লেখাপড়ায় ওর দৌড় আরও কম। তবে চাকরি ছাড়াও আর একটা কেরিয়ার মেয়েদের থাকে যেটায় অল্পবয়সেই হাত পাকিয়েছিল মিলি। এখন মন দিয়ে সংসার করছে। ওর বর জগদীশ ঠান্ডা মাথার ছেলে। জগদীশের স্টেশনারি দোকান রমরম করে চলে। মিলিকে ও মাথায় করে রেখেছে। বাচ্চা হবার কিছু সমস্যা ছিল। কলকাতায় দেখানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল অক্ষরই। একসঙ্গে তিন সন্তানের মা হল মিলি। পরে জগদীশ দেখা করতে এসেছিল। সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট আর টাপুর-টুপুরের জন্য জামাকাপড়। অক্ষর এসেছে খবর পেলে মিলি একবার অন্তত মুখ দেখিয়ে যায়।

এবারে মিলিকে ভাল দেখল না অক্ষর। মুখ শুকনো, চুল উস্কোখুস্কো।

"কী হয়েছে রে? অসুখ-বিসুখ? বাচ্চাগুলো ভাল আছে তো?"

আঁচলে চোখ ঢাকল মিলি, "শ্বশুরের ক্যানসার।"

"আজকাল অনেক ক্যানসারই সেরে যায়। আমাকে জানাসনি কেন?"

"ধরা পড়তে দেরি হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বলল আর কিছু করার নেই।"

"কাগজপত্র-রিপোর্ট যা যা আছে দিয়ে দিস। আমার বন্ধু ডাক্তার। দেখিয়ে নেব।"

সঙ্গে করে গাছের পেয়ারা এনেছিল মিলি। এ বাড়িতেও পেয়ারা গাছ। তবে ফল আসে না। মিলিদের বাড়ির পেয়ারাগুলো সত্যিই ভাল। বাচ্চারাও পছন্দ করে। নিয়ে যাবে বলে তুলে রাখল অক্ষর।

মাকে ধরতে পারল সেই দুপুরে।

খাবার সময়।

আজকাল ঠাকুরদেবতারা মায়ের সকালবেলাটা খেয়ে নেন। ঠাকুরদের ওঠানো, শোওয়ানো, জপ-তপ, হাজারটা রীতি-আচার মাকে ঠাকুরঘরে আটকে রাখে। নিজের সময় বলতে মা'র আর কিছুই থাকে না।

"নিজের সময়"। শব্দদুটো নাড়াচাড়া করল অক্ষর। কেউ কি মা'র সাহচর্যের জন্য প্রতীক্ষা করে? মা-ও সেটা বোঝে। বোঝে বলেই গণ্ডি কেটে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে।

কলাইয়ের ডাল, পোস্তর বড়া, ট্যাংরা মাছের ঝাল আর চাটনি। বসে খাওয়াল মা। ডিমভর্তি ট্যাংরা মাছ।

খাওয়া হয়ে গেলে কুয়োতলায় আঁচাচ্ছে, মা জলের ঘটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "তুই এলি, নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারলাম না, কী যে দুঃখ হয়...," মা'র গলা ধরে এল।

অক্ষর গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, "না-ই বা রেঁধে খাওয়ালে মা। খাবার সময় সামনে বসে রইলে, জোর করে আর-একটা মাছ খাওয়ালে, সেটাও যে কতখানি... তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।"

"কেন? তুই খাওয়ার সময় বীথি সামনে বসে না? একলা একলা খাস?"

আলোচনাটা অন্য দিকে যাচ্ছে দেখে অক্ষর তাড়াতাড়ি বলল, "তোমার খাওয়া হয়েছে মা?"

"ঠাকুরপুজো করে প্রসাদ মুখে দিয়েছি। এখন খিদে নেই। খাবখন সময়মতো। তোকে চিন্তা করতে হবে না।"

অক্ষর জানে, জেদাজেদি মা পছন্দ করে না। জেদ করলে হয়তো "খাবই না" বলে বসে থাকবে। কথা ঘোরানোর জন্য বলল, "চলো তাহলে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি। কতদিন ছোটবেলার গল্প হয় না।"

ধরে-ধরে মাকে লাগোয়া বাগানে নিয়ে গেল অক্ষর। এই এক ফোঁটা সবুজও বিক্রি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল অন্তু। অনেক কষ্টে আটকাতে হয়েছে। যত্নের অভাব চতুর্দিকে। আগাছায় ভর্তি। হাত পড়ে না বোঝাই যাচ্ছে। পেয়ারা গাছের নীচটা বরাবরই অক্ষরের প্রিয়। শীতকালে ওখানে বসেই অঙ্ক কষত। মা বসল ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে। মা-র পায়ের কাছে অক্ষর।

"মিলি এসেছিল মনে হল?"

মা ছিল ঠাকুরঘরে। কিন্তু নজর চতুর্দিকে।

"ওর একটা খারাপ খবর আছে।"

"জানি।"

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য অক্ষর বলল, "অন্তু ওপরে ঘর তুলেছে। ইনকমপ্লিট হয়ে পড়ে আছে। বলছিল টাকা-পয়সার কথা।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "কে থাকবে ঘরে? আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। আমার ঘরটা খালি হলে সেটাই দখল করতে পারবে।"

মাকে জড়িয়ে ধরে অক্ষর বলল, "যেতে দিলে তো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা জবাব দিল, "না রে! সেই মানুষটা পথ চেয়ে বসে আছে। অনেকদিন তো হল, তোরা মানুষ হয়ে গেছিস। দায় বলতে আমার কিছু পড়ে নেই। এবার যাবার সময়।"

অক্ষর মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল, "আচ্ছা মা, আমার জন্মের কথা তোমার মনে আছে?"

"ও মা! থাকবে না? সব মেয়েরই তার প্রথম সন্তানের জন্মের কথা মনে থাকে।"

"আমার জন্মসময় মনে আছে তোমার?"

"না রে! সেই জন্যই তো কোষ্ঠী বানানো হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি করে তোর বাবা ফিরে গেল। ব্যথা উঠেছিল, কিন্তু ব্যথায় জোর ছিল না। কীসব ওষুধ-ইনজেকশন দিল। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। ঘোর যখন কাটল, নার্স দিদিরা তোকে এনে দেখাল। তখন ফটফটে সকাল।"

"ডিসচার্জ সার্টিফিকেট? সেখানে তো জন্মসময় লেখা থাকে।"

"লেখা ছিল কিছু। মাঝরাতের দিকে। ঠিক না ভুল বলতে পারব না।"

"আছে কাগজটা?"

"পাগল! কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মা। রোদ এসে পড়ছিল মুখে। হাত ধরে তুলল অক্ষর, "চলো, ওঠা যাক।"

বারান্দার দিকে এগোতে এগোতে মা বলল, "শরীরের যত্ন নিস বাবা। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করিস। প্রেশার-টেশারগুলো চেক করাস তো মাঝেমাঝে?"

"করাই সময় পেলে।"

"সময় টময় নয়। করাতেই হবে। তোরও তো বয়স পঞ্চাশের দিকে এগোচ্ছে।"

"পঞ্চাশ হলে কী হয় মা?"

"ভয় হয় রে বাবা। ভেতরে কু গাইতে থাকে। সেই মানুষটাও তো পঞ্চাশেই চলে গিয়েছিল।"

ভেতরে একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল অক্ষর। মা বলছিল, "মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শোক কী জানিস? সন্তানশোক। ঠাকুরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করি, সন্তানশোক যেন পেতে না হয়। তার আগেই আমাকে টেনে নিয়ো, আমি কিচ্ছুটি মনে করব না।"

৫

ঘড়ি অর্ধসত্য বলে।

ক্যালেন্ডার মিথ্যা বলে না।

বারো থেকে চলতে শুরু করে এক-দুই-তিন... দশ-এগারো হয়ে ঘড়ির কাঁটা একসময় আবার বারোতে ফিরে আসে।

ক্যালেন্ডারের দিনগুলো এগোতে থাকে। তিরিশ... একত্রিশ। পাতা শেষ। উল্টে দিলে নতুন মাস। আগের মাস কিংবা আগের বছর কখনওই ফিরে আসে না।

ঘড়ির সময় দেখানোতে একটা লুকোচুরি আছে। একটা মিথ্যাচার। ঘড়ি যেন আশ্বাস দেয়, পার হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? অপেক্ষা করো। আবার সব গোড়া থেকে শুরু হবে। কিছুই ফেলা যায়নি। ছলনায় ভুলে মানুষও আশা করে বসে থাকে।

ক্যালেন্ডার নির্দয়। প্রতিটা চলে চাওয়া দিন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাক্ষী হয়ে ক্যালেন্ডার দুলতে থাকে। প্রতিটা চলে যাওয়া মাস। মাস পার হয়ে বছর। বছর ফুরোলে পুরনো ক্যালেন্ডার সরিয়ে জায়গা নেয় নতুন ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা যায়, তা কখনও ফিরে আসে না।

ধড়মড় করে উঠে বসল অক্ষর।

কী শুরু করেছে অক্ষর? কোথায় দিনটা ভালভাবে আরম্ভ করবে তা নয়, ঘুম ভাঙা থেকে যত উল্টোপাল্টা চিন্তা! আসলে অন্য দিন ঘুম ভাঙে জানলার দিকে পাশ ফিরে। সকালের রোদ, কথা-বলা পায়রা এদের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে দিন শুরুর ঘণ্টা বাজে। আজেবাজে চিন্তা মাথায় বসতে পায় না। আজ হয়েছে উল্টোটা। ঘুম ভেঙেছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে। দেওয়ালে পাশাপাশি ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার। আজকাল ঘড়ি-দেখার পাট উঠে গেছে। লোকে সময় দেখতে হলে মোবাইল ফোনের পর্দায় চোখ রাখে। ঘড়িটা তার আগে কেনা। যখন মোবাইল ফোন জন্মায়নি। অ্যান্টিকের দোকান থেকে মস্ত ঘড়িটা এনে যেদিন দেওয়ালে ঝুলিয়েছিল, বীথি-অক্ষরের সন্দেহ ছিল, চলে কিনা। এতগুলো বছর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অক্ষরকে ভুল প্রমাণ করে চলেছে ঘড়ি। পাশাপাশি চলেছে তার লোক-ঠকানোও। পাশে ঝোলানো ক্যালেন্ডার অবশ্য চেহারা পাল্টায়। মাসে মাসে। প্রতিবছর তার খোল-নলচে বদলে যায়। সত্য-ঘোষণা বদলায় না।

রান্নাঘরে বাসনের আওয়াজ। তার মানে বীথি রান্নাঘরে। অর্থাৎ বাথরুম খালি। তড়াক করে উঠে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল অক্ষর। নিশ্চিন্ত। আর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে মন-খারাপ করতে হবে না।

দাঁত ব্রাশ করে কুলকুচি করল। তোয়ালেতে মুখ মুছল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে হাত বোলাল। কেউ কেউ নাকি সপ্তাহে দু' দিন কি তিন দিন দাড়ি কামিয়েই দিব্যি কাটিয়ে দেয়। অক্ষরের তা নয়। অক্ষরের দাড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ে। রোজ কামাতে হয়।

রেজ়র, সাবান, ব্রাশ বেসিনে গুছিয়ে নিয়ে গাল-গলা ভাল করে ভিজিয়ে নিল। এই স্টেপটা জরুরি। নাহলে রেজ়র চালানোর সময় দাড়িগুলো খরখর করে। চোখে জল এসে যায়। পরের স্টেপ ব্রাশে সাবান লাগানো। আগেকার বাটিসাবান আর পাওয়া যায় না। টুথপেস্টের মতো দাড়ি কামানোর সাবানও এখন টিউব বন্দি। সাবানের টিউবটা নিয়ে পেটে চাপ দিল।

ফসফস করে খানিকটা হাওয়া বেরলো। আরও জোরে টিউবটা প্রেস করল। সাবান বেরলো না। বেকুবের মতো টিউবটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অক্ষর।

শেষ হয়ে গেল? এমনি হঠাৎ? জানান না দিয়েই? কালকেও তো দিব্যি দাড়ি কামিয়েছে। টিউব টিপে সাবান বের করে গালে লাগিয়েছে। বুঝতে পারেনি তো ভেতরের সাবান শেষ?

বিরক্ত লাগল। টিউবটা একরকম রাগ করেই ময়লা ফেলার বিন-এ ফেলে দিল। শব্দ হল ঠক করে। তখনই অন্য একটা চিন্তা মাথায় এল অক্ষরের।

জীবন কি এইরকম? আগের দিন, কিংবা আগের মুহূর্তেও জানতে পারা যায় না মেয়াদ শেষ? এইরকম হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়া?

হাত-পা অবশ হয়ে এল। বেসিনের কিনারা ধরে সামলালো অক্ষর। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অক্ষর কি জ্যোতিষে বিশ্বাস করে?

না।

হস্তরেখা, কোষ্ঠীবিচার ইত্যাদি যে অবিজ্ঞান, সেটাই এতকাল সকলের কাছে গলা ফুলিয়ে যে বলে এসেছে, তার নাম কি অক্ষর নয়?

একশোবার।

তাহলে হাত দেখে কেউ বলে দিল তার বেঁচে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই নিয়ে পা ছড়িয়ে ভাবতে বসল অক্ষর!

অক্ষর নিজেকেই যেন চিনতে পারে না।

কিন্তু কেন?

এই নিয়ে অনেক ভেবেছে। ভেবে-ভেবে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সেগুলো এইরকম:

প্রথম, ঘটনার আকস্মিকতা। নিজের ভাগ্যবিচার করবার কথা মাথাতেও ছিল না অক্ষরের। সে গিয়েছিল সপ্তর্ষিকে সঙ্গ দিতে। আর কিছুটা কৌতূহল নিরসন করতে। সপ্তর্ষিই না বলে-কয়ে অক্ষরের হাতখানা এগিয়ে দিয়েছিল জ্যোতিষীর দিকে। জ্যোতিষীও অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। খানিকটা দ্বিধা করেই অক্ষরের হাতের রেখা দেখতে শুরু করেছিলেন। তারপর করেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণী।

অক্ষর তো বটেই, সপ্তর্ষিও অবাক হয়ে গিয়েছিল। অপরাধবোধে ভুগছিল সপ্তর্ষি। বাইরে এসে বলেছিল, "মন খারাপ করিস না। হাত দেখে যে ঠিকঠাক ভবিষ্যৎ বলা যায় না, শাস্ত্রীজি নিজেই তো বললেন। আর কোষ্ঠী তো তোর নেই বলছিস।"

অক্ষর জবাব দেয়নি। একবার মনে হয়েছিল, তার পরিচয় দেবার সময় সপ্তর্ষি যে বলেছিল, এ আমার বন্ধু, জ্যোতিষ বিশ্বাস করে না, সেই রাগ থেকেই জ্যোতিষী ওইরকম বলেছিলেন। ঠিক করেছিল এর শেষ দেখে ছাড়বে।

কোষ্ঠী নেই অক্ষরের, ঠিকই, কিন্তু জন্মসময় বললে তা থেকে নাকি কোষ্ঠী তৈরি করা যায়। তাই গিয়েছিল মা'র কাছে। গিয়ে নিরাশ হয়েছিল। অক্ষরের জন্মসময় মা'র নিজেরই নাকি জানা নেই। তাও যেটুকু জেনেছিল সেটাই এনে দিয়েছিল সপ্তর্ষির হাতে। সপ্তর্ষি একাই গিয়েছিল এবার। সঙ্গে অক্ষরের জন্মসময়। কিন্তু ফিরে এল মুখ কালো করে। জ্যোতিষী নাকি নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

অক্ষর কথা বাড়ায়নি। সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিয়েছিল। এবার কাউকে না জানিয়ে এমন এক জ্যোতিষী, যিনি নাকি হস্তরেখাতেই

স্পেশালাইজ় করেছেন, কোষ্ঠী-ঠোষ্ঠির ধার ধারেন না, তাঁর সামনে হাতের পাতা মেলে ধরেছিল।

ইনিও একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

আকস্মিকতার পর্ব পার হয়ে ততক্ষণে যে-ঘাটে অক্ষর পা রেখেছে সেখানে এমন কিছু ছিল যা ঘোর অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস টলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাহলে এখন অক্ষরের কী করা উচিত?

যদি ধরেই নেওয়া হয় যে জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত, তাহলে অক্ষরের হাতে কয়েকটা মাত্র মাস সময় আছে। তারই মধ্যে যা-যা করার সেরে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন হল, সেগুলো কী-কী?

সবচেয়ে আগে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে ও রকম কোনও ঘটনা না ঘটে। দুর্ঘটনার কথা আগে থেকে বলা যায় না। তাও সাবধান থাকবে অক্ষর। কিন্তু অসুখবিসুখ? লুকনো রোগ? প্রাণঘাতী জটিল কিছু। যা অক্ষরের শরীরে বাসা বেঁধেছে, কিন্তু অক্ষর টের পাচ্ছে না! যদি এখনই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়, এবং রোগটা ধরা পড়ে, সময়ে চিকিৎসা করালে তো সেরেও যেতে পারে!

সেই ভাবনা থেকেই তার দীপ্তর কাছে যাওয়া। এক রকম জোর করেই পরীক্ষানিরীক্ষা করানো। করিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া, তার শরীরে সত্যিই কোনও মারণ রোগ লুকিয়ে নেই।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে শেষ অবধি পারল কই?

হ্যাঁ, তার শরীরে এই মুহূর্তে কোনও মারণ রোগ বাসা বেঁধে নেই তা দীপ্ত বলে দিল। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলে দিল, কিছু কিছু মারাত্মক অসুখ আছে যা এইসব পরীক্ষার হাত এড়িয়ে যেতে পারে। তার থেকেও যা খারাপ, আজ সে সুস্থ, কোনও প্রাণঘাতী অসুখ নেই, তার মানে আজ থেকে তিনমাস পর তেমন কোনও রোগ আত্মপ্রকাশ করবে না, সে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।

অর্থাৎ মাথা থেকে চিন্তা পুরোপুরি চলে গেল তা বলা গেল না।

তাহলে তার পরবর্তী কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

যে-যে মানুষগুলো তার ওপর ভরসা করে আছে, তার ভাল থাকা, আরও নির্দিষ্ট করে বললে তার বেঁচে থাকার ওপর যাদের ভবিষ্যৎ ষোলো আনা নির্ভরশীল, তাদের যাতে কোনও বিপদে পড়তে না হয় সেটা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ আর্থিক নিরাপত্তার দিকটা ঠিক করা।

বীথি চাকরি করে। ঠেকা দিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু আজকাল ছেলেমেয়েদের এডুকেশনের খরচ আকাশছোঁয়া। টাপুর এর মধ্যেই ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে। ক্যাপিটেশন ফি-র প্রশ্ন নেই, কিন্তু যে রেকারিং এক্সপেনডিচারটা আছে সেটাও কম নয়। সংসার চালিয়ে বীথি পারবে সেটা ম্যানেজ করতে? টাপুরের পর আছে টুপুর। টুপুরের পড়াশোনার খরচ তো আছেই, তার সঙ্গে যোগ হবে ওর সেটলমেন্ট। নয় নয় করেও বিয়ে উপলক্ষে কম খরচ তো হয় না! তার একটা সংস্থানও রেখে যেতে হবে।

প্রথম টার্গেট ব্যাঙ্ক। বড় অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজ়িট। দু'-একটা ফিক্সড ডিপোজ়িট আছে অক্ষরের। তেমন বড় কিছু নয়। সেগুলোরও নমিনি করা আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। আজকাল কেউ মারা গেলে হকের টাকা পেতেও নাকি ছেলেমেয়েদের ঘাম ছুটে যায়। তা যাতে না হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পরেরটা ইনশিওরেন্স। একটা ভাল পলিসি করাতে দোষ কোথায়?

কলেজের স্টাফরুমে এই নিয়ে আলোচনা হয়। এতদিন এসব আলোচনায় মাথা গলাত না অক্ষর। যাদের অঢেল টাকা তারাই টাকা বাড়ানোর ফন্দি নিয়ে মাথা ঘামায়। শেয়ার মার্কেট, রিয়েল এস্টেট, ল্যান্ড অনেক রকম কথাই শুনেছে।

শুনে শুনে যেটুকু বুঝতে পেরেছে, তার মতো আনপড় মানুষদের জন্য শেয়ার মার্কেট নয়। যারা ওই লাইনটা বোঝে, বুঝে ঠিকমতো টাকা লাগায়, তারাই লাভ করেছে। বেশির ভাগই শেয়ার মার্কেটে হাত পুড়িয়ে পরে কপাল চাপড়েছে। সুতরাং ওদিকে না যাওয়াই ভাল। রিয়েল এস্টেটের দামও নাকি পড়তির দিকে। পড়ে রইল ল্যান্ড। খোঁজ নিতে হবে।

আর একটা চিন্তাও মাথায় এল। যে ক'টা মাস হাতে আছে সেগুলোকে প্রপারলি ইউটিলাইজ় করে উপার্জন কিছু বাড়ানো যায় না? চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির মতো সহজ অথচ অর্থকরী রাস্তাগুলো অক্ষরের মতো ভিতু মানুষদের জন্য নয়। তার যা পেশা, অধ্যাপনা, সেখানেও তো অর্থ উপার্জনের কিছু রাস্তা আছে। এতদিন অক্ষর সেই পথে হাঁটেনি। তা বলে হাঁটবে না এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি? চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? সহকর্মীদের অনেকেই তো দিব্যি পড়ানো আর প্রাইভেট টিউশন পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে-লাইফস্টাইল লিড করে, দেখলে ঈর্ষা হয়। কথা বলবে? দেখবে চেষ্টা করে?

সব কিছু গুছিয়ে নেবার পর পড়ে থাকবে অক্ষর নিজে। আর তো ক'টা মাস। নিজের জন্য কিছুই করবে না অক্ষর?

কিন্তু ক'মাস পর তো সে নিজেই থাকবে না। কী এমন করা সম্ভব এই ক'টা মাসের মধ্যে?

তেমন কিছু লুকনো ইচ্ছে, যা অক্ষর এতদিন তুলে রেখেছিল। রেখেছিল ভাল সময়ের জন্য। অপেক্ষা করেছিল, সময় পেলে শখ মিটিয়ে নেবে। যখন জানত না, সময় নিয়ে জীবন তার জন্য অপেক্ষা করে নেই।

প্রথম শখ বেড়ানোর।

পৃথিবী ঘুরে দেখবে ততখানি রেস্ত অক্ষরের নেই। কিন্তু দেশের মধ্যেই কত জায়গা পড়ে আছে যা দেখা হয়ে ওঠেনি। অক্ষরকে সবচেয়ে টানে ইতিহাস। যেসব জায়গায় গেলে অতীত কথা বলে, সেসব জায়গায় যখন পা দেয়, কেমন গা ছমছম করে। যেমনটি হয়েছিল ফতেপুর সিক্রিতে। *তুঙ্গভদ্রার তীরে* পড়া ইস্তক ঠিক করে রেখেছে হাম্পি একবার যেতেই হবে। সেই বিজয়নগর, সেই মণিকঙ্কনা আর বিদ্যুন্মালা যাবে না? একটিবার দেখে আসবে না?

কিন্তু সমস্যাও তো রয়েছে। যেখানেই যাও, গাঁটের কড়ি খরচা করতেই হবে। বিনা পয়সায় সুন্দরবনও বেড়ানো যায় না। কিন্তু যে ক'টা টাকা শখের পেছনে খরচ করবে, সেটুকু থাকলে তো বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

ভেবেচিন্তে বেড়ানোর পরিকল্পনাটা তুলে রাখল অক্ষর। কিন্তু এমন কি কোনও শখ অক্ষরের নেই, যা মেটানোর জন্য পকেট থেকে টাকা বের করতে হয় না? বরং উল্টো। ক্লিক করে গেলে কিছু আমদানির সম্ভাবনাও থেকে যায়!

কী সেই শখ?

অক্ষর লেখে।

কী লেখে অক্ষর? কবিতা?

বাংলা ভাষায় কথা বলে, লিখতে-পড়তে জানে, অথচ কবিতা লেখেনি এমন মানুষ টুঁড়লে কোটিতে একখানাও মিলবে কিনা সন্দেহ। অক্ষর সেই বিরলতমদের মধ্যে পড়ে।

তা বলে অক্ষর কি কবিতা পড়ে না? অবশ্যই পড়ে। কবিদের শ্রদ্ধাও করে অক্ষর। কবিরাই সবচেয়ে কম শব্দে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে।

অক্ষর গল্প লেখে।

কিন্তু অক্ষরের গল্পগুলো অন্যদের থেকে আলাদা। খুব অল্প কথায় গল্প লেখায় পেয়েছে অক্ষরকে। লিখতে লিখতে খাতা বোঝাই হয়ে গেছে। সব লেখকের মতো তারও ইচ্ছা একবার অন্তত গল্পগুলো প্রকাশিত হোক। সেখানেই বিরাট দেওয়াল! প্রকাশ করবে কে? নিজের পয়সায় বই ছাপাবে সে সামর্থ্য অক্ষরের নেই। আবার প্রতিষ্ঠিত পত্র-

পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হবে তেমন সম্ভাবনাও খুবই কম।

তাহলে?

চলে যাবার আগে অন্তত একটিবার তার লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে দেখে যেতে পারলে অক্ষর সত্যিই শান্তি পেত।

"কী ভাবছ অত?"

চমকে তাকাল অক্ষর। বীথি। কখন সামনে এসে বসেছে খেয়াল করেনি।

"কিছু না।"

"কিছু না বললে তো মানব না। আলুর পরোটা আর একখানা দেব কিনা জানার জন্যে রান্নাঘর থেকে এসে দেখি একখানাই খাওয়া হয়নি। খাবার সামনে নিয়ে ভাবছ, ভেবেই চলেছ। কী ভাব আজকাল দিনরাত?"

"বললাম তো কিছু না। আচ্ছা, বিড়ি-সিগারেট খাই না, অন্য কোনও নেশা নেই, একটু একা বসে ভাবব, তাতেও দোষ?"

"ওগুলো খেলে না হয় কথা ছিল, চোখের সামনে বসে খাচ্ছ। ভাবনার তো ল্যাজামুড়ো নেই, তাই চিন্তা হয়।"

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে জানলার সামনে এসে বসল। পর্দা টেনে দিল। সামনের গাছটায় থোকা থোকা লাল ফুল ফুটেছে। অহঙ্কারে ডগমগ করছে গাছের মাথা। পায়রা বাসা করেছে ছাদের এক কোণে। মা-পায়রা পাহারা দিচ্ছে শাবক, কাকে-চিলে মুখে করে না নিয়ে যায়। খানিকটা দূরে, রাস্তার ওপারে, দু'জন হাত-পা নেড়ে ঝগড়া করছে। হাত-পা-মুখের ভঙ্গি বোঝা যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না। মূকাভিনয়ের

মতো দেখাচ্ছে।

সমস্ত এক থাকবে, আজকের মতো। অক্ষরই দেখবার জন্য থাকবে না। অজান্তেই চোখ ঝাপসা হয়ে এল অক্ষরের।

কিন্তু অক্ষর কেন এমন করছে? কেন এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অক্ষর? জ্যোতিষীর একটা ভবিষ্যদ্বাণী এতখানিই টলিয়ে দিল অক্ষরকে?

উত্তরটা অক্ষরের জানা।

কেউ যদি অক্ষরের হাত দেখে বলত, লটারিতে কোটি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত অক্ষর। দু'বার চিন্তা করত না। এ তো তা নয়। কেউ আঙুল তুলে বলছে, "মৃত্যু! নিশ্চিত মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।" একজন নয়। একাধিক ব্যক্তি একই কথা বলছে। তখন সেই চিন্তা মাথা থেকে তাড়ানো কঠিন। অবধারিত মৃত্যু তার শীতল স্পর্শ একটু একটু করে অক্ষরের মস্তিষ্কে যেন বিছিয়ে দিচ্ছে। মাঝেমাঝে অক্ষরের মনে হয়, যা হবার হয়ে যাক। আর সে অপেক্ষা করতে পারছে না।

"বাবা!"

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অক্ষর। টুপুর।

"বল।"

"কখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?"

"না রে মা! শুনতে পাইনি।"

"তুমি যে বলেছিলে রোববার পড়া দেখিয়ে দেবে। ভুলে গেছ?"

"সত্যিই ভুলে গেছি রে মা। বুড়ো হচ্ছি তো!"

উঠে গিয়ে কাছে টানল মেয়েকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "একটা কথা বল তো? আমি যদি না থাকি, অনেক দূরে চলে যাই, কার কাছে পড়া দেখাতে আসবি?"

"ফোন করব। মেসেজ পাঠাব।"

"এমন জায়গাও তো থাকতে পারে, যেখানে কোনও মেসেজই যায় না।"

"যাঃ। তাই আবার হয় নাকি? পৃথিবীর সব জায়গায় মেসেজ যায়।"

মেয়ের কাছ থেকে আড়াল করে ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল অক্ষর, "পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর বাইরে। অন্য কোথাও? যেখানে মেসেজ পৌঁছনো সম্ভব নয়!"

৬

অনেকদিন পর ব্যাঙ্কে এল অক্ষর। বেশ কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ল।

ব্যাঙ্কের সেই সর্পিল ভিড় আর নেই। মনে আছে লাইন কাউন্টার থেকে শুরু হয়ে গেট ছাড়িয়ে বাইরে অবধি চলে যেত। ব্যাঙ্কে আসা মানেই পাক্কা দুটো ঘণ্টা বরবাদ।

ভিড় যে কমেছে তার কারণ একাধিক। টাকা-পয়সার লেনদেনে আজকাল আর ব্যাঙ্কে আসার দরকার পড়ছে না। নেট ব্যাঙ্কিং, ফোন ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড তো আছেই, আজকাল ফোন-এর একটা ক্লিক-এই টাকা এ-পকেট থেকে ও-পকেটে স্থানান্তরিত হচ্ছে। টাকা তোলার জন্যও এটিএম আছে। ব্যাঙ্কও চাইছে না কাস্টমার ব্যাঙ্কে পা রাখুক। প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্কই যাবে কাস্টমারের কাছে।

চেনা মুখগুলোও আর দেখতে পেল না। সামনেই বসত যে মেয়েটি, পল্লবী, অসম্ভব কাজের, আর সবসময় হাসিমুখ, তার টেবিল খালি। কাউন্টারেও বেশির ভাগ অচেনা মানুষ। মানুষ অচেনা হলেই খারাপ হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু চেনা মানুষের প্রতি একটা অনুরক্তি সবসময় কাজ করে, স্বীকার করি বা না-করি, এটা সত্যি।

তিন নম্বর যে-পরিবর্তনটা সবচেয়ে চোখে লাগল, আগে ব্যাঙ্কের ভেতরে ধুলো-ময়লা-ছেঁড়া কাগজ দেখতে পাওয়া যেত না। আজ দেখল, মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ, কাগজের কুচিও ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র।

অক্ষরকে কেউ বসতে বলেনি। তবু একপাশে যে তিন-চারটে চেয়ার আবহমানকাল ধরে রয়েছে তারই একটাতে নিজেকে প্লেস করে ম্যানেজারের ঘরের দিকে তাকাল। ম্যানেজার পাল্টাননি। ঘর থেকেই অক্ষরের দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে আপ্যায়ন। ম্যানেজারের সামনে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। কাচের দরজা বন্ধ। তাই কথাবার্তা কানে আসছে না। কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষটি উত্তেজিত। হাত নেড়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। ম্যানেজারও সাধ্যমতো তাঁকে বোঝাচ্ছেন। বোঝাতে যে পারছেন না কাস্টমারের বডি-ল্যাঙ্গোয়েজই তা বলে দিচ্ছে।

আগে এইভাবে বসে থাকলে কেউ না কেউ জানতে চাইত কী দরকারে এসেছে। চা-কফিও জুটে যেত। আজ কেউই কিছু জিজ্ঞেস করল না। অনাহুতের মতো একটা নিঃসঙ্গ চেয়ারে বসে ম্যানেজারের ঘর কখন খালি হবে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল অক্ষর।

বসে থাকতে-থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দরজা খুলে গেল, আর ভেতরের মানুষটি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। কয়েকটা কথা কানে গেল: "ইয়ার্কি হচ্ছে?" "লোকঠকানো?" "দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।" কী করবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত করছে, চোখ গেল ম্যানেজারের দিকে। হাত নেড়ে তাকেই ডাকছেন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অক্ষর বলল, "সরি, ভুল দিনে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে?"

"এখন সব দিনই ভুল দিন। বলুন, কী মনে করে? তার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আজ চা-কফি কোনওটাই অফার করতে পারব না। যে চা-কফি নিয়ে আসত, মহান্তি, রিটায়ার করে গেছে। এখনও কেউ জয়েন করেনি।"

"সেইটাই। বসে-বসে দেখছিলাম। ব্যাঙ্কের এমন হতশ্রী অবস্থা আগে দেখিনি। মনে হল এক মাস মেঝেতে ঝাঁটা পড়েনি।"

"এক মাস নয়, দু' মাস। লোক চেয়েছি। কবে আসবে জানি না। কর্তৃপক্ষ বলছে আউটসোর্স করো। তারও নিয়মকানুন কড়া। ইচ্ছে করলেই আমি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারব না। যে সবচেয়ে কম রেট দেবে তাকে নিতে হবে।"

"পল্লবীকে দেখলাম না, টেবিল খালি।"

"পল্লবী প্রোমোটেড অ্যান্ড ট্রান্সফার্ড। রিপ্লেসমেন্ট নেই। এমন দিন আসছে যখন এক-একটা ব্রাঞ্চ একজন করে স্টাফ দিয়ে চালানোর কথা ভাববে ব্যাঙ্ক।"

"তবে পল্লবীর রিপ্লেসমেন্ট পাওয়া কঠিন।"

"কী ব্যাপার বলুন তো? যে-ই আসে, পল্লবীকে না দেখে হায়-হায় করে। আমরা কি কেউ নই?"

"আপনারা নিশ্চয়ই কেউ। পদমর্যাদায় আরও বড়, আরও বেশি কিছু। কিন্তু পল্লবী একই সঙ্গে এফিশিয়েন্ট আর ওয়েল-ম্যানার্ড। দুটোর কম্বিনেশন আজকাল রেয়ার।"

হাসলেন ম্যানেজার, "ঠিকই বলেছেন। এফিশিয়েন্সি হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু দ্বিতীয়টার অভাব আজ সর্বত্র।"

"আগের কাস্টমার দেখলাম খুব বিরক্ত। কিছু হয়েছে?"

"আর বলবেন না। সিনিয়র সিটিজেন। চাকরি থেকে যা পেয়েছিলেন বেশিটাই ফিক্সড ডিপোজ়িট করা ছিল। টাকা ফিক্স করেছিলেন দশ বছরের জন্য। মাসে মাসে ইন্টারেস্ট পেয়ে এসেছেন। এফডি ম্যাচিওর করেছে, সেটা রোলওভার করানো হয়েছে আবার দশবছর। কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট এখন অর্ধেক। ওঁর মাথায় হাত। ইন্টারেস্টের টাকায় নাকি বুড়োবুড়ির সংসার চলে। ইন্টারেস্ট যদি অর্ধেক হয়ে যায়, ওদিকে জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, সংসারটা চলবে কী করে?"

"ঠিক কথা।"

"কথাটা তো ঠিকই, কিন্তু ইন্টারেস্ট কি আমি কমিয়েছি? নাকি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছি আমি? কিছুতেই বুঝতে চান না। বয়স্ক মানুষ, রেগে যান এমন কিছু বলাও যায় না। সব মিলিয়ে আমাদের মতো ব্যাঙ্ক-এমপ্লয়ির যে কী অবস্থা!"

ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছিল অক্ষরের। ম্যানেজারবাবুকে বলে এসির ঠান্ডা কমিয়ে দিতে বলল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিলেন মশাই! মানুষ কি আর ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে না?"

"কে বলল রাখবে না? বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয়, ব্যাঙ্কে রাখলে নিরাপদ; সেই কারণে ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। ব্যাঙ্ক আর ইন্টারেস্ট দেবে না। বরং সিকিওরিটি দিচ্ছে বলে ব্যাঙ্কই চার্জ করবে।"

"তার মানে আগের যুগ? তোশক-বালিশে টাকা! দেওয়ালে লুকনো সিন্দুকে টাকা!"

"তা কেন? বাড়িতে টাকা না রেখে ইনভেস্ট করুন। শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, টাকা বাড়ানোর এখন হাজারটা রাস্তা।"

"যদি শেয়ার মার্কেটে ধস নামে? শেয়ারের দাম পড়ে যায়!"

"ওটুকু রিস্ক তো আপনাকে নিতেই হবে।"

"বাদ দিন ওসব কথা। ক'টা টাকা আমার বাড়তি আছে যে শেয়ারে খাটাব? আপনার কাছে আজ এসেছি একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে।"

"রিকোয়েস্ট বলবেন না। হুকুম করুন। আপনাদের মতো কাস্টমারের জন্য ব্যাঙ্ক হাত বাড়িয়ে আছে।"

"আমার কয়েকটা ফিক্সড ডিপোজ়িট আছে। বেশি দিনের নয়। বের করে দেখলাম সেগুলোয় নমিনি করা নেই। নমিনির নাম ঢোকানো যাবে?"

"সে তো নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তার চেয়ে বেটার অপশন আছে। কার নামে নমিনি করতে চান?"

"ছেলে আর মেয়ে।"

"ওদের বয়স আঠারো হয়েছে?"

"ছেলের হয়েছে। মেয়ের এখনও বাকি, কয়েক বছর।"

"ওদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে?"

"না। খুলব-খুলব করেও খোলা হয়নি।"

"খুলে দিন। আঠারো না হলেও আজকাল অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। সেটা আমরা দেখে নেব। তারপর এগজ়িসটিং এফডি ক্লোজ় করে নতুন ফিক্সড ডিপোজ়িট করুন, আপনার আর সন্তানের নামে। আইদার অর সারভাইভার। ফার্স্ট অ্যাপ্লিক্যান্ট আপনি। এটাই সবচেয়ে সিকিওরড।"

"বাঁচালেন। মাথা থেকে চিন্তা নামল।"

"একটা কথা বলুন তো? হঠাৎ নমিনেশন নিয়ে পড়লেন কেন?"

"বয়স পঞ্চাশ হতে চলল। কার কখন কী হয় কিছু বলা যায়? তাই ভাবলাম, এতদিন তো যেমন তেমন করে কাটিয়েছি। এবার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখাই ভাল।"

"আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? পঞ্চাশ একটা বয়স হল? পঞ্চাশে মানুষ আজকাল নতুন করে জীবন শুরু করে। আমার এক সম্বন্ধী, আপনার চেয়েও বছর পাঁচেকের বড়, এই তো সেদিন বাঞ্জি-জাম্পিং করে এল। যান যান, ওসব উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথা থেকে তাড়ান। বরং একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে নিন।"

"করিয়েছি। সব নর্মাল।"

"তাহলে? আর যদি সত্যিই সিকিওরিটির কথা ভাবেন, লাইফ ইনশিওরেন্স করুন, ভাল এজেন্ট চেনা আছে? না থাকলে বলবেন, পাঠিয়ে দেব।"

ধন্যবাদ দিয়ে উঠে আসতে-আসতেও অক্ষর বলতে ভুলল না, "ফিক্সড ডিপোজ়িটে আইদার অর সারভাইভার, তাই তো?"

"হ্যাঁ, তার আগে দু'জনের অ্যাকাউন্ট। দাঁড়ান, অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম দু'খানা দিয়ে দিই।"

মধ্যিখানে টাক, চারপাশে কাঁচাপাকা চুল; সস্তা ছিটের শার্ট, যার দু'খানা বোতাম ছেঁড়া, হাওয়াই চটি, ডাঁটিভাঙা চশমা, কালি-বেরনো কলম।

ইনশিওরেন্স-এর এজেন্ট বলতে এই রকমই একটা ছবি মাথায় আসে। পুরনো বাংলা সিনেমা এবং গল্প-উপন্যাস এই ছকেই ইনশিওরেন্স কোম্পানির দালালদের এঁকে এসেছে।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরাও যে নিজেদের পাল্টে ফেলেছেন— পাল্টে ফেলেছেন বলা ভুল, তাঁদের যে মেটামরফসিস হয়েছে— না দেখলে অক্ষর বিশ্বাস করত না।

সহকর্মীদের কাছে শুনেছে, পার্থদা, পার্থ, পার্থবাবুর কথা। ইনশিওরেন্স-এর এজেন্ট। একটা ফোনের অপেক্ষা। তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যান। কিন্তু চোখের দেখা হয়নি। বিকাশের রেফারেন্স-এ যেদিন এসে উপস্থিত হলেন, চমকে উঠল অক্ষর।

ইনি... ইনশিওরেন্স-এর এজেন্ট?

টাইট-জিনস, গোলগলা টি-শার্ট, স্নিকার, সানগ্লাস, গাড়ি পার্ক করে

চাবির রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে টিচার্সরুমে এসে যখন অক্ষরের খোঁজ করলেন, অক্ষরের মনে হল, ছেলে না হয়ে সে যদি হত মেয়ে আর বয়সটা বছর কুড়ি কম, নির্ঘাৎ প্রেমে পড়ে যেত।

তার নাম ধরেই খোঁজাখুঁজি করছিলেন, সময়টাও যেমন বলা ছিল তার দু' মিনিট আগেই, তবু সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অস্বস্তি হচ্ছিল। হীনমন্যতা? অসম্ভব নয়।

বিকাশ সঙ্গে করে নিয়ে এল।

"অক্ষর! এর কথাই তোমাকে বলছিলাম।"

হাতজোড় করে নমস্কার করল অক্ষর। পার্থ প্রতিনমস্কার করে বললেন, "এখানে... মানে কলেজের ভেতর... কেউ আপত্তি করবে না তো?"

"না না। আপনি স্বচ্ছন্দে শুরু করতে পারেন। তা ছাড়া কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছে। আমরা যে ক'জন আছি প্রত্যেকেই কারও না কারও জন্য অপেক্ষা করছি।"

ফাঁকা দেখে একপাশে বসল দু'জন। ডায়েরি আর ডট পেন বের করলেন পার্থ। তারপর অক্ষরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পলিসি চুজ় করার আগে আপনার সম্বন্ধে কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন আমার লাগবে।"

"বলুন।"

"আপনার বয়স?"

"ফর্টি নাইন প্লাস।"

"ছেলে-মেয়ে?"

"এক ছেলে এক মেয়ে। আঠারো আর বারো। ছেলে বড়। ছেলে ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে। মেয়ের ক্লাস সিক্স।"

"আপনার স্ত্রী?"

"স্কুলে পড়ান।"

"বাঃ! বাবা-মা দু'জনেই শিক্ষকতায়। বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ। এবার বলুন এগজ়িসটিং পলিসির কথা। ক'টা আছে। কবে ম্যাচিওর করবে।"

"নিল। শূন্য। কোনও পলিসি নেই।"

এতক্ষণ ডায়েরিতে নোট নিচ্ছিলেন পার্থ। কলমটা টেবিলের ওপর রেখে অক্ষরের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "উনপঞ্চাশ বছরেও কেউ ইনশিওরেন্স ছাড়া রয়েছে আমার এই প্রথম এক্সপিরিয়েন্স।"

হাসবার চেষ্টা করল অক্ষর। ভাবল বলে, বাড়িতে ডাকাত না পড়লে কি কেউ কাঁটাতারের বেড়া দেয়? ভাবনাটাকে চেপে রেখে জবাব দিল, "সেই জন্যেই তো আপনাকে ডাকা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্থ বললেন, "ঠিক আছে। আপনাকে কয়েকটা পলিসি দেখাই। দেখুন কোনটা আপনার পছন্দ।"

পাশাপাশি স্মার্টফোন আর প্রিন্ট আউট দেখিয়ে পার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অক্ষরের মনে হল যে কোনও প্রথম শ্রেণির অধ্যাপকের মতো না দেখেই গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন পার্থ। নিজস্ব বিষয়ে তাঁর যে গভীর দখল, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

"প্রথম যেটা দেখাচ্ছি, আপনার বয়সি লোকেদের পক্ষে এটা একদম আইডিয়াল। পপুলারও হয়েছে পলিসিটা। দশ বছর আপনাকে টাকা জমা করতে হবে, একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, সে ওয়ান ল্যাক পার অ্যানাম। আপনাদের রিটায়ারমেন্ট এজ কত যেন? ষাট না পঁয়ষট্টি?"

"ষাট ছিল। এখন পঁয়ষট্টি।"

"বেড়ে গেল কেন?"

"সরকার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দিতে পারছে না। তাই যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিছু দিনের মধ্যে ওটা সত্তরও হতে পারে।"

"বেশ। তাহলে আপনি বছর বছর একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট জমা করছেন। তারপর থেকে, যতদিন বেঁচে থাকবেন সেম অ্যামাউন্ট আপনি পেতে থাকবেন।"

"আর বেঁচে না থাকলে?"

"আপনার নমিনি পাবে।"

"খুব অ্যাট্রাকটিভ লাগছে না। আর কোনও পলিসি?"

পাতা ওল্টালেন পার্থ, "এটায় লাম্পসাম ইনভেস্ট করতে হবে। পাঁচবছর লকইন। তারপর থেকে যা ইনভেস্ট করলেন তার এইট পার্সেন্ট হিসেবে প্রতিবছর পেয়ে যাবেন, লাইফ লং।"

"যদি হঠাৎ টাকার দরকার পড়ে? তোলা যাবে তো?"

"ওইটা যাবে না। যতদিন বেঁচে থাকবেন তোলা যাবে না। মারা গেলে আপনার নমিনি পাবে।"

মনে-মনে হিসাব করছিল অক্ষর। পার্থ থামলে বলল, "আপনারা কিন্তু ব্যাঙ্কের থেকেও কম রিটার্ন দেন। আর ইনফ্লেশন দিয়ে কারেক্ট করলে কিছুই থাকে না।"

"এগজ্যাক্টলি। ইনশিওরেন্স কেউ ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে করে না। করে রিস্ক কভারেজের জন্য।"

"তাহলে সেটাই বলুন যাতে রিস্ক কভারেজ ম্যাক্সিমাম।"

"ঠিক আছে। তাহলে এটা দেখুন। একলক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলে আপনি বেঁচে থাকতে কিছুই পাবেন না। মারা গেলে আপনার নমিনি পাবে, দশ লাখ।"

"গুড! এটাই আমার দরকার।"

জিনিসপত্র গোছাতে-গোছাতে পার্থ বললেন, "আপনার বয়সে এই পলিসি অপ্ট করতে কাউকে দেখিনি। ... যাই হোক, আপনার যা চয়েস। মেডিক্যাল লাগবে কিন্তু একটা।"

"রিসেন্টলিই করিয়েছি। সব নর্মাল। তাও, লাগলে করিয়ে নেবেন।"

"আপনি সত্যিই অবাক করলেন। একটা কথা বলব? ইনশিওরেন্স-এ বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। একটা বড়সড় পলিসি করিয়ে ঝপ করে যারা মরে যায়, প্রফিট সেইসব মানুষের।"

"প্রফিট ভোগ করবার জন্য সে আর রইল কোথায়?"

"সে নয়, ভোগ করবে তার নমিনি। আর তাদের জন্য ইনশিওরেন্স কোম্পানির যা লস হয় সেটাই কোম্পানি উশুল করে অন্যদের ঘাড় ভেঙে।"

৭

মনে আছে, স্কুলের মাস্টারমশাইরা বেশির ভাগই সাইকেলে আসতেন, কেউ কেউ হেঁটে। ভক্তিবাবুর পায়ের ডিফেক্ট ছিল, এখন বুঝতে পারে পোলিও, হাঁটতেন ক্রাচে ভর করে, আসতেনও রিকশায়। এর বাইরে কাউকে কোনও বাহন ব্যবহার করতে দেখেনি।

সাইকেলে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাঁচুবাবু, বিশেষ করে মনে আছে এই কারণে, ছোটখাটো মানুষটির পা নীচ অবধি পৌঁছত না। একদিন প্রখর গ্রীষ্মে বাড়ি ফেরার সময় দেখেছিল রাস্তার ধারের পাঁচিলে সাইকেলটা ঠেসিয়ে চেন পরানোর চেষ্টা করছেন স্যর। চেন আলগা হয়ে গেলে ওরকম মাঝেমাঝেই হয়। তখন সাইকেল সারানোর দোকানে গিয়ে টাইট করিয়ে আনতে হয়।

অক্ষর দেখেছিল মানুষটা দরদর করে ঘামছেন, গায়ের পাঞ্জাবিখানা সেঁটে বসেছে, কিন্তু যতবার চেন পরাচ্ছেন ততবারই খুলে যাচ্ছে। কষ্ট হয়েছিল। কাছে গিয়ে বলেছিল, "সরুন স্যর, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।" চেন পরানো হয়ে গেলে পিঠে একখানা হাত রেখেছিলেন পাঁচুবাবু। সেই স্পর্শে 'থ্যাংক ইউ', 'ধন্যবাদ', 'ভাগ্যে তুই এসেছিলি' সব জড়ানো ছিল। এখনো চোখ বন্ধ করলে অক্ষর অনুভব করতে পারে।

সাইকেল বিদায় নিয়েছে, পদব্রজে স্কুলে আসার কথা এখনকার শিক্ষকরা স্বপ্নেও ভাবেন না। বেশির ভাগই অটো-টোটোতে আসেন-যান। দু'-একজন গাড়িও কিনে ফেলেছেন। বাকিরা ইএমআই-এর

হিসাব কষছেন। পরের ইনস্টলমেন্ট ডিএ-টা অ্যানাউন্স করলেই গাড়ি কোম্পানির দরজায় ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে যাবে।

কলেজে ছবিটা সামান্য আলাদা।

বেশির ভাগ অধ্যাপকই গাড়ি পোষেন। তার মধ্যে কুলীন তাঁরাই যাঁদের বিদেশি গাড়ি কলেজে পৌঁছে দেয়। জাতে উঠতে গেলে ড্রাইভার রাখাও অবশ্য প্রয়োজন। অক্ষরদের কলেজে কুলীন চূড়ামনি যে তার নাম রাকেশ খান্ডেলওয়াল।

খান্ডেলওয়াল শুনে কেউ ভুল করে ফেললেই মুশকিল। রাকেশ বাঙালিদের থেকেও ভাল বাংলা বলে। কলাইয়ের ডাল-আলু পোস্ত ওর ফেভারিট মেনু। আর যারা ভাবে গাড়িটা ও বংশানুক্রমে অর্জন করেছে, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাক, সারাটা কর্মজীবন ওর বাবা মহাজনের গদিতে খাতা লিখেই কাটিয়েছেন। ওর বউ শিপ্রাও এসেছে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে।

তাহলে বিদেশি গাড়ির রহস্য?

রাকেশকে জিজ্ঞেস করলে মুচকি হাসে।

"ওসব মুখে বলে হয় না। একদিন আয় আমার সঙ্গে। নিজের চোখে দেখে আসবি।"

যাব-যাব করেও এতদিন যাওয়া হয়নি। এবার ঠিক করে ফেলল, আর দেরি না করে একবার দেখে আসাই ভাল।

রাকেশ টিউশন পড়ায়।

টিউশন তো আরও অনেকেই করে। তাহলে অন্যদের থেকে রাকেশ আলাদা কেন?

অক্ষরদের কলেজটা মফস্সলে। ছাত্রছাত্রীরাও বেশির ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা। অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন কলেজ পড়ুয়া। কলেজের মাইনে, টিফিন-খরচ এসব মিটিয়ে আবার প্রাইভেট টিউশন?

কেউ কেউ যে টিউশন নেয় না তা নয়। সেখানেও শ্রেণিবৈষম্য।

বৈষ্ণব কবিরা যে পদাবলি রচনা করে গিয়েছেন, তাতে বছর বছর সংযোজন হয় না। শেক্সপিয়রের মহান সৃষ্টিও কালের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে অজর-অমর-অক্ষয়। কাজেই বাংলা-ইংরেজির অধ্যাপকদের তৈরি করা নোটস-এর কোনও বদল ঘটে না। সেয়ানা ছাত্ররা আগের ব্যাচের থেকে কম দামে নোটস জোগাড় করে সেগুলোই পরীক্ষায় উগরে দেয়। তেমনই, আকবর বাদশা জনহিতে যা যা করে গিয়েছেন তা যেমন বদলানো সম্ভব নয়, পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া অবধি কর্কটক্রান্তি-মকরক্রান্তি রেখাও একই জায়গায় থাকবে। সেই কারণে বাংলা-ইংরেজি-ইতিহাস-ভূগোলের অধ্যাপকরা টিউশনের বাজারে তেমন কল্কে পান না।

সায়েন্স সাবজেক্ট তা নয়। বুঝিয়ে দিতে হয়। এতদিন ছিল না, ক'বছর হল সায়েন্স সাবজেক্টগুলোতেও এক-এক করে অনার্স খুলে যাচ্ছে কলেজে। সেইসব বিষয়ের অধ্যাপকদের বাজারও সমানুপাতিক হারে বাড়ছে।

রাকেশ পড়ায় অঙ্ক। কিন্তু অন্যদের থেকে রাকেশের যেখানটায় ফারাক, স্থানীয় বাজারে রাকেশ তেমন উৎসাহী নয়। যেখান থেকে রাকেশের গাড়ির ডিজ়েল এবং ড্রাইভারের মাইনে সাপ্লাই হয় সেটি এক নামকরা কোচিং সেন্টার, মাসে অন্তত একবার যার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন নামী সংবাদপত্রগুলিকে অলঙ্কৃত করে।

অক্ষর যখন কলেজের পড়া শেষ করে কলকাতায় পড়তে এসেছিল, অক্ষরের মতো অনেককেই তখন হস্টেলে থেকে পড়াশোনার পাট চোকাতে হয়েছিল। টাকাপয়সার টানাটানি ছিল। মেসবিল মেটানোই কোনও-কোনও মাসে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াত। স্বভাবতই বাইরে টিউশন বা কোচিং নেবার ভাবনা মাথার কোণেও জায়গা পেত না।

কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের আশপাশে, মির্জাপুর স্ট্রিট বরাবর, আনাচেকানাচে গলিঘুঁজির মধ্যে গজিয়ে ওঠা অগুনতি কোচিং সেন্টার চোখ এড়াত না। লাইটপোস্ট থেকে শুরু করে গাছের ডাল, সব জায়গা থেকেই সাইনবোর্ড ঝুলত, 'হরিদার কোচিং' কিংবা 'অঙ্কে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রফেসর পি.সি.মিদ্যা'। একবারই শুধু এক কোচিং সেন্টারের প্রাণপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

পুজোর ক'টা দিন হস্টেলের মেস বন্ধ থাকত। এদিকে পুজোর ছুটির পরই পরীক্ষা। তাই বাড়ি যাওয়াও সম্ভব হত না। ভরসা বলতে মির্জাপুর স্ট্রিটের মিনি হোটেল আর সেখানকার কাঁচকলা-জিরে-হলুদ দিয়ে রান্না করা মাছের ঝোল আর ভাত।

সেরকমই একদিন দুপুরে দুই বন্ধু খেতে বসেছে, ভাত ভেঙে জিরের ঝোল ঢেলেছে সবেমাত্র, কর্মচারীদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা লক্ষ করল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল হোটেলে ঢুকছেন গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি সোনালি ফ্রেমের চশমা এক স্মিতদর্শন ভদ্রলোক।

কাউন্টারে বসা মালিক উঠে গিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করে হোটেলের একমাত্র পরিষ্কার টেবিলটিতে বসালেন। তারপর হাতজোড় করে জানতে চাইলেন, "আজ কী সেবা হবে?"

আয়েশ করে বসে 'হরিদা'— ততক্ষণে অক্ষররা জেনে গিয়েছে তিনিই সাইনবোর্ডের 'হরিদা'— নিমীলিত দৃষ্টিতে জানতে চাইলেন, "ডিমসুদ্ধ ইলিশ আছে?"

"আছে।"

"দিন এক প্লেট। চিংড়ির মালাইকারি?"

"আছে।"

"ওটাও দিন। চিতল পেটি?"

মালিকের মুখ কালো হয়ে গেল। মাথা নিচু করে বললেন, "আজ্ঞে, চিতলপেটি শেষ হয়ে গেছে।"

"চিতল পেটি নেই?"

হাহাকারের মতো শোনাল হরিদার কণ্ঠস্বর। তারপর অক্ষরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চিতলপেটি নেই। বলুন, খাওয়া যায়?"

গলার কাছে জিরের ঝোলমাখা ভাতের দলা তখনও আটকে রয়েছে, ঘাড় নেড়ে অক্ষররা বলেছিল, "ঠিকই তো! চিতলপেটি না হলে খাওয়া যায়?"

কিছুদিন আগে মির্জাপুর স্ট্রিটে যেতে হয়েছিল একটা কাজে। পাইস হোটেলগুলো রেস্তরাঁয় কনভার্ট করে গিয়েছে। কালিকার চপের দোকানেও চপ-ফুলুরি-বেগুনি এখন ব্রাত্য। আর কোচিং সেন্টার?

সেন্টারের নাম লেখা সাইনবোর্ডগুলো কাত হয়ে ঝুলছে। লেখা মুছে গিয়েছে। কঙ্কালের মতো কয়েকটা টিনের পাত কাঠের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে। চিতলপেটি না-খাওয়ার দুঃখে যিনি দুপুরের মির্জাপুর স্ট্রিটে দীর্ঘশ্বাসের তুফান বইয়ে দিয়েছিলেন, কে জানে তিনিই বা এখন কোথায় আছেন! বিগতযৌবনা বারাঙ্গনার মতো মির্জাপুর স্ট্রিট এখনও চড়া লিপস্টিক লাগিয়ে অপেক্ষা করে, কার জন্য সে-ই জানে।

রাকেশ কিন্তু মির্জাপুর-বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ধার দিয়েও গেল না। বদলে অক্ষরকে যেখানে এনে ফেলল, থিয়েটার রোডের সেই ঝাঁ-চকচকে বাড়িটিতে সরস্বতীর বদলে মা লক্ষ্মীর আরাধনা হলেই মানাত ভাল। অক্ষরকে একা আসতে হলে ভেতরে পা রাখার আগে দু'বার ভাবত।

রাকেশকে দেখা গেল সবাই চেনে। রিসেপশনে বসে থাকা ধাক্কা দেওয়া সুন্দরী মেয়েটিও উঠে দাঁড়িয়ে উইশ করল। দেখেও না দেখার ভান করে হাত বাড়িয়ে অক্ষরকে ডাকল রাকেশ, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়।"

স্লিপ পাঠাতে যে ঘরটার দরজা অক্ষরদের জন্য খুলে গেল, তেমন ঘর সিনেমাতেই দেখা যায়। দেওয়ালজোড়া আনব্রেকেবল গ্লাস-এর ওপারে সমুদ্রসৈকত, রৌদ্রস্নানরতা যুবতী এবং নীলাভ ঢেউয়ের আবহটুকুই শুধু নেই। বাকি যা যা বিল গেট্স্- জেফ বেজোস-এর ঘরে থাকা সম্ভব সমস্তই রয়েছে ঘরখানায়।

“চা না কফি?”

সেন্ট্রাল এসিতে বসেও অক্ষর ঘামছিল। রাকেশ অম্লানবদনে বলল, “ব্ল্যাক কফি। উইথ শুগার।”

কফির অর্ডার নিয়ে বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই রাকেশ ভনিতা না করে কথা পাড়ল, “এর কথাই আপনাকে বলছিলাম। আমার কলিগ, অক্ষর। অসম্ভব ভাল পড়ায়। আপনার সেন্টারে কনট্রিবিউট করতে এসেছে।”

“ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আপনাদের মতো ব্রাইট প্রফেসরদেরই তো আমরা খুঁজছি। তা আপনার সাবজেক্টটা কী জানতে পারি?”

অক্ষর বলল। একটা স্লিপ-প্যাডে নোট করলেন ভদ্রলোক। তারপর অক্ষরের চোখে চোখ রেখে বললেন, “কোয়েশ্চন সেট করেন?”

প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারল না অক্ষর। অসহায়ের মতো রাকেশের দিকে তাকাল। রাকেশ ধরিয়ে দেবার আগেই উল্টোদিকে বসা ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিলেন, “মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স-পাস, জয়েন্ট-আইআইটি কোনও পরীক্ষার কি আপনি কোয়েশ্চন-সেটার, বা মডারেটর?”

ঘাড় নাড়ল অক্ষর।

“তাহলে আপনাকে ওয়েট করতে হবে। নাম ফোন নাম্বার রেখে যান। ভেকেনসি হলে ডেকে পাঠানো হবে।”

“আর কোয়েশ্চন সেটার বা মডারেটর হলে?”

“দরজা খোলা। এখনই নেগোসিয়েশনে বসব। টার্মস অ্যান্ড পার্কস। কতটা সাদায় আর কতখানি ব্ল্যাক-এ।”

“কেন এত তফাত?”

“হবে না? ধরুন আপনি জয়েন্ট-এর কোয়েশ্চন সেট করেন। অথবা মডারেশন। কোয়েশ্চন-এর একটা কপি আপনার কাছে থাকবেই। বুদ্ধিমান মানুষ, কীভাবে কপি রাখতে হয় আমার চেয়ে আপনারা ভাল জানেন। আমরা বলব না, তবে এক্সপেক্ট করব, প্রশ্নগুলোর... ধরুন এইট্টি পার্সেন্ট... পরীক্ষার আগে সাজেসশন হিসেবে সেন্টারের স্টুডেন্টদের দেবেন। রেজাল্ট যখন বেরোবে দেখা যাবে ফার্স্ট হান্ড্রেডে অন্তত তিরিশজন এখানকার। ইমিডিয়েটলি লিডিং নিউজপেপারগুলোতে সেই নিউজ আমরা ফ্ল্যাশ করব। ধরেই নেওয়া যায় পরের বছর আমাদের এনরোলমেন্টও হয়ে যাবে ডাবল। পাশাপাশি কোর্স ফি-ও আমরা টুয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেব।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল অক্ষর। মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে ভদ্রলোকও বলে যাচ্ছিলেন, “এমন নয় যে প্রফিটটা আমরা একাই এনজয় করব। আপনাদের মতো যেসব প্রফেসর-এর কনট্রিবিউশনে আমাদের এই অ্যাচিভমেন্ট, তাঁদেরও ডিউলি কমপেনসেট করা হবে।”

অক্ষর ভাবছিল। কত সহজে বোঝাচ্ছেন সিইও। যেন দরজা রং করার কনট্র্যাক্ট দিচ্ছেন। যত পালিশ, তত দর।

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাকে ডেকে টেবিল পরিষ্কার করতে বলে বাকিটুকু কমপ্লিট করলেন সিইও।

“কাল একজন আইআইটির প্রফেসর এসেছিলেন। অন দ্য ভার্জ অফ রিটায়ারমেন্ট। সাবজেক্ট ডাইভাল্জ করছি না, বিখ্যাত মানুষ, অনেকেই চেনে। বহুবার এনট্রান্স এর কোয়েশ্চন সেট করেছেন। আমাদের এখানে জয়েন করতে চান। নেগোসিয়েশন হল, শেষ অবধি কত প্যাকেজ ওনাকে অফার করা হল জানেন? গেস?”

অক্ষর চুপ করে বসেছিল। এই রাস্তার গলিঘুঁজি সমস্তই অক্ষরের অজানা।

শূন্য পাওয়া ছাত্রদের মুখের দিকে যেভাবে তাকান শিক্ষক, দৃষ্টিতে ততখানিই তুচ্ছতা মিশিয়ে সিইও বললেন, “ফিফটি ল্যাকস। হাফ-আ-ক্রোড়। উইথ আ প্রমিস টু হাইক ইট বাই টেন পার্সেন্ট এভরি ইয়ার। ক্যান ইউ ইমাজিন?”

বাইরে বেরিয়ে রাকেশের দিকে তাকিয়ে প্রথম যে-প্রশ্নটা অক্ষর করেছিল সেটা হল, “তুই কোয়েশ্চন সেট করিস?”

রাকেশ হেসেছিল, “অফ কোর্স। তুইও করবি।”

আকাশ থেকে পড়েছিল অক্ষর, “আমি?”

“বলে দেব রাস্তাটা, চিন্তা করিস না। আমি সঙ্গে আছি কী করতে?”

পরের সপ্তাহে অক্ষরকে নিয়ে অধ্যাপক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গেল রাকেশ। অ্যাসোসিয়েশনকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে এসেছে অক্ষর। অধ্যাপকদের দাবিদাওয়া যে অযৌক্তিক তা মনে করে না। তাই নিয়ে আন্দোলনের দরকার আছে সেটাও অস্বীকার করে না। কিন্তু অক্ষরের আপত্তি সেইসব মানুষগুলোকে নিয়ে যারা অ্যাসোসিয়েশনের অফিস আলো করে বসে থাকে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া থেকে হেন দু'নম্বরি নেই, যার সঙ্গে এদের অনেকেই জড়িত নয়। অথচ দিনের পর দিন এরাই ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে। জমানা বদলায়। ঘরের দরজায় লটকানো প্রতীকচিহ্নটা বদলে যায়। ভেতরের মানুষগুলো একই থাকে।

“এখানে?” নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল অক্ষর।

অক্ষরের রিঅ্যাকশন দেখে হেসেছিল রাকেশ।

“উপায় নেই। শুরুটা এখান থেকেই করতে হবে। তুই যে অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার তার পরিচয়পত্র তো জগা-মাধা অন্য কেউ দেবে না।”

সদস্য হওয়া মানে একটা ফর্ম ফিল-আপ আর চাঁদা। ফর্মালিটিজ় কমপ্লিট হতে একসপ্তাহ লাগল। তারপর অক্ষরকে ধরে একদিন রাকেশ বলল, “এবার যেতে হবে আসল জায়গায়।”

“আসল জায়গা?”

“হাইকমান্ড।”

নাকতলার কাছে পাঁচিলঘেরা যে-বাড়িটায় রোববার সকালে দু'জনে পৌঁছল, কাছাকাছি যে দু'-চারজন ফিল্মস্টার থাকেন তাঁরাও ঢুকলে ঈর্ষার জ্বলুনি টের পেতেন। বলা ছিল। তাই সোজা হাজির হল স্টাডিতে, যেখানে পেল্লায় বইয়ের আলমারির সামনে ইজ়িচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে সমৃদ্ধ গুপ্ত বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

“সমৃদ্ধদা, এ-ই অক্ষর।”

“এসেছ? দাঁড়াও, ওকে আগে একটা বই দিই।”

আগডুম বাগডুম কথা বলে ওরা যখন বেরিয়ে এল বই বের করে দেখাল রাকেশ। ভেতরে চোখ বুলিয়ে অক্ষরের আক্কেল গুড়ুম। চাঁদার রশিদ বই। এক থেকে একশো পাতার।”

রাকেশ বলল, “শোন, সামনে স্টেট কনফারেন্স। তার জন্য চাঁদা তুলে দিতে হবে। ডোনেশন। যে যত তুলে দেবে, তার সামনে ততখানিই চওড়া রাস্তা খুলে যাবে।”

রশিদ বইয়ের পাতাগুলো ফরফর করে উড়িয়ে রাকেশ ব্যাখ্যা করল, “মিনিমাম চাঁদা পাঁচ হাজার। একশো পাতা। তার মানে পাঁচলাখ। তবে কেউই পাঁচলাখ দেয় না। আমার যেমন বারো লাখ তোলা হয়ে গেছে।”

“বারো লাখ?”

“তবে? ক্যাশবাক্সের চাবি কি অমনি খোলে? কী ভাবছিস, এইসব টাকা অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে?”

“পড়বে না?”

“খেপেছিস? এমনি হাজার হাজার রশিদ বই হাতে হাতে ঘুরছে। তার টেন পার্সেন্টও দেখানো হবে না। বাকি সব জমা পড়বে বইয়ের আলমারির পেছনে।”

বুঝতে না পেরে রাকেশের দিকে তাকাল অক্ষর। রাকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“ওই আলমারিগুলো নকল। বইগুলোও। সরালে নীচে নেমে যাবার সিঁড়ি। ধাপে ধাপে। সেখানে কোটি কোটি টাকা। সোনার বাট। সবই এইভাবে রোজগার।”

“ধরা পড়েন না? ইনকাম ট্যাক্স? ইডি? সিবিআই?”

"পাগল? এক কোটি টাকা সরালে চুরির দায়ে ধরা পড়ে। একশো কোটিতে সে দেশসেবক। সব কিছুর ওপরে।"

৮

সায়ন্তন কবিতা লেখে। সেই কবিতা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়।

ভালই লেখে নিশ্চয়ই, নইলে ছাপা হবে কেন? সায়ন্তন বোঝায়, কবিতা তো কেউ একা একা অন্ধকার ঘরে আবৃত্তি করার জন্য লেখে না। লেখে অন্যকে শোনাবার জন্য। লেখে, যাতে সে লেখা ছাপা হয়। লোকে পড়ে। শুধু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায় তা-ই নয়। আজকাল নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে: ফেসবুক। সকালে চা খেয়ে বাথরুমে যাবার আগে নিয়ম করে সায়ন্তন একটি করে কবিতা প্রসব করে। সেটা ফেসবুকে সাজিয়ে দেয়। তারপর কতজন সেখানে লাইক মারল তার হিসাব করে। "আনলাইক"-এর অস্তিত্ব যেখানে নেই, সেখানে "লাইক" দেখে পুলকিত হওয়াই একমাত্র সম্বল। প্রতিদিন "লাইক"-এর সংখ্যা মাথায় রেখে ঘুমোতে যায় সায়ন্তন। পরদিন আর একটি কবিতা জন্ম দেবার প্রতিশ্রুতি বুকে নিয়ে।

অক্ষর মাঝেমাঝে ভাবে, ভ্যান গঘ, গগ্যাঁ এঁদের যদি বাদও দিই, জীবনানন্দ, যিনি লেখার পর লেখা ছাপতে না দিয়ে বাক্সবন্দি করে রেখে দিয়েছিলেন, একালে জন্মালে "অচল" তকমা অর্জন করতে এক মুহূর্তও সময় লাগত না। এই ক্রান্তিকালে জীবনানন্দ নন, সায়ন্তন মিত্রই কবি।

অক্ষরও লেখে। কবিতা লেখার মুরোদ অক্ষরের নেই। তাই লেখে গদ্য। প্রবন্ধ নয়। উপন্যাস তো নয়ই। ছোটগল্প সেগুলোকে বলা চলে কিনা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু নিজের লেখা সম্বন্ধে তার এতখানিই কুণ্ঠা, কোথাও ছাপতে দিতে পারে না। আর ছাপার জন্য পাঠালে তা ছাপা হবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? কিন্তু ছাপা নয়, তার আগে অক্ষর চায় লেখাগুলো কাউকে দেখাতে। এমন কেউ, যিনি সাহিত্যের যথার্থ সমঝদার। আদৌ তার লেখাগুলো সত্যিকার লেখা হচ্ছে কিনা তা জেনে নিয়ে তবেই ছাপার কথা ভাবা যাবে।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পার হয়ে সায়ন্তনকে বলেই ফেলল কথাটা।

"আমিও লিখি জানিস?"

"তাই? দারুণ খবর! কী লিখিস, কবিতা?"

"না, গল্প।"

"দেখা তো, কেমন গল্প।"

একদিন দুটো গল্প দেখাল ও সায়ন্তনকে। পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল সায়ন্তন।

"কিছু হয়নি, না রে?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"তার মানে?" ঢোঁক গিলল অক্ষর।

"মানে, তোর গদ্যটা কেমন যেন, কাটাকাটা, স্ট্যাকাটো টাইপের। ঠিক টানে না। তরতর করে পড়ে ফেলা যায় না।"

"ছাপবার যোগ্য নয়, তাই তো?"

"তা তো বলিনি। বলছি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। চল, সত্যেনদাকে দেখাই। উনিই আসল লোক।"

"সত্যেনদা?"

"সত্যেনদার নাম শুনিসনি? সত্যেন হালদার। সত্যেনদাকে বলা হয় সাহিত্যের জহুরি। ভাল লেখা খুঁজে বের করায় ওঁর কোনও জুড়ি নেই। চল্লিশ বছর একটা পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন। সেখানে লেখা ছাপানোর জন্য ছোট-বড় কবি-গদ্যকাররা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লেখা ছাপা হওয়া মানে সাহিত্য জগতে আসন পাকা হয়ে যাওয়া।"

"অত বড় মানুষ, অমন নামজাদা সম্পাদক! আমার লেখা কি পড়ে দেখবেন?"

"ওইটাই তো সত্যেনদার বিশেষত্ব। প্রতিটা লেখা খুঁটিয়ে পড়েন। নতুন লেখকদের লেখা হলে তো কথাই নেই। সত্যেনদার মুখ থেকে দুটো বাক্য শোনবার জন্য লেখকরা উদগ্রীব হয়ে থাকে। কথা তো নয়, বাণী! এগিয়ে চলার পাথেয়।"

সায়ন্তন চেয়েছিল সরাসরি পত্রিকা অফিসে অক্ষরকে নিয়ে যেতে। অক্ষর সাহস পায়নি। শেষ অবধি তিনখানা ছোটগল্প সায়ন্তন মারফত পাঠিয়ে দিল অক্ষর। সায়ন্তন এসে জানাল, সত্যেনদা লেখাগুলো নিয়েছেন এবং পড়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওটুকুতেই কৃতার্থ হয়ে গেল অক্ষর। শুরু হল প্রতীক্ষা।

সেদিন থেকে স্টাফরুমে করিডরে ক্যান্টিনে সায়ন্তনকে দেখতে পেলেই ছুটে ছুটে যায়। জিজ্ঞেস করে, "কোনও খবর পাওয়া গেল?"

সায়ন্তন ধমকে ওঠে।

"তোর কি সবুর সয় না? সবে তো দিলাম। দু' সপ্তাহও হয়নি। মানুষটাকে পড়ে দেখতে দে। পড়বে, ভাববে, বিচার করবে, তবে না? ... চিন্তা করিস না। খবর পেলেই জানাব।"

দিন কাটে। আর ছুটে যায় না অক্ষর। দূর থেকেই চোখ দিয়ে জানতে চায়। সায়ন্তন ঠোঁট ওল্টায়। অক্ষরও নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

অবশেষে একদিন সায়ন্তনই খুঁজে বের করল অক্ষরকে।

"খবর আছে।"

একটা হার্টবিট মিস করল অক্ষর। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

"খবর ভাল। সত্যেনদা তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।"

অক্ষরের মনে হল ভুল শুনেছে।

আবার জিজ্ঞেস করল।

"আমার সঙ্গে? আমি?" নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না অক্ষর।

"হ্যাঁ। সামনের রোববার। একটা কবি-সম্মেলন আছে নজরুল মঞ্চে। ওখানেই যেতে বলেছেন।"

"কবি-সম্মেলন? কিন্তু আমি তো..."

"জানি। গল্প লিখিস। কবি-সম্মেলনে যেতে বলেছেন। কবিতা পড়তে বলেননি। আমার অবশ্য একটা কবিতা-পাঠ আছে। ওখানেই।"

নজরুল মঞ্চে পৌঁছে ঘাবড়ে গেল অক্ষর। মঞ্চের ভেতরে বাইরে অসংখ্য কবির সমাবেশ। এত কবি? প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত। না হলে কবিতা-পাঠের ডাক পেলেন কী করে? অবশ্য সবাই যে কবিতা পড়তে এসেছেন তাই বা কেন? এমন তো হতেই পারে, অধিকাংশই এসেছেন অন্যদের কবিতা শুনতে।

একটি ছটফটে তরুণী সায়ন্তনকে দেখে ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কখন এলেন সায়ন্তনদা?"

"এই তো, এখনই। কেমন আছ?"

"কেমন দেখছেন?"

"একটু রোগা হয়ে গেছ আগের থেকে।"

"আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কবে থেকে চেষ্টা করছি ওয়েট কমাতে। আপনি বললেন, তার মানে কাজ হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, মানে একটু বেবি-ফ্যাট ছিল তোমার। সেটা ঝরে গেছে। এখন একদম ঠিকঠাক।"

"আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি। ... দাঁড়ান, আমার একটা বই দিই আপনাকে।"

ঝোলা থেকে একখানা পাতলা বই বের করে ভেতরে কীসব লিখে সায়ন্তনের হাতে দিল মেয়েটি। তারপর বলল, "পড়বেন কিন্তু। না পড়লে ফোন করে করে মাথা খারাপ করে দেব। আপনার নম্বর আমার সেভ করা আছে।"

"পড়ব। নিশ্চয়ই পড়ব। জানাব কেমন লাগল।"

যেমন এসেছিল, প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে তেমনই চলে গেল মেয়েটি। হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলেন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক।

"সায়ন্তন না?"

"হ্যাঁ। কেমন আছেন দেবাশিসদা?"

"ভাল। তুমি কেমন আছ?"

"এই... চলে যাচ্ছে।"

"পড়লে আমার কবিতাটা?"

"কোন কবিতা বলুন তো?"

"ওই যে, আগের সপ্তাহে 'আকাশের মাঝখানে'-তে প্রকাশিত হয়েছে।"

"না দেবাশিসদা, ওটা দেখা হয়নি। সংগ্রহ করে পড়ে নেব।"

"পোড়ো। পড়ে বোলো কেমন লাগল।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

এইভাবে বিভিন্ন বয়সের কবি এসে সায়ন্তনের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কেউ বই বাড়িয়ে দিলেন। কেউ তাঁর লেখা সদ্য প্রকাশিত কোনও কবিতা সায়ন্তন পড়েছে কিনা জানতে চাইলেন। পড়লে কেমন লেগেছে সেই মতামত। না পড়ে থাকলে, সে যেন অবশ্যই পড়ে নেয় সেই অনুরোধ। একটা জায়গায় অদ্ভুত মিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কবিতা সম্বন্ধে মতামত জানতে ব্যগ্র। একজনকেও দেখা গেল না, এগিয়ে এসে বললেন, "সায়ন্তন, অমুক পত্রিকায় তোমার কবিতাটা পড়লাম। খুব ভাল লিখেছ।"

ভিড় যখন হলের বাইরে থেকে ক্রমশ ভেতরে জায়গা নিচ্ছে, তখনই এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোককে দেখা গেল মাথা নিচু করে হেঁটে আসতে। সায়ন্তন অক্ষরের হাতে চাপ দিয়ে বলল, "সত্যেনদা! চল অন্যরা ঘিরে ফেলবার আগেই কথাটা সেরে ফেলি।"

ব্যাকব্রাশ চুল, রোদে-পোড়া তামাটে রং, ঝুঁকে হাঁটা মানুষটির কাছে গিয়ে সায়ন্তন ডাকল, "সত্যেনদা! ভাল আছেন?"

সায়ন্তনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন সত্যেন।

"সায়ন্তন না?"

"হ্যাঁ। ভাল আছেন?"

"আমাদের আর ভাল-মন্দ। তা তোমার সঙ্গে ইনি কে?"

"এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। অক্ষর, আমার বন্ধু। ওর লেখা কয়েকটা ছোটগল্প আপনাকে দিয়েও এসেছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বেশ লেখে। প্রোগ্রাম শেষ হলে দেখা কোরো।"

বলতে-বলতেই ছোট-বড় নানা বয়সের কবি এসে ঘিরে ফেললেন সত্যেনকে। তারপর ভিড়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হলের ভিতর ঢুকে পড়লেন সত্যেন। পেছনে সায়ন্তন আর অক্ষর। আয়োজকরা সত্যেনকে নিয়ে মঞ্চের কেন্দ্রে বসালেন। ঘোষণা হল। জানা গেল সত্যেনই সঞ্চালক।

মুখপাতটা চমৎকার করলেন সত্যেন। 'কবি ও কবিতার সম্পর্ক', 'কবি কবিতা লেখে কেন', 'কবিতার প্রাসঙ্গিকতা' ইত্যাদি কঠিন ও গুরুগম্ভীর বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। কবিদের নামের একটি তালিকা সত্যেনের হাতে ছিল। কিন্তু তিনি ক্রম অনুসারে নাম ডাকলেন না।

কারণ হিসাবে বললেন, "এখানে অনেক তরুণ কবি আছেন, আছেন প্রতিষ্ঠিত কবিও। আমি চাই, তরুণ কবিরা প্রতিষ্ঠিতদের সামনে কবিতা পড়ে তাঁদের মতামত জানার সুযোগ পাক। আবার প্রতিষ্ঠিতরা কেমন লেখেন সেটা জানাও তো জরুরি। তাই একজন নবীন একজন প্রবীণ, এইভাবে আমি কবিদের মঞ্চে আহ্বান করব।"

অক্ষরের মনে হল, এই কারণেই তাঁকে সঞ্চালক মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর চেয়ে ভালভাবে আর কেউই এই কবি সমাবেশ ও কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারতেন না। কিন্তু আরও যে কারণে এই ব্যবস্থা নিতে সত্যেন বাধ্য হয়েছেন, অনুষ্ঠান যত এগোতে লাগল অক্ষর বুঝতে পারল।

প্রথম যে-প্রবীণ কবিকে ডাকা হয়েছিল, তিনি সঞ্চালকের অনুমতি নিয়ে তিনটি কবিতা পড়লেন। অথচ গোড়াতেই সঞ্চালক বলে দিয়েছিলেন, প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ তিন মিনিট। সেই সময়ের মধ্যে একটি-দুটি-তিনটি যেমন ইচ্ছে পাঠ করা যাবে। প্রবীণ কবি তিনটি দীর্ঘ কবিতায় প্রায় পনেরো মিনিট পার করে মঞ্চ থেকে নামলেন। পরবর্তী নবীন কবির পাঠ শুরু হতেই শুরু হল প্রবীণের উসখুস। তারপর যেই না সঞ্চালকের চোখ তাঁর ওপর পড়েছে, সঞ্চালককে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে টুক করে পাশের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দেখা গেল এটাই দস্তুর। প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত যাঁরা, নবীনদের কৃতার্থ করে দুই-তিন, কখনও পাঁচটি কবিতা পাঠ করছেন। কেউই সময়সীমা মানছেন না। আর নেমে আসার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাশের দরজা দিয়ে গলে যাচ্ছেন।

নবীনরা প্রথম দিকে নিয়ম মানছিলেন। কবিতা পড়ে নেমে এসে হলের ভেতর বসে অন্যদের কবিতা শুনছিলেন। ক্রমশ প্রবীণদের হাওয়া তাঁদের গায়েও লাগতে শুরু করল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা গেল তাঁরাও নিজেদের কবিতা পাঠ করে আর অন্যদের কবিতা

শোনবার জন্য অনর্থক কালক্ষেপ করছেন না। মঞ্চ থেকে নেমে নিজের আসনের বদলে নিষ্ক্রমণপথের দিকে গুটি-গুটি এগিয়ে যাচ্ছেন।

মোটামুটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সামনের তিনখানা রোয়ের অর্ধেকের ওপর আসন খালি হয়ে গেল।

সায়ন্তন অক্ষরকে বলল, "চল সামনে গিয়ে বসি। সত্যেনদা তাহলে দেখতে পাবেন। খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না।"

সায়ন্তন যে ভুল বলেনি, একটু পরেই বুঝতে পারা গেল। ওদের দেখতে পেয়েই হাত তুলে হাসলেন সত্যেন। সায়ন্তন বলল, "দেখলি? সত্যেনদা আমাদের রেকগনাইজ় করেছেন!"

রেকগনাইজ় যে করেছেন, পরবর্তী কবির নাম ডাকার আগে সত্যেনের ঘোষণা শুনেই বোঝা গেল।

"আপনাদের কবিতাপাঠ কী ভাল যে লাগছে, বলে বোঝাতে পারব না। খুব ইচ্ছে ছিল অনুষ্ঠানের শেষ অবধি থাকি। কিন্তু আর-একটি অনুষ্ঠানে আমার না গেলেই নয়। তাই আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিতে হবে। তবে যাবার আগে আমারও দু'টি কবিতা আপনাদের শুনিয়ে যাই।"

দু'খানা কবিতা পড়লেন সত্যেন। বরাদ্দ সময়ের মধ্যেই। পড়া শেষ করে কবিতার কাগজ ঝোলায় ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, "আমার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন অনুজপ্রতিম কবি সায়ন্তন মিত্র।"

সায়ন্তন সিট ছেড়ে উঠে মঞ্চের দিকে যেতে যেতে অক্ষরকে বলে গেল, "সত্যেনদাকে ধরে তোর গল্পগুলো সম্বন্ধে জেনে নিতে ভুলবি না কিন্তু।"

সত্যেন মঞ্চ থেকে নেমে দরজার দিকে এগোতেই অক্ষর পাকড়াও করল।

"আমার গল্প। কেমন লাগল?"

"কোন গল্প বলুন তো?"

"আমি সায়ন্তনের বন্ধু। সভা শুরুর আগে বললেন, প্রোগ্রামের শেষে দেখা করতে।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

ঝোলা থেকে একগোছা কাগজ বের করে অক্ষরের হাতে দিলেন সত্যেন, "কয়েকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ফর্ম দিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজ্ঞাপনের টাকা তুলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন," তারপর কথা না বাড়িয়ে লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সত্যেন হালদার।

হলের ভেতর ফিরে এল অক্ষর। অনুষ্ঠান এগিয়ে চলল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কেউই নিজের কবিতাটা পাঠ করে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করছেন না। একসময় হল খালি হয়ে গেল। সায়ন্তন যখন সঙ্গে আনা কবিতা দু'খানা পাঠ করল অক্ষর আর দু'চারজন হলকর্মী ছাড়া কেউই শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল না।

নীচে নেমে অক্ষরকে দেখে এগিয়ে এল সায়ন্তন। সায়ন্তনের জন্য অক্ষরের কষ্ট হচ্ছিল। কিছু বলার আগে সায়ন্তনই জানতে চাইল, "কথা হল? সত্যেনদা বললেন কিছু?"

হাতের ফর্মগুলো দেখাল অক্ষর, "বিজ্ঞাপন তুলে দেখা করতে বলেছেন।"

লেকের ধারে অন্ধকারে পাশাপাশি দু'জন বসেছিল। একটা বাল্বহীন ল্যাম্পপোস্ট পাহারা দিচ্ছিল ওদের। সায়ন্তনের হাতে হাত রাখল অক্ষর, "খারাপ লাগছে তোর জন্য। এত ভাল কবিতাগুলো... কেউ শুনতেই পেল না।"

সায়ন্তন মুখ ঘুরিয়ে অক্ষরের দিকে তাকাল। অন্ধকারে চোখ খুঁজল অক্ষরের। তারপর বিজ্ঞাপনের ফর্মগুলোয় আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "আমি কিছু মনে করিনি রে। এই লাইনে এটাই নিয়ম। কিছু পেতে গেলে কিছু তো দিতেই হয়।"

৯

বোনের মাথায় আলতো করে একটা গাঁট্টা মারল টাপুর।

তাতেই চোখে জল এসে গেল টুপুরের।

ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "তুই আমাকে মারলি?"

টাপুর অবাক হবার ভান করল।

"মারলাম কোথায়? ঠুকে দেখছিলাম মাথার ভেতর গোবর কতখানি আছে।"

"আছে তো আছে, আমার আছে। তোর তাতে কী?"

"আমার আর কী? প্রবলেমে পড়বি তুই। উঁচু ক্লাসে উঠে নাকের জলে চোখের জলে হবি। তখন এই দাদা বাঁচাতে আসবে না।"

"আসবে না আসবে না। বয়েই গেল। আর যাই হোক তখন তোর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ব না। পা জড়িয়ে বলব না, দাদা, এ যাত্রা পার করে দে।"

"অঙ্ক তোর হবে না।"

"যা, যা, আর জ্ঞান দিতে হবে না। বাবা বলে, যারা ভাল টিচার তারা কখনও বকাঝকা করে না, গায়ে হাত তোলে না। তুই একটা ফালতু শিক্ষক, থার্ড ক্লাস টিচার।"

"তাহলে আসিস কেন আমার কাছে বুঝতে?"

"ভুল করেছি এসে। মনে ছিল না, তুইও অঙ্ক পারিস না।"

"ডাক্তারিতে অঙ্ক লাগে না।"

"তাহলে তো হয়েই গেল। অঙ্ক ছাড়াও একটা লাইন খোলা আছে। আমি ডাক্তারিই পড়ব।"

"ডাক্তারি পড়বে! জানিস ডাক্তারিতে কত মোটা-মোটা বই পড়তে হয়! আগে তো চান্স পা। চান্স পেয়ে দেখিয়ে দে।"

"তুই যদি চান্স পেতে পারিস, আমিও পাব।"

পাশের ঘর থেকে ছেলে-মেয়ের কথোপকথন শুনছিল অক্ষর। ভাইবোনে যেমন ভাব তেমনই ঝগড়া। দু'জনে দু'জনকে চোখে হারায়। বেশিক্ষণ না দেখে থাকতে পারে না। আবার একসঙ্গে হলেই ঝগড়া করে। ঝগড়া কখনও-কখনও হাতাহাতি অবধি পৌঁছয়। তখন মাঝখানে পড়ে থামাতে হয়।

টাপুরের সেশন শুরু হবার মুখে। এবার ওকে ক্যাম্পাসে ছেড়ে আসতে হবে। ইচ্ছে করলেও যখন-তখন দেখাসাক্ষাৎ হবার উপায় থাকবে না। থাকবে না তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-মনকষাকষি। দু'জনেই দু'জনকে মিস করবে। হয়তো সপ্তাহশেষে একটা ফোন। অথবা তাও নয়। টুপুরও বড় হবে। ওরও নিজের জগৎ তৈরি হবে। যোগাযোগ কমে আসবে দু'জনের।

আরও অনেকগুলো বছর পরে দু'জনে বসে যখন স্মৃতিচারণ করবে, মনে পড়বে এই দিনগুলোর কথা, চোখে জল আসবে। খুব কাছের কিছু, ভাল লাগার কিছু হারিয়ে গেলে যেমন চোখে জল আসে। ইচ্ছে করবে ফেলে-আসা দিনগুলোকে একবার ছুঁয়ে দেখার। উপায় থাকবে না।

অক্ষর পাশের ঘরে গেল।

টাপুর-টুপুর ঘুরে তাকাল।

খাটের একপাশে বসে ফাইল খুলল অক্ষর।

"ক'টা সইসাবুদ করতে হবে।"

"আবার সইসাবুদ? সেদিন করালে যে?" টাপুর জিজ্ঞেস করল।

"সই কি একটা? সেদিন কিছু করিয়েছিলাম। আজ বাকিগুলো।"

"কীসের কাগজ এতসব?"

"ফিক্সড ডিপোজিট। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।"

"তা আমাদের সই লাগবে কেন?"

"সব আইদার অর সারভাইভার করিয়ে রাখছি।"

“মানে?”
“অত কিছু বুঝে কাজ নেই। সই করে দে।”
“সই তো করবই। তার আগে বুঝিয়ে দাও।”
ফাইল বন্ধ করে মুখোমুখি বসল অক্ষর।
“বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এতদিন যা-যা আমার একার নামে ছিল, সব তোর আর টুপুরের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখছি। যাতে আমার অবর্তমানে টাকা তুলতে কোনও অসুবিধা না হয়।”
“অবর্তমানে মানে?”
“অবর্তমান মানে জানিস না? যখন আমি থাকব না।”
“থাকবে না? কোথায় যাবে?”
“মানুষের জীবনের কথা কিছু কি বলা যায়? এই আছে, এই নেই। হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তোর ডাক্তারি পড়ার খরচ, টুপুরটা তো এখনও অনেকটাই ছোট, তোদের ভবিষ্যৎ... সেইসব ভেবেই...”
“তোমার কি মাথাটা গেছে? কত বয়স এখন তোমার?”
“বয়স যাই হোক। বিপদ কখনও বয়স বিচার করে আসে না। কত মানুষ অল্প বয়সেই চলে যায়। ভবিষ্যতের কথা, সিকিওরিটির কথা সব সময় ভাবা উচিত।”
“তাহলে তো মানুষ জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গেই তার ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত। আমাদের করিয়েছ কিছু?”
“আছে কিছু। কিন্তু তোদের সঙ্গে আমার তফাত আছে। তোদের এখনও কোনও লায়াবিলিটি নেই। আমার আছে। তাই তোদের ফিউচারের কথা আমাকে ভাবতেই হয়। ...পরে একদিন দেখিয়ে দেব, কোথায়-কোথায় কী-কী রাখা আছে। যদি দরকার পড়ে!”
টুপুর এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার পাশ থেকে ফোঁস করে উঠল।
“তার মানে আমরা তোমার লায়াবিলিটি, তাই তো?”
অক্ষরের অসহায় লাগল।
কোনও রকমে বলল, “তাই কখনও হয় রে মা? আমি কি তাই বলেছি? তোরা লায়াবিলিটি হতে যাবি কেন? তোরাই তো আমাদের অ্যাসেট। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমরা তো কেউই দেখতে পাই না। তোদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই...”
“থাক, অত না ভাবলেও চলবে।”
উঠে গেল টুপুর।

দক্ষিণ থেকে উত্তর। শহরটার হাত এখন অনেক বেশি লম্বা। আগে হলে বলা হত শহরতলি। কলকাতার পিনকোড বুকে লটকে এখন এইসব জায়গাও বুক বাজিয়ে নিজেকে কলকাতা বলে জাহির করছে।
একটা সময় মেট্রো যখন ছোট ছিল, বাস পাল্টে পাল্টে বাড়ি থেকে স্কুল আসতে-যেতে দিনের বেশিটাই খরচ হয়ে যেত। মেট্রো দৈর্ঘ্যে বেড়েছে। শহর ছেড়ে উপকণ্ঠ অবধি বিস্তৃত হয়েছে। পাশাপাশি কমে গিয়েছে আসা-যাওয়ার সময়। দূরত্ব যেমন ছিল তার একচুলও বাড়ে-কমেনি। কিন্তু সময় কমে যাওয়ায় মানুষের স্বস্তি বেড়েছে। আসলে দূরত্ব বিস্তারে বোঝায় না। একবিংশ শতাব্দতে দূরত্বের অর্থ সময়। কলকাতা থেকে দিল্লি ট্রেনে যেতে যতখানি সময় লাগে প্লেনে লন্ডন পৌঁছে যাওয়া যায় তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। সেই হিসাবে লন্ডন-কলকাতা দূরত্ব দিল্লি-কলকাতা দূরত্বের প্রায় কাছাকাছি।
একটা সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় মেট্রো-বাস-অটো শরীরের সমস্ত শক্তিটুকুই শুষে নিত। বাড়িতে ঢুকে স্নান করে জামাকাপড় পাল্টে অল্প কিছু মুখে দিতে না দিতেই শরীর এলিয়ে আসত। মনে হত কখন একটু বিশ্রাম নেবে। আজকাল তা হয় না। নিজস্ব কিছু সময় বাড়তি পাওনার মতো হাতে থেকে যায়।
আজ তিন বান্ডিল খাতা ছিল সঙ্গে। পরীক্ষার খাতা। একা বয়ে আনতে গেলে সত্যিই কষ্ট হত। রক্তিমা থাকায় বেঁচে গেল। ওর সাবজেক্টের পরীক্ষা এখনও বাকি। খাতা বেরোয়নি। যে-কোনও ভার, দুঃখও, ভাগ করে নিলে কমে। আজ রক্তিমা তার ভার হালকা করল। যেদিন রক্তিমার সঙ্গে খাতার বোঝা থাকবে, বীথি হাত বাড়িয়ে দেবে।
মেট্রো থেকে নেমে অটোর লাইন। ভিড় কমই ছিল। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। দু'জনে একসঙ্গে উঠবে বলে একটা অটো ছেড়ে পরেরটায় উঠল।
পাশাপাশি বসে রক্তিমা জিজ্ঞেস করল, “টাপুরের কবে যেন যাওয়া?”
“সামনের রোববারের পরের রোববার।”
“সে কী? তাহলে তো এসে গেল?”
“হ্যাঁ। বড় হয়েছে। তাও একা একা থাকবে, কখনও তো একা ছেড়ে থাকিনি, মন খারাপ হচ্ছে।”
“কে যাবে ছাড়তে?”
“ওর বাবা।”
“তাহলে তো অক্ষরদাকেও ছুটি নিতে হবে।”
“অ্যাপ্লাই করে রেখেছে। সবাই জানে টাপুরের ব্যাপারটা। অসুবিধা হবে না।”
“হস্টেল আছে?”
“হ্যাঁ, ক্যাম্পাসেই। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত।”
“সত্যি! আজকাল ছেলেমেয়েরা হায়ার এডুকেশনের জন্য কত দূরে দূরে যাচ্ছে! তবে ডাক্তারিতে তো শুনেছি আমাদের স্টেটও ভাল। এদিকে পেল না?”
“পেয়েছিল তো। র‍্যাঙ্ক পেছনের দিকে হয়েছিল। কলকাতা পেত না। বাঁকুড়া-বর্ধমান যেতে হত। সে তুলনায় অল ইন্ডিয়ায় কোয়ালিফাই করে যেটায় চান্স পেয়েছে সেটা নাকি খুবই ভাল। তাছাড়া ওটায় পিজিও আছে। একেবারে এমডি করে বেরিয়ে আসবে।”
“আজকাল নাকি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সরাসরি করা যায় না? আবার অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হয়?”
“অনেক খবর রাখিস তো! ঠিক বলেছিস। কিন্তু যেখানে যাচ্ছে, তাদের ট্রেনিং এতটাই ভাল, কেউই শুধু এমবিবিএস হয়ে পড়ে থাকে না।”
“তবে খরচ শুনেছি অনেক?”
“সে তো যেগুলোয় ক্যাপিটেশন ফি লাগে সেইসব মেডিক্যাল কলেজে। সেসব জায়গায় পড়ানোর কথা কল্পনায়ও আনতে পারতাম না। এটা সরকারি কলেজ। খরচ নমিনাল।”
“তাহলে তো সত্যিই ভাল খবর।”
“সবই ভাল, শুধু ওখানকার খাবার ছেলের মুখে রুচলে হয়। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে টাপুরের অনেক প্যাকনা। এটা খাব না, ওটা খাই না।”
“দেখবে ওখানে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।”
“তাই যেন হয়।”
“অক্ষরদা ভাল আছেন?”
“বাইরে থেকে তো ঠিকঠাকই মনে হয়।”
“বাইরে থেকে? কেন হয়েছে কিছু?”
“কী জানি? ঠিক বুঝতে পারি না। মানুষটা তো বড্ড চাপা। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেয়। আজকাল দেখি সবাইকে দিয়ে কাগজপত্তরে সই করাচ্ছে।”
“কাগজপত্তরে মানে?”
“নমিনির কাগজ। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। ফিক্সড ডিপোজিটগুলোয় নিজের সঙ্গে ছেলেমেয়েকেও জুড়ে নিল। নতুন দুটো এলআইসিও করল।”
“হঠাৎ? জানতে চাওনি?”
“চেয়েছিলাম। এড়িয়ে গেল।”

"শরীর-টরির ঠিক আছে তো?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল তো ঠিকই আছে।"

"টেস্ট করিয়েছে কিছু? আজকাল পরীক্ষা না করালে কিছু বোঝাও যায় না।"

"করিয়েছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়েছিল। সে খবর পেয়েছি।"

"রিপোর্ট?"

"ওর বন্ধু ডাক্তার। তাকে দেখিয়েছে।"

"কী বলেছে সে?"

"বলল তো খারাপ কিছু নেই।"

"তাও, একদিন দেখতে চেয়ো। তেমন হলে অন্য কারও মতামত নিয়ো। বয়স কত যেন হল?"

"উনপঞ্চাশ। আর ক'মাস পরেই পঞ্চাশ।"

"বয়সটা তো ভাল নয়। কিছুই ফেলে রাখা ঠিক নয়।"

মাইলের পর মাইল পাথুরে জমি। দিগন্ত ছুঁয়ে পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উঁচুনিচু মাথা। জমি খুঁড়ে যত নীচেই যাওয়া হোক, না মিলবে জল, না পাওয়া যাবে তেল। তাহলে হাজার হাজার একর জমিতে ইনভেস্ট করে বসে আছে যারা, তারা কি নির্বোধ?

নির্বোধ যে নয় তার প্রমাণ একটার পর একটা গজিয়ে ওঠা ইনস্টিটিউট। নামের শুরুতে স্থানীয় কোনও দেবদেবীর নাম। পরের অংশটুকু ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। অথবা ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স। পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন। তাই দেখেই ছেলে-মেয়েকে পড়তে পাঠায় বাবা-মায়েরা। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই পরিকাঠামো নেই। ডিগ্রি রেকগনাইজ়ডও নয় অনেকের। তবু সন্তানকে ঘিরে পিতা-মাতার যে-স্বপ্ন তাকেই টার্গেট করে এরা। মাটির গভীর থেকে তেল নিষ্কাশন না হোক, স্বপ্ন নিংড়ে অর্থ উপার্জনে কৃতবিদ্য এইসব প্রতিষ্ঠান। দিন দিন এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

অক্ষরের ভাল লাগল এই ভেবে যে টাপুরকে এরকম কোনও জায়গায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে না। আসতে আসতে ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে নিঃসঙ্গ এক-একটা ইনস্টিটিউটের খাঁচা দেখতে দেখতে অক্ষরের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মন খারাপ হচ্ছিল সেইসব ছাত্রছাত্রীর কথা ভেবে, যারা আগামী পাঁচ বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়, সময় মানে বার্ধক্য নয়, ফুটন্ত যৌবন, এই ঊষর প্রান্তরে ঢেলে দিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার একটা গেটপাসও জোগাড় করতে পারবে না।

টাপুরের মেডিক্যাল কলেজটা শহরের প্রান্তে। প্রায় একশো বছরের পুরনো। ঐতিহ্য জীর্ণ বসনের মতো গায়ে এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্য নয়, মেডিক্যাল সায়েন্স যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা-সরঞ্জাম না থাকলে যে-কোনও প্রতিষ্ঠানই পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। অক্ষর যেটুকু খোঁজ নিয়েছে, সেদিক থেকে এই কলেজ কোনও রকম দুর্নামের ভাগিদার নয়। স্টেট অফ দি আর্ট— ইংরেজি এই শব্দগুচ্ছ অক্লেশে এই প্রতিষ্ঠানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া যায়।

অ্যাডমিশন ফর্মালিটিজ় হয়ে গিয়েছিল। অক্ষরকে ক্যান্টিনে বসিয়ে টাপুর গিয়েছিল হস্টেলে। মাঝখানে অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং। চারপাশে ছড়ানো হস্টেল। মেয়েদের হস্টেল সবচেয়ে কাছে। তারপর ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের থাকার জায়গা। সিনিয়ররা পিছনে। র‌্যাগিং থেকে ফ্রেশারদের রক্ষা করার এটাই এখন অ্যাকসেপটেড নর্ম। হসপিটাল ঘিরে পাশ করে যাওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের থাকার জায়গা। সেটাও জরুরি। হঠাৎ ডাক পড়লে যাতে ছুটে আসা যায়। ক্যাম্পাসের বাইরে স্টাফ কোয়ার্টার্স। প্ল্যান করেই সমস্তটা তৈরি।

ক্যান্টিনটা ঘুরে-ফিরে দেখছিল অক্ষর। ভাল ব্যবস্থা। তবে দাম যথেষ্ট চড়া। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, মাছ-মাংসের গন্ধ নেই। বীথি বারবার করে সেটাই বলে দিয়েছিল, "দেখো তো মাছ মাংস মেলে কিনা!" মুশকিল হচ্ছে, মেলে যে না সেটা বীথিকে গিয়ে বললে বীথি কী করবে? মাছ রান্না করে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেবে? তবে আসার পথে দেখে এসেছে শহরে ঢোকার মুখেই পরপর দুটো পাঞ্জাবি ধাবা। প্রত্যন্ত মরুভূমিই বলো কিংবা এভারেস্টের চূড়া, ধাবা মিলবে না এ হতেই পারে না। ছেলেটা খেতে ভালবাসে। পা গজালে নিজেরাই গিয়ে ধাবা থেকে খেয়ে আসবে, কাউকে বলে দিতে হবে না। আর আজকাল কীসব হয়েছে না? সুইগি, জ়োমাটো? তারাও নিশ্চয়ই আসা-যাওয়া করে?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল করেনি কখন টাপুর এসে দাঁড়িয়েছে।

"খিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?"

অক্ষর ভেবে দেখল, আইডিয়াটা খারাপ নয়। রাস্তায় আর কিছু জোটার সম্ভাবনা কম। বাজেট-ফ্লাইট খাওয়াদাওয়ার পাট তুলে দিয়েছে। অক্ষরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে টাপুরই অর্ডার দিয়ে এল। তারপর বসল মুখোমুখি।

"আজ এসে আজই ফিরে যাওয়াটা হেকটিক হয়ে যাবে না?"

"হবে হয়তো। কিন্তু উপায় নেই। কাল ইনভিজিলেশন আছে।"

"ওসব তো চিরকালই থাকবে। ... তা নয়, তোমারও তো বয়স হচ্ছে।"

"যেদিন সেটা ফিল করব সেদিন নিশ্চয়ই রেস্ট নেব।"

"তাহলে অত ফিক্সড ডিপোজ়িট, নমিনেশন নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?"

জবাব দিল না অক্ষর। হেসে চুপ করে রইল। সেই সুযোগে টাপুর বাকিটুকু শেষ করল।

"জীবনের কথা কেউই বলতে পারে না। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার চিন্তা যে অযৌক্তিক তাও বলছি না। তবে এটা মাথায় রেখো, কারও জন্যই কিছু পড়ে থাকে না। তুমি যদি না-ও থাকো, আমার ডাক্তার হওয়া কিংবা টুপুরের সেটলমেন্ট কোনওটাই আটকে থাকবে না। বরং দিনরাত আমাদের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার না স্ট্রোক হয়ে যায়।"

এয়ারপোর্টে বসে টাপুরের কথাই ভাবছিল অক্ষর। সেদিন জন্মাল। আজ বিজ্ঞের মতো জ্ঞান দিচ্ছে। অক্ষরের কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছে না। বরং ভরসা হচ্ছে।

প্লেন ঠিক সময়েই উড়ল। সারাদিন কাগজ পড়ার সময় পায়নি। একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল। বাইরে দিন শুকিয়ে আসছে। মেঘের শরীরে লালের বিভিন্ন শেড।

তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্লেনকে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করতে হচ্ছে। সবাই যেন সিট বেল্ট বেঁধে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

হু-হু করে নেমে যাচ্ছে প্লেন। যাত্রীদের মধ্যে কান্নাকাটি। অক্ষরের চোখের সামনে টাপুর আর টুপুরের মুখ দুটো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি। ঘুম ভেঙে গেল অক্ষরের।

চোখ রগড়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল তখনও অস্তরাগ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। নীচে ছোট-ছোট পাহাড় চিরে বয়ে যাচ্ছে সুতোর মতো নদী।

সত্যিই, আকাশ থেকে পৃথিবীটাকে বড্ড সুন্দর দেখায়।

১০

স্টাফরুমে মনখারাপ করে বসেছিল পুষ্পল। লোকের কথায় নেচে রাতারাতি বড়লোক হবার নেশায় কোথায় যেন টাকা রেখেছিল। সব

ডুবেছে। যে যার মতো সান্ত্বনা দিচ্ছিল। যার যায় সে-ই শুধু জানে শুকনো সান্ত্বনায় কোনও লাভ হয় না।

টিফিন পিরিয়ড শেষ হলে সবাই ক্লাসে চলে গেল। পুষ্পলও উঠে বাইরে গেল। আজ মনে হয় হাফ সিএল নিয়ে বাড়িই ফিরে যাবে। অক্ষর আর সায়ক স্টাফরুমে বসে রইল। ওদের এটা অফ-পিরিয়ড।

অক্ষরই কথাটা তুলল, "সত্যি, কোথায় যে টাকা রাখবে মানুষ? কোথাওই আর নিরাপত্তা নেই।"

"প্রপার্টি। ওই একটাই অপশন পড়ে আছে," সায়ক বলল।

"প্রপার্টি? জানিস প্রপার্টির অবস্থা? তিরিশ লাখে যারা ফ্ল্যাট কিনেছিল এখন পনেরো লাখও দাম পাচ্ছে না।"

"ফ্ল্যাট নয়, ল্যান্ড। ল্যান্ড-এ ইনভেস্টমেন্ট সব সময় ভাল রিটার্ন দেয়।"

"ল্যান্ড? কলকাতায় ল্যান্ড কোথায়?"

"কলকাতা নয়, আশেপাশে। তুই কি ইন্টারেস্টেড?"

"জানা আছে কিছু?"

"একজন ভাল ব্রোকার আছে, চেনাজানার মধ্যে। দরকার হলে জানাস।"

মেট্রো। তারপর বাস। তারপর টোটো। টোটো যেখানে নামিয়ে দিল সেখানে বাজারে ঢোকার মুখেই সাইকেলের দোকান। কেনা-বেচা নয়, সাইকেল সারাই হয় দোকানে। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন অক্ষয়কুমার মণ্ডল।

অক্ষরকে দেখে এগিয়ে এসে দু'হাত কপালে ঠেকালেন, "আমিই শ্রীঅক্ষয়কুমার মণ্ডল। চলুন, রোদ চড়ার আগেই বেরিয়ে পড়া যাক," তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন, "এখানে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। চাইলে নিতে পারেন।"

"সাইকেল? কেন অনেক দূর? হেঁটে যাওয়া যাবে না?"

"যাবে না কেন? আমরা গ্রামের মানুষ, অভ্যেস আছে। আপনারা শহরের লোক, পারবেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।"

অক্ষরের সম্মানে লাগল। ভাবল বলে, সেও মফস্‌সলের মানুষ, নেহাত এসে পড়েছে কলকাতায়। তাছাড়া অক্ষয়ের সঙ্গে তার তফাত মাত্র একটা অক্ষরের। অক্ষয় পারলে সেও পারবে।

কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখল অক্ষয় তার চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে। ঘামতে ঘামতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে যখন জিরোচ্ছে, অক্ষয় এসে সহানুভূতির গলায় বলেছেন, "ওই জন্যই বলেছিলাম সাইকেলের কথা। সাইকেল থাকলে এতক্ষণে..."

হাঁটতে-হাঁটতে যখন ভাবতে শুরু করেছে, এর পরেই সুন্দরীগাছের অরণ্য, বাঘের ডাক আর নদীর ধারে কুমিরের রোদ পোহানো, মণ্ডলমশাই ব্রেক কষলেন।

"দাঁড়ান। এটাই আপনার জমি।"

'আপনার' শব্দটা মাথার মধ্যে ধাক্কা মারল। এদিক-ওদিক তাকাল। ধু-ধু এবড়োখেবড়ো নাবাল জমি। কোনও পথ নেই, দাগ নেই, সীমানার চিহ্ন নেই।

"এ... ই জমি?"

"হ্যাঁ। এটাই জমি।"

"এখানে ... মানে এতখানি উজিয়ে এসে মানুষ জমি কেনে?"

"কিনবে না কেন? আশেপাশে যত জমি দেখছেন সব বিক্রি হয়ে গেছে। পড়ে আছে এইটুকুই। কে জানে, এর মধ্যে হয়তো বিক্রিও হয়ে বসে আছে।"

"কারা কেনে জমি?"

"আপনার মতো মানুষ। যাদের ঘটে বুদ্ধি আছে।"

"বুঝলাম না।"

আঙুল দিয়ে দূরের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো দেখালেন অক্ষয়। ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স। পথে পড়েছিল।

"ওখানকার জমি, দশ বছর আগেও ছিল পাঁচ হাজার কাঠা। এক জনকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুদ্ধিমান লোক। দশকাঠা ধরে রেখেছিল। বিক্রি করল পাঁচ লাখে।"

"পাঁচ লাখ টাকা কাঠা?"

"নইলে বলছি কী? জমি বিক্রির টাকায় ফ্ল্যাট কিনে এখন ওখানেই থাকছে।"

"আমাকে ওর কাছাকাছি জমি দেখালেন না কেন?"

"কারণ আপনি এসেছেন সায়ক রায়ের কাছ থেকে।"

"সায়ককে আপনি চেনেন?"

"আমার সম্বন্ধীর মাসতুতো ভাই।"

একই রাস্তায় ফিরছিল ওরা। আসবার সময় যতখানি দূর মনে হয়েছিল, ফিরতে অতখানি লাগল না। দূরত্বের বোধটা মানসিক। চেনা না থাকলে, জমি বা মানুষ, কাছাকাছি পৌঁছতে সময় লাগে, দূরত্ব বেশি বোধ হয়। একবার চেনার বৃত্তে এসে গেলে তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাওয়া যায়, দূরত্বকে তখন আর দূরত্ব বলে মনে হয় না।

পরপর হাউজিং কমপ্লেক্স। উঁচু উঁচু টাওয়ার। মস্ত পাঁচিল। যাবার সময় পাশের পায়ে-চলা পথ ধরেছিলেন মণ্ডল মশাই। এবারে সামনের গেটের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন। তারপর ভেতরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "দেখতে পেয়েছেন?"

কমপ্লেক্স-এর নাম "ঝরনাধারা"। এক ঝলক তাকিয়েই নামকরণের সার্থকতা টের পেল অক্ষর। গেটের পর থেকেই রাস্তা বলে কিছু নেই। জল আর জল। জলের ভেতর এক একটা টাওয়ার ব-দ্বীপের মতো ভাসছে।

"কী দেখলেন?"

"জল।"

"হ্যাঁ জল। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতেও নৌকো লাগে। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় জল আরও বেশি। ফ্ল্যাট মালিকরা ফ্ল্যাট ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।"

"এই অবস্থা?"

"এই অবস্থা। কখনও যদি ফ্ল্যাট বা জমি কেনেন, দেখতে যাবেন ভরা বর্ষায়। যদি সেখানে জল না ঢোকে, তবেই কথাবার্তা। দালালরা সব সময় জমি বা ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যায় শীতকালে, যখন আসল চেহারাটা লুকিয়ে রাখা যায়।"

হাঁটতে হাঁটতে বলে যাচ্ছিলেন অক্ষয়, "আগে এখানে মাইলের পর মাইল জলাজমি ছিল। জলাজমি ভরাট করে বাড়ি তৈরি শুরু হল। ফ্ল্যাট বিক্রি করেই কাজ হাসিল। মালিকানা হাত-বদল হওয়ামাত্র যারা বিক্রি করল তারা হাওয়া হয়ে গেল। ফ্ল্যাট কিনে মালিক পড়লেন অথৈ জলে।"

অথৈ জল! কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি।

অক্ষয়ের মুখ থামছিল না।

"আপনি নিজের লোক। ওসব জায়গা দেখালে অধর্ম হবে। তাই যেখানটায় নিয়ে গেলাম, একটু দূর বটে, কিন্তু ডুবে যাবার চান্স নেই।"

সেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান। অক্ষর বুঝতে পারছিল না মানুষটার পরিশ্রমের দাম ঠিক কতখানি।

অক্ষয় নিজেই খোলসা করলেন।

"অন্যদের কাছে পাঁচশো নিই। আপনি কমসম করে দিন।"

চারশো টাকা দিল অক্ষর।

মাথায় ঠেকিয়ে হাঁটা দিলেন শ্রীঅক্ষয়কুমার মণ্ডল।

স্টাফরুমে অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করছিল, অঙ্কিত জিজ্ঞেস করল, "তুই কি সিরিয়াসলি ল্যান্ড-এ ইনভেস্ট করার কথা ভাবছিস?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"তোকে একটা গল্প শোনাই। আমার মামাতো দাদার গল্প। ... তোর সময় আছে তো?"

"হ্যাঁ। মিনিট পনেরো দেওয়াই যায়।"

"আমার মামাতো দাদা থাকে দুবাইতে। তোর মতোই এক দালালের খপ্পরে পড়ে বেশ খানিকটা জমি কিনেছিল ফলতার দিকে। একজন কেয়ারটেকার রেখেছিল। জমিতে মরসুমি সবজির চাষও শুরু করেছিল। ... শুনছিস তো?"

"বলে যা।"

"হঠাৎ কেয়ারটেকার কাজ ছেড়ে দিল। দাদাও, হুট বললেই তো আর আসা যায় না, মাস দুয়েক বাদে এল জমির খোঁজখবর নিতে। আর দেখতে গিয়েই মাথায় হাত।"

"মাথায় হাত কেন?"

"প্রথমে তো জমি খুঁজেই পায় না। তারপর স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, যেখানে গোলপোস্ট পুঁতে ফুটবল খেলা হচ্ছে সেটাই নাকি তার এক কালের জমি।"

"ফুটবল খেলা?"

"হ্যাঁ। আর যেখানে কেয়ারটেকারের থাকবার জন্য ঘর বানিয়ে দিয়েছিল তার সামনে একটা ব্যানার, সেখানে লেখা "লতাপাতা সংঘ"।

"লতাপাতা সংঘ? ক্লাব?"

"হতভম্ব দাদা ছুটল থানায়। থানা খুব দূরে নয়। সেখানে সেকেন্ড অফিসারের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বললেন, আমি তো এর সমাধান করতে পারব না, পারবেন বড়বাবু। চলুন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।"
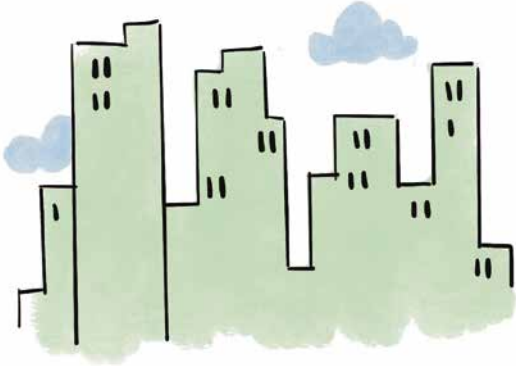
"হল দেখা?"

"নিশ্চয়ই। মেজোবাবু দাদাকে পাশে বসিয়ে চললেন বড়বাবুর কাছে। যেতে যেতে রাস্তাটা চেনা-চেনা লাগতে শুরু করল। অবশেষে যেখানে গাড়ি পৌঁছল সেটা দাদার জমি ওরফে লতাপাতা সংঘের ক্লাব ঘর।"

"তারপর!"

"মেজোবাবু গাড়ি থেকে দাদাকে হাত ধরে নামালেন। তারপর আঙুল তুলে দেখালেন, ওই যে বড়বাবু। দাদা বুঝতে পারছিল না। মেজোবাবুর আঙুল অনুসরণ করলে তো মাঠ, যেখানে খেলা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে ফেলল, ওটা তো মাঠ। বড়বাবু কোথায়?"

"মেজোবাবু একগাল হেসে বললেন, ওই যে হুইস্‌ল মুখে বাঁশি বাজাচ্ছেন রেফারি, উনিই বড়বাবু।"

"থানার বড়বাবু রেফারি?"

"তাঁরও তো উপায় নেই। রেফারিগিরি ঠিকমতো না করলে পরদিনই ট্রান্সফার, অযোধ্যাপাহাড়।"

"বুঝলাম। তা কী করলেন তোর দাদা?"

"ফিরে এল। কেস করল। কেসের রায় বেরল। মহামান্য বিচারক থানার বড়বাবুকেই নির্দেশ দিলেন মালিককে জমি ফিরিয়ে দিতে। ...দাদা আর ওমুখো হয়নি।"

"তাহলে জমি কিনব না বলছিস?"

"বুদ্ধি থাকলে।"

"তাহলে উপায়?"

"বড়-বড় জালা কেন টাকা রাখার জন্য। গুপ্তকক্ষও বানাতে পারিস। রূপকথার বইগুলো আবার পড়তে শুরু কর। আলাদিন। ভাল ক্লু পাবি।"

অক্ষরের মনে পড়ল সমৃদ্ধ গুপ্তর কথা। তাঁর বইয়ের আলমারির পিছনে নাকি সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নামলে পৌঁছনো যায় এমন কোনও ঘরে যেখানে থাক-থাক টাকা আর সোনাদানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অক্ষর।

"অত টাকা আমার নেই রে। সংসার চালিয়ে ক'টা টাকাই বা জমাতে পারি বল? তা নয়। ভয় করে। কখন কী ঘটে তো বলা যায় না। কিছু হয়ে গেলে ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বীথি বিপদে পড়ে যাবে। ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই..."

অঙ্কিত উঠল, "ভাবিস না। আমরা অনর্থকই ভেবে মরি। নিজেকে মূল্যবান ভাবতে ভালবাসি তো, তাই।"

তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "শোন! কী ঘটতে পারে তাই ভেবে-ভেবে বর্তমানটাকে নষ্ট করিস না। নিজের দিকে তাকা। ভেবে দেখ। ছবি আঁকতে ভালবাসিস? প্রাণভরে ছবি আঁক। বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে? যেখানে যেতে প্রাণ চায় এইবেলা ঘুরে আয়। যা খেতে ইচ্ছে করে, যা পরে পরবি বলে তুলে রেখেছিলি, যে গান শুনতে ভাল লাগে, সব সেরে রাখ। কোনও কিছুই ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখতে নেই। সব খরচ-খরচা সামলিয়ে যেটুকু বাঁচাতে পারবি তা খরচ কর। নিজের জন্য। নিজের ইচ্ছের জন্য। পছন্দের জিনিসগুলোর জন্য। নইলে কখন জীবনটা আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে, বুঝতেও পারবি না।"

১১

বিছানার পাশে কাগজের পাহাড়ের দিকে তাকাল অক্ষর। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে। বীথি রান্নাঘরে। আসার আগেই গুছিয়ে ফেলতে হবে। নইলে এসে তুলকালাম করবে।

আজকাল অনেকেই যন্ত্রে লেখা অভ্যেস করে ফেলেছে। অক্ষর পারেনি। অক্ষরের অনেকগুলো না-পারার মধ্যে এটাও একটা। বুকে বালিশ চেপে শুয়ে সাদা কাগজে মনের কথাগুলো ফুটিয়ে তুলতে না পারলে অক্ষরের মনে হয় লেখাই হল না।

আবার নিজের লেখার সবচেয়ে বড় সমালোচকও সে নিজেই। লেখা হয়ে গেলে যখন পড়তে যায় তখন মনে হয় ওগুলো কিচ্ছু হয়নি। বাজে কাগজের ডাঁই ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয় ওদের হতেই পারে না।

অক্ষরের গল্পে কোনও শুরু বা শেষ নেই। পাত্র-পাত্রীও বদলে যায় হঠাৎ হঠাৎ। কাহিনিও নেই তেমন কিছু। কোনও চিন্তার ঝলক, অথবা অনুভূতির অনুরণন, এই নিয়েই গল্প এগোয়। তারপর যেমন শুরু হয়েছিল, না বলে-কয়েই থেমে যায়। অক্ষর নিজেই জানে না, পাঠক লেখাগুলো পড়ে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে। নিজেকে বঞ্চিত ভাববে না তো? মনে করবে না, তাকে ঠকানো হয়েছে?

কিন্তু এসবই ভাবনার কথা। ছাপা হলে তবে না প্রতিক্রিয়া। যে লেখা ছাপাই হল না তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না।

কিন্তু ছাপবে কে?

সায়ন্তনকে ধরে একজন স্বনামধন্য সম্পাদকের কাছাকাছি পৌঁছেছিল অক্ষর। কথা শুনে মনে হয়েছিল তিনি অক্ষরের লেখা গল্পগুলো পড়েছেন। ভুল ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। সত্যেন হালদার তার লেখা সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই না করে বিজ্ঞাপনের রশিদ বই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষর এখন বুঝতে পারে অক্ষরের পাঠানো গল্পগুলোর একটা লাইনও পড়ে দেখেননি সত্যেন। বাজে কাগজের ঝুড়িতে ওগুলোর জায়গা হয়েছে।

সায়ন্তনের জন্য অক্ষরের কষ্ট হয়েছিল। সায়ন্তনের চেষ্টাতে যে কোনও খাদ ছিল না অক্ষরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সত্যেনের দেখানো রাস্তাতেও হাঁটতে তার মন সায় দেয়নি। তাই সায়ন্তনকেও আর বিব্রত করেনি অক্ষর।

সত্যেন-চ্যাপ্টার না হয় ক্লোজ়ড, কিন্তু অন্য কেউ? অন্য কোনও রাস্তা? অন্য কোনও ভাবে কি চেষ্টা করা যায়? অন্তত একবার পাঠকের সামনে তার লেখাগুলো মেলে ধরা। একটিবার তাদের মতামত নেওয়া। হিসেবের দিন যে একটু একটু করে ফুরিয়ে আসছে।

অনেক ভেবে ঠিক করল দুরন্তকে একবার দেখানো যাক। সাহিত্য-সমালোচনার জগতে ও এখন একটা নাম। সবাই সমীহ করে। একসঙ্গে পড়ত। এক ইয়ার। কিন্তু সাবজেক্ট আলাদা। যোগাযোগটা রয়ে গিয়েছে।

দুরন্তদের আড্ডা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির উল্টো দিকে একটা ঠেক-এ। সেখানেই গিয়ে ধরল দুরন্তকে। একাই ছিল। কথা না বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, “এনেছিস লেখা?”

কয়েকটা সাহিত্যকর্ম সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল অক্ষর। সেগুলোই দুরন্তর হাতে জিম্মা করে শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাতে লাগল। দেখবার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু পরীক্ষার খাতা এগজ়ামিনার-এর হাতে জমা দিয়ে নম্বরের জন্য অপেক্ষা করবার সময় ক্যাটরিনা কাইফ হেঁটে গেলেও যেমন নজর পড়ে না, অক্ষরও দুরন্তকে দেখতে দেখতে বোঝার চেষ্টা করছিল তার অ্যাসেসমেন্ট।

পড়া শেষ হলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দুরন্ত। লেখাগুলো অক্ষরের হাতে ফেরত দিল। তারপর বলল, “হুম, পড়লাম। অফবিট। অন্যরকম।”

“কিছু কি হয়েছে? দাঁড়িয়েছে লেখাগুলো?”

“বলতে পারব না।”

“বলতে পারবি না মানে? তুই এতবড় ক্রিটিক, সবাই ধন্য ধন্য করে, আর বলতে পারবি না লেখাগুলো হয়েছে কিনা।”

হাসল দুরন্ত, “রেগে যাচ্ছিস কেন? ক্রিটিকদের সম্বন্ধে তোর ধারণাটা আগে সংশোধন করে দিই। ক্রিটিকরা এস্টাব্লিশড সাহিত্যিকদের নিয়ে চর্চা করেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ পাতে আমের চাটনির বদলে তেঁতুলের আচার খেয়ে যেসব কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলো বেশি উতরেছিল কিনা তাই নিয়ে পাতার পর পাতা গবেষণামূলক নিবন্ধ ছাপা হয়, কিন্তু কোনও প্রাবন্ধিক নতুন লেখককে পাঠকের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছেন এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।”

“তাহলে নতুন লেখককে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবে কে?”

“সম্পাদক।”

গিয়েছিলাম তো এক সম্পাদকের কাছে। তিনি একগাদা ফর্ম হাতে দিয়ে বললেন অ্যাডভারটাইজ়মেন্ট জোগাড় করে দিতে। বুঝলাম, ও আমার কম্ম নয়।”

“কোন সম্পাদক?”

অক্ষর তখন নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। শোনা হয়ে গেলে হাই তুলল দুরন্ত।

“তুই ভুল জায়গায় গিয়েছিলি।”

“ভুল জায়গা?”

“অফ কোর্স ভুল জায়গা। যে-স্বনামধন্য সম্পাদকের কথা তুই বললি, প্রথমত তিনি কবি। কবিরা গদ্যলেখা কমই পড়ে।

“এইখানে আমার একটু সংযোজন : কবিরা নিজের কবিতা ছাড়া অন্যদের কবিতাও কম পড়ে। আমার ধারণা, পড়েই না।”

“যাই হোক, ইশুটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। যা বলছিলাম, দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে একটা পত্রিকা চালান, তার খরচ নিজের পকেট থেকে দিতে হয়।”

“আবার ইন্টারাপ্ট করছি, কবিযশোপ্রার্থী তরুণ কবিদের দিতে হয়।”

“যাই হোক, তোকে যেতে হবে কমার্শিয়াল কাগজের সম্পাদকদের কাছে, যাঁরা নিজের পয়সায় কাগজ চালান না। দ্বিতীয় কথা, এমন কেউ, যিনি নিজে কবি নন, গদ্যকার।”

“তোর মতো প্রাবন্ধিক? সমালোচক?”

“হতে পারেন, নাও পারেন। তবে গদ্য লেখেন। এবং গদ্যকারদের রচনা ভাল বুঝতে পারেন। বিশেষ করে সেইসব লেখক যাঁরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান না।”

“কমার্শিয়াল কাগজ এসব লেখা ছাপবে?”

“ছাপবে। কারণ এরাই নতুন লেখকদের তুলে ধরার হিম্মত রাখে। তাছাড়া সেই সাহস থাকতে গেলে যতখানি ট্যাঁকের জোর লাগে তা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোরই আছে।”

“বলে দে কোথায় যাব?”

“বলব। আগে একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নিই।”

“কার কথা ভাবছিস?”

“এখনই বলব না। ভেবে নিই। দরকার হলে মুখপাতটা করে রাখি। তারপর জানাব কোথায় কার কাছে যেতে হবে।”

এই শহরেই কোনও কোনও বাড়ির ফ্লোর যে শো-রুম পারপাসে ভাড়া দেওয়া হয় অক্ষর তা জানত না। দুরন্তর সঙ্গে এসে জানতে পারল। ঠিক শো-রুম নয়, এগজ়িবিশন। জুয়েলারির এগজ়িবিশন। অক্ষরের মতো গ্রামের গন্ধ না-ওঠা লোকজনের কাছে জুয়েলারি। এখানে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ডায়লেক্ট-এ ওটা জুয়েল্‌রি।

এগজ়িবিশনে যে-দোকানের গয়না দেখানো হচ্ছে তার মালিক জ্বালামুখী নস্কর। নানারকম গয়না। দামও আকাশছোঁয়া। দরজার সামনে ভয় পাওয়ানো অস্ত্র হাতে প্রহরী। নীচে, লিফটের পাশে আরও দু’জন।

লিফটে ওঠার মুখেই ওদের আটকেছিল। দুরন্তর কাছে থাকা ভিআইপি কার্ড উল্টেপাল্টে দেখে এবং অক্ষরের পোশাক পরিচ্ছদের সঙ্গে মেলাতে না পেরে খানিকটা কনফিউজ়ড হয়েই বোধহয়, ছেড়ে দিয়েছিল। ছ’-তলায় এগজ়িবিশনে ঢোকার মুখে আর একবার নাকা-চেকিং। অবশেষে ভেতরে।

দোকানের মালিক একপাশে সোফায়। তাঁর পিতৃদেব, এক নামকরা নিউজ়পেপার হাউসের সর্বময় অধীশ্বর, শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর, তিনিও সোফাসীন। প্রবল এসি থাকা সত্ত্বেও দু’জনেই গলগল করে ঘামছেন। অর্ধেন্দুকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁর বিলক্ষণ অসুবিধা হচ্ছে। উপায় নেই। একমাত্র মেয়েকে, বলা উচিত তার গয়নার ব্যবসাকে, যথাযথ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করতে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেই হত। এবং সেই প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তির উপদেশ ছাড়া তিনি এক পা-ও চলেন না তিনিই এই প্রদর্শনীর মধ্যমণি। তাঁর নাম সুস্মিতা ঘোষাল।

এইখানে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অবশ্য, এই সমস্ত ব্যাখ্যাই অক্ষরের মাথায় সেঁধিয়ে দিয়েছে দুরন্ত। সুস্মিতা ঘোষালের পদবি এর মধ্যে তিনবার স্থানচ্যুত হয়ে আবার স্বস্থানে। তবে পিতৃদত্ত “সুস্মিতা”

নামটি আধার বা প্যান কার্ড ব্যতীত অন্যত্র তিনি ব্যবহার করেন না। সুস্মিতা ভেঙে স্মিতা, সেখান থেকে মিতা। এই মুহূর্তে তিনি 'মি-ই-টা' নামেই পরিচিত হতে ভালবাসেন। 'মি-ই-টা' হলের মধ্যে ভ্রমরের মতো উড়ছিলেন। যে-যে ফুলে তাঁর ছোঁয়া লাগছিল, তারা খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠছিল। কয়েক মিনিট দেখেই অক্ষরের মতো গাড়োলেরও বুঝতে অসুবিধা হল না, এই প্রদর্শনী নাম-কা-ওয়াস্তে গয়নার শো-রুম। এখানে একজনই এগজিবিট— তিনি স্মিতা ঘোষাল।

দুরন্ত ফিসফিস করে মন্ত্র পড়ছিল, "স্মিতার পিছনে যিনি ঘুরঘুর করছেন, উনিই আরক-ব্যারন জ্যাকি আয়রন। শোনা যায় ওঁর সঙ্গেই এখন স্মিতার স্টেডি রিলেশন। আর কাছে যাবার সুযোগ না পেয়ে যিনি দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে স্কচ-এ ঠোঁট ভেজাচ্ছেন, ওঁর নাম লিলিপুট কারদানি। কলকাতার যাবতীয় হাইরাইজ়ের মাথায় যে স্কাইওয়াক, তার স্থপতি ওই লিলিপুট।"

তারপর গলা নামিয়ে যোগ করল, "নস্করের কাগজ যে চলে, চলে মানে টাট্টুঘোড়ার মতো চলে, তার একটিই কারণ: স্মিতা ঘোষাল। স্মিতার কথায় গোটা পৃথিবীটাই তার পায়ের সামনে ধরে দিতে পারেন নস্কর। স্মিতাও চেষ্টা করেন রেসিপ্রোকেট করতে। কাগজটা এস্টাব্লিশ করেছেন। এখন অর্ধেন্দু ধরেছেন, মেয়ের গয়নার দোকানেও যেন স্মিতা তাঁর মিডাস টাচ বুলিয়ে দেন।"

এতক্ষণ যে-প্রশ্নটা করব-করব করেও করে উঠতে পারেনি, সেটাই করে ফেলল অক্ষর, "আমরা তাহলে কাকে মিট করতে এসেছি, নস্কর?"

"খেপেছিস? ও সাহিত্যের বোঝেটা কী? ওদের হাউস থেকে বেরোয় একটা সাহিত্য পত্রিকা, সোনার কলম। সোনার কলম-এ লেখা বেরনো মানেই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আর সেই সোনার কলম-এর এডিটর হচ্ছেন শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষাল।"

"তার মানে আমরা..."

"ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।"

"আমি নেই," বলে দরজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই অক্ষরের হাতটা খপ করে ধরে ফেলল দুরন্ত। তারপর টানতে-টানতে স্মিতা ঘোষালের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলল, "দিদি, এর কথাই আপনাকে বলছিলাম। অক্ষর। দুর্দান্ত লেখে। কিন্তু ওর লেখা পড়ে অ্যাপ্রেশিয়েট করবে এমন কোনও সম্পাদক সাহিত্যজগতে এগজ়িস্ট করে না। ওকে বলেছিলাম, একজনই আছেন, যাঁর কাছে তোকে নিয়ে যেতে পারি। চোদ্দো ক্যারেট আর চব্বিশ ক্যারেটের তফাত যিনি একবার দেখেই ধরতে পারেন।"

আপাদমস্তক অক্ষরকে জরিপ করলেন স্মিতা। যেন অক্ষরের লেখন-নৈপুণ্য তার বাইসেপস্-ট্রাইসেপস্ এ লুকিয়ে রয়েছে। দেখা হয়ে গেলে দুরন্তর দিকে ফিরে অসহায় হবার ভঙ্গি করলেন।

"এখানে এনেছ কেন? এখানে কি ওসব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব?"

"তাহলে কোথায় আনব?"

"আমার ফ্ল্যাটে। তোমার আসার দরকার নেই। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওঁকে পাঠিয়ে দিয়ো। আর হ্যাঁ," এবার অক্ষরের দিকে তাকালেন স্মিতা, "সঙ্গে লেখা নিয়ে আসবেন। পড়ে তখন তখনই আলোচনা করা যাবে।"

এর বেশি সময় দেবার অবকাশ স্মিতা ঘোষালের নেই। তবু যেতে-যেতে দুরন্তর দিকে ঘুরে বলে গেলেন, "যাবার আগে ডিনার করে যেতে ভুলো না কিন্তু। না খেয়ে গেলে দুঃখ পাব।"

কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে দুরন্ত কানে কানে বলল, "দেখেছিস, কেমন সবদিকে নজর!"

আমন্ত্রিত না হলে অক্ষরের সাহসে কুলোত না বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এই ফ্ল্যাটের চৌহদ্দিতে পা রাখার। তিন ধাপ সিকিওরিটি, সিসি ক্যামেরা, সব পার হয়ে এগারোতলায় লিফট যখন পৌঁছে দিল, বাঁ দিকে ঘুরে প্রথম ফ্ল্যাটের ডোরবেল-এ আঙুল ছুঁইয়ে অক্ষর ভাবছিল আপ্যায়নটা না-জানি কেমন হবে।

অক্ষরকে বিস্মিত করে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে গেল এবং এক গাল হেসে স্মিতা ঘোষাল বললেন, "এসো, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

সোফায় ডুবে যেতে যেতে অক্ষর চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখল এই রকম ড্রয়িংরুমে সে আগে কখনও আসেনি। উল্টোদিকে বসে স্মিতা জিভ কাটলেন, "দেখেছ? আজ তুমি বলে ফেললাম। আমি না বেশিক্ষণ আপনি টাপনি বলতে পারি না। "তুমি" নাহলে "তুই"। মাইন্ড করো নি তো?"

ঘাড় নাড়ল অক্ষর। স্মিতা পরে আছেন হাউসকোট। কিন্তু হাউসকোটও যে ওপরে এতখানি জায়গা ছেড়ে রাখতে পারে সে অভিজ্ঞতা অক্ষরের নতুন। কত বয়স স্মিতার? জিজ্ঞেস করবে?

স্মিতা সে সুযোগ দিলেন না। ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেল।

"কী যেন নাম তোমার?"

"অক্ষর।"

"চমৎকার নাম তো! কে রেখেছিলেন নাম?"

"আমার কোনও পূর্বপুরুষ। সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন।"

"অক্ষর মানে কি লেটার? ক খ গ ঘ?"

"হ্যাঁ। তবে আর একটা অর্থও আছে। যার ক্ষয় নেই।"

"সে তো অক্ষয়।"

"হ্যাঁ। দুটো শব্দের একই মানে।"

"তা কী লেখো তুমি?"

"গল্প।"

"এনেছ গল্প?"

সঙ্গে আনা গল্পগুলো বাড়িয়ে দিল অক্ষর।

উল্টেপাল্টে দেখে ভুরু কোঁচকালেন স্মিতা।

"একটাই গল্প?"

"না। তিনটে।"

"তিনটে গল্প? ছোটো সাইজের?"

"হ্যাঁ। অনুগল্পের চেয়ে বড়। আবার পত্রপত্রিকায় যেসব ছোটগল্প বেরোয়, দেড় থেকে দু'হাজার শব্দের, তার চেয়ে ছোট।"

চিন্তিত দেখাল স্মিতাকে।

"এগুলো ধরানো কিন্তু মুশকিল হবে। একটা ছাপলে স্পেস ভরানো যাবে না। তিনখানা একসঙ্গে ছাপলে প্রশ্ন উঠবে: একই লেখকের তিনখানা গল্প একসঙ্গে?"

"কেন? কবিতা তো মাঝেমাঝে ছাপা হয়, গুচ্ছকবিতা। আপনাদের কাগজেই আগের মাসে বেরিয়েছে।"

"মন্দারের কবিতা তো? ওর কথা আলাদা।"

"আলাদা কেন?"

"ওর ফলোয়ার কত জানো? ফ্যান ক্লাবও আছে। বছরে একবার মিট করে। ফাইভ স্টার হোটেলের বলরুম ভাড়া নিতে হয়। অবশ্য আমরাই স্পনসর করি। ওর কোনও বই-ই পাঁচ হাজারের কম ছাপা হয় না।"

অক্ষর ভাবছিল। স্টার আর্টিস্ট-এর মতো স্টার লেখক। অনেক ডিরেক্টরই শুনেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় কার প্রতিপত্তি কত তাই দেখে কাস্টিং করেন। এখানে এসে মনে হচ্ছে, সাহিত্যও সেই জায়গাটা ধরে নিয়েছে। গুণগত মান নয় লেখকের সেলেবিলিটিই ঠিক করবে তার লেখা প্রকাশিত হবে কি হবে না।

"কী খাবে? চা-কফি? অন্য কিছু?"

"কিচ্ছু না। আপনি চাইলে নিতে পারেন।"

ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বের করে প্লেটে সাজিয়ে অক্ষরের সামনে রাখলেন স্মিতা। অক্ষর দেখল বাড়িতে স্মিতা একাই রয়েছেন। সব সময়ের কাজের লোক স্মিতা মনে হয় পছন্দ করেন না। নিজে একটা গ্লাসে ড্রিংক্স ঢেলে বরফ মিশিয়ে মুখোমুখি বসলেন। গ্লাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "একেবারেই চলে না? নাকি আজ ইচ্ছে করছে না?"

"মানে... অভ্যেসটা করা হয়ে ওঠেনি।"

পানীয়তে ঠোঁট ডুবিয়ে আবার উঠলেন স্মিতা। একটা যন্ত্রে কীসব টেপাটেপি করলেন। বাজনা বেজে উঠল। ওয়েস্টার্ন মিউজ়িক।"

বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, "জানা আছে এটা কোন নাম্বার?"

বোকার মতো ঘাড় নাড়ল অক্ষর, "না।"

ওয়েস্টার্ন মিউজ়িক এ তার ফান্ডা জ়িরো বললেও বাড়িয়ে বলা হয়।

"ভাল লাগছে?"

এবারে সত্যি কথাটা বলল অক্ষর, "হ্যাঁ।"

"আর কী ভাল লাগছে?"

"সব কিছুই। এই ফ্ল্যাট। ড্রয়িংরুম।"

"আমাকে?"

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল অক্ষরের। ভাল করে দেখল স্মিতাকে।

তার দিকেই তাকিয়ে আছেন স্মিতা। ঘাড়টা সামান্য কাত করা। হাতের গ্লাসখানা ঠোঁটের কাছে ধরা। লিপগ্লস মদিরায় ধুয়ে যায়নি, চকচক করছে একজোড়া পুরন্ত ঠোঁট। ছোট কপাল, সেখানে আকাশপ্রদীপের মতো জ্বলছে ছোট্ট একটা টিপ। ভুরুতে জমছে মুক্তোর মতো ঘামের বিন্দু। সেদিন মেকআপ আর শাড়ি-গয়নায় দাউদাউ করে জ্বলছিলেন স্মিতা। পতঙ্গরা উড়ছিল। ঝাঁপ দেবার টাইমিং ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আজ ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেন নিজেকে নিবেদন করবেন ঠিকই করে এসেছেন এই লাস্যময়ী নারী।

অক্ষর কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে উঠে গিয়ে মিউজ়িক-এর আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে এলেন। তারপর একখানা হাত বাড়িয়ে বললেন, "এসো। লেট আস ডান্স।"

অক্ষর উঠে দাঁড়াল, কিন্তু এগিয়ে গেল না। কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "আমি তো নাচতে জানি না।"

"কী জানো অক্ষর? হার্ড ড্রিংকস জানো না। ওয়েস্টার্ন মিউজ়িক জানো না। মিউজ়িক-এর সঙ্গে নাচতে জানো না।"

এগিয়ে এসে অক্ষরের হাত ধরলেন স্মিতা। স্মিতার গরম নিশ্বাস পুড়িয়ে দিতে লাগল অক্ষরকে। অক্ষরের মুখের খুব কাছে স্মিতার মুখ। বুকে ঠেকে আছে উদ্ধত দুই পয়োধর। কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিস করে স্মিতা বললেন, "ব্রা-এর হুক খুলতে জানো?"

ডুবে যেতে যেতেও চোখের কোনা দিয়ে অক্ষর তার গল্পগুলো একঝলক দেখার চেষ্টা করল। টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া, যাতে উড়ে না যায়।

চিঠিটা শনিবার বিকেলে এল।

নিজেই নিল অক্ষর। খুলল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি।

তার গল্পগুলি মনোনীত হয়েছে। শিগগির প্রকাশিত হবে। একসঙ্গে।

বারান্দায় দুটো পায়রা বকবকম করছিল। অক্ষর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে জায়গা ছেড়ে উড়ে গেল।

চিঠিটা হাতেই ছিল। আর একবার পড়ল। রেলিং ধরে ঝুঁকে পথচলতি মানুষের দিকে তাকাল।

ভাঁজ করে খামে ঢোকাতে ঢোকাতে একটা কথাই মনে হল।

এত সহজ? সব কিছু এতটাই সহজ?

১২

এমনিতে লোহার গেটটা বন্ধই থাকে। বাইরে থেকে বেল বাজালে গার্ডদের কেউ মুন্ডু বাড়ায়। চেনা লোক দেখলে গেট খুলে দেয়।

বাজার থেকে ফিরে আজ দেখল অন্যরকম। গেটটা আধখোলা। ঠেলতেই যেটুকু ফাঁক হল সেখান দিয়ে গলে যাওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল।

গেটের মুখে যেখানে গার্ডরা বসে থাকে সে জায়গাটা ফাঁকা। সামনের সিমেন্ট বাঁধানো প্যাসেজ, যেখান দিয়ে গাড়িগুলো বেরোয়, সেখানে একটা জটলা। জটলার মুখগুলো চেনা। সিকিওরিটি গার্ড ক'জনকে বাদ দিলে হাউজ়িং-এর অধিবাসী দু'জন।

প্রথমেই যার সঙ্গে চোখাচোখি হল, সন্তোষ, সেও সিকিওরিটি গার্ড।

"কী ব্যাপার সন্তোষ?"

"মাধব।"

"কী হয়েছে মাধবের?"

"টুলে বসে ডিউটি করছিল। হঠাৎ চোখ উল্টে গেল। পড়ে গেল মাটিতে। এখন কথা বলতে পারছে না। হাত-পা খিঁচছে।"

মাধব! বাজারে যাবার সময় গেট খুলে বেরনোর রাস্তা করে দিয়েছিল মাধবই তো! কী হল এর মধ্যে?

ভিড়ের পেছন থেকে উঁকি মারল অক্ষর। শুয়ে আছে মাধব। চোখ বন্ধ। জামা-প্যান্ট ভিজে। মাথায় জল ঢালা হয়েছে মনে হয়।

কমপ্লেক্স-এর যে-দু'জন নেমেছিলেন, তাঁদের একজন জানতে চাইলেন, "সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্টকে জানানো হয়েছে?"

"সেক্রেটারি এসেছিলেন। দেখে গিয়েছেন।"

"দেখে?"

"আবার ওপরে উঠে গিয়েছেন।"

"প্রেসিডেন্ট?"

"খবর পেয়েছেন। আসবেন বলেছেন।"

বলতে বলতেই লিফটের আওয়াজ হল। প্রেসিডেন্ট। নিজেই ডাক্তার। দেখে সবাই সসম্মান রাস্তা ছেড়ে দিল।

মাধবের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখলেন। চোখের পাতা টানলেন। হাতের মুঠোয় নিজের আঙুল ঢুকিয়ে মুঠোর জোর পরীক্ষা করলেন। দু'বার জোরে জোরে 'মাধব' 'মাধব' করে ডাকলেন। মাধব চোখ খোলার চেষ্টা করল। জড়িয়ে জড়িয়ে কী যেন বললও।

প্রেসিডেন্ট সকলের দিকে ঘুরে তাকালেন। তারপর হাতের ধুলো ঝেড়ে বললেন, "চিন্তা নেই, ঠিক হয়ে যাবে। একটু গরম দুধ পাওয়া যাবে? পেলে খাওয়ানোর চেষ্টা করো। দুর্বলতা থেকে হয়েছে। দুধ খেলেই উঠে বসবে।"

একজন গেট খুলে দিল। একজন ছুটল গরম দুধ আনতে। গাড়ি হাঁকিয়ে প্রেসিডেন্ট বেরিয়ে গেলেন।

ছোট কমপ্লেক্স। তিনটে ব্লকের প্রতিটায় আটখানা করে ফ্ল্যাট। কমপ্লেক্স থাকলেই সোসাইটি থাকবে। সোসাইটি থাকলেই সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। আর সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্ট থাকা মানে সমস্ত দায়ভার এই দু'জনের ওপর চাপিয়ে অন্যরা নিশ্চিন্ত। সেক্রেটারি জেনে গেছেন। প্রেসিডেন্ট জানলেন। নিদানও দিয়ে গেছেন। অতএব বাকিদের আর কোনও দায়িত্ব নেই। যে-দু'জন এতক্ষণ ছিলেন তাঁরাও গুটিগুটি নিজেদের ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হলেন।

রয়ে গেল অক্ষর, তিনজন সিকিওরিটি গার্ড, আর মাধব, যে তখনও ভূমিশয্যায়।

এর মধ্যে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এক ফোঁটাও ভেতরে যায়নি। সবটাই গড়িয়ে পড়েছে বাইরে। ওদিকে যেটুকু নড়াচড়া দেখা যাচ্ছিল, সেটুকুও যেন চলে যাচ্ছে মাধবের শরীর থেকে। ক্রমশ

নিস্তেজ হয়ে আসছে মানুষটা।

অক্ষরের ভাল ঠেকল না।

সন্তোষকে ডেকে ওর হাতে বাজারের থলিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

সন্তোষ জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলতে হবে?"

"বোলো ফিরতে দেরি হবে।"

গার্ডদের মধ্যে যে সিনিয়র, চৈতন্য, তাকে ডেকে বলল এজেন্সির অফিসে খবর দিতে। আজকাল এজেন্সি থেকে সিকিওরিটি গার্ড পাঠানো রেওয়াজ হয়ে গেছে। মাসকাবারি বন্দোবস্ত। এজেন্সির ঠিকানা- ফোন নম্বর সেক্রেটারির কাছে। তিনি হাত ধুয়ে ফেলেছেন। সুতরাং গার্ডদের দিয়েই এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা ছাড়া উপায় নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মাধবের বাড়ির ফোন নম্বর কারও কাছে নেই। সেদিকটায় আপাতত এগোনো গেল না।

মাধবের দিকে আর একবার তাকাল অক্ষর। ঘাড়টা একদিকে কাত হয়ে গেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার।

সন্তোষ ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছে। সন্তোষকে বলল ট্যাক্সি ডাকতে। তারপর চৈতন্যকে গেটে থাকতে বলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। বীথিকে একটা মেসেজ টেক্সট করল।

সন্তোষ যে ট্যাক্সিটা এনেছিল তার ড্রাইভারের সঙ্গে হেলপার ছিল না। সুবিধাই হল। মাধবের মাথাটা কোলে নিয়ে সন্তোষ বসল পেছনের সিটে। সামনে ড্রাইভারের পাশে অক্ষর আর গিরি, গার্ডদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ যে।

একটাই ভরসা, হাসপাতাল দূরে নয়। ড্রাইভারটিও বুদ্ধিমান। গাড়ি নিয়ে থামাল সোজা ইমার্জেন্সির দরজায়।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল মাধবকে শোয়ানো হয়েছে বেড-এ। একজন বয়স্ক ডাক্তারবাবু নাকের ওপর ঝুলন্ত চশমা সামলাতে সামলাতে দেখেও গিয়েছেন ওকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেড থেকে ট্রলিতে তোলা হল মাধবকে। তারপর ওদের কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়েই করিডর ধরে ট্রলিসুদ্ধ মাধবকে ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল দু'জন হাসপাতালকর্মী।

উপায় না দেখে ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ধরল অক্ষর। ডাক্তারবাবু কাচের জানলার ওপারে কাউন্টারে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন। অক্ষরকে দেখে চোখ তুললেন, "বলুন।"

"কেমন আছে আমাদের রোগী?"

"কোন রোগী?"

"ওই যে, যাকে আপনি দেখে এলেন।"

"দেখে তো অনেককেই এলাম।"

ঠিক কথা। ঝট করে মাথায় খেলে গেল অক্ষরের। বলল, "যাকে ট্রলিতে চাপিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হল।"

"ওই স্ট্রোক কেস?"

"স্ট্রোক? স্ট্রোক হয়েছে মাধবের?"

"মনে হচ্ছে সেরকমই। মাথার স্ক্যান করলে বোঝা যাবে। তাই পাঠালাম স্ক্যান করাতে।"

"ভাল হয়ে যাবে তো?"

"দেখা যাক। স্ক্যানের রিপোর্ট আসুক আগে। ... কে হয় আপনার?"

উত্তর খুঁজতে সময় নিল অক্ষর। কে হয় মাধব অক্ষরের? অক্ষর যে হাউজিং কমপ্লেক্স-এ থাকে মাধব সেখানকার সিকিওরিটি গার্ড। এটুকু দিয়ে কি কোনও সম্পর্ক এস্টাব্লিশ করা যায়? আর সম্পর্ক যদি না-ই থাকে, অক্ষরের কি অধিকার আছে মাধবের ভাল-মন্দ নিয়ে প্রশ্ন করার?

সত্যি কথাটাই বলল অক্ষর। চিন্তিত দেখাল ডাক্তারবাবুকে, "বাড়ির লোক কেউ নেই?"

"খবর দেওয়া হয়েছে। এসে যাবে এখনই।"

"এলেই নিয়ে আসবেন। কিছু ফরম্যালিটিজ় আছে, যা বাড়ির লোকজন ছাড়া হওয়ার নয়।"

বাইরে বেরিয়ে দেখল এজেন্সির লোকজন এসে গিয়েছে। লোকজন বলতে দু'জন, একজন বয়স্ক, অন্য জন, দেখে মনে হল সবে জয়েন করেছে, অ্যাপ্রেনটিস। ডাক্তারবাবুর কথাটা তুলল ওদের সামনে। বয়স্ক ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন, "বাড়িতে জানানো হয়েছে। দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছয়।"

সিকিওরিটির যারা সঙ্গে এসেছিল তারা এজেন্সির দু'জনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ভিড় এড়িয়ে অন্য দিকে গেল। অক্ষরও হাসপাতালের গেট ছাড়িয়ে বাইরে বেরলো বীথিকে একটা ফোন করতে।

বীথি তাড়ায় ছিল। কথা বাড়ালে স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। ছোট করে যতটুকু পারল বলে অক্ষর শেষ করল, "কখন ফিরতে পারব জানি না।"

"তার মানে?" বীথির গলায় বিরক্তি স্পষ্ট।

"কী করে বলব? দুপুর-সন্ধে-রাত্তির।"

"খাওয়া দাওয়া?"

"কিছু একটা ম্যানেজ করে নেব।"

বীথি লাইন কেটে দিল।

আজ অক্ষরের ডে-অফ। অন্যদের মতো শনি অথবা সোমবার ডে-অফ নেয় না অক্ষর। অক্ষর ডে-অফ নেয় বুধবার। অক্ষরের বিশ্বাস সপ্তাহের মধ্যে একটা ব্রেক নিলে টানা কাজের মনোটনি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কাল বৃহস্পতিবার। ফার্স্ট পিরিয়ডেই ক্লাস। পারবে পৌঁছতে?

দেখা যাক। পরিস্থিতি তেমন হলে অম্বরদাকে জানিয়ে রাখতে হবে। অম্বরদা টিচার-ইন-চার্জ। মানুষ ভাল।

বীথি ভাল একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে পেটে তেমন কিছু পড়েনি। একটা দোকানে গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। পরে আবার কখন খাবার সুযোগ মিলবে বলা কঠিন। তাড়াতাড়ি গোটা চারেক কচুরি লোড করে নিল।

ভেতরে ঢুকে দেখল এজেন্সির লোক দু'জন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অক্ষরকে দেখে এগিয়ে এল।

বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "গার্ডরা ফিরে যেতে চাইছিল। ওদের ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আপনার কোনও প্রয়োজন নেই তো ওদের?"

অক্ষরের আর কী প্রয়োজন? যার প্রয়োজন হলেও হতে পারে সে তো এখন স্ক্যান করাতে ...

এই অবধি ভেবেই চড়াত করে মাথায় এল, মাধবকে সেই যে স্ক্যান করাতে নিয়ে গেল আর তো খবর নেওয়া হয়নি। কী বেরলো স্ক্যানে? ভাল আছে তো মাধব?

এজেন্সির দু'জনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকল। ঢুকে দেখল এর মধ্যে ডাক্তার পাল্টিয়ে গেছেন। মাধবের বেড-এও অন্য কেউ শুয়ে।

নিজেকেই দুষল অক্ষর। এর মধ্যে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। নতুন ডাক্তারবাবু ছাড়া গতি নেই। তাঁকেই গিয়ে ধরল।

ডাক্তারবাবু খাতা দেখে বললেন, "মাধব কয়াল? তার তো স্ক্যান হয়ে গেছে। পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে নিউরোলজি ওয়ার্ডে।"

নিউরোলজি?

ছুট ছুট। মস্ত বিল্ডিং নিউরোলজি। অনেকগুলো ফ্লোর। সেখানে সার্জিকাল মেডিক্যাল আলাদা ওয়ার্ড। বহু খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান মিলল মাধব কয়ালের। কাছে যেতেই নার্সের মুখ ঝামটা।

"কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাক্তারবাবু কখন থেকে খোঁজ করছেন। যান। শিগগির গিয়ে দেখা করুন।"

আবার খোঁজ। ডাক্তারবাবুর ঘরে পৌঁছে দেখা গেল ঘর খালি। ডাক্তারবাবু লাঞ্চে গিয়েছেন।

অপেক্ষা। অবশেষে ডাক্তারবাবু যখন ঘরে এলেন আর অক্ষর পরিচয় দিয়ে বলল, “আমরা মাধব কয়ালের বাড়ির লোক,” ডাক্তারবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

“আপনাদের জন্যই তো অপেক্ষা করছি। আসুন আমার সঙ্গে। একটা কনসেন্ট ফর্মে সই করতে হবে।

“কনসেন্ট ফর্ম?”

“হ্যাঁ। মাধবের মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এখনি অপারেশন না করলে বাঁচানো মুশকিল। ... বলুন কে ওর আত্মীয়? কে সই করবেন ফর্মে?”

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল তিনজন। অক্ষর বা এজেন্সির দু’জন, কেউই তো মাধবের আত্মীয় নয়।

সত্যি কথাটাই ডাক্তারবাবুকে বলা হল। ডাক্তারবাবু নিভে গেলেন।

“আপনারা আত্মীয় নন?”

“না। খবর দেওয়া হয়েছে। তারা রাস্তায় আছে। পৌঁছে যাবে। একটু সময়...”

“সময়? সময় আমি দেবার কে? যাই হোক, বাড়ির লোক এলেই খবর দেবেন। আমাকে না পেলে সিস্টারদের জানালেই হবে। আমার টিম রেডি থাকবে। ফর্মে সই করলে ওটি রেডি করতে বলব।”

বেরিয়ে কপালের ঘাম মুছে এজেন্সির ভদ্রলোক বললেন, “মাধবের বাড়ি ঘাটাল। খবর পৌঁছে গেছে। ওর ভাই বেরিয়েও পড়েছে। কিন্তু ঘাটাল তো এখানে নয়। জানি না কখন পৌঁছবে।”

তারপর অক্ষরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, “অনেক বেলা হয়ে গেল। আপনার খাওয়া হয়েছে কিছু?”

ইঙ্গিতটা ধরতে পারল অক্ষর। জবাব দিল, “আমার জন্য ভাববেন না। যান, কিছু মুখে দিয়ে আসুন।”

এজেন্সির দু’জন গেটের দিকে এগোলেন। হাসপাতালের ভেতর একটা নিমগাছ। তার ছায়ায় বসতে বসতে আশপাশের মানুষজনকে একঝলক দেখল অক্ষর। সবারই কেউ না কেউ ভর্তি আছে। কেউ এসেছে কাকদ্বীপ থেকে, কেউ বা সমুদ্রগড়। উৎকণ্ঠায় মুখ শুকিয়ে আছে প্রত্যেকের। আশঙ্কার মধ্যেও মরূদ্যানের মতো জেগে আছে আশা। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে অসুস্থ মানুষটা। সুস্থ হয়ে ফিরে দাওয়ায় বসে শিঙিমাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খাবে। সব আবার হয়ে উঠবে আগের মতো।

অক্ষর নিজেকে প্রশ্ন করে, কার জন্য বসে আছে অক্ষর? মাধব অক্ষরের কে? কোথাকার কে পরস্পর মাধব কয়াল, নিবাস ঘাটাল, তার জন্য অক্ষরের এই অপেক্ষা, সত্যিই কি কোনও মানে আছে? উত্তরটা অক্ষর নিজেকেই দেয়। মানুষের প্রতিটি কাজ, সমস্ত ক্রিয়াকর্মই কি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ? মাধব ভর্তি হয়ে গেছে। বাড়ির লোক খবর পেয়েছে। তারা রওনাও হয়েছে। এজেন্সির লোক উপস্থিত। সেই হিসাবে অক্ষরের তো কোনও ভূমিকাই পড়ে নেই। তা সত্ত্বেও অক্ষর আছে। থাকবে, যতক্ষণ না একটা ভাল খবর মুখে করে ফিরে যেতে পারবে।

দার্শনিকতা থেকে নিতান্ত জৈবিক একটা অনুভূতির জগতে আছড়ে পড়ল অক্ষর।

চারখানা কচুরির সুদূরপ্রসারী প্রভাব এতক্ষণে একটু একটু করে বুঝতে পারছে। খাবার সময় ভেবেছিল চারখানা ছোট-ছোট কচুরি, ও তো পড়তে না পড়তেই হজম হয়ে যাবে।

ধারণাটা ভুল এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। পেটটা ক্রমশ ফুলছে। ঢেঁকুর উঠছে ঘনঘন। আগামী তিনদিন পেটে কিছু না পড়লেও কচুরির বাচ্চারা ঠেকা দিয়ে দেবে, অক্ষর নিশ্চিত।

মাধবের ভাই যাদব পৌঁছল বিকেল পার করে। অক্ষর যাদবকে চেনে না, চেনেন এজেন্সির ভদ্রলোক। তাও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল, সন্ধান করে নিয়ে এলেন এজেন্সি। যাদবের সন্ধান পাওয়ামাত্র তাকে বগলদাবা করে তিনজন ছুট লাগাল।

আবার ডাক্তারবাবুর চেম্বার। ডাক্তারবাবু তখনও বেরিয়ে যাননি। হাঁপাতে হাঁপাতে যাদবকে সামনে ঠেলে দিয়ে অক্ষর বলল, “বাড়ির লোকের খোঁজ করছিলেন। এর নাম যাদব, মাধব কয়ালের ভাই।”

ম্লান হাসলেন ডাক্তারবাবু, “কী করব বাড়ির লোক দিয়ে?”

“কেন, অপারেশন?”

“বাড়ির লোকের জন্য আর অপেক্ষা করে নেই মাধব কয়াল।”

“তার মানে?”

“আধ ঘণ্টা আগেই উনি মারা গিয়েছেন।”

মাধবের ভাই আর এজেন্সির লোকজন হাসপাতালে থেকে গেল। অক্ষর ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

বিকেলের আঁচল থেকে শেষ আলোটুকুও মুছে যাচ্ছিল দ্রুত। একটা ভিজে হাওয়া আসছিল, বৃষ্টি হয়েছে কোথাও। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল অক্ষর। সারাদিনের ক্লান্তি যেন স্পর্শ করছিল না অক্ষরকে। একটা হতাশা, না-পারার গ্লানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বছর আটেকের একটাই ছেলে মাধবের। সামান্য জমিজিরেত। ভাইয়েরা চাষ করে। মাধবই বাইরে বেরিয়েছিল উপার্জনের আশায়। অল্পই আয়। তবু গরিবের সংসারে সেটাই অনেকখানি। শুধু মানুষটার চলে যাওয়াই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তার অবদান কতখানি, সেটারও টাকা-আনা হিসাব করতে বসে পড়ে থাকা মানুষ। দেখতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব।

আর অক্ষর?

সকালে দরজা খুলে দিল। বাজার করে ফিরে দেখল মানুষটা মাটিতে শুয়ে। সেই থেকে সারাটা দিন একসঙ্গে। একটা যুদ্ধ। কাঁধে কাঁধ লাগিয়েছিল অক্ষর। শেষ অবধি পেরে উঠল না। প্রতিপক্ষ অমিত-পরাক্রম হলে হেরে তো যেতেই হয়।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, গেটের পাশে বেল। আঙুল ছোঁয়াতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল।

কত যেন বয়স মাধবের?

ছত্রিশ।

তার মানে অক্ষরের থেকেও তেরো বছর কম।

যাবার সত্যিই কি কোনও বয়স আছে?

১৩

মিক্সিটা খারাপ হয়ে গেছে, সারাতে হবে। এইসময় একটা লোক হাঁকতে হাঁকতে যায়, “খারাপ মিক্সি সারাই...” বারান্দায় বসে ডাকটা শোনবার জন্যই অপেক্ষা করছিল, আজও হেঁকে হেঁকে চলে গেল, কানে গেল না বীথির।

রেলিং-এ জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া আছে। একটা পায়রা তার ওপর বসে নোংরা করে দিয়ে গেল, বীথি দেখল, অথচ পায়রাটাকে তাড়াবার জন্য হাত ওঠাল না।

আকাশে মেঘ সাজল। দুপুরের আলো মুছে গেল, অন্ধকার আচ্ছন্ন করল মাটি ও বনানী। বীথি দেখতে পেল না।

অবশেষে আকাশ যখন ভয়-দেখানো গলায় ডেকে উঠল, ভূমিকা-হিসাবে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পাঠিয়ে দিল বীথিকে লক্ষ্য করে, ধড়মড় করে উঠে শুকনো জামাকাপড় তুলে ভেতরে গিয়ে বসল বীথি।

বারান্দা ছেড়ে উঠে আসতে না আসতেই বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ঘরের ভেতর ছাঁট আসছিল। উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। যেটুকু আলো আসছিল ঘরে তাও নিভে গেল। অন্ধকারে খানিকক্ষণ ভূতের মতো বসে থেকে হাতড়ে হাতড়ে টিভির রিমোটটা হাতে নিল। টিভি অন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চ্যানেল সার্ফ করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক টিভির

পর্দায় চোখ রাখার পর খেয়াল হল কিছুই দেখছে না। টিভি অফ করে সোফায় বসে আবার ছিঁড়ে যাওয়া চিন্তাগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আজ স্কুলের ফাউন্ডেশন ডে। তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। টুপুর গেছে বন্ধুর বাড়ি, আজ ফিরবে না। অক্ষরও বাড়ি নেই। ফাঁকা বাড়িতে একা একা বসে চিন্তা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে?

বাইশ বছর। মানুষটার সঙ্গে পরিচয়ের বয়স বাইশ বছর হতে চলল। কেমন মানুষ অক্ষর?

জেদি, খেয়ালি, অন্তর্মুখী। এটুকু বাদ দিলে দোষ খুঁজে পাওয়া শক্ত। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস। আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তার পুরোটাই নিজের যোগ্যতায় এই ভাবনা থেকে কোনও সমস্যাকেই সমস্যা বলে না ভাবার একটা প্রবণতা আছে। তার জন্য বিপদে যে পড়তে হয়নি তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ওপর ভরসা করেই সেসব বিপদ থেকে ঠিকই উদ্ধার পেয়ে এসেছে। বীথিও একটু একটু করে নির্ভর করতে শিখেছে। বিপদে-আপদে সবসময় পাশে পাওয়া যাবে এমন একটা বিশ্বাস বীথির গভীরে কোথাও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। বীথি জানে, আর কেউ না থাকুক, এই একটা মানুষ তার জন্য ছায়া হয়ে আশ্রয় হয়ে বাকি জীবনটা ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকবে।

একা বীথিই নয়, ছেলেমেয়ের সামান্য তৃপ্তির জন্যও মানুষটা প্রাণপাত করে। আত্মীয়স্বজন কেউ বলতে পারবে না, অসুখ-বিসুখ বিপদে-আপদে অক্ষর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। বীথির বাবা-মা, বয়স হয়েছে, একা থাকেন, তাঁদেরও নিয়মিত খবরাখবর নেওয়ায় অক্ষর কখনও অবহেলা করেছে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই অক্ষর। বীথির চেনা অক্ষর।

অথচ সেই মানুষটাকে বীথি আজকাল আর চিনতে পারে না। মাঝেমাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করে, যে অক্ষর বীথির পছন্দ নয় বলে বাথরুমের টাইলস তুলে ফেলে নতুন টাইলস বসিয়েছিল, এই অক্ষর সেই অক্ষরই তো?

অক্ষরের এই পরিবর্তন ছেলেমেয়েরও নজর এড়াচ্ছে না।

টুপুর তো বলেই ফেলল, "বাবার কী হয়েছে বলো তো?"

"কেন?" সাবধানী গলায় বীথি জানতে চেয়েছিল।

"আমার জন্মদিনে কেক কাটবার সময় এমন বেজার মুখ করে দাঁড়িয়েছিল দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন জিভে নিমপাতা ঘষে দিয়েছে। ছবিটা পাঠিয়েছিলাম। দাদাও দেখে সেটাই বলল।"

ধমকে টুপুরকে থামিয়ে দিয়েছিল বীথি।

"কলেজে একটা ঝামেলা চলছে শুনিসনি? নইলে জন্মদিনে তোকে উইশ করবে না তা কখনও হয়?"

টুপুরকে থামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু টুপুরের প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পারেনি। যখনই একা হয়েছে, বারবার টুপুরের কথাগুলো ধাক্কা দিয়েছে, "বাবার কী হয়েছে বলো তো?"

ব্যাপারটা এক্সট্রিম-এ পৌঁছল বিবাহবার্ষিকীর দিন।

ছেলে-মেয়ে ছোট থাকতে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ভালভাবেই সেলিব্রেট করত বীথিরা। অক্ষর কিছু না কিছু গিফট তার জন্য নিয়ে আসতই। সময় পেলে বেড়াতে যেত দিঘা, বকখালি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বীথিই থামিয়ে দিত, "আদিখ্যেতা! ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে না? এবার থামাও তো এসব।"

সেই অক্ষর বিবাহবার্ষিকীর দিনটাই বেমালুম ভুলে যাবে বীথি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

রাতে শুতে যাবার সময় বীথি জিজ্ঞেস করেছিল, "আজকের দিনটার কথা ভুলে গেছ?"

অক্ষর অবাক হয়ে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়েছিল।

"আজকের দিন? কেন বলো তো?"

"কিছুই মনে পড়ছে না?"

অক্ষর যখন মনে করবার চেষ্টা করছে, ডেটটা বলে বীথি জানতে চেয়েছিল, "এবার মনে পড়েছে?"

জিভ কেটে অক্ষর বলেছিল, "দেখেছ? একদম ভুলে গিয়েছি।"

বীথি সামাল দিয়েছিল, "থাক, ভুলে গেছ ভুলে গেছ। আর ওটা নিয়ে ব্রুড করতে হবে না। পরের বছর ভাল করে সেলিব্রেট করলেই হবে।"

এতদিন বীথি, ছেলেমেয়েরা, কাছের লোকদেরই নজরে পড়ছিল। এবার বাইরের যারা, তারাও পয়েন্ট-আউট করতে শুরু করল।

তিথি, বীথির পিঠোপিঠি বোন, সেদিন ফোন করেছিল।

"অ্যাই দিদি! অক্ষরদার কী হয়েছে বল তো?

বীথি ঢোঁক গিলেছিল, "কী আবার হবে?"

"সত্যিই কিছু হয়নি?

"বললাম তো, আমার কিছু জানা নেই।"

"সেদিন রাস্তায় দেখা। আমি আর সৃঞ্জয় যাচ্ছিলাম গড়িয়াহাটে বাজার করতে। সৃঞ্জয়ই প্রথম দেখতে পেয়েছিল। আমাকে বলল, অক্ষরদা না? আমি বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে। সৃঞ্জয় বলল, ডেকে দেখব? বললাম, ডাকো।"

শ্বাস বন্ধ করে শুনছিল বীথি। তিথি থামলে বলল, "তারপর?"

"সৃঞ্জয় কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাল আছেন অক্ষরদা? অক্ষরদা ফিরে তাকাল। তারপর আমাদের দেখে এমন ভাব করল যেন জীবনে প্রথম দেখছে। হুঁ হাঁ করে একটা দুটো কথা বলে হনহন করে চলে গেল। ... হ্যাঁ রে, কিছু হয়েছে অক্ষরদার?"

"না, মানে তেমন কিছু... ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব।"

ফোন কেটে দিয়েছিল তিথি। কিন্তু বীথির বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস আর যায় না। তিথি না হয় নিজের লোক, কিছু মনে করবে না। কিন্তু বাইরের লোক? তারা তো ছেড়ে দেবে না। অক্ষরের কলেজ, ছাত্রছাত্রী, সহকর্মীরা, তারাও যদি লক্ষ করে? আস্তে আস্তে জানাজানি হয়? চাকরি নিয়ে টানাটানি হয় অক্ষরের? মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে বীথির।

কিন্তু কারণটা কী?

কী এমন ঘটল যে রাতারাতি মানুষটাই পাল্টে গেল?

অসুখবিসুখ নয় তো?

যে-মানুষটাকে ঠেলে-ঠেলেও ডাক্তারের কাছে পাঠানো যায় না সেই যখন একগাদা পরীক্ষানিরীক্ষা করাল, অসুখবিসুখের কথাই প্রথম মাথায় এসেছিল বীথির। রিপোর্টগুলো আলমারিতে ছিল। একদিন অক্ষর যখন কলেজে গেছে, চুপিচুপি ওগুলো নিয়ে গিয়েছিল তন্ময়দার কাছে।

তন্ময়দা সরকারি হাসপাতালের বড় ডাক্তার, দূর সম্পর্কের

জামাইবাবু। রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

"কী দেখলেন তন্ময়দা? খারাপ কিছু?"

"কত বয়স যেন অক্ষরের?"

"এ... ই পঞ্চাশ হবে এবার।"

"পঞ্চাশ? মোটে? রিপোর্ট এতটাই ভাল, একশো বছরেও ওর কিছু হবার নয়। আমারই কপাল খারাপ। কবে থেকে আশা করে বসে আছি, ওর জায়গাটা খালি হবে, আমি গিয়ে অকুপাই করব। এ যাত্রা তা আর হওয়ার নয়।"

তার মানে অসুখবিসুখ নয়। তাহলে? অন্য কিছু? সেই অন্যটা কী?

চাকরির জায়গায় কোনও সমস্যা? আজকাল সবেতেই তো পলিটিক্স। ও রাজনীতি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, রাজনীতি করি না বললেও তো কেউ বিশ্বাস করে না। আমাদের রাজনীতি করে না মানে নিশ্চয়ই অন্যদের সঙ্গে আছে— এমনটাই ধরে নেয়নি তো? আর তা থেকেই শুরু হয়েছে অত্যাচার। মুখ বুজে থাকা স্বভাব। বলেও উঠতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে দগ্ধাচ্ছে। আর সেই জন্যই অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারে দেখা যাচ্ছে লক্ষণীয় পরিবর্তন।

যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে, মুখ ফুটে বলবে না? বললে তো ভারটা হালকা হয়। তা ছাড়া বীথিরও তো চেনাজানা আছে কেউ কেউ যারা রাজনীতির অন্ধকার গলিতে ঘোরাফেরা করে। ধরতে তো পারে তাদের কাউকে। কখনও কোনও ফেভার চায়নি। বলে দেখতে দোষ কী? পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেবে এমনটা তো নাও হতে পারে!

শেষ যে-ভাবনাটা মাথায় আসতে চাইলেও বীথি বারবারই সরিয়ে দিয়েছে সেটা অন্য কোনও রিলেশন। কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি তো অক্ষর? অক্ষরের জীবনে নতুন কেউ আসেনি তো? সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আবার বীথিকে পরিষ্কার করে বলেও উঠতে পারছে না। এই দোটানা থেকেই যত সমস্যা। মানুষটাই আমূল বদলে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক পড়েছে, এই বয়সটা নাকি সত্যিই ভালনারেবল। এই বয়সেই নাকি মানুষ নতুন নতুন সম্পর্কের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু অক্ষরও কি তাই? এত বছর ধরে দেখছে মানুষটাকে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না। মনে হয় না, অক্ষরও অন্যদের মতো। অক্ষর তাকে ছাড়া অন্য কারও কথা মাথায় আনতে পারে, মরে গেলেও তা মেনে নিতে পারবে না বীথি।

অনেক ভেবে শেষ অবধি ঠিক করল মুখোমুখি হওয়াই ভাল। ফেলে রাখলেই যে-কোনও সমস্যা হাতের বাইরে চলে যায়। তখন আর সমাধানের পথ থাকে না। তার চেয়ে বাড়তে না দিয়ে সামনাসামনি বসে মিটিয়ে নেওয়া, সেটাই ঠিক রাস্তা।

একটা দিনও ঠিক করে ফেলল। টুপুর থাকবে না। একা সে আর অক্ষর। এমনটাই আইডিয়াল সিচুয়েশন। আজই সেই দিন।

বৃষ্টি কমে এসেছিল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঢুকল ঘরে। গুমোট অনেকটাই কেটে গেল।

মা'র কাছেই রান্নায় হাতেখড়ি বীথির, কিন্তু সত্যিকার রান্না কাকে বলে বড়মাসির কাছে শিখেছিল। মাসি সবচেয়ে যেটা ভাল জানত, কার সঙ্গে কী ভাল যায়। রুই মাছের ঝোলে গাঠিকচু যোগ করলে ঝোলটা যে সত্যিই উতরোয় মাসি না দেখিয়ে দিলে জানতে পারত না। সর্ষে দিয়ে কচুবাটা, পেঁয়াজকলি দিয়ে ট্যাংরা মাছ এমন অনেক প্রিপারেশন হাতে ধরে শিখিয়েছিল মাসি। ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক এমনই একটা রান্না, যা অক্ষরও তারিয়ে তারিয়ে খায়।

অক্ষরকে ভাল করে খেতে দেখলে বীথির আনন্দ হয়। হস্টেলের গল্প শুনেছে বীথি অক্ষরের মুখেই। ভাতের মধ্যে মরা আরশোলা দেখতে পেলেও চুপচাপ খেয়ে উঠে আসাটাই ছিল রীতি। মেসবিল মিটিয়ে এমন কিছু টাকা হাতে থাকত না যা দিয়ে বাইরে ভাল-মন্দ খাওয়া যায়। সেই মানুষটাকে বসিয়ে খাওয়াতে পারলে বীথির মনে পুণ্য-অর্জনের আনন্দ হয়। মানুষটা পেটুক নয়। খেতেও পারে না বেশি। কিন্তু ভাল জিনিস রেঁধে খাওয়ালে তরিবত করে খায়।

মুখোমুখি বসে অক্ষরের খাওয়া দেখছিল বীথি। খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে কচুর শাকটা?"

"ভাল। দেখলে না কেমন চেটেপুটে খেলাম।"

"দেখলাম বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।"

"আচ্ছা, অনেকদিন চালতার অম্বল খাই না। বানাবে একদিন? চালতার অম্বল, ভেতরে চাকা চাকা করে মুলো। আমরা ছোটবেলায় বলতাম টাকার অম্বল।"

"চালতা? চালতার তো এখন সিজ়ন নয়। তাও দেখব খুঁজে। মুলো অবশ্য খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।"

বুধ আর রবি, এই দুটো দিনই অক্ষর বাজার করে। অন্য দিনগুলোয় স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তার ধারের বাজার থেকে কেনাকাটা করে ফেরে বীথি। যা হাতের কাছে পায়।

টেবিল পরিষ্কার করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বীথি। ছোট থেকেই বাজার করে অক্ষর। চালতার যে এটা সিজ়ন নয় অক্ষরের সেটা জানার কথা। অক্ষর কি সব ভুলে যাচ্ছে?

তবে নিজে যেচে খেতে চাইল তাতেই মনটা ভাল হয়ে গেল বীথির। মানুষটার চাহিদা ভীষণ কম। নতুন জামাকাপড়, তাও কিনে হাতে দিলে তবে পরবে। শখ করে নিজের জন্য কিছু কেনা, বিয়ে হওয়া ইস্তক কোনওদিন অক্ষরকে করতে দেখেনি বীথি।

তবে কিছুদিন হল একটু খাই-খাই হয়েছে মানুষটার। ভাল-মন্দ খেতে আবদার করে। চিংড়ির মালাইকারি খেতে চেয়েছিল ক'দিন আগে। খাইয়েছিল বীথি। কিন্তু এটাও কি পরিবর্তন নয়? যে মানুষটা সকালে কী দিয়ে ভাত খেয়েছিল জিজ্ঞেস করলে মনে করতে পারত না, সে হঠাৎ এটা-সেটা খাবার বায়না করছে মেনে নিতেও যেন কেমন লাগে। শুনেছে বুড়ো হলে নাকি মানুষের নোলা বাড়ে। অক্ষরও কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

খেয়ে উঠে টিভি চালিয়ে খবরের হেডলাইন দেখা অক্ষরের বরাবরের অভ্যাস। বাংলা-ইংরেজি, দেশি-বিদেশি অনেকগুলো চ্যানেল। সকালে কাগজটা ভাল করে পড়ার সময় পায় না। এইসময় আর একবার চোখ বুলোয়। কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ে। বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারে না। রান্নাঘরের কাজ গুছিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে বেশির ভাগ দিনই বীথি দেখে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে অক্ষর।

আজ দেখল অক্ষর জেগে।

বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হল বীথি। পোশাক বদলাল। তারপর ঘরে ঢুকে বিছানার পায়ের কাছে বসল। ঠোঁটের কোণে হাসি।

মুখের সামনে থেকে কাগজ নামাল অক্ষর, "হাসছ যে?"

"ঘুমিয়ে পড়োনি দেখলাম, তাই হাসলাম।"

"আজকাল তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না, জানো? আগে চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। আজকাল ঘুমের সাধনা করতে হয়। কত রাত এ পাশ-ও পাশ করেই কেটে যায়। ঘুম যেন আমাকে ত্যাগ করেছে।"

বীথি জানে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখেছে অক্ষর বিছানায় নেই। জানলার সামনে বসে একা একা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাচতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে ঘুমের ওষুধের ফ্ল্যাপও দেখতে পেয়েছে মাঝেমাঝে।

বীথি দেখল, এটাই সুযোগ কথা শুরু করার। বলল, "আমারও তো সেটাই প্রশ্ন। কী হয়েছে তোমার?"

চোখে ছায়া পড়ল অক্ষরের, "কী হয়েছে মানে?"

"এই যে, আগে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়তে। আজকাল

সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। ঘুমের ওষুধও খেতে হয়। কিছু হয়েছে? কলেজে কোনও সমস্যা?"

পাশ ফিরে শুল অক্ষর।

"না। সমস্যা আর কী?"

"কিছু তো নিশ্চয়ই হয়েছে। আমাকে বলো কী হয়েছে। বলে ফেললে দেখবে হালকা লাগবে।"

"বললাম তো কিছু হয়নি।"

অক্ষরের গলায় বিরক্তি। তবু গায়ে মাখল না বীথি। আজ ঠিকই করে এসেছে, অক্ষর ভেঙে না বলা পর্যন্ত ছাড়বে না।

"কিছুই হয়নি? তাহলে কী ভাবো দিনরাত?"

"ভাবি? কোথায় ভাবতে দেখলে?"

"দেখলাম বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।"

"ভাবনা কি একটা? টাপুর সবে কলেজে ঢুকল। ডাক্তারদের এস্টাব্লিশড হতে বহু বছর লেগে যায়। টুপুরটা বড্ড ছোট। আমারও তো পঞ্চাশ হতে চলল। মানুষের জীবন... কখন কী ঘটে কিছু কি বলা যায়?"

"রাখো তো ওসব ছাইপাঁশ চিন্তা। তাছাড়া আমি তো আছি। আমারও একটা চাকরি আছে। উল্টোপাল্টা না ভেবে, চলো ক'টা দিন কোথাও ঘুরে আসি। কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না বলো তো? মনে আছে? আগে ছুটিছাটা পেলেই প্যাকিং করতে বসতাম। হুটহাট বেরিয়ে পড়তাম সকলে মিলে। সেই দিনগুলো ফিরে পেতে খুব ইচ্ছে করে।"

জবাব না দিয়ে আলো থেকে চোখ আড়াল করল অক্ষর।

"কী হল? আলোটা চোখে লাগছে? নিভিয়ে দেব?"

"ছোট আলোটা জ্বেলে দাও।"

উঠে গিয়ে সুইচ অফ করে দিল বীথি। মাথা গলিয়ে নাইটিটা খুলে ফেলল। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় এসে অক্ষরের পাশে শুয়ে অক্ষরকে জড়িয়ে ধরল।

"কী ব্যাপার?"

"ব্যাপার আবার কী? কতদিন আমরা ইন্টিমেট হই না বলো তো? আজ ওরা কেউ নেই। এটাই সুযোগ।"

অক্ষর কিছু বলছে না দেখে ওকে কাছে টানল বীথি। মাথার চুলে বিলি কেটে দিল। গালে গাল ঘষল। চোখের পাতায় চুমু খেল।

অক্ষর তেমনই পড়ে রইল: শীতল, শুকনো, উদাসীন।

যা-যা করলে অক্ষর উত্তেজিত হয়, অন্তত এতদিন তেমনটাই দেখে এসেছে, তার কোনওটাই বীথি বাদ রাখল না। গোড়াতে অক্ষর সাড়া না দিলেও, বীথির আগ্রহ দেখে সে-ও একসময় চেষ্টা করল নিজেকে প্রস্তুত করতে।

অথচ সব কিছুর পরেও অক্ষরের পুরুষত্ব মরা ইঁদুরের মতো লেপটে রইল তার শরীরে।

সমস্ত বিফল হলে বীথির দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় অক্ষর বলল, "কী করব? আমি যে পারছি না!"

"কেন পারছ না? কেন কেন?"

এতদিন একটা কান্না বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল বীথি। আর পারল না। বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে থাকল, "কী হল তোমার? কেন এমন হল?"

হাহাকারের মতো অক্ষর বলে চলল, "জানি না, জানি না, জানি না।"

১৪

কিছু-কিছু মানুষ আছে যারা তাদের বিশ্বাস সবার সামনে বের করে দেখাতে পছন্দ করে না।

আবার এমন মানুষও আছে, বলা উচিত তাদের সংখ্যাই ক্রমবর্ধমান, যারা ধর্মবিশ্বাস বিদেশি গাড়ির মতো ডিসপ্লে করতে ভালবাসে। গিরিশ ভুজিয়াওয়ালা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন।

আলাপটা ট্রেনেই। প্রথম থেকেই অক্ষরকে "ভাইয়া" বলে ডাকতে শুরু করলেন গিরিশ। এবং স্বার্থ যে ছিল সেটা গোপনও করেননি গিরিশ। অক্ষরের জুটেছে লোয়ার বার্থ। থ্রি-টিয়ার কম্পার্টমেন্টের অক্ষরের দিকের মিডল আর আপার বার্থ বরাদ্দ গিরিশ আর তাঁর মেয়ের। গিরিশের নাতনিটি খুবই ছোট। তার আলাদা বার্থ-এর প্রয়োজন নেই, মায়ের সঙ্গে শোবে। ভদ্রভাবেই গিরিশ অক্ষরকে অনুরোধ করেছেন, মেহেরবানি করে সে যদি ওপরের বার্থ-এ চলে যায় তাহলে বাচ্চা নিয়ে মেয়ে নীচের বার্থ-এ শুতে পারে। বলামাত্র ওপরে শিফ্ট করে গিয়েছিল অক্ষর।

আসলে এটুকুও অক্ষরের জোটার কথা নয়। রিজ়ার্ভেশন ছিল না। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছিল ট্রেন ছাড়ার মুখে। ট্রেন আওয়াজ করে নড়ে উঠতে সামনে যে-কম্পার্টমেন্ট পড়েছিল সেখানেই উঠে গেটের মুখে দাঁড়ানো টিটিই-কে অনুরোধ করেছিল খালি বার্থ থাকলে তাকে যেন দেওয়া হয়। চোখের ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন টিটিই।

সকলের চেকিং শেষ করে অক্ষরের কাছে এসেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর এই খালি বার্থটা দেখিয়ে রশিদ কেটে টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অক্ষর মিলিয়ে দেখেছিল যতটুকু নেবার কথা তার চেয়ে এক টাকাও বেশি চার্জ করেননি টিটিই।

উল্টো দিকের বার্থ-এ কাত হয়ে শুয়ে একজন সবটাই লক্ষ করছিলেন। টিটিই চলে গেলে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কত নিল?"

অক্ষর রশিদ দেখে টাকার অঙ্কটা বলতে যাচ্ছে, থামিয়ে দিলেন সহযাত্রী।

"না, মানে টিটিই-র পকেটে কত টাকা গেল?"

"এক টাকাও না।"

উত্তর শুনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। একবিংশ শতাব্দর ভারতে টিটিই বার্থ অ্যালট করে ঘুষ নেবে এ তো জানা কথা। কিন্তু ঘুষ দিয়েও যে কেউ ভর সন্ধেয় মিথ্যে বলতে পারে এতটা বোধহয় উনি নিতে পারলেন না।

পরে টিটিই-র বুকে সাঁটানো নেমপ্লেটটায় চোখ বুলিয়েছিল অক্ষর: এস. রাও। অক্ষরের মনে হয়েছিল, ট্রেনটা যে চলছে, উল্টে পড়ে যাচ্ছে না, তার কারণ নিশ্চয়ই এটা। চাকাগুলোর কিছু অন্তত সত্যিকার লোহা দিয়েই তৈরি।

লোয়ার বার্থ খালি পেতেই ঝটপট বিছানা পেতে ফেললেন গিরিশ। যেন ফেলে রাখলে কেউ দখল করে নেবে। মেয়ে তার শিশুসন্তানকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গিরিশ পড়লেন মিডল বার্থ নিয়ে। সেখানে সসিংহাসন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। একবার উঁকি মেরে ঠাকুর দর্শন করল অক্ষর। দেবীমূর্তি। চেনা লাগল না। ঠাকুরের পায়ে ফুল, সামনে গুজিয়া ধরে শর্টকাটে পুজো সেরে ঠাকুরকে তোরঙ্গে ঢুকিয়ে অক্ষরের দিকে তাকালেন। অক্ষর হাত পাতল। হাতে একটা ফুল আর দু'খানা গুজিয়া ধরিয়ে দিয়ে গিরিশ নিজেই অক্ষরের হাতটা তার মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন। তারপর নাতনি ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে মেয়ের হাতে ফুল-প্রসাদ দিয়ে তবে নিজে প্রসাদ মুখে তুললেন।

চমৎকার গুজিয়া। খেতে-খেতে ছোটবেলার কথা ভাবছিল। অক্ষরদের ছোটবেলাতেও মরসুমি ঠাকুরদেবতার আনাগোনা ছিল। বাড়িতে নিত্যপূজা তো ছিলই। স্কুলে সরস্বতীপুজো হত। পুজোর প্রসাদ, পরের দিন খিচুড়ি-লাবড়া, ওগুলোই ছিল সরস্বতীপুজোর আকর্ষণ। দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরনো হত। বাবা চলে যাবার পর পুজোর রোশনাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াত মা। তা দেখে অক্ষরদেরও কষ্ট হত। তখন তো খানিকটা বড় হয়েছে। বুঝতে

অসুবিধা হত না।

ঠাকুরদেবতারা আসতেন-যেতেন। মা দুর্গার স্টে পাঁচদিন এক্সটেন্ড করত। মা সরস্বতী খাওয়াদাওয়া মিলিয়ে তিনদিন। বাকিরা সবাই দিনের অতিথি। ফলে মনের ইচ্ছা, বিশেষ করে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে সারা বছর যে দেবতার শরণাপন্ন হওয়া যেত তিনি মা কালী। কালীঠাকুরই সবচেয়ে কাছের দেবতা ছিলেন। স্কুলে যাবার রাস্তাতেই পড়ত কালীতলা। টুক করে প্রণামটা সেরে নেওয়া যেত। সঙ্গে যোগ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বামাখ্যাপা ইত্যাদি সাধকপুরুষের নামে জড়িয়ে থাকা হাজারটা মিথ। সব মিলিয়ে ছোটবেলার বেশির ভাগটাই মা কালীর ছত্রচ্ছায়ায় কেটে গেছে।

বড় হয়ে? অক্ষর যখন নিজের সংসার গুছিয়ে বসল? কলকাতার বাড়ি?

বীথির একটা ঠাকুরঘর আছে। সেখানে পৃথিবীসুদ্ধ ঠাকুরদেবতার বসবাস। উঁকি মেরে দেখেছে, স্নেহময় যিশুও সেখানে বিরাজ করেন।

আর অক্ষর?

এই প্রশ্নটা নিজেকে বারবার করেছে। বিশেষ করে বিগত কয়েকটা মাস। জ্যোতিষী যেদিন থেকে তার বেঁচে থাকার দিন দাগ কেটে দিয়েছেন। সে কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকেই থাকে, কেন সে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াচ্ছে না? বলছে না, ঠাকুর রক্ষা করো?

জ্যোতিষীরা খারাপ ভবিষ্যতের কথা উচ্চারণের পাশাপাশি তাবিজ-কবচ-রত্ন ধারণের কথা বলে থাকেন। সেদিকে অক্ষর এগোয়নি। কিন্তু ঠাকুরদেবতা? তাঁদের তো স্মরণ করতে পারত।

আসলে ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার আবদার নিয়ে ঠাকুরের কাছে যেতে অক্ষরের সঙ্কোচ হয়। মনে হয় তাতে যেন ঠাকুরকে ছোট করা হবে। একজন ব্যস্ত মানুষ, যিনি পৃথিবীর মঙ্গল নিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁর কাছে ছোটখাটো বাসনা কামনা প্রকাশ করবে?

কিন্তু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী তো ছোটখাটো নয়। অক্ষরের জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে একটা ঘোষণা। অক্ষর বিশ্বাস করেছে তা নয়। আবার ফেলে দিতে যে পারেনি তার প্রমাণ বিগত কয়েকটা মাস। এই সময়ে অক্ষর তো স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরের শরণ নিতে পারত। প্রার্থনায় প্রার্থনায় ঈশ্বরকে ভিজিয়ে ফেলতে পারত। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী যাতে না ফলে তার ব্যবস্থা করতে পারত।

করেনি তো!

তাহলে অক্ষর কি নাস্তিক?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি তার জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে?

অক্ষর জানে না।

মানুষ অনেক কিছুই করে যার ব্যাখ্যা তার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। এই একটা জায়গায় অনেক ভেবেও অক্ষর কূল পায়নি।

দীপ্ত ফাঁকা ছিল। তাড়াতাড়িই ডেকে নিল অক্ষরকে। ঢুকতেই হেসে বলল, “আয়। খবর সব ঠিকঠাক তো?”

চেয়ারে বসতে বসতে অক্ষর জিজ্ঞেস করল, “কিছু হল সেই কেসটার?”

“কোন কেস বল তো,” জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে দীপ্ত জানতে চাইল।

“সেই যে আগের দিন, মা-ছেলেতে মিলে কী হম্বিতম্বি, আমি তো ভয়ে কাঁটা, ভাবলাম মারধর না করে বসে... কোনও ফলোআপ?”

“মনে পড়ছে না রে। দিনরাত এত হম্বিতম্বি আর খারাপ খারাপ কথা শুনতে হয় যে পরের গালাগালিগুলো আগের গালাগালকে ভুলিয়ে দেয়। আসল কথা কী জানিস, যারা মুখে তড়পায় তারা বরং ভাল। বিপজ্জনক তারাই যারা চুপচাপ কেস ঠুকে অপেক্ষা করে।”

“তোরও হয়েছে?”

“গাদাগাদা। আর হিসাব রাখি না। ... চা খাবি?”

“না। তুই খেলে খেতে পারিস।”

চা আনতে বলে অক্ষরের দিকে ঘুরল দীপ্ত, “স্কুলে মনে আছে, কোনও কোনও মাস্টারমশাইয়ের ছিল চণ্ডরাগ। মেরে তক্তা করে দিতেন!”

“মনে আবার নেই? কত খেয়েছি মার!”

“ওইসব মাস্টারমশাইই ভাল ছিলেন। মাথায় রাগ চড়ল, মেরে হাতের সুখ করে নিলেন, রাগও পড়ে গেল। কিন্তু আর এক শ্রেণির মাস্টারমশাই ছিলেন, মারতেন না, কিন্তু রাগ পুষে রাখতেন। পরীক্ষার খাতায় শোধ তুলতেন। এমন কম নম্বর দিয়ে রাখতেন, মাথা তোলার জো থাকত না। জিতেনবাবু ছিলেন এমন একজন।”

“জিতেনবাবু মারা গেছেন, খবর পেয়েছিস?”

“না রে! যোগাযোগ নেই তেমন। ...বল, আজ এমনিই এসেছিস, না কোনও খবর মুখে করে?”

“একটা ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কলেজে। ভাবলাম তোকে জিজ্ঞেস করি। সত্যিই এমন হয় কি না!”

“বলে ফেল।”

“আমাদেরই এক কলিগ, বয়সে আমাদের চেয়ে অনেকটাই ছোট, একটি মেয়েকে বাড়ি গিয়ে পড়াত। মেয়েটা কনসিভ করে যায়। এখন অ্যাডভান্সড স্টেজ। অ্যাবরশনও নাকি সম্ভব নয়।”

“বিয়ে দিয়ে দে। গ্রামে তো এমন আকছারই হয়।”

“সেটাই সমস্যা। ছেলেটি বিবাহিত।”

“কেলোর কীর্তি! তারপর?”

“থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, এনকোয়ারি। কিন্তু সব কিছুতে জল ঢেলে দিল ছেলেটির স্ত্রী।”

“ছেলেটি মানে লোকটি? সেই অধ্যাপক?”

“হ্যাঁ। তার স্ত্রী স্টেটমেন্ট দিল, তার হাজ়ব্যান্ড ইমপোটেন্ট। মানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সহবাস, এইসবে সে নাকি অক্ষম। আটবছর বিয়ে হয়েছে। এক দিনের জন্যও তারা নাকি ফিজ়িকালি ইন্টিমেট হয়নি। এমনও কি হয়?”

চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল দীপ্ত। সিগারেটটা দেখিয়ে বলল, “নিজের ক্ষতি নিজেই করছি। ... কী যেন বলছিলি, এমন হয় কিনা? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, হয়। আমাদের ফরেনসিক মেডিসিনে পড়তেও হয়। একজনের কাছে ইমপোটেন্ট, তার অর্থ এই নয় যে অন্য কারও কাছেও তাকে ইমপোটেন্ট হতে হবে।”

“তা আবার হয় নাকি?”

“বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোদের ওই সহকর্মীর স্ত্রী তার স্বামী সম্বন্ধে যা বলেছেন, ডাক্তারি পরিভাষায় তাকে বলা হয় ইরেকটাইল ডিসফাংশন, সংক্ষেপে ইডি। এই ইডি-র একটা লার্জ পারসেন্টেজ কিন্তু ফাংশনাল, মানে মানসিক। ‘আমি পারব না’, এই ভয় থেকে সত্যিই সে পারে না। খেয়াল করলে দেখবি, অনেক সাধুসন্ন্যাসীই বিয়ের পর প্রথম রাত স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে তার পরই সংসার পরিত্যাগ করেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক রাতেই তাঁর উপলব্ধি হয়, কনজুগাল রিলেশনে তিনি অক্ষম। অতএব কাজ কি আর একটা মানুষের জীবন নষ্ট করে? মজার কথা কী জানিস, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে অন্য মহিলার সঙ্গে দিব্যি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন। তাঁদের নিয়ে কাগজপত্রে লেখালিখি হয়, সন্ন্যাসীসমাজ সম্পর্কেই মানুষের মনে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। মানুষ সত্যি-সন্ন্যাসী আর মিথ্যে-সন্ন্যাসী গুলিয়ে ফেলে।”

ঘড়ি দেখল দীপ্ত, “একটা কল আছে রে! এবার আমার না উঠলেই নয়।”

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম আসার আগে দীপ্তর কথাগুলোই মনে পড়ছিল অক্ষরের।

তাহলে এটা অসম্ভব নয়?

সুস্মিতা ঘোষালের সঙ্গে অক্ষর যা পারে, বীথির সঙ্গে যে পারে না, তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাহলে আছে।

ট্রেনে ঘুম আসে তাড়াতাড়ি। আর ঘুম ভাঙে তার চেয়েও আগে।

আলো ফোটার আগেই শুরু হয়ে যায় হকারদের হাঁক-ডাক। শুরু 'চায়' দিয়ে। শুধু 'চায়' আর কার পছন্দ? অতএব চা-এর সঙ্গে শিঙাড়া থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত খাবারের জোগান। আর পেটে চা-শিঙাড়া পড়ল কী ডাক পড়ল প্রকৃতির। তখন বাথরুমে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি। এ দিকে বুদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরা এর মধ্যেই যথাস্থানে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। লাইন উপচে এসেছে ভেতর অবধি। বাথরুমে ঢুকে যেসব ব্যক্তি অধিক সময় নষ্ট করছেন তাঁদের জন্য দরজা-ধাক্কানো হাঁকাহাঁকি তো আছেই।

সুতরাং ট্রেনে উঠেছ, অথচ ভোরের ঘুম বন্ধক রেখে আসনি, এমন সম্ভাবনা আকাশকুসুম।

গিরিশজি আগেই উঠে পড়েছেন। শুধু প্রাতঃকৃত্য নয়, স্নানও সেরে নিয়েছেন গিরিশ। কানের পেছন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে ভিজে চুল বেয়ে।

ট্রেনে উঠে গিরিশকে নিঃসঙ্গ ভেবেছিল অক্ষর। ভুল ভাঙল যখন দেখল বেশ কিছু হকার ফুল-বেলপাতা বিক্রি করছে। চাহিদা নিশ্চয়ই আছে; নইলে জোগানের বন্দোবস্ত থাকবে কেন? তার মানে গিরিশের মতো আরও অনেক যাত্রীই কম্পার্টমেন্টে আছেন যাঁদের জন্য, বলা ভাল তাঁদের সঙ্গী ঠাকুরদেবতাদের জন্য, পুষ্প-বিল্বপত্রাদির অঢেল আয়োজন। সকালের পুজোটা রাতের মতো শর্টকাটে হল না। গুছিয়ে পুজো করে গিরিশ আবার প্রসাদ অফার করলেন। মুখ ধোয়া হয়নি অজুহাত দেখিয়ে এ-যাত্রা পার পেয়ে গেল অক্ষর।

অক্ষর ভাবছিল।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই নজর পড়েছে।

ছোট চিরকুটখানা টেবিলের ওপরেই ছিল, "চললাম। খোঁজ কোরো না। ড্রআরে ফোনটা রইল।"

ফোনের কথাটা বলার উদ্দেশ্য ছিল। সেলফোন চাপা দেওয়া সমস্ত ইনস্ট্রাকশন রাখা, টাকাপয়সা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট এলআইসি কোথায় কী আছে। ফোন তুললেই চোখে পড়বে। একটা মুখবন্ধ খামে কয়েকটা চেকও সই করে ঢুকিয়ে রেখেছে, যাতে টাকার অ্যামাউন্ট বসিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিলে টাকা তুলতে অসুবিধা না হয়।

ওইটুকুই। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কবে ফিরবে, সেসব নিয়ে একটা শব্দও লেখা ছিল না।

বীথি কি দেখিয়েছে কারোকে? বীথির এক মাসতুতো দাদা উকিল। তাঁর সঙ্গে কি পরামর্শ করেছে?

গিরিশের নাতনিটার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই কান্না জুড়ল বাচ্চাটা। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাচ্চার মা। খাবার মুখে গুঁজে দিতেই কান্না থামল। চোখ বন্ধ করে আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল শিশু।

দেখতে দেখতে অন্য রকম অনুভূতি হল অক্ষরের। টুপুরও একদিন মা হবে। তারও কোলজুড়ে আসবে অমনই এক শিশু। সে যখন বড় হবে, বুঝতে শিখবে, অক্ষরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইবে মানুষটা কে, কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে টুপুর? কেমন বাবা ছিল অক্ষর? একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ, যে স্ত্রী-সন্তান ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল? নাকি এক স্নেহময় পিতা যে তার মৃত্যু সন্তানদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিল?

১৫

মাঝেমাঝেই দেখা হয় এক দম্পতির সঙ্গে। হয় অক্ষর উঠছে, ওঁরা নেমে আসছেন। অথবা অক্ষর নামছে, ওঁরা তখনও চূড়া অবধি পৌঁছতে পারেননি।

সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত।

সিনেমা-থিয়েটার, গানবাজনার আসর, কিছুই নয়। এনটারটেনমেন্ট বলতে একখানাই: দর্শন। দিনমণির আবির্ভাব আর প্রস্থান। তাই দেখতেই লোক জড়ো হয়। লোক মানে অবশ্য স্থানীয় কেউ নয়— যারা অল্প সময়ের অতিথি সেইসব মানুষ।

স্থানীয়রা কেন আসে না?

উত্তর পেতে অক্ষরকে কষ্ট করতে হয় না। যে মফস্সল শহরে অক্ষরের বড় হওয়া সেখানে অবারিত সূর্য-সান্নিধ্য ছিল। তথাপি তার আসা অথবা যাওয়া যে দেখবার মতো কিছু, কখনও মনে হয়নি। সূর্য উঠবে অস্ত যাবে। বসন্তে পাতা ঝরবে, সেখানে ঝলমল করবে শিমুল ফুল। শরতে নীল টোপর পরে অহঙ্কারে ডগমগ করবে জারুল গাছ। এসবই খাওয়া শোয়া দাঁত-মাজার মতো দৈনন্দিনতায় মিশে ছিল।

কলকাতার জীবনে কর্মব্যস্ততার ফাঁক গলে সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদির উঁকি দেওয়াও ছিল নিষিদ্ধ। যদি বা সূর্যের দিকে চোখ গেল, ধুলো-রঙা আকাশে কোথায় যে তার অবস্থান সেটা ছিল দস্তুর মতো গবেষণার বিষয়।

এখানে সমস্ত হিসাব উল্টে গেল। সারাটা রাত জীবন যেন থমকে থাকে। সূর্যের প্রথম কিরণ থেমে-থাকা জীবনে গতির সঞ্চার করে। সারাটা দিন জীবন গড়াতে থাকে। সূর্যাস্ত। জীবনেরও থেমে যাওয়া। আবার প্রতীক্ষা: পরবর্তী সূর্যোদয়টির জন্য।

ক্যালেন্ডারে যেমন বিশেষ কয়েকটা দিন লাল কালিতে দাগানো, জায়গারও বিশেষ-নির্বিশেষ আছে। তীর্থস্থানই হোক কিংবা ভ্রমণক্ষেত্র, কোনও-কোনও জায়গার কপালে লাল তিলক জুটে যায়। মুখে-মুখে তাদের প্রসিদ্ধি ছড়াতে থাকে। মানুষ আসে। অনেকেই দর্শন শেষ হলে ফিরে যায়। কেউ কেউ ফেরে না। তৈরি হয় বাড়ি-ঘর, ধর্মশালা। আরও পরে হোটেল-রিসর্ট। সভ্যতার প্রয়োজন স্থানটিকে সড়কপথ রেলপথ-এর সঙ্গে যুক্ত করে। অনাবিল সৌন্দর্যকে সরিয়ে সভ্যতার ক্লেদ একটু একটু করে জনপদটির গায়ে জমতে থাকে।

অক্ষর যাত্রা শুরু করেছিল তেমনই একটি গন্তব্যকে উদ্দেশ করে। এমন একটি স্থান, যাকে সবাই এক ডাকে চেনে। নাম বললেই চোখে পরিচিতির ছায়া পড়ে। কেউ কেউ ঘাড় নাড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ, আমার জায়ের মাসি তো ওখানে এক মাস থেকেও এসেছিল। চমৎকার জায়গা।"

বাস চলছিল দুলকি চালে। জানলার পাশে সিট পেয়েছিল। দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল অক্ষর। সভ্যতার শেষ আঁচও যেন মুছে যাচ্ছিল ফেলে আসা অতীতের মতো।

চলার পথে বাস থেমেছিল এইখানে। অন্য সহযাত্রীদের মতো অক্ষরও নেমেছিল বাস থেকে। আর নেমেই মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে আবার বাসের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

বিকেল হয়ে আসছে। পাহাড়ের খাঁজে, গাছের মাথায়, জড়ো হচ্ছে কুয়াশা। আর কুয়াশার সঙ্গে মিশে হিমেল হাওয়া যেন দূরের বরফ-ঢাকা গিরিশৃঙ্গ থেকে তীব্র বেগে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল অক্ষরদের।

অন্যদের মতো অক্ষরও বাধ্য হল রাস্তার ধারের সবেধন দোকান থেকে এক গ্লাস আতপ্ত চা চেয়ে নিয়ে ঠোঁট ডোবাতে। আর তখনই চোখ গেল নদীর ওপারে।

রাস্তার ধার থেকে খাড়া নেমে গিয়েছে খাদ। খাদ পার হয়ে খানিকদূর এগিয়ে গেলেই নদী। নদী পার হলে উপত্যকা। তারপর আবার পাহাড়। আর সেখানেই অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

একটি পুরনো ও অভ্যস্ত প্রক্রিয়া। অথচ চোখ আটকিয়ে গিয়েছিল অক্ষরের। কন্ডাক্টর যখন হাঁক পেড়ে সবাইকে বাসে উঠতে বলেছিল, অক্ষরও উঠেছিল। তারপর নিজের পোঁটলাখানা বগলদাবা করে নেমে

এসেছিল।

কন্ডাক্টর অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, অক্ষর আর যাবে না? ঘাড় নেড়েছিল অক্ষর।

ধুলো উড়িয়ে বাস যখন চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল পায়ে পায়ে দোকানে গিয়ে বসেছিল অক্ষর। দোকানি এতক্ষণ সবই লক্ষ করছিল। একটাই প্রশ্ন করেছিল দোকানি, "থক গয়ে?" ঘাড় নেড়েছিল অক্ষর। এবার হ্যাঁ বলার জন্য।

শেষ খদ্দেরটিও যখন বিদায় নিল অক্ষর জানতে চেয়েছিল এখানে থাকার কোনও বন্দোবস্ত হতে পারে কিনা। মুখে জবাব দেয়নি, ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলেছিল দোকানি। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছিল খানিকটা নীচে। তারপর নিঃসঙ্গ একটি কাঠের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কাঠের দরজা, টানলেই খুলে যায়। ভেতরে একখানা কাঠের চৌকি, তার ওপর শতরঞ্চি বিছানো। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে দোকানি জিজ্ঞেস করেছিল, "চলেগা?"

মুখে হাসি এনে অক্ষর বলেছিল, "বহুৎ আচ্ছা। বড়িয়া।"

সেই থেকে এটাই অক্ষরের আস্তানা। চুলদাড়ি কাটার বাহুল্য বর্জন করেছে। দাঁত-মাজা আর স্নান করার বিলাসিতাটুকু ছাড়তে পারেনি।

সূর্য ওঠার আগেই নদীর ধারে নেমে যায়। ঘরে ফিরে পোশাক পাল্টে দৌড়য় পাহাড়চূড়ার উদ্দেশে। কোনওদিন অক্ষর আগে পৌঁছয়। কোনওদিন সূর্য তার আগেই মুখ দেখায়। সূর্যালোকে পৃথিবীর জেগে ওঠার দৃশ্য প্রাণভরে দেখে চায়ের দোকানে নেমে আসে অক্ষর। ধূমায়িত চায়ের গ্লাস নিয়ে দোকানি তার জন্যই অপেক্ষা করে। ব্রেকফাস্ট ওখানেই সেরে নেয়। ঘরে ফিরে খানিকক্ষণ রৌদ্রস্নান। রোদ চড়লে নদীতে নেমে বাসি জামাকাপড় কেচে মেলে দেয়। হাওয়ায় শুকিয়ে সেগুলো নিয়ে ঘরে ফেরে। এবার লাঞ্চ। আবার দোকান। দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত কিঞ্চিৎ তেজি। রুটির সঙ্গে ডাল, সবজি।

লাঞ্চ সেরে দুপুরে আর ঘরে ফেরে না। বাস আসে, থামে। লোকজন নামে। পাখির মতো তারা ঠোঁটে করে নিয়ে আসে সভ্যতার খবর। অক্ষর শোনে। অক্ষরকেও তারা দেখতে থাকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। নাগরিক মানুষ বিস্ময় গোপন করতে জানে। দেহাতি মানুষ জিজ্ঞেস না করে পারে না, কে অক্ষর। কী তার পরিচয়? জানতে চায়, কোথায় থাকা হয়? "এখানেই" শুনে বিস্ময় আর গোপন করতে পারে না। বাকিটুকু জেনে নেবার আগেই বাসের হর্ন ঘনঘন বেজে ওঠে। কন্ডাক্টরের হাঁকাহাঁকি। গ্লাসের নীচে তলানি চায়ের মতো প্রশ্নের শেষটুকু দোকানে ফেলে রেখে মানুষগুলো বাসে ওঠে। যেতে যেতেও ঘাড় ঘুরিয়ে অক্ষরকে দেখতে থাকে।

সন্ধের মুখে ডিনার সেরে নেয় অক্ষর। এবার দোকানি তাকে সঙ্গ দেয়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জেনে নেয় অক্ষরের কোনও তকলিফ হচ্ছে কিনা। কোনও অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন জানানো হয় সেটাও মনে করিয়ে দেয়। তারপর অক্ষরকে একা ছেড়ে গাঁয়ের পথে নেমে যায়। অক্ষরও তার ফাইভ স্টার আবাসের দরজা খোলে।

অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই ঘুমিয়ে পড়ে অক্ষর। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার কারণও আছে। রাত গাঢ় হলে পাহাড়ের যে হিমেল হাওয়া এতক্ষণ গাছের নীচে আটকে ছিল সেটাই গড়িয়ে গড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামতে থাকে। অক্ষরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। সাড়া না পেয়ে দরজার ওপর-নীচের ফাঁক গলে, কাঠের জোড়ের ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে থাকে ঘরের ভেতর। ঘুম ভেঙে যায়। সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়েও খাটে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে অক্ষর।

বাকি রাতটুকু ওইভাবেই কাটিয়ে দেয়। আর অপেক্ষা করে। একসময় পুব আকাশ ফিকে হতে শুরু করে। প্রথম পাখিটি ডেকে ওঠে সন্তর্পণে। ঘুম ভেঙে উঠে দিবাকর আড়মোড়া ভাঙেন। গাছের ডালে জমে থাকা কুয়াশা গলতে থাকে। আর একটা দিনের জন্ম হয়।

এই সবই ভাবতে ভাবতে ওপর থেকে নামছিল, দেখা হয়ে গেল সেই দম্পতির সঙ্গে।

দেখতে দেখতে মুখ চেনা হয়ে গেছে। অক্ষর হাসল।

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আপনি কি বাঙালি?"

অক্ষর অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময় চেপে রেখে জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা? মানে এইখানে?"

"এক্সপেক্ট করেননি, তাই তো? আমার নাম বীণা, বীণা মুস্তাফি। খাস কলকাতার মেয়ে। হাতিবাগান। আর ইনি আমার স্বামী। ঋষি, ঋষি ভার্গব। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, উনি বাঙালি নন।"

ঋষি সামনে এলেন, "সে তো কবেকার কথা, বীণা। তোমার পাল্লায় পড়ে এখন আমি পুরোদস্তুর মাছের টক-খেকো বাঙালি।"

অক্ষরের বিস্ময় যাচ্ছিল না।

রহস্যটা ঋষিই পরিষ্কার করলেন।

"শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েই আমাদের আলাপ। আলাপ থেকে ইয়ে। তারপর যা হয়। আমাকে পুরোপুরি ব্যাপটাইজ় করে ফেলেছে বীণা। এখন আমি নিজেকে বাঙালি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না। ... আসুন না একদিন আমাদের ভদ্রাসনে। কথা দিচ্ছি, নিরাশ হবেন না।

অক্ষর দেখল দম্পতিটি কথা বলতে ভালবাসেন। তার সম্বন্ধে অযাচিত কৌতূহলও প্রকাশ করলেন না। কোথায় থাকেন, কীভাবে যেতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে চূড়ার দিকে এগোলেন। যাবার আগে বীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেলেন, "আমরা লেট। সানরাইজ় আজ আর দেখা হল না।"

কাঠের গেট। খুলে ঢুকলেই ঘাসের লন। মাঝখানে মোরাম-ফেলা পথ। দু'পাশে ফুলের বাগান। পথ যেখানে শেষ, পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে একটা কাঠের তৈরি বাংলো।

ঢুকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অক্ষর। যেন ক্যালেন্ডারের ছবি। হাত-ছোঁয়ানো বারণ।

গেটের আশেপাশে কোনও কলিং বেল দেখতে পায়নি। ভেতরেও তেমন কিছু নজরে পড়ল না। ডাকবে? ভাবছে, তার মধ্যেই বাংলোর দরজা খুলে উঁকি মারলেন বীণা।

"আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য!"

"সৌভাগ্য কেন?"

"আপনি আসবেন ভাবতে পারিনি।"

কথা বাড়াল না অক্ষর। কেন তার আসাটা প্রত্যাশার অতীত জানতে চাইলে, কিছু উত্তর তার দিক থেকেও প্রত্যাশিত থাকে। অক্ষর ঠিক করেই এসেছে, নিজের থেকে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে কোনও কথা সে বলবে না। আসলে এই কারণেই তার আসতে ক'টা দিন দেরি হয়ে গেল। হতে পারে তার দেরি হওয়া দেখেই বীণা ভেবেছেন সে আর আসবে না।

পা মুছে ড্রয়িংরুমে ঢুকে হকচকিয়ে গেল অক্ষর। দেওয়াল জোড়া ছবি আর ছবি। কোনও কোনওটা সত্যিই ক্যালেন্ডারে দেওয়ার মতো।

"কী দেখছেন?"

"বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল ক্যালেন্ডারের ছবি। ভেতরে এসেও সেই জিনিসই দেখব ভাবতে পারিনি।"

ভেতরের দরজা খুলে ঢুকলেন ঋষি।

"আপনার অবজ়ারভেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট। আমাদের বাড়ির সবটাই ক্যালেন্ডারের ছবি।"

বুঝতে না পেরে দু'জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, বীণা বললেন, "তুমি বুঝিয়ে দাও। আমি ততক্ষণে ওনার জন্য কিছু বানিয়ে আনি। ... চা না কফি?"

“কফি।”

ঋষি একটা তোয়ালেতে আঙুল মুছতে মুছতে বললেন, “কলাভবন থেকে বেরিয়ে আমরা দু’জনেই রিয়ালাইজ় করলাম, অবনীন্দ্রনাথ-রামকিঙ্কর-নন্দলাল হওয়ার প্রতিভা আমাদের নেই। অতএব চাকরির ধান্দা। দু’জনেরই কর্পোরেটে কাজ জুটে গেল। কাজের ধরণটা আলাদা। তবে খুব যে অমিল আছে তাও নয়। দু’ চারটে কোম্পানি বদলে বীণা যে কাজটা ধরল সেটা, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ক্যালেন্ডার বানানো। আমি অবশ্য পোস্টার তৈরিটা ছাড়িনি, কারণ ওটাতেই রোজগার বেশি। আমি ফ্রিল্যান্স কাজ ধরলাম। বীণারটা ফিক্সড স্যালারির কাজ।”

বীণা এসে বসলেন চেয়ারে।

“খিদে পেলে বলবেন। আজ কিন্তু আপনার লাঞ্চ আমাদের সঙ্গে।”

“আরে না না। আমার খাবার নষ্ট হবে।”

“নষ্ট কিছু নয়। পরে গরম করে খেয়ে নেবেন। আমাদের এখানে গেস্ট আসে হাতে গোনা। আর এলে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যায়।”

ঋষি ফেলে আসা কথাটার খেই ধরলেন, “চাকরি করতে করতে আর পরের বেগার খেটে একটা সময় রিয়ালাইজ় করলাম, যে-জামাটা এতদিন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেটা আসলে আমাদের নয়, অন্য কারও।”

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে অক্ষর তাকাল। ঋষি বীণার দিকে তাকিয়ে বললেন, “বাকিটা তুমি বলো।”

বীণা কোলের ওপর হাত জড়ো করে বসেছিলেন। হাত দু’খানা দু’পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, “বলবার আর কী আছে? মনে হল, যে জীবনটা এতগুলো বছর গাধার মতো বয়ে বেড়াচ্ছি, সে জীবন আমাদের নয়। এই জীবন আমরা চাইনি। পরিস্থিতির দায়ে মেনে নিতে
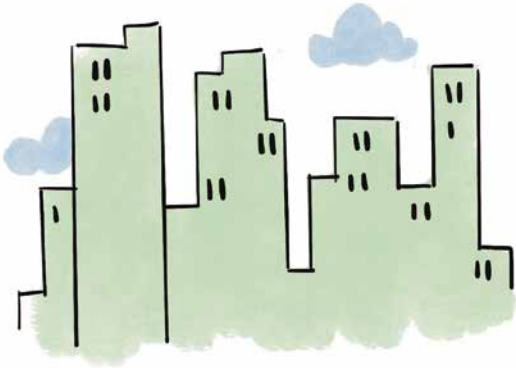
হয়েছে, কিন্তু আর মানব না। বেরিয়ে আসব।”

অবাক হয়ে যাচ্ছিল অক্ষর। এমন কিছু কথা সে শুনছে যেগুলো সে-ই এতদিন বলতে চেয়েছে। অথবা ভেতরে কথাগুলো বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গিয়েছে, অক্ষরই বেরিয়ে আসতে দেয়নি।

ঋষি ধরে নিলেন।

“এই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। এখানে জমির দাম সস্তা। অনেকখানি জমি কিনে থাকতে শুরু করলাম। সামনে ফুলের বাগান। পেছনে ফল আর সবজি চাষ করেছি। দু’জনেই হাত লাগাই। যা ফলে তা-ই রান্না হয়। খেয়ে দেখবেন, স্বাদই আলাদা। বিশ্বাস করবেন না, এই বাড়িরও সত্তর ভাগ আমাদের দু’জনের বানানো।”

“ছবি আঁকা? কাজ?”

“বন্ধ হয়নি। আজকাল এই একটা সুবিধা। দশটা-পাঁচটা অফিসে বসে না থেকেও কাজ করা যায়। যখন আমরা ডিসাইড করলাম এখানেই সেটল করব, একটাই কনসার্ন ছিল ইন্টারনেট কানেকশন আছে কিনা। পাহাড়ের ওপারে একটা আর্মি বেস আছে। ইলেকট্রনিক গুডস-এর কারখানাও তৈরি হচ্ছে কাছাকাছি। ন্যাচারালি ইন্টারনেট কানেকশন থাকাটা এখানে মাস্ট। বাকি রইল ল্যাপটপ আর স্টুডিয়ো। ল্যাপটপ আমাদের দু’জনেরই আছে। স্টুডিয়োটা শেয়ার করি।”

“বুঝতে পেরেছি। আমি যখন এলাম আপনি স্টুডিয়োতে।”

“এগজ্যাক্টলি। আর বীণা বাইরের দরজায় চোখ রেখে বসেছিল। কেউ এলে যাতে দরজা খুলে দেওয়া যায়।”

“একটা ডোরবেল থাকলেই তো হত। কাউকে ওই কাজে অকুপায়েড থাকতে হত না।”

হাসলেন ঋষি, “ডোরবেলের আওয়াজে বাগানের পাখিরা বিরক্ত হয়। ওরাই তো আসল মালিক। আমরা জোর করে ভাগ বসাতে এসেছি।”

বীণা উসখুস করছিলেন। সুযোগ পেয়ে বললেন, “চলুন, এবার খাওয়াদাওয়ার পাট মিটিয়ে ফেলা যাক।”

ঋষি ইন্টারাপ্ট করলেন, “তার আগে এক চক্কর কিচেনগার্ডেন ঘুরিয়ে আনি ওনাকে। আর সেখানেই মিট করতে পারবেন আমাদের ফ্যামিলির তিন নম্বর মেম্বারকে।”

বাড়ির পিছনে সবজিবাগান। পালংশাক থেকে কাঁচা লঙ্কা— কী নেই বাগানে? সত্যিই তাজ্জব হবার মতো বাগান।

ঋষি বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, “ইনসেক্টিসাইডের বালাই নেই। সারও হাতে তৈরি। মানুষ সবচেয়ে বড় ভুলটা কোথায় করেছে জানেন? এইসব ছেড়ে মাটিকে পিষে তা থেকে শেষ রস বের করার খেলায় মেতেছে। এ যেন সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের গল্প। একদিনে সব ক’টা ডিম বের করতে গিয়ে হাঁসটাকেই মেরে ফেলার কাহিনি।”

হঠাৎ বীণার গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

“রণ! ওটা কী করছ?”

বীণার দৃষ্টি অনুসরণ করে অক্ষর দেখল বাগানের একপাশে একটা টিনের পাতকে সোজা করার চেষ্টা করছে বছর দশেকের এক বালক। ঝাঁকড়া-চুল পাতলা-ঠোঁট আর মায়াবি দু’খানা চোখে যাকে দেবশিশু বলে ভুল হয়।

“রণ আমাদের একমাত্র সন্তান,” গলা নামিয়ে বললেন ঋষি, “স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পারফর্ম করতে পারত না। দেখানো হল। কাউনসেলিং। পরীক্ষানিরীক্ষা। কেউই ঠিকমতো রোগ ধরতে পারলেন না। এখানে এসে কিন্তু ও খুব ভাল আছে। আমাদের সঙ্গে বাগানের কাজে হাত লাগায়, ছবি আঁকে, মডেল বানায়। চমৎকার রান্না করতে শিখেছে। লেখাপড়াও করে, ইচ্ছেমতো।”

হাতের ধুলো ঝেড়ে মা’র দিকে তাকিয়ে রণ বলল, “এটা দিয়ে পাখির ঘর বানাব। ভাল হবে না মা?”

রণর চুলে বিলি কেটে বীণা বললেন, “খুব ভাল হবে। ওদেরও একটা থাকবার জায়গা হবে। শুধু ফাইনাল করার আগে আমাকে একটু দেখিয়ে নিয়ো।”

নিরামিষ রান্না। কিন্তু টাটকা সবজি আর পাকা হাতের ছোঁয়া দুইয়ে মিলে প্রত্যেকটা পদই অসম্ভব ভাল হয়েছিল। মন থেকেই প্রশংসা করল অক্ষর।

বীণা পরিবেশন করতে করতে বললেন, “এখানে কিন্তু মাছও পাওয়া যায়, নদীর মাছ। পরে যেদিন আসবেন, আগে খবর পেলে মাছ রান্না করে রাখব।”

“লোভ দেখাবেন না। তারপরে দেখবেন মাঝেমাঝেই হানা দিচ্ছি। তখন আপনাদেরই বিরক্ত লাগবে।”

“মোটেও না। কতদিন পর যে বাইরের কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারলাম! ভীষণ ভাল লাগছে। যখন ইচ্ছে চলে আসবেন। একটুও বিরক্ত হব না।”

“এখানে বাঙালি আর কেউ নেই?”

ঋষি জবাব দিলেন, "শুনেছি আছেন। এক সাধুবাবা। স্থানীয়রা বলে বাংগালি বাবাজি। নদী ধরে উত্তরে এগিয়ে গেলে আর একটা পাহাড়, সেখানেই নাকি সাধুবাবার ডেরা। শুনেছি, কিন্তু যাওয়া হয়নি।"

সাধুবাবা! বাঙালি?

ঋষি-বীণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঠতে উঠতে অক্ষরের মনে হল— একবার দেখা করে এলে ক্ষতি কী?

১৬

দোকানিকে জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে বলল, "যাইয়ে না, যাইয়ে। ভেট করকে আইয়ে। সাধুবাবা ভি বাংগালি হ্যায়। শরিফ আদমি।"

ডিরেকশন জেনে নিল। রাস্তা সহজ। নদীর ধার বরাবর উত্তরমুখো হাঁটলে প্রথম যে পাহাড়, তার মাথায় সাধুবাবার ডেরা। সকাল থেকে দর্শন দেন। সূর্য ঢলে গেলে গুহায় সেঁধিয়ে যান।

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল অক্ষর। একটু যেতেই নদী, নদীর শব্দ। পাথরে ঘা খেতে খেতে গড়িয়ে যাচ্ছে নদী। নদী যাচ্ছে পাহাড় থেকে মোহানায়। অক্ষরের অভিমুখ তার উল্টো। সমতলের মানুষ, অক্ষর আজ চলেছে পাহাড় লক্ষ্য করে।

সারাটা পথ নদী তার সমস্ত না-শোনা কথা অক্ষরকে বলতে বলতে সঙ্গ দিল। কী বলে নদী? যে গিরিশৃঙ্গ থেকে নদীর সৃষ্টি তার নিভৃত বাণী! যত জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর চলা, তার সুখদুঃখের জলছবি! দু'পাড়ের অনতিক্রম্য দূরত্ব! পাথরের নির্মম ঔদাসীন্য! রোদ মাথায় উঠতেই পাখির কলস্বর ফুরিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল হাওয়ার শিষের আওয়াজ। অক্ষরও পৌঁছে গেল গন্তব্যের কাছাকাছি।

বলতে পাহাড়, কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায় উচ্চতা খুব যে বেশি তা নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। এই মুহূর্তে জনহীন; কিন্তু মানুষ ওঠানামা করে বোঝা যায়। মানুষ যে পথে যায় সেখানে তার পদচিহ্ন থাকে। খাবারের ঠোঙা, শুকনো শালপাতা, দেশলাইয়ের খোল, প্লাস্টিকের খালি বোতল এগুলোই মানবসভ্যতার পদচিহ্ন।

ঠিক পাহাড়চূড়া নয়, একটু নীচে সাধুবাবার আশ্রম। আশ্রম বললে ভুল বলা হয়। পাহাড়ের গায়ে গুহা। গুহাটা প্রকৃতির দান। মানুষ গুহার মুখে বেড়া দিয়েছে। গুহার সামনে পাথরের চাতাল। চাতাল ঘিরে ছোট-বড় পাথর। চাতালে হাতজোড় করে বসে স্থানীয় কিছু মানুষ। সংখ্যায় জনা পনেরো, তার বেশি নয়। একটা চওড়া পাথরের ওপর আসন পেতে বাবু হয়ে বসে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বসেছেন ভক্তদের দিকে মুখ করে।

কী করবে ঠিক করতে না পেরে অক্ষরও অন্যদের পিছনে ঠান্ডা চাতালের ওপরই বসে পড়ল। সন্ন্যাসীর ঠোঁটের কোনায় কি এক চিলতে হাসি? অক্ষরের সেই রকমই মনে হল।

নদীর পাড় ধরে এতক্ষণ হেঁটে এসেছে। রোদও ছিল মাথার ওপর। এখানে ঘন গাছের ডালপাতা মাথা বাড়িয়ে চাতালটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাহাড় চিরে ঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে গাছগাছালির ফাঁক গলে। অক্ষর সঙ্গে আনা শালখানা ভাল করে জড়িয়ে নিল। সন্ন্যাসীও শাল জড়িয়েছেন। স্থানীয় মানুষদের অধিকাংশই শীতবস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করছে না। দারিদ্র? নাকি শীতের পোশাকের অভাব? ঠিক বুঝে উঠতে পারল না অক্ষর।

একটি বই থেকে কিছু পড়ছিলেন সন্ন্যাসী। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল অক্ষর। মনে হল রামায়ণ। রাম-সীতা লক্ষণ-হনুমান এদের নাম শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শুদ্ধ হিন্দি। তুলসীদাসী রামায়ণ নয়।

রামায়ণে মন না দিয়ে অক্ষর সন্ন্যাসীতে মনোনিবেশ করল। সাধু-সন্ন্যাসীদের বয়স বোঝা যায় না। তাও অক্ষরের মনে হল পঞ্চাশের আশপাশেই হবে। মাথায় জটা। সন্ন্যাসীসুলভ দাড়ি। রোদে-পোড়া তামাটে রং। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও উদাত্ত।

যে-পৃষ্ঠাটি এতক্ষণ পড়া হচ্ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাতা ওল্টালেন সন্ন্যাসী। কিন্তু পরের পৃষ্ঠার পাঠ শুরু হল না। বই গুটিয়ে উঠে পড়লেন সাধুবাবা। গুহার অভ্যন্তরে গিয়ে একটি বাটি আর চামচ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সকলে হাত পাতল। বাড়ানো হাতের পাতায় এক খাবলা চাল-কলা মাখা পড়ল। মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিল ভক্তরা। প্রসাদ। দেখাদেখি অক্ষরও হাত বাড়াল। অক্ষরকে প্রসাদ বিতরণের সময় সন্ন্যাসী অপাঙ্গে দেখলেন। এক মুহূর্ত। তারপর বাটি-চামচ রাখতে আবার গুহায় ঢুকলেন।

রামায়ণ এবং প্রসাদপর্ব চুকলে অনেকেই অসুখবিসুখের কথা বলতে শুরু করল। পেট-খারাপ, মাথার যন্ত্রণা, এমনি ঘরোয়া অসুখ। ধৈর্য ধরে প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনলেন সন্ন্যাসী। এতক্ষণ লক্ষ করেনি, প্রসাদের বাটি রেখে আসার সময় একটা ওষুধের বাক্স নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। ঢাকনা খুলে বাক্স থেকে গুলি বের করে যার যেমন রোগলক্ষণ মিলিয়ে মুখে ঢেলে দিতে থাকলেন সন্ন্যাসী। ডাক্তারিপর্বও যখন শেষ হয়ে গেল একে-একে প্রণাম করে সবাই বিদায় নিতে লাগল। সাধুবাবাও ওষুধের বাক্স বগলে নিয়ে গুহায় ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলেন।

খানিকক্ষণ চাতালে বসে অপেক্ষা করল অক্ষর। প্রসাদ নেবার সময় হাত বাড়িয়েছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারিপর্বে অক্ষরের ভূমিকা ছিল নিছকই দর্শকের। সন্ন্যাসীও তার কাছে আসেননি। বসে বসে গুহার চারপাশ ভাল করে দেখল অক্ষর। গুহার মাথায় একখানা ত্রিশূল গাঁথা না থাকলে এটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর ডেরা এমন ভাবার কোনও অবকাশ ছিল না। আশেপাশে কোনও দেবদেবীর মূর্তি, বা যাগযজ্ঞ-ধুনি তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ বসে থাকার পরও যখন গুহার মুখ খুলল না, উঠে পড়ল অক্ষর। যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তাতেই ফিরে চলল।

খেতে বেলা হল। দোকানি জানত আজ সন্ন্যাসীর ডেরায় যাবে অক্ষর। খাবার বেড়ে দেবার সময় আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভেট হুয়া?"

ঘাড় নাড়ল অক্ষর।

অক্ষর কথা বাড়াল না দেখে দমে গেল শান্তশিষ্ট পাহাড়ি মানুষটা। কিন্তু অযাচিত কৌতূহলও দেখাল না। খাওয়া শেষ করে ডেরার দিকে হাঁটা দিল অক্ষর।

সন্ধেবেলা আর খেতে যেতে ইচ্ছা করল না। একবার ভেবেছিল দোকানিকে বলে আসবে। সেটাও শেষ অবধি পেরে উঠল না। সকাল সকাল শুয়ে পড়ল।

সারারাত শুয়ে এ পাশ-ও পাশ করল। বোঝার চেষ্টা করল সন্ন্যাসীর ব্যবহারের তাৎপর্য। সন্ন্যাসী যে তাকে দেখেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সে যে অন্যদের থেকে আলাদা সেটাও বুঝতে তাঁর অসুবিধা হবার কথা নয়। অথচ হাবভাবে কিছুই প্রকাশ করলেন না। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। যেন ইনডাইরেক্টলি বলা, এবার তুমি এসো।

অনেক ভেবেচিন্তে অক্ষর ঠিক করল সে আবার যাবে। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত। মত পাল্টাতেও তো পারে।

পরদিন সকাল-সকাল উঠে দোকানির সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইল। বলল, বেলা করে খেয়ে শরীর ভাল লাগছিল না, তাই আর খেতে আসতে পারেনি। তবিয়ত আজ ঠিক লাগছে কিনা বারবার জানতে চাইল দোকানি। দোকানির চোখের ভাষায় আত্মীয়তাটুকু পড়তে পারল অক্ষর।

আবার এক রাস্তা। সেই পাহাড়। সেই গুহা। রামায়ণ-পাঠ প্রসাদ-বিতরণও আগের মতোই। ডাক্তারি শেষ হলে লোকজন উঠতে শুরু করল। সন্ন্যাসীও উঠে গুহার ঝাঁপ বন্ধ করলেন।

রোখ চেপে গেল অক্ষরের। পরেরদিন আবার গেল। তারপরের দিন। দিনসাতেক এইভাবে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন প্রসাদের সঙ্গে একখানা চিরকুট হাতে গুঁজে দিলেন সন্ন্যাসী। চাতাল ফাঁকা হলে চিরকুট খুলে দেখল গোটা গোটা হরফে বাংলায় লেখা, "কাল ফিরে না গিয়ে অপেক্ষা করবেন। দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন।"

চোখ তুলে সন্ন্যাসীকে খুঁজতে গিয়ে বুঝল, ততক্ষণে আগের দিনগুলোর মতোই গুহার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে।

এই ক'দিন সাধুবাবার ডেরায় যেতে যেতে যে যে জিনিসগুলো অক্ষর লক্ষ করেছে তার প্রথমটা হল সন্ন্যাসী কোনও তত্ত্ব বা ধর্মের কথা শোনান না। কোনও পুজো-পাঠ হোম-যজ্ঞিরও লক্ষণ চোখে পড়েনি। থাকার মধ্যে একটাই, রামায়ণ পাঠ। তাও প্রত্যেক দিনের জন্য এক পাতাই বরাদ্দ।

দ্বিতীয় যেটা, মানুষ যে আসে তার প্রধান আকর্ষণ রামায়ণ কিংবা চাল-কলা প্রসাদ নয়। আকর্ষণ ওষুধের গুলি। ওইটা না থাকলে সাধুবাবার সাধুগিরি কতদিন চলত বলা মুশকিল। তবে এটাও ঠিক, ওই গুলিতে অসুখ সারে নিশ্চয়ই। রোগ না সারলে লোক আসত না।

অর্থাৎ টু-ইন-ওয়ান।

সাধু-কাম-ডাক্তার।

বাবাজির বুদ্ধি আছে, সন্দেহ নেই।

অন্যদিন গুহার গেট বন্ধ হলে অক্ষরও রাস্তা ধরে। আজ লাঞ্চ-এর নেমন্তন্ন। তাই অন্যরা উঠে পড়লেও অক্ষর বসে রইল। যেতে যেতে স্থানীয়রা পেছন ফিরে অক্ষরকে দেখল। মনের ভাবখানা: ধান্দাটা কী? কিছুক্ষণ বসে থাকার পরও গুহার মুখ যখন খুলল না, উঠে পড়ল অক্ষর। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের অন্য পাশে এসে পড়ল।

এদিকে কখনও আসা হয়নি। অক্ষর যে পথে আসে সেই পথেই নেমে যায়। সেটা পাহাড়ের অন্য দিক। এদিকে পাহাড়ের খাঁজে কয়েকটা ঝুপড়ি। সন্ন্যাসীর কাছে আসা লোকজন এদিকেই কোথাও থাকে। সেইজন্য ফেরার পথে কোনও দিনই তাদের দেখতে পায়নি। এই পাহাড় ছাড়িয়ে আরও একটা পাহাড়। দুটো পাহাড়কে যোগ করেছে দড়ির সাঁকো। দড়ি ধরে অক্লেশে পার হচ্ছে মানুষ। অক্ষরের চোখের সামনে সাঁকোটা একবার টাল খেল। পার হচ্ছিল দুই কিশোরী। খিলখিল হাসির আওয়াজ এত দূর থেকেও শোনা গেল।

"আসুন, খাবার রেডি।"

গলার আওয়াজে ঘুরে তাকাল অক্ষর। সন্ন্যাসী। খুঁজতে খুঁজতে এই অবধি এসে গেছেন। খারাপ লাগল। অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

আয়োজন সামান্যই। শালপাতায় খিচুড়ি আর আলুসেদ্ধ। তবে খিচুড়ির ওপর গব্যঘৃতের ছিটে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি আসন। অক্ষর বসলে সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করলেন।

"এখানে খাবার চট করে জুড়িয়ে যায়। আগে খাওয়াটা সেরে নিন। পরে কথা হবে।"

নির্দেশমতো ভোজনপর্ব তাড়াতাড়ি সেরে নিল অক্ষর। সন্ন্যাসীর দেখাদেখি শালপাতা মুড়িয়ে পিছনে ফেলে এল। চকচকে লোটায় জল নিয়ে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করছিলেন।

"ঝরনার জল। খেলে পেটখারাপ হয় না।"

অঞ্জলিভরে জল খেল অক্ষর।

দু'জনে বসল মুখোমুখি।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগল রান্না?"

"দুর্দান্ত। আপনি নিজেই রাঁধেন?"

"তাছাড়া উপায়?"

এই সুযোগে যে-প্রশ্নগুলো অক্ষরের পেটের ভেতর গজগজ করছিল সেগুলোই করতে শুরু করল।

"আপনি... মানে এদিককার তো নন?"

"না না। আমার আদিনিবাস কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে। ছানার মিষ্টি বিখ্যাত। গেছেন কখনও ও দিকে?"

"না।"

প্রশ্নের ফেলে আসা সুতোটা আবার ধরে ফেলল অক্ষর।

"দাঁইহাট থেকে এখানে? এমনিই? না ঘুরতে ঘুরতে?"

"ঘুরতে ঘুরতে বলাই ঠিক। ইশকুলের গণ্ডি পেরোতে পারিনি। কিছুদিন ঘষাঘষি করে বুঝতে পারলাম লেখাপড়া আমার হবার নয়। একদিকে বাবার হা-হুতাশ: ছেলেটা মানুষ হল না। অন্যদিকে মাস্টারমশাইদের শাসন। শেষে ধুত্তোরি বলে বেরিয়ে পড়লাম।"

"বেরিয়ে?"

"অনেক কিছু করেছি। লোকের বাড়ি রান্না করেছি, বাজারে মুটেগিরি করেছি, চায়ের দোকানে বাসন মেজেছি। শেষ পর্যন্ত ভিড়ে গেলাম এক সাধুর আখড়ায়। আখড়া থেকে আখড়ায় জায়গা পাল্টাতে পাল্টাতে আর সাধুদের চ্যালাগিরি করতে করতে বুঝে গেলাম এটাই আমার লাইন।"

"লাইন মানে?"

"অশিক্ষিতদের জন্য খুব বেশি রাস্তা যে খোলা আছে তা তো নয়? বাপের অঢেল পয়সা থাকলে ব্যবসা ফেঁদে বসা যায়। অভিনয়টাও লাইন হিসেবে খারাপ নয়, কিন্তু খুঁটির জোর লাগে। সবচেয়ে ভাল লাইন রাজনীতি। ভেবে দেখলাম দিনরাত মিথ্যে বলা আর লোক-ঠকানো ও আমার পোষাবে না। পড়ে রইল একটাই রাস্তা: সাধুগিরি। ওই লাইনেই ঢুকে পড়লাম।"

"তারপর?"

"যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। আপনারই মতো নেমে পড়লাম এখানে। খুঁজতে খুঁজতে এই গুহা। আমার জন্যই যেন সাজিয়ে রাখা ছিল। দাড়ি জটা বানাতে যেটুকু সময় লাগে। মানুষ এখনও সাধু-সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করে। একটু একটু করে লোকজন আসা শুরু হল। শুধু রামায়ণে আজকাল চিঁড়ে ভেজে না। সাধুদের আখড়ায় যখন ছিলাম, কারও অসুখবিসুখ করলে আমারই ডাক পড়ত। একটু-আধটু শিখেও নিয়েছিলাম টোটকা ওষুধের ব্যবহার। সেটাই কাজে লেগে গেল। সাধুগিরি। সঙ্গে ডাক্তারি। টাকাপয়সা দেবে তেমন সাধ্য এদের নেই। যে যেটুকু পারে, চাল-ডাল-সবজি, হাতে করে নিয়ে আসে। তাতেই চলে যায়। নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোও কুলিয়ে যায়।"

হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী। ঝকঝকে দাঁতের অনাবিল হাসি। টুথপেস্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন হতে পারতেন অনায়াসে। মনে করিয়ে দেবে সেই অপশনটাও?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল অক্ষর। কত সহজে নিজের না-পারার কথা বলে গেলেন সন্ন্যাসী। এইভাবেই কি শুদ্ধ হতে হয়?

হঠাৎই বলে ফেলল, "একা লাগে না? ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?"

সন্ন্যাসী তাঁর আয়তচোখের দৃষ্টি অক্ষরের চোখে স্থাপন করলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "আপনার ইচ্ছা করে না?"

শীতটা যেন চেপে ধরল অক্ষরকে। শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। ভাল করে দেখল সন্ন্যাসীকে। একটু আগেই কথায় কথায় বলছিলেন, "আপনারই মতো নেমে পড়লাম এখানে।" জানলেন কী করে অক্ষরের কথা?

প্রশ্নটা আপাতত সরিয়ে রেখে অন্য প্রশ্নে গেল, "আচ্ছা যে বইটা রোজ পড়েন, ওটা কি রামায়ণ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুলসীদাসের রামায়ণ তো নয়?"

"না। রামায়ণ যুগে যুগে লেখা হয়েছে। অনেকভাবে। তার ব্যাখ্যাও বিভিন্নরকম।"

"কিন্তু এক পাতার বেশি কখনও পড়েন না কেন?"

হাসলেন সন্ন্যাসী। অক্ষরের চোখ থেকে চোখ সরালেন না। গলা নামিয়ে বললেন, "বইয়ের শেষ পাতা কখনও আগে পড়ে ফেলতে

নেই। একটি একটি পাতা পড়ে তবেই শেষের পাতায় পৌঁছতে হয়।"

এইভাবে এই কথাগুলো কেউ তো কখনও অক্ষরকে মনে করিয়ে দেয়নি! অক্ষরের মনে হল, যে প্রশ্নগুলো বিগত কয়েকটা মাস অক্ষরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেগুলো জিজ্ঞেস করবার এটাই উপযুক্ত সময়।

"আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, বিরক্ত হবেন না তো?"

"প্রত্যেক মানুষের ভেতর কিছু না কিছু প্রশ্ন প্রত্যেক মুহূর্তে জন্ম নেয়। প্রথমে বুদ্বুদের মতো প্রশ্নগুলো ভেসে ওঠে। একসময় অন্য সব চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে তারাই মনকে অধিকার করে। তখন সেইসব প্রশ্ন ছাড়া অন্য চিন্তা করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনওটাই মানুষের থাকে না। প্রশ্ন করুন। বিরক্ত হব না।"

"মৃত্যু কী?"

"সঠিক বলা কঠিন। মৃত্যুতে জীবনের শেষ, এই অবধি বলা যায়।"

"মৃত্যু কি যন্ত্রণাদায়ক?"

"মৃত্যুর মুখোমুখি না হলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে যেসব মানুষ মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে ফিরে এসেছেন তাঁদের কারও সঙ্গে অন্যদের অভিজ্ঞতা মেলেনি।"

"মৃত্যুর পর সত্যিই কি কিছু আছে?"

"সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এমন অনেকেই সারাটা জীবন মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে কাটিয়ে দিয়েছেন। খেয়াল করলে দেখবেন একটা জায়গায় তাঁদের ভীষণ মিল। তাঁরা স্বর্গ বা নরক বর্ণনা করেছেন। স্বর্গ জায়গাটা ভারী চমৎকার, সেখানে সব কিছু হাত বাড়ালেই মেলে, সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দুঃখ-বেদনা কিছু নেই। উল্টোদিকে নরক মানেই তপ্ত কটাহে ফুটন্ত তেলে সেদ্ধ হওয়া। কিন্তু মানুষ স্বর্গে যাবে না নরকে, তা কিন্তু শর্তসাপেক্ষ।"

"কী সেই শর্ত?"

"সেই শর্ত মঙ্গলময় একটি জীবনের অতিবাহন। যে মানুষ সৎ চিন্তা সৎ কর্মে জীবন কাটাবে, অন্যের ক্ষতি করবে না, আনন্দময় স্বর্গপ্রাপ্তি তার বাঁধা। কেন বলুন তো?"

"বলতে পারব না।"

"আসলে এইসব সিদ্ধ পুরুষ একটি কল্পিত স্বর্গের হাতছানি দিয়ে মানুষকে শুদ্ধ জীবন কাটাতে প্রলোভিত করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীকে আরও সুন্দর আরও বাসযোগ্য করা। স্বর্গবাসের মোহ না থাকলে পৃথিবীটা তো ঠগ-বদমাশ-চোর-লম্পটে ছেয়ে যেত।"

"আর জীবন?"

সন্ন্যাসী হাত বাড়িয়ে দিলেন অক্ষরের দিকে, "আসুন।"

সন্ন্যাসীর হাত ধরে অক্ষর আবার পৌঁছল পাহাড়ের ওপাশে, একটু আগেই যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল । সেই সাঁকো। সাঁকো ধরে একটু একটু করে পার হচ্ছে মানুষ। নীচে বয়ে যাচ্ছে নদী। নদী পার হলে উপত্যকা। আরও পাহাড়। পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সূর্য।

"কী দেখছেন?"

"নদী। উপত্যকা। পাহাড়।"

"দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ওইটা?"

"সাঁকো। দড়ির সাঁকো।"

"দড়ি ধরে ধরে মানুষ কেমন পার হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন? সাঁকো দুলে উঠছে। এই মনে হচ্ছে পা হড়কে যাবে। অথচ যাচ্ছে না। পড়তে পড়তেও সামলে নিচ্ছে মানুষ। ... ওটাই জীবন।"

অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাল অক্ষর। অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েছে সন্ন্যাসীর জটায়, কপালে। কপালের নীচে উজ্জ্বল দু'খানা চোখ।

"রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছে কিশোর। হাতে-ধরা মোবাইল ফোনে ভিডিয়ো গেম চলছে। পেছন থেকে ধেয়ে আসছে ট্রেন। তীব্র হুইসল। কানে যন্ত্র, শুনতে পাচ্ছে না কিশোর। ট্রেন তাকে পিষে দেবার আগের মুহূর্তে লাইন ছেড়ে পাশে উঠে গেল ছেলেটি। ... ওটাই জীবন। প্রাণঘাতী অসুখ। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ চোখ খুলে তাকাল যুবতী। ঠোঁট কেঁপে উঠল। কান পেতে সবাই শুনল, মেয়েটি ডাকছে : মা! ওটাই জীবন। বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল বাড়ি। ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সবাই যখন ফিরে যাচ্ছে, হঠাৎ শিশুর কান্না! ছুটে গিয়ে দেখা গেল সব কিছুর নীচে তখনও হাত-পা ছুঁড়ছে জীবন্ত শিশু। প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুকে অস্বীকার করার অন্য নামই জীবন।"

অজান্তেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল অক্ষরের। মুছে যাচ্ছিল মানুষ ও প্রকৃতি, ধুয়ে যাচ্ছিল অতীত ও অন্ধকার।

শুনতে পাচ্ছিল সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর, "পাহাড় আলো করে সূর্যোদয় হয়, অন্য পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত হয়, প্রতিদিন। দেখুন। পাহাড়ের গায়ে ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, রঙের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে গাছের মাথায়। চোখ খুলে রাখুন। সন্ধ্যা হবে, ছমছমে জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যাবে চরাচর। দেখতে ভুলবেন না। ভালবাসার মানুষ হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করে আছে। তাদের আঁকড়ে থাকুন। আরও বেশি করে ভালবাসুন। ওইটাই বেঁচে থাকা।"

১৭

কাঠের যদি মিস্তিরি হয়, কলেরও মিস্তিরি, চুলের মিস্তিরিই বা হবে না কেন? "নাপিত" শব্দটার মধ্যে যে তাচ্ছিল্য থাকে, মিস্তিরিতে তা থাকে না। স্থানীয় মানুষের শব্দচয়নের তারিফ করল অক্ষর।

দাড়িটা বিসর্জন দেবে, চুল খানিকটা ট্রিম করাবে, এমন মনস্থ করে খোঁজ নিতে গিয়ে জানল মিস্তিরি রোজ আসে না। ফি-শনিবার যন্ত্রপাতিসহ সে বাসস্ট্যান্ডে উদয় হয়। মানুষও তাকে দেখতে পেলে সসম্মান মাথা পেতে দেয়। অতএব চুলদাড়ি কাটতে গেলে শনিবার ছাড়া গতি নেই। একটাই ভরসা, মাঝে একটা দিন, তারপরেই শনিবার।

অক্ষরকে খাতির করেই বসাল মিস্তিরি। অক্ষরের হোস্ট মনে হয় তার আগে যথাবিহিত ইনট্রোডাকশন দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মিস্তিরির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে অক্ষর দেখল চুলের ক্ষেত্রে মিস্তিরির স্টকে দুটোই ফর্মুলা: হয় সবংশ নিধন, নইলে বাটি ছাঁট। দাড়ির ক্ষেত্রে নির্মূল করায় অক্ষরের আপত্তি ছিল না। কিন্তু চুল কাটার পর ছাঁট দেখে দমে গেল। শেষ অবধি চুলের বংশও ধ্বংস করার পক্ষেই রায় দিল।

চুল-দাড়ি সংহার করার পর আয়নাখানা বাড়িয়ে মিস্তিরি বলল, "অপনা সুরত একবার দেখ তো লিজিয়ে!"

সুরত দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল অক্ষর। বাবা চলে যাবার পর শেষ ন্যাড়া হতে হয়েছিল। সে স্মৃতি আবছা। সচুল নিজেকে আয়নায় দেখে দেখেই অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ নতুন করে নিজেকে দেখে মনে হল, খারাপ দেখাচ্ছে না। বেশ তাপস তাপস চেহারা। মিস্তিরির হাতে প্রাপ্য দর্শনী গুঁজে দিতে মাথায় ঠেকিয়ে পকেটে ঢোকাল। হাবভাবে মনে হল কাস্টমার-এর কাছ থেকে ফুলরেট-এ টাকা পেতে সে অভ্যস্ত নয়।

দোকানিকে নিয়ে পড়ল মুশকিলে। খাবারের দাম দিতে গেলে সে ঘরভাড়া মকুব করে দেয়। আবার ঘরভাড়া পুরোপুরি মিটিয়ে দিলে বলে খাওয়ার চার্জ নাকি ওর মধ্যেই ধরা আছে। কিছু টাকাকড়ি জোর করে হাতে দিয়ে অক্ষর যখন বাসে উঠল, স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল দোকানি, অক্ষর দেখল দোকানি তো চোখ মুছছেই, তারও চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

শহরে পৌঁছে অক্ষরের মনে হল, তার বর্তমান চেহারার সঙ্গে প্যান্ট-শার্টটা ঠিক মানাচ্ছে না। দোকানে ঢুকে ধুতি-চাদর ফরমায়েশ করে অপেক্ষা করছে, দোকানদার যা এনে হাজির করল তা দেখে অক্ষরের চক্ষুস্থির। গেরুয়া ধুতি আর উড়নি। ভেবেচিন্তে সেটাই কিনে ফেলল। পরেও ফেলল দোকানেই। আর দোকানের ফুলসাইজ় আয়নায় নিজেকে দেখে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, এতক্ষণে সাজ সম্পূর্ণ হল। দাম দেবার সময় আরও বিস্ময়: সাধারণ ধুতি চাদরের তুলনায় গেরুয়া

প্রায় অর্ধমূল্যে পাওয়া যায়। সাধে কী আর সাধু-সন্ন্যাসীতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে!

গেরুয়ার মাহাত্ম্য আর একবার উপলব্ধি হল ট্রেনে উঠে। এই ট্রেনে রাও নামের কোনও টিটিই নেই। গেরুয়া দেখিয়েও রিজ়ার্ভড কম্পার্টমেন্টে এন্ট্রি মিলল না। অগত্যা আনরিজ়ার্ভড। আর সেখানেই অপেক্ষা করছিল ভারতবর্ষ।

ছাদে-বাম্পারে ঠেসাঠেসি ভিড়। কোনও রকমে শরীরটা ভেতরে গলাতেই নাড়া উঠল "বাবাজিকো জায়গা ছোড় দো।" বসার আসনও জোগাড় হয়ে গেল। একজন পোঁটলাখানার জিম্মা নিল। রাত্তিরে খাবার ভাগও যখন জুটে গেল, মনে পড়ল সন্ন্যাসীর কথা। ডাক্তারি আর সাধুগিরি, এই দুটো পেশার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধায় এখনও ভাটা পড়েনি। ডাক্তার গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে ট্রেনে ওঠেন না। তাঁকে চেনার উপায় নেই। সাধুর সাধুত্ব তাঁর বসনে। শ্রদ্ধার আসন তাঁর জন্য বাঁধা।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মনে হল, স্নান করা দরকার। আজকাল অর্থমূল্যে মলিনতামুক্ত হওয়া যায়। চিন্তা ছিল সঙ্গের পোঁটলাখানা নিয়ে। রাখবে কোথায়? সুলভ শৌচাগার-এর গেটপাস ইশ্যু করছে যে, দেখা গেল তারও সাধুর সামান্য সম্বল দেখভাল করতে আপত্তি নেই। বেরিয়ে খিদে পেল। ডালপুরি সহযোগে ব্রেকফাস্ট করে খিদের মুখে এখনকার মতো হাত-চাপা দেওয়া গেল।

ঠিকই করে নিয়েছিল নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে মিনিবাসে উঠবে। লঞ্চঘাটে টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন। টিকিট কেটে এগোনোর উপক্রম করতেই লঞ্চ হর্ন দিল। অন্যরা ছুটল লঞ্চ ধরতে। অক্ষরের তাড়া নেই। নিজের মতো হেঁটে লঞ্চে পা রাখতে রাখতে ওপরে তাকাল। সারেং তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। অক্ষর উঠলে দড়ি খোলার ইঙ্গিত দিল।

লঞ্চে নদী পার হতে হতে অন্য একটা নদীর কথা মনে পড়ছিল অক্ষরের। যে নদী যেতে যেতে কথা বলে। শহরের নদী তার যাবতীয় স্বর বুকে চেপে রাখে। অথবা বলে, যন্ত্রের শব্দে চাপা পড়ে যায়।

নদী পেরিয়ে ঘাট। ঘাট পার হলে রাস্তা। একটি নিঃসঙ্গ মিনিবাস সেখানে অক্ষরের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গন্তব্য লেখা ছিল বাসের গায়ে। কিন্তু লেখা থাকলেই গন্তব্য অবধি যেতে হবে এমন দায় কলকাতার মিনিবাসের কোনওদিনই ছিল না। তাই ওঠবার আগে শেষ পর্যন্ত যাবে কিনা কন্ডাক্টরের কাছ থেকে কনফার্ম করে নিল।

একসময় বাস ছাড়ল। যেন ছাড়তে হয় তাই ছাড়া। চললও দুলকি চালে। পৌঁছনোর তাড়া নেই। আজ। কাল হলেও ক্ষতি নেই। এসপ্লানেডে পৌঁছে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। প্যাসেঞ্জার তুলল। তারপর চলল দক্ষিণে।

অক্ষর দেখছিল। বৃষ্টি হয়েছে মনে হয় কাল-পরশু। রাস্তার ধারে এখনও জমা জলের রাবার স্ট্যাম্প। একটা জারুল গাছের মাথা ঘন বেগুনি ফুলে ছেয়ে আছে। আলো পিছলে যাচ্ছে ঘাসের গায়ে জমে থাকা বৃষ্টি বিন্দুতে।

দেখতে দেখতে ভাবছিল সন্ন্যাসীর কথা। রাস্তার পাশে এমন করেই চিরটাকাল দাঁড়িয়ে থেকেছে গর্বিত বনস্পতি, এমনিভাবেই হীরকখণ্ডের মতো জ্বলেছে বৃষ্টির ফোঁটা। অক্ষরের চোখে পড়েনি। ছুটন্ত অক্ষর তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়েছে প্রকৃতির যাবতীয় সুষমা থেকে। প্রকৃতি ও মানুষ তার দ্রষ্টব্যের তালিকায় অপাঙক্তেয় হয়ে থেকেছে।

কীসের সন্ধানে এতটাকাল ছুটে বেরিয়েছে অক্ষর? কীসের তাড়নায়? কতখানি পড়ে থাকে শেষ পর্যন্ত? কতটুকু?

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষল বাস। অক্ষরের মাথাটা ঠুকে গেল সামনের সিটের পেছনে। হই হই করে উঠল বাস-ভর্তি প্যাসেঞ্জার। বাছাবাছা গালাগাল ধেয়ে গেল ড্রাইভারের দিকে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাইরে তাকাল অক্ষর।

দু'জনে হাত-ধরাধরি করে রাস্তা পার হচ্ছিল। মেয়েটিকে ফুটপাথে তুলে দিয়ে পা স্লিপ করে গিয়েছিল ছেলেটির। তখনই অক্ষরদের বাসটা চলে এসেছিল একদম কাছে। ঠিক সময়ে ড্রাইভার ব্রেক কষায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ছেলেটি।

দু'চোখ হাতের পাতায় ঢেকে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল ভিক্টোরিয়ার রেলিং ঘেঁষে। ছেলেটি কাছে যেতেই চড়-থাপ্পড়ে ভরিয়ে দিতে থাকল তাকে। যেন আঘাত নয় আদর, হিহি করে হাসছিল ছেলেটি। যেন মৃত্যু নয়, সম্বর্ধনা একটু হলেই ছুঁয়ে ফেলছিল। এ যাত্রা হল না, এই যা। তারপর হাত-ধরাধরি করে দু'জনে হেঁটে গেল ভিক্টোরিয়ার গেটের দিকে।

জীবন! যেন অফুরন্ত জীবন ছলকে ছলকে উঠছে।

বাস থেকে নেমে অটো নিতে ইচ্ছা করল না। দু'পাশ দেখতে দেখতে হেঁটে যাচ্ছিল অক্ষর। অথবা কিছুই দেখছিল না, ভাবছিল। দু'পাশে জীবনের চলন্ত জলছবি। এতদিন কেন চোখে পড়েনি?

টুপুরের জন্মদিনে কেক কাটার সময় মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়েছিল বলে ধাতানি খেয়েছিল মেয়ের কাছে। টাপুরের জন্মদিন সেলিব্রেট করা হয়েছিল ভার্চুয়ালি। আজ অক্ষরের জন্মদিন।

নতুন যে-ছেলেটি মাধবের জায়গায় জয়েন করেছে অচেনা মানুষ দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কী ভেবে গেট খুলে সরে গেল পাশে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠল অক্ষর।

ডোরবেল।

অপেক্ষা।

দরজা খুলে গেল।

বীথি।

হাসল অক্ষর। হাসিটা ভাল এল না।

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। স্নান করেছে সদ্য। ভিজে চুল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের বিন্দু। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে অক্ষরের বেঁচে-থাকা।

উঁকি মেরে ভেতরটা একবার দেখার চেষ্টা করল অক্ষর।

কোনও কি আয়োজন চোখে পড়ছে? উদ্‌যাপনের?

বীথি তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। দু' চোখে বিস্ময়।

অক্ষর নরম গলায় বলল, "কী হল? ঢুকতে দেবে না?"

বীথি জবাব দিচ্ছে না দেখে এবার গলা তুলল।

"আমি অক্ষর। চিনতে পারছ না?"

ঘাড় নাড়ল বীথি।

"না।"

[উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কোনও বিশ্বাস বা বিশেষ পেশার মানুষকে আঘাত করা এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ দুঃখ পান তার জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।]

ছবি: রৌদ্র মিত্র

মুকুট পড়িল পদতলে...

যতই শান্তশিষ্ট হোন, পত্নীনিষ্ঠ কি? সাদামাঠা, ভালমানুষের মলাট। ভিতরের পাতায় পাতায় দুর্নীতি আর স্খলনের ইতিবৃত্ত। এমনই ‘বর্ণচোরা’ **পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে** নিয়ে লিখেছেন **দেবাশিস ভট্টাচার্য**

শুধু একটি হ্রস্ব-ই কার। তাতেই পুরো ‘আকার’ বদল! শুনতে হেঁয়ালির মতো। কিন্তু এটাই নির্দয় সত্য। এত দিন নিজেকে যিনি মন্ত্রিসভায় ‘দু’নম্বর’ ভাবতেন এবং ভাবাতেন, আজ লোকচক্ষে তিনি ‘দু’নম্বরি’। এত দিন যিনি ছিলেন দলের নীতি-নিয়ামক এবং শৃঙ্খলার নজরদার, তাঁর মুকুট আজ দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পাঁকে ডুবে গিয়েছে। এগ রোলে আজ শুধুই পেঁয়াজ, নাই শসা!

সেই পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত কী মিলতে পারে, কোথাকার জল কত দূর গড়ায়, সে সব সময়ে বোঝা যাবে। তবে আপাতত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ‘ডরপোক’ বাঙালি বরং একটু ‘গর্ব’ করুক! বুক বাজিয়ে বলুক, হম কিসিসে কম নহি! সত্যিই তো কে কবে এমনটা ভাবতে পেরেছিল! তেল-জলে পুষ্ট, নিদ্রারসে সিক্ত এক স্ফীতোদর বঙ্গ-নেতা— এটাই তো ছিল এত বছর যাবৎ তাঁর পরিচিত অবয়ব। সেই ব্যক্তির কব্জায় কোটি কোটি

নজরুল মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানে

এক সাংবাদিক সম্মেলনে

অফিসফেরত অ্যাটাচি হাতে তখনকার পার্থ প্রায় নিয়মিত মমতাদের কালীঘাটের বাড়িতে ঢুঁ মারতেন।

নগদ টাকা, বিপুল ভূ-সম্পত্তি এবং মহিলাকুলের সমাহার বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের চেহারাটাই বুঝি বদলে দিল। এগিয়ে বাংলা!

সর্বজনীন 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের দলে মুষ্টিমেয় যে ক'জন নাম ধরে ডাকার অধিকারী ছিলেন বা আছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একজন। উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কও কমবেশি অর্ধশতকের। সেই ছাত্র-রাজনীতির সময় থেকে।

পার্থের জন্ম ১৯৫২ সালে। তাঁর পরিবার আদতে কুমিল্লার। যদিও তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা সবই কলকাতার নাকতলায়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় থেকে পাশ করে আশুতোষ কলেজে বিএ পড়া। তখনই ছাত্র পরিষদ করার সূত্রে মমতার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ঘটে তাঁর। পার্থ তখন কলেজে সিনিয়র দাদা।

সেই যোগাযোগ দীর্ঘ সময় জুড়ে শুধু অবিচ্ছিন্নই ছিল না, মমতার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রতিটি স্তরে পার্থ তাঁর পাশে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও মমতার বিভেদ হয়েছে কয়েকবার। পার্থের সঙ্গে একবারও নয়। মমতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাই পার্থেরও 'ওজন' বেড়েছিল। সুতোটা দৃশ্যত কাটা পড়ল এখন, মন্ত্রিত্ব ও দলীয় পদ থেকে পার্থের অপসারণের মধ্য দিয়ে।

ছাত্র-রাজনীতির পর্ব মেটার পরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা, নানা কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া ইত্যাদি পার্থ ছাড়েননি। মমতার সঙ্গেই কংগ্রেস থেকে তিনিও বেরিয়ে আসেন। ১৯৯৮ সালে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই পার্থ ছিলেন দলের মহাসচিব। তবে ভোটের রাজনীতিতে তিনি পাকাপাকিভাবে এসেছেন কিছু সময় পরে। তাঁর চাকরি জীবনের প্রায় শেষ দিকে। তার আগে তাই রাজনীতির চেনা পরিসরে তাঁকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না।

ততদিন পার্থ বরং চুটিয়ে চাকরি করেছেন সরকারি সংস্থা অ্যান্ড্রু ইউল-এর এইচআর বিভাগে। সেখানে তাঁর একটি ভারী পদ ছিল। অফিসফেরত অ্যাটাচি হাতে তখনকার পার্থ প্রায় নিয়মিত মমতাদের কালীঘাটের বাড়িতে ঢুঁ মারতেন।

মমতার মা এবং পরিবারের সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। মমতা হয়তো তখন কোথাও মিটিং-মিছিল-আন্দোলনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর তাঁর বাড়িতে পার্থ চা-জলখাবার খেতে খেতে গল্প করছেন অন্যদের সঙ্গে। তাতে রাজনীতি তেমন থাকত না। সেখানে তিনি ছিলেন মমতার পরিবারের এক 'দাদা'। ছোটদের পড়ায় সাহায্য করা থেকে শাসন, সব অধিকারই তাঁর ছিল।

২০০১ সালে 'হয় এবার, নয় নেভার' স্লোগান দিয়ে মমতা ভোটে নামেন। তৃণমূলের ভোটসঙ্গী কংগ্রেস। অনিল বিশ্বাসের নেতৃত্বে রাজ্য সিপিএম আবার তার আগেই জ্যোতি বসুকে সরিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়েছে। ভোটের হাওয়া সেবার একটু গরম।

বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে পার্থকে তৃণমূলের প্রার্থী করেন মমতা। বিরোধীরা সম্মিলিত ভাবে পেয়েছিল ৮৬টি আসন। তৃণমূল একক ভাবে ৬০। তবে বেহালা পশ্চিমে দুঁদে সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে দিয়ে বিধানসভায় প্রথম পা রাখতে পেরেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূলের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা। কিন্তু বুদ্ধবাবুর সঙ্গে টক্করে তাঁকে টেক্কা দিতেন পার্থ। ফলে অচিরেই তিনি নজরে পড়েন। পরিষদীয় রাজনীতির মূল ধারায় তাঁর অবস্থান পোক্ত হতে থাকে।

২০০৫-এ কলকাতা পুরসভার ভোটে সিপিএমের মেয়র-মুখ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পার্থকেই প্রার্থী করেছিলেন মমতা। যাদবপুরের রামগড়ে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁরা দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী। সহজ অনুমানে ধরে নেওয়া হয়, তৃণমূল জিতলে পার্থ মেয়র হবেন। তৃণমূল তো জেতেইনি, বিকাশের কাছে পার্থও হেরে যান।

এই ইতিহাস ফিরে দেখতে গিয়ে আবার একটি অদ্ভুত সমাপতন মনে আসে। মাঝের এই সতেরো বছরে রাজনীতির গতিপথ আমূল বদলে গিয়েছে। এককালের ক্ষমতাসীন বিকাশবাবুদের দল অনেকটাই সঙ্কুচিত। অন্য দিকে মন্ত্রীর চেয়ারে বসে থাকা ক্ষমতাধর পার্থকে দুর্নীতির অভিযোগে সব মান ও পদ খুইয়ে কারাবাসে যেতে হল। ঘটনাচক্রে যে অভিযোগ কেন্দ্র করে পার্থের এই দুর্গতির সূচনা, সেই মামলার অন্যতম আইনজীবী বিকাশরঞ্জন!

২০০৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ফল আরও খারাপ হয়। বামফ্রন্ট একাই ২৩৫। কিন্তু সে বারেও পুরনো কেন্দ্র থেকে জিতে পার্থ ফের বিধায়ক। এ বার তিনি বিরোধী দলনেতাও। পরবর্তী পাঁচ বছর ওই ভূমিকায় পার্থ মমতার কাছে নিজের নম্বর যথেষ্ট বাড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন। এই পর্বেই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলন। বিধানসভার ভিতরে-বাইরে উত্তাপ চরমে। পার্থ তখন সামনের সারিতে।

২০১১। রাজ্যে ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটিয়ে মমতা এলেন ক্ষমতায়। বাম শাসনের অবসানের পরে মমতাকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। প্রথম মন্ত্রিসভায় এমবিএ ডিগ্রিধারী পার্থকে শিল্পমন্ত্রী করলেন মমতা। শুরু হল পার্থের নবযাত্রা।

ভারীসারি দফতর একটি পেলেন বটে, যোগ্য হয়ে উঠতে পারলেন কি? ইতিহাস বলবে, পারেননি। আরও ঠিকঠাক বললে শিল্পমন্ত্রীর কাজের গুরুদায়িত্ব গয়ংগচ্ছ পার্থের ধাতে সয়নি। কাজে আগ্রহের অভাব ছিল বললেও হয়তো খুব ভুল হবে না। এমন মন্ত্রীকে নিয়ে শিল্পপতি মহলের খুশি হওয়ার কথা নয়। এই অবস্থায় পার্থ না-চাইলেও মমতার সম্মতিতে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বকলমে শিল্প দফতরের কাজে সহায়তা করতে শুরু করেন। অমিত এবং পার্থের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতাও সেখান থেকে শুরু।

প্রথম পার্থ এবং মন্ত্রী পার্থের মধ্যে একটি তফাৎ ছিল স্পষ্ট। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় তাঁকে 'খুঁজে' পেতে খোদ মমতাও বহু ক্ষেত্রে বেগ পেতেন। এক সময়ে তো মমতার ফোনবুকে পার্থের নামের 'কোড' ছিল 'নো রিপ্লাই'!

মমতা যখন জেলা সফর করেন, তখন চলার পথে মানুষের সঙ্গে কথা বলা, সরাসরি তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার কথা শোনা এবং বোঝা তাঁর বরাবরের অভ্যাস। সেভাবেই অনেকসময় অনেক বিষয়ে জানতে পেরে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ফোন করে রাস্তা থেকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

পার্থ তখন শিক্ষামন্ত্রী। বেশ কয়েকবার দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে স্কুলের পড়ুয়ারা, শিক্ষকেরা তাঁর কাছে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। কিছু দাবি করেছেন। শুনে কখনও মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে এর সমাধান দরকার। কিন্তু দফতরের মন্ত্রী পার্থকে বারবার ফোন করেও তিনি ধরতে পারেননি। এ নিয়ে ক্ষোভও জানাতে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে। পার্থ বদলাননি।

মন্ত্রিত্বের ফেলে আসা প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক। প্রথম দফা মন্ত্রিত্বের ঠিক তিন বছরের মাথায় মমতা শিল্প থেকে শিক্ষায় পাঠান

বাজেট অধিবেশনে

নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘের খুঁটিপুজোয়

প্রথম মন্ত্রিসভায় এমবিএ ডিগ্রিধারী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিল্পমন্ত্রী করলেন মমতা। শুরু হল পার্থের নবযাত্রা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তার পিছনেও একটি গূঢ় কারণ ছিল। আর সেখানে ছিল পার্থের কুশলী চাল।

তৃণমূল সরকারের শুরুতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ব্রাত্য বসু। বাম জমানায় সিপিএমের অনিল বিশ্বাস শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক রাজনীতিকরণ কায়েম করতে গিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলীয় প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজ্য-রাজনীতিতে যা 'অনিলায়ন' বলে অভিহিত।

উচ্চশিক্ষার অঙ্গনকে রাজনীতি-মুক্ত করতে ব্রাত্য পুরো আইন সংশোধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অবশ্যই মমতার তাতে সম্মতি ছিল। কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। এ বার আসরে নামেন পার্থ। তিনি মমতাকে বোঝান, এইভাবে আইন সংশোধন করলে তৃণমূলকে ভবিষ্যতে তার 'মাসুল' দিতে হবে। কারণ এর ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে দলের লোকজনের কোনও ভূমিকাই থাকবে না। সাংগঠনিক দিক থেকে এটা 'ঠিক' নয়।

তৃণমূল মহাসচিবের এই যুক্তি মেনে নিয়ে দলনেত্রী হিসাবে মমতা বেঁকে বসেন। আইন সংশোধন কার্যকর হওয়া দূরের কথা, শিক্ষা দফতর থেকে দূরে সরে যান ব্রাত্য। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে কার্যত মুখিয়েই ছিলেন পার্থ। প্রথম দফার সরকারের ঠিক তিন বছরের মাথায় ২০১৪-এর ২০ মে তিনি উচ্চশিক্ষা দফতরের দায়িত্ব পেয়ে

ভোট দিতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে

পার্থের আচরণ ও কথাবার্তায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন।

যান। পরে এককভাবে পুরো শিক্ষাই তাঁর হাতে চলে যায়। সেই থেকে টানা সাত বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার সরকারের পুরো মেয়াদ তিনিই শিক্ষা দফতর চালিয়েছেন। ঘটনাচক্রে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীনই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন পার্থ। অল্পবিস্তর কথা উঠেছিল সেটা নিয়েও।

কিন্তু তার কোনও কিছুই তাঁর এখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়। আজকের পার্থ অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। দুর্নীতির যে কলঙ্ক গায়ে মেখে, তাঁর দল ও সরকারের মুখে কালি লেপে এবং সব ক্ষমতা খুইয়ে পার্থকে জেলে যেতে হল, আপাতভাবে শিক্ষা দফতর তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে।

ক্ষমতা ভোগের পাশাপাশি তা জাহির করার উদগ্র বাসনা পার্থ বরাবর পোষণ করেছেন। যত দিন মুকুল রায় তৃণমূলে সক্রিয় ছিলেন, তত দিন তাঁকেই দলে 'দু-নম্বর' বলে মান্যতা দেওয়া হত। অবশ্যই এসবের কোনও লিখিত-পঠিত ঘোষণা থাকে না। কিন্তু তৃণমূলের ভিতরে-বাইরে সবাই একবাক্যে জানতেন এবং মানতেন যে, মমতার পরেই ওই দলে প্রধান ব্যক্তি হলেন মুকুল রায়। দলে অভিষেকের এই উত্থান তখনও হয়নি।

অভিষেককে নিয়ে পার্থের মধ্যে একটি অসূয়া যে কাজ করেছে, তা মোটামুটি সর্বজনবিদিত। গত পুর নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় যা তীব্রতর হয়। অন্য দিকে সংগঠনে নিজের ক্ষমতার রাশ শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিষেকের দিক থেকেও পার্থের সঙ্গে 'সম্পর্করক্ষা' হয়ে পড়েছিল কার্যত আনুষ্ঠানিক।

কিন্তু তার আগে মুকুলকে নিয়েও পার্থের 'চাপ' কম ছিল না। কারণ তিনি মনে করতেন, মমতার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সতীর্থ হিসাবে তাঁর 'গুরুত্ব' কারও চেয়ে কম হতে পারে না। হয়তো তাই মাঝে মাঝেই 'ঝলসে' উঠে পার্থ বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে, তিনিও মহাসচিব! সংগঠনের অনেক গুরুভার তাঁকেও নিতে হয়। মমতা তাঁকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা সর্বাংশে ভুল, তা নয়। কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব অবশ্যই মমতা তাঁকে দিতেন। তবে সংগঠনে কখনওই তিনি মুকুলকে ছাপিয়ে উঠতে পারেননি। আগেও নয়, পরেও নয়।

একইভাবে সরকারেও পার্থ নিজেই নিজেকে 'মমতার ঠিক পরে' বলে বোঝাতে চেয়েছেন বরাবর। এটিও ছিল তাঁর স্বঘোষিত অবস্থান। অথচ মন্ত্রীর দফতরে অফিসের সময় মতো নিয়মিত হাজির থাকার 'অপবাদ' তাঁকে দেওয়া যাবে না! সল্টলেকের বিকাশ ভবনে তাঁর দফতরে তাঁকে দেখতে পাওয়াও বেশ দুষ্কর ছিল। পরিষদীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও জরুরি কারণ ছাড়া বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন তাঁর পৌঁছতে প্রায়ই বিলম্ব ঘটত। তথাপি নিজের চারপাশে একটি রাশভারী বলয় তৈরি করে তিনি একটি গাম্ভীর্যময় আড়াল খুঁজে নিতেন।

দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার ছিল তাঁর আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণ স্তরের কর্মীরা তো বটেই, 'উঁচু' মাপের কেউ না হলে সাধারণ বিধায়করাও তাঁর কাছে রুক্ষ আচরণ পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একবার পার্থের আচরণ ও কথাবার্তায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। মমতার হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটেছিল। বদমেজাজের আড়াল তৈরি করে রাখার নেপথ্যে পার্থের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের টানাপড়েন, 'বান্ধবী'দের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে শুরু করে নগদ কোটি কোটি টাকা ও সম্পত্তি 'আবিষ্কার' ইত্যাদি বিষয় কতটা সম্পৃক্ত বলা কঠিন। কিন্তু এখন তাঁর পরিণতি থেকে অনুমান করা যায়, মন্ত্রী-জীবনের বিস্তর সময় তিনি হয়তো এমনই নানা কাজে 'ব্যস্ত' থেকেছেন!

যত দূর জানি, এবারের মন্ত্রিসভা গঠনের সময় পার্থের দফতর ঠিক করা নিয়ে দলের অন্দরে একটু মতের অমিল ঘটেছিল। অভিষেক সম্ভবত পার্থকে ফের শিক্ষামন্ত্রী দেখতে চাননি। এমন কি শিল্পমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তও তিনি খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আগেই বলেছি, মমতা সর্বদা তাঁর পুরনো দিনের এই রাজনৈতিক সঙ্গীর 'মর্যাদা' রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তাই পার্থকে ছোটখাটো দফতর দিতে তিনি অসম্মত হন। তাতে শেষ পর্যন্ত পার্থ
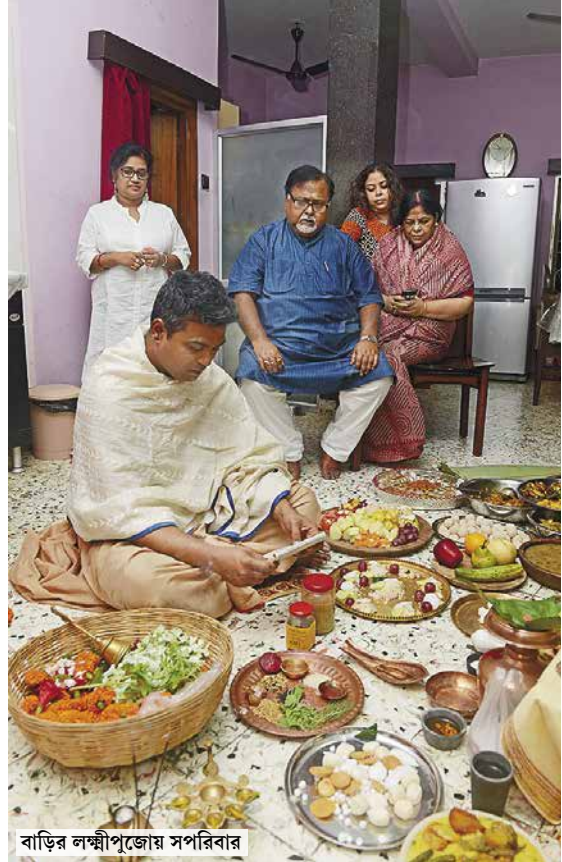
বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় সপরিবার

শিল্পমন্ত্রী হতে পারলেও অচিরেই তাঁর মাথায় মমতার নেতৃত্বে একটি শিল্প পরামর্শদাতা কমিটি গড়া হয়। সেই কমিটিই কার্যত দফতরের নিয়ন্ত্রক হয়। দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে বাণিজ্য সম্মেলন, কোথাও শিল্পমন্ত্রী পার্থের ভূমিকা তাই বোঝা যেত না।
তৃণমূলে আদি-নব টানাপড়েনের নিরিখে এসবের একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সহজেই দেওয়া যেতে পারে। তবে পার্থ সম্পর্কে কোথাও কোনও 'সঙ্কেত' মিলছিল কি? এখন সেটিও বড় প্রশ্ন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী থেকে গেলে পাঁকের পুকুর আরও গভীর হত কিনা, তা-ই বা কে বলবে!
স্ত্রী, মা এবং একমাত্র মেয়ে সোহিনীকে নিয়ে গোছানো ছিল পার্থের নিজস্ব সংসার। আর পোষ্য সারমেয়— গোল্ডেন রিট্রিভার ও পাগ। তাদেরও ভালবেসেছেন প্রায় সন্তানস্নেহে। এমনিতে সবাই পার্থকে শান্তশিষ্ট, পত্নীনিষ্ঠ এবং সংসার-প্রিয় বলেই জেনে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী মারা যান বছর পাঁচেক আগে। আর মা প্রয়াত হয়েছেন দেড় বছরও হয়নি।
পার্থের একমাত্র কন্যাসন্তান বিবাহিত। তিনি কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকেন। জামাই অবশ্য বেশ কিছুকাল এখানেই বেশি থাকছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে একথাও বলা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ পার্থের কিছু ব্যবসার সঙ্গে নাকি জামাইয়ের 'যোগ' আছে। অবশ্যই তা প্রমাণসাপেক্ষ।
নিজের পাড়া নাকতলার পুজো পার্থের আর একটি বড় 'দুর্বলতা'র জায়গা। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের যেমন ছিল একডালিয়া, অরূপ বিশ্বাসের যেমন আছে সুরুচি, ববি হাকিমের চেতলা অগ্রণী, পার্থের তেমনই নাকতলা উদয়ন। এই পুজোকে বড় এবং আরও বড় করে তোলার পিছনে পার্থের ভূমিকা একশ'ভাগ। তাঁর মন্ত্রিত্ব এবং ক্ষমতার ঝলকানি এই পুজোকে অল্পকালের মধ্যে চোখধাঁধানো উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।
মমতাকে ওই পুজোর উদ্বোধনে হাজির করানোর জন্য ছেলেমানুষের মতো পীড়াপীড়ি করতেও দেখেছি পার্থকে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই মমতা অনেক পুজো প্যান্ডেলে যেতেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মহালয়ার দিন থেকে চরকির মতো ঘুরে ঘুরে তিনি পুজো উদ্বোধন করেন। এটা সবাই জানেন।
একবার সময়ের অভাবে মমতা স্থির করেছিলেন নাকতলায় যাবেন না। সেটা জেনে পার্থ প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। মনে আছে, সে-বার বৃষ্টির মধ্যে যোধপুর পার্কের একটি মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে মমতা গাড়িতে বসে হঠাৎ বললেন, ''পার্থদার পুজোটা ঘুরেই আসি। নইলে খুব কষ্ট পাবে।''
মন্ত্রীসুলভ কায়দা-কেতা বাদ দিয়ে পার্থের দৈনন্দিন জীবনযাপন

মেয়ে সোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতার সঙ্গে
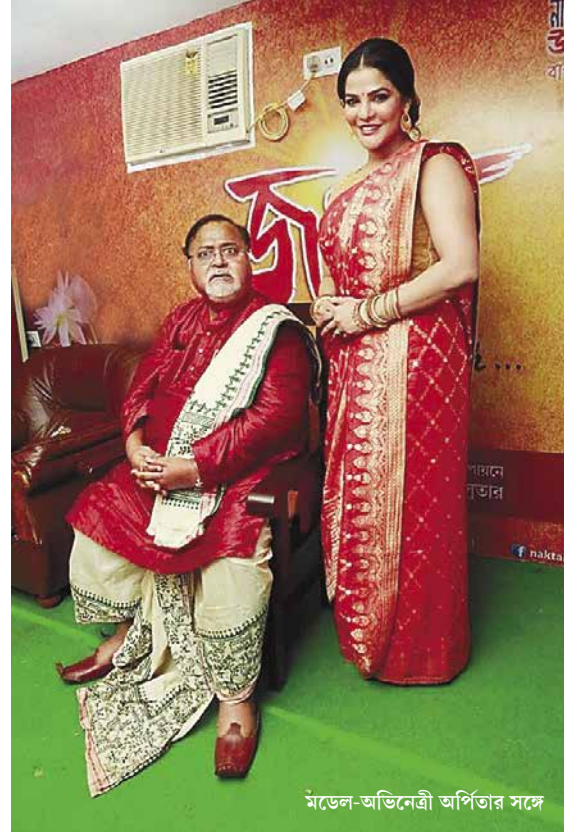
দিনের শেষে পার্থের গাড়ি এসে থামত নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে কালো কাচ ঢাকা গাড়িতে চলে আসতেন অর্পিতা।

কিন্তু বরাবর সাদামাঠা লেগেছে। কোথাও বাড়তি বিলাস-বৈভবের ছাপ বোঝা যায়নি। হাফ পাঞ্জাবি, পাজামা এবং স্নিকার্স ছিল তাঁর চেনা পোশাক। খাওয়াদাওয়াতেও সোজাসাপ্টা। বিধানসভায় থাকলে কখনও হয়তো স্পিকারের ঘরে গিয়ে বলেছেন, ''একটু ঘুগনি খাওয়ান তো, বিমানদা!'' কখনও হাইকোর্টের সামনে থেকে মুড়ি-বাদাম, শিঙাড়া-জিলিপি আনিয়ে নিজের ঘরে দেদার আড্ডা জমিয়েছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। এবারেই রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের দিন বিধানসভায় এক আর্দালিকে ডেকে বলেছিলেন, ''বৃষ্টি পড়ছে। একটু গরম গরম তেলেভাজা খাওয়াতে পারিস!'' শোনা যায়, জেলে গিয়েও নাকি বায়না করে তেলেভাজা খেয়েছেন তিনি।
কিন্তু এখন তাঁর সম্পর্কে পরতে পরতে আরও যে সব খবরাখবর সামনে এসে পড়ছে, তাতে ওই সারল্যের ভাবমূর্তি ধাক্কা খেতে বাধ্য। টাকা, সোনাদানা, বাড়ি-জমিই শুধু নয়, পার্থের 'বান্ধবী-বিলাস' বোধহয় পার্থসারথি কৃষ্ণকেও হার মানিয়ে দেবে!
তাঁর 'বিশেষ বান্ধবী'র সংখ্যা কত তা নিয়ে বাজারে গুঞ্জন প্রচুর। তবে ইডি-র তদন্তের আদি পর্বেই যেসব নাম উঁকিঝুঁকি মারছে, তাতে পার্থের 'প্রেম' গোপন নেই। তা যেন আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে!
টলিপাড়ায় ঘোরাফেরা করা মডেল তথা ছোট অভিনেত্রী অর্পিতা

'শিক্ষামন্ত্রী' পার্থের সঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মোনালিসা

এমন অনেকের সঙ্গেও পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক রাখতেন বলে অনুমান, যাঁরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

মুখোপাধ্যায় পার্থের সঙ্গেই জেলে গিয়েছেন। আপাতত তিনিই পার্থের সবচেয়ে 'কাছের' সঙ্গিনী! অর্পিতার বিভিন্ন বাড়ি ও ফ্ল্যাট থেকেই পাওয়া গিয়েছে নগদ কোটি কোটি টাকা, গয়নাগাঁটি। তাঁর কথায় পরে আসছি।

এ ছাড়াও আরও যে দু'-তিনজনের সঙ্গে পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক রাখতেন বলে তদন্তকারীদের অনুমান, তাঁরা প্রধানত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সম্পর্কগুলি তৈরিও হয়েছে পার্থ শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরে। এমনকি, তাঁদের কারও মাধ্যমে তাঁর প্রতিবেশী রাষ্ট্রে লেনদেন চালানোর কাজকর্ম চলত বলেও সন্দেহ। তবে তদন্তের প্রথম ধাপে আপাতত অর্পিতা একাই একশো! কার্যত মেয়ের বয়সি অর্পিতার সঙ্গে পার্থের সম্পর্কের যোগসূত্র আসলে সিনেমাপাড়া। একজন সুপরিচিত অভিনেত্রীও। 'ভাগ্যান্বেষণে' বেরিয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী পার্থের দর্শনলাভ হয় অর্পিতার! তার পরে? প্রথম দর্শনেই?

অনেকটা তেমনই। গোড়ায় পার্থের নাকতলার পুজোর মঞ্চে অর্পিতাকে দেখা যেত। সেখানেই একবার মমতার সঙ্গেও তাঁকে পরিচয় করানো হয়। ক্রমে মঞ্চ থেকে বিজন গৃহকোণে অর্পিতার উত্থান!

সান্নিধ্যের 'উষ্ণতা' বাড়তে বাড়তে নাকি নৈশবিহার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পার্থের গাড়ি এসে থামত একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে আগেই কালো কাচ ঢাকা গাড়িতে চলে আসতেন অর্পিতা। তার পরে তাঁদের নিয়ে গাড়ি ছুটত আরও নিরালা, নিভৃত কোনও গন্তব্যে। ফিরে আসতে রাত কাবার! জনশ্রুতি এমনই। কেউ কেউ আবার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলেও দাবি করে থাকেন। রসিকতা চালু হয়েছিল, এই সব কারণেই পার্থের 'দিন' শুরু হত দুপুরের পরে!

পার্থ-অর্পিতার মধ্যে এমন 'মাখামাখি' সম্পর্ক কত দিনের? উত্তরটি একটু অন্যভাবে খোঁজা যাক।

পার্থের স্ত্রী জয়শ্রী ওরফে বাবলি চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন ২০১৭ সালে। স্ত্রী-বিয়োগের পরে দৃশ্যতই ভেঙে পড়েছিলেন পার্থ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আয়োজনের ত্রুটি রাখেননি। স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় নানাভাবে উদ্যোগীও হয়েছেন স্বামী। প্রয়াত স্ত্রী-র নামাঙ্কিত নানা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করে দিয়েছেন।

তখন কি কেউ জানতেন যে, ২০১২ সালে অন্য এক মেয়ের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিনিকেতনে একটি বাংলো বাড়ি কিনে ফেলেছেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়? ঘটনা হল, সেই মেয়েটিরই নাম অর্পিতা মুখোপাধ্যায়! বাড়িটির নাম আবার 'অপা'। যাতে দু'জনের নামের আদ্যক্ষরের অপূর্ব সম্মিলন! ইডি-র তদন্তে তা-ও সামনে এল। এবার বুঝ লোক, যে জান সন্ধান!

কালে কালে এমন আরও যা যা বের হচ্ছে, সেগুলি সাধারণের দৃষ্টিতে চারিত্রিক স্খলনের পর্যায়ে পড়ে। তাঁর ওই ঘনিষ্ঠার বাড়ি থেকে নগদ কোটি কোটি টাকা কেন পাওয়া গেল, সেই টাকা কার, সেসব বিতর্ক তো আছেই। সঙ্গে রাজনীতিও।

কিন্তু কী করে পার্থ এতগুলি বাড়ি ও ভূসম্পত্তির 'মালিক' হলেন, কেনই বা পরিবারের বাইরের এক বা একাধিক মহিলার সঙ্গে তাঁর এইধরনের অন্তরঙ্গতা ও লেনদেনের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠল, তার জবাব কি রাজনীতির মারপ্যাঁচে মিলবে?

জোকায় ইএসআই হাসপাতালের সামনে

খুব মাতৃভক্ত ছিলেন পার্থ। মায়ের কথা, মায়ের আদেশ তিনি মান্য করতেন সবসময়। ছেলের নামে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ কিছু প্রকাশিত হলে বা পার্থের কোনও কাজ সমালোচিত হলে তাঁর মা বিচলিত হতেন। বকতেন। পার্থ মাথা নিচু করে বকুনি শুনতেন এবং বলতেন, "আর এমন হবে না।" ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি নিজেই বলেছেন এই সব। আজ যদি তাঁর মা ইহলোকে থাকতেন এবং ছেলের এই সব কীর্তিকলাপ তাঁকে দেখতে, শুনতে, জানতে হত, কী ঘটত তা হলে!

সুন্দর এসো হে...

পশ্চিমি পোশাক ভাবনার সঙ্গে যখন সম্মিলিত হয় দেশজ চিন্তন, তখন ফ্যাশনের দিগন্ত উন্মোচিত হয় নতুনতর আঙ্গিকে। ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফ্যাশনের মূলমন্ত্রই হল, চিরাচরিত পোশাকের কাট বা ড্রেপকে 'ব্রেক' করে ফিউশনের সৃষ্টি। অভিনেত্রী **প্রিয়াঙ্কা সরকারের** স্টাইল বোধের সঙ্গে মিলেছে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফ্যাশনের সুচারু বিন্যাস। সাজের অ্যাকসেসরিজ় নায়িকার স্নিগ্ধ, নম্র ব্যক্তিত্ব।

শিয়ারের জাদু

শর্ট টিউব ককটেল ড্রেসের ইউএসপি নেটের স্বচ্ছ ট্রেল। পাথরের দ্যুতিতে দীপ্তিময়ী প্রিয়াঙ্কা। সাজটির পরতে জড়িয়ে রয়েছে উৎসবের আমেজ।

পোশাক: কোমল সুদ

সবুজে সতেজ

অ্যাসেমেট্রিক্যাল টপে রয়েছে ডিজ়াইনারের ফিউশন ভাবনা। বটমওয়্যারেও রয়েছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল কাট। চুলে মিডল পার্টিং করে ক্লিপ সেট করা হয়েছে। ব্যস, সাজ সম্পূর্ণ।

পোশাক: ভেদিকা এম

শ্যামলে শোভনে

পেস্তা অলিভ ওয়ালপেপার প্রিন্টেড টপ ও ফ্লেয়ার্ড প্যান্টসের সঙ্গে শেডেড এমব্রয়ডারি করা কেপের যথাযথ সঙ্গত। নায়িকার দেহভঙ্গি ও চোখের মায়াবি আর্কষণ তাঁকে করে তুলেছে সর্বাঙ্গসুন্দর।

পোশাক: দেব আর নীল

ললিত বিভঙ্গে
রুবি পিঙ্কের গাঢ় উষ্ণতায়
প্লিটেড লং ড্রেস যে কোনও
অনুষ্ঠানে নজর কাড়বে।
স্টেটমেন্ট জুয়েলারি ও
স্টিলেটোর মিশেলে
স্টাইলের পারদ ঊর্ধ্বগামী।
পোশাক: ইবসিস জ়িরোওয়ান

আমি চিনি গো চিনি তোমারে

সিকুইন জাম্পসুটের পরতে পরতে জড়িয়ে আসে উৎসবের ঔজ্জ্বল্য। এ ধরনের পোশাকের সঙ্গে শুধু হাই হিলস এবং ইয়ারিংস যথেষ্ট, সাজ সম্পূর্ণ করতে।

পোশাক: সস্যা

নীলাভ সন্ধ্যা

পুরো পোশাকটির আনইভন স্টাইলই হল তার নিজস্ব স্বাক্ষর। ককটেল ড্রেসে সান্ধ্য পার্টির মধ্যমণি হওয়া আটকায় কে!

পোশাক: নেহা গান্ধী

ডেনিমে
শাড়িতে
শারদসাজে
পোশাকের রং শরতের
দোসর। ডেনিমের সঙ্গে
শাড়ির ফিউশন ড্রেসে
যেন কাশফুলের শুভ্রতা।
পোশাক: ডেনিম দরজ়ি
ছবি: সোমনাথ রায়
লোকেশন: দি ওবেরয় গ্র্যান্ড
মেকআপ: অভিষেক ইন্দু
হেয়ার: কুশল মল্লিক
স্টাইলিং: আয়েষা দেশমুখ
জুয়েলারি: অ্যাড্রোস ক্রিয়েশনস,
এ সি মার্কেট
ফুড পার্টনার: বাবু কালচার,
ডোভার লেন পোস্ট অফিস

অবহেলা নয় গ্যাস্ট্রাইটিসকে

পেটের প্রদাহজনিত রোগ হল গ্যাস্ট্রাইটিস। জীবনযাপন বদলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এই রোগকে। তবে ঠিক সময়ে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। রোগের কী-কী উপসর্গ দেখলে সচেতন হবেন, সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করলেন **সৌরজিৎ দাস**

পেটে গ্যাস, অম্বল, বুক জ্বালা, বদহজম, পেট ভর্তি বা ফোলা ভাব, পেটে ব্যথা, পেটে মোচড়, বারে বারে ঢেকুর তোলা, খিদে না হওয়া—আমবাঙালির চিরাচরিত সমস্যা। এমন যে কোনও সমস্যাকে অধিকাংশ মানুষই 'গ্যাস্ট্রাইটিস' আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত, ইংরেজিতে 'আইটিস' কথাটির অর্থ হল ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহ। আঘাত বা সংক্রমণের কারণে আমাদের শরীরের কোনও জায়গা বা অঙ্গ লাল হলে বা ফুলে গেলে অঙ্গটির নামের সঙ্গে 'আইটিস' যোগ করা হয়। টনসিল ফুলে গেলে যেমন টনসিলাইটিস, ফ্যারিঙ্কস ফুলে গলায় ব্যথা হলে বলা হয় ফ্যারিনজাইটিস। তেমনই গ্যাস্ট্রাইটিস হল পেটের প্রদাহজনিত রোগ। যদিও পেটের সব সমস্যা শুধু পেটের কারণে হয় না। যেমন, যকৃৎ-এর সমস্যা, অগ্ন্যাশয়ে সংশ্লিষ্ট এনজ়াইম (উৎসেচক) কিংবা অন্ত্রে খাবার হজম হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হলেও বদহজম হতে পারে। সে সব কিন্তু গ্যাস্ট্রাইটিস নয় বলেই জানালেন জেনারেল ফিজ়িশিয়ান ডা. সুবীর মণ্ডল। এই বিষয়ে একই অভিমত গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্ট অভিজিৎ চৌধুরীরও। তাঁর মতে, পেট ফোলা, ক্ষুধামান্দ্য, পেট ভার, বদহজমের সমস্যা, বারে বারে ঢেকুর তোলার মতো সমস্যাগুলি 'ডিসপেপসিয়া'র কারণে হয়ে থাকে। তিনি বললেন, গ্যাস্ট্রাইটিস নির্ণীত হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে কিংবা এন্ডোস্কপির মাধ্যমে।

মানুষের শারীরিক কার্যক্রমে প্রতিটি জিনিসেরই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, আমাদের পাকস্থলীতে প্রোটিন হজম করার জন্য অ্যাসিডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই, তখন তা হজম করার জন্য পাকস্থলীতে বেশি পরিমাণে অ্যাসিড

নিঃসৃত হয়। ওই অ্যাসিড পাকস্থলীতে থাকা উৎসেচক, যেগুলি প্রোটিন হজম করতে সাহায্য করে, সেগুলিকে উদ্দীপিত করে। তা ছাড়া ওই অ্যাসিড প্রোটিনের সঙ্গে মিশে সেটাকে অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন-এ রূপান্তরিত করে। উৎসেচকগুলি তবেই এই অ্যাসিড মেটাপ্রোটিনকে হজম করতে পারে। অধিকাংশ বাঙালি বাড়িতে মাংস হলে শেষ পাতে সাধারণত চাটনি থাকে। তার মূল কারণ, এই চাটনি অতিরিক্ত অ্যাসিডের কাজ করে ওই মাংস হজম করার জন্য। তাই বিয়েবাড়ির খাওয়া খেয়ে এসে অ্যান্টাসিড খাওয়া উচিত নয় বলে জানালেন ডা. মণ্ডল। কারণ তাতে শরীরে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হজমের প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়।

মানুষের শরীরে এমন প্রক্রিয়া ঘটে কেন? ডা. মণ্ডলের মতে, এর সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা যদি না হত, তা হলে পাকস্থলীর মধ্যে যে উৎসেচক তৈরি হয়, তাতে পাকস্থলীটি নিজেই হজম হয়ে যেত, যে হেতু সেটাও প্রোটিন দিয়েই তৈরি। তাই পাকস্থলী থেকে প্রোটিন হজম করার উৎসেচক নিষ্ক্রিয় ভাবে নির্গত হয়। তা ছাড়া, পাকস্থলী থেকে অ্যাসিডের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত শ্লেষ্মা বা মিউকাস তৈরি হয়, যেটা ওই অ্যাসিডকে পাকস্থলীর ভিতরের আস্তরণের সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয়। এই প্রক্রিয়াটি কোনও ভাবে বিগড়ে গেলে, তার প্রভাব পড়ে পাকস্থলীর ওই অন্তর্বর্তী আস্তরণের উপরে। যার ফলে হতে পারে গ্যাস্ট্রাইটিস।

ডা. চৌধুরীর মতে, ডিসপেপসিয়া দুটো কারণে হতে পারে। এক, যদি কারও পেটে আলসার থাকে যেটা এন্ডোস্কপি করে দেখা গিয়েছে, সেটাকে বলে আলসার ডিসপেপসিয়া। আর ডুয়োডিনামে কোনও আলসার না থাকলে তাকে বলা হয় নন-আলসার ডিসপেপসিয়া। অধিকাংশ মানুষেরই পেট ফোলা, পেট ভার, ক্ষুধামান্দ্য, নন-আলসার ডিসপেপসিয়ার কারণে হয়ে থাকে। যদিও এর ভিত্তি কী, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। পেটে খাবার হজমের সাধারণ কার্যকলাপ ব্যাহত হলেই এটা হয়ে থাকে বলে জানালেন তিনি।

রোগের কারণ

কী ভাবে বিগড়ে যেতে পারে সাধারণ প্রক্রিয়াগুলি বা ক্ষতি হতে পারে পেটের অন্তর্বর্তী আস্তরণের? এক, সংক্রমণ হলে। বিশেষ করে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি (এইচ পাইলোরি) নামে এক ব্যাকটিরিয়া থেকে। এটি খাদ্যনালির সবচেয়ে খারাপ ধাঁচের সংক্রমণ। এই সংক্রমণ হলে রোগীর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। দুই, ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া নিয়মিত পেনকিলার খেলে। তিন, অত্যধিক মদ্যপান করলে বা সিগারেট খেলে। চার, বার্ধক্যের কারণে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা নিঃসরণ কমে আসে, পেটের অন্তর্বর্তী আস্তরণ পাতলা হয়ে যায়। পাঁচ, যদি শরীরে যে অনুপাতে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে সেই অনুপাতে শ্লেষ্মা তৈরি না হয়। একে বলে ‘ট্রু অ্যাসিডিটি’। ছয়, অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে। সাত, মানসিক চাপ বা অবসাদ। মানসিক চাপের ফলে মানুষের অ্যাসিড নিঃসরণ বেশি হয়। আট, ক্যানসার বা টিউমর থাকলে পেটের সেই অংশ থেকে শ্লেষ্মা বেরোতে পারে না। তখন সেই জায়গা অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে সহজে ক্ষয় হয়। ফলে পেট জ্বালা করতে থাকে। নয়, অটোইমিউনিটির কারণে। অনেক সময়ে আমাদের শরীর ভুল করে মনে করে কোনও একটি অঙ্গ শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। ফলে তার বিরুদ্ধে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি। সেগুলি অঙ্গটির ক্রমশ ক্ষতি করতে থাকে, পাকস্থলীর এমন ক্ষতি থেকেও হতে পারে গ্যাস্ট্রাইটিস। একই ধরনের লক্ষণগুলির কারণে ডিসপেপসিয়াও হয়ে থাকে বলে জানালেন ডা. চৌধুরী। যদিও হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরির কারণে ডিসপেপসিয়া হওয়ার বিষয়টিতে বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি

গ্যাস্ট্রাইটিস-এর মূল লক্ষণ হল পেটজ্বালা এবং পেটের উপর দিকে, দুই পাঁজরের খাঁজের নীচের দিকে ব্যথা হওয়া।

নন তিনি। তাঁর মতে, আমাদের সবার পেটেই এই জীবাণু থাকে। জন্মের সময় থেকেই এটি পেটে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে। এবং খুব কম সংখ্যক মানুষের এর কারণে পেটের রোগ হয় বলে তাঁর অভিমত। এর থেকে সাধারণত আলসার হয়। যদিও তাঁর মতে, ডিসপেপসিয়ার অন্যতম বড় কারণ মানসিক চাপ।

লক্ষণ

গ্যাস্ট্রাইটিস-এর মূল লক্ষণ হল পেটজ্বালা এবং পেটের উপর দিকে, দুই পাঁজরের খাঁজের নীচের দিকে ব্যথা হওয়া। এ ছাড়া পেটে হজমের প্রক্রিয়া ঠিকমতো না হওয়ার ফলে পেট ভার থাকতে দেখা যায়। ডাক্তারি ভাষায় একে বলা হয় ‘গ্যাস্ট্রিক ফুলনেস’। খাওয়ার ইচ্ছে থাকে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রে খাবার ঠিকমতো হজম হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বমি বমি ভাব থাকে রোগীর। এবং গ্যাস্ট্রাইটিস-এর সমস্যা যখন আরও প্রকট হয়ে ওঠে তখন ক্রমাগত বমিও হতে থাকে।

ঢেকুর তোলা (বেলচিং) বা বায়ুবিয়োগ সাধারণত সবাই করে থাকেন। কিন্তু এগুলি যখন বেশি মাত্রায় কেউ করেন তখন সেই ব্যক্তিকে পেট ফোলা কিংবা পেটের ব্যথায় ভুগতে দেখা যায়। যদিও এগুলি সাধারণত কোনও বড় রোগের লক্ষণ না-ও হতে পারে। বরং জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলি কমানো যায়। বেশি বায়ু গিলে ফেলার কারণে লোকে অত্যধিক ঢেকুর তোলার

সমস্যায় ভুগতে পারেন। গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্ট জয়ন্ত দাশগুপ্তের মতে, কেউ খুব তাড়াতাড়ি খাবার বা জল খেলে, খাওয়ার সময় কথা বললে, চিউইংগাম চিবোলে, জোরে জোরে শক্ত ক্যান্ডি চুষলে, ঠান্ডা পানীয় খেলে বা ধূমপান করলে এটা হতে পারে। অ্যাসিড রিফ্লাক্স-এর কারণে অনেক সময়ে লোকে বেশি ঢেকুর তোলে। কারও যদি ধারাবাহিক ঢেকুর তোলার সমস্যা থাকে, তা হলে সেটা পেটের অন্তর্বর্তী আস্তরণের প্রদাহ কিংবা হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি (এইচ পাইলোরি) নামক ব্যাকটিরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণের কারণেও হতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়া পেটে আলসার হওয়ার অন্যতম কারণ। এই সব ক্ষেত্রে রোগীর বুক জ্বালা বা পেটে ব্যথাও হয়ে থাকে।

ফ্ল্যাটুলেন্স হল অন্ত্রে গ্যাস তৈরি হওয়া। পেটে হজম না হওয়া খাবার যখন পেটে থাকা ব্যাকটিরিয়ার কারণে ফারমেন্টেড হয়ে যায়, তখন ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং বৃহদন্ত্রে গ্যাস তৈরি হয়। ডা. দাশগুপ্ত জানালেন, অনেক সময় খাবারের কিছু বিশেষ উপাদান লোকে হজম করতে পারেন না। যেমন, গম, বার্লি বা ওটসের উপাদান গ্লুটেন কিংবা দুধজাতীয় পণ্য কিংবা ফলের সুগার। তার ফলেই গ্যাস তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া ফ্যাটযুক্ত খাবারও অনেকের ক্ষেত্রে অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পেট ফোলা বা 'ব্লোটিং' কেন হয়, সেই বিষয়ে এখনও সে ভাবে কিছু জানা যায়নি। অনেক সময়ে রোগীর পেটের আকার বেড়ে যেতে দেখা যায়, যাকে 'ডিসটেনশন' বলা হয়, জানালেন ডা. দাশগুপ্ত। লোকে অনেক সময়ে এই পেট ফোলাকে 'ব্লোটিং' বলে অভিহিত করেন, বিশেষ করে যদি এই সমস্যা ঢেকুর তুলে, বায়ুবিয়োগ করে কিংবা মলত্যাগ করে না কমে।

রোগ নির্ণয়

এ ক্ষেত্রে ডা. মণ্ডল জানালেন প্রথমত, রোগীর স্টুল টেস্ট করে দেখে নেওয়া হয়, কোনও ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ হয়েছে কি না। এ ছাড়া ডাক্তারের নির্দেশমতো এক মাস অ্যান্টাসিড খেয়েও যদি রোগী না সারেন, তখন তাঁর আপার জিআই এন্ডোস্কপি বা ইসোফেগোগ্যাস্ট্রোডুয়োডেনোস্কপি-র প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই পরীক্ষা করার সময় র‍্যাপিড ইউরিয়েজ টেস্ট (এক ধরনের রাসায়নিক টেস্ট বায়প্সির মতো) করে দেখে নেওয়া হয় এইচ পাইলোরি সংক্রমণ আছে কি না।

এ ছাড়া বিশেষ ধরনের এক্স-রে করা হয়। বেরিয়াম মিল এক্স-রে। এ ক্ষেত্রে 'রেডিয়ো ওপেক' উপাদান রোগীকে খাইয়ে দেওয়া হয়। সেটি পাকস্থলীতে গিয়ে পাকস্থলীর আকার নেয়। এ বার এক্স-রে করে যদি কোথাও উঁচু নিচু অংশ ধরা পড়ে, তা হলে চিকিৎসকরা ধরে নেন যে, সেই জায়গায় আলসারের মতো কোনও ক্ষত রয়েছে বা টিউমর আছে। যদিও ডা. মণ্ডলের মতে, এটি পুরনো পদ্ধতি হলেও প্রত্যন্ত স্থানে এমন পরীক্ষার গুরুত্ব অসীম। কিন্তু কারও যদি পেটে অগভীর ক্ষত থাকে, তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। তাই গ্যাস্ট্রাইটিস নির্ণয় করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল আপার জি আই এন্ডোস্কপি।

ডা. দাশগুপ্তের মতে, বেশ কিছু অসুখের কারণে ডিসপেপসিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যেমন, এনএসএআইডি বা নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগের ব্যবহার, ৪০-৫৫ বছরের মধ্যে বয়স

থাকলে, অ্যানিমিয়া, ওজন হ্রাস, অ্যানোরেক্সিয়া (খিদে চলে যাওয়া), ডিসফেজ়িয়া (ঢোক গিলতে অসুবিধে) ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা করাতে হয় অন্যান্য রোগ আছে কি না তা দেখার জন্য। যেমন, আপার জিআই এন্ডোস্কপি করে দেখে নেওয়া হয় রোগীর ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস (বিশেষ করে এইচ পাইলোরি-র কারণে), পেপটিক আলসার, ইরোসিভ ইসোফেজাইটিস, ইসোফেগাস এবং পেটে কোনও ম্যালিগন্যান্সি আছে কি না। এ ছাড়া ইউএসজি এবং সিইসিটি অ্যাবডোমেন করে দেখে নিতে হয় প্যানক্রিয়াটিক কিংবা হেপাটোবিলিয়ারি রোগ রয়েছে কি না, যেটা আশঙ্কাজনক লক্ষণযুক্ত ডিসপেপসিয়া বলে মনে করা হচ্ছে।

চিকিৎসা

গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণ নির্ণয়ের পরে সেই অনুযায়ী করা হয় চিকিৎসা। যদি ক্যানসার বা আলসারের কারণে সমস্যা হয়ে থাকে, তা হলে সেই রকম চিকিৎসা করা হয়, এইচ পাইলোরি হলে আর এক রকম। তবে যদি চিকিৎসার আগেই রোগীর ট্রিটমেন্ট করতে হয় তা হলে চিকিৎসকেরা সাধারণত অ্যান্টাসিড দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মূলত প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) কিংবা হিস্টামিন এইচ২-রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টস (এইচটু ব্লকার) ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া লিকুইড অ্যান্টাসিড বা সুক্রালফেটও দেওয়া যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, অ্যান্টাসিড খেয়েও কিন্তু গ্যাস্ট্রিক ফুলনেস, বমি ভাব, ডায়রিয়া হতে পারে। তাই ঠিকমতো জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা ঠিক রোগ নির্ণয় করেন।

ডা. চৌধুরীর মতে, ডিসপেপসিয়া-র বিভিন্ন লক্ষণ দেখে চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কোন রোগীকে দেখেশুনেই চিকিৎসা করা যায় আর কাদের আরও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে রোগীর পূর্ণ রোগের ইতিহাস জানা এবং ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা খুবই দরকার বলে জানালেন ডা. দাশগুপ্ত।

নিরাময়

গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে বাঁচতে চাই ঠিক লাইফস্টাইল। যে খাবারগুলি শরীরে ক্ষতি করতে পারে, সেগুলি থেকে দূরে থাকুন। বেশিক্ষণ পেট খালি রাখা চলবে না। কম করে বারে বারে খাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া খালি পেটে কখনও জল খাওয়া উচিত নয়, বিজ্ঞানসম্মত কারণেই। ডা. মণ্ডলের মতে, যেহেতু কোনও ভারী জিনিস পেটে পড়লেই 'ঘুমিয়ে থাকা' উৎসেচকগুলি খাবার হজমের প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, তাই খালি পেটে জল খেলেও সেই প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। জল যেহেতু খাদ্য নয়, তাই সক্রিয় উৎসেচকগুলির পাকস্থলীর অন্তর্বর্তী আস্তরণ ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা থাকে। যাঁদের ক্রনিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছে তাঁদের প্রত্যেক বার খাবারের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় কোনও খাবার থাকতে হবে। যেমন, সয়াবিন, ডাল, ছাতু বা ছানা ইত্যাদি। ডা. মণ্ডলের মতে, এর ফলে পেটের অ্যাসিড এবং উৎসেচক ওই প্রোটিন জাতীয় খাবার হজমের কাজে ব্যবহৃত হয়ে গেলে, পাকস্থলীর আস্তরণের ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়।

ডা. দাশগুপ্ত জানালেন, কয়েকটি পদক্ষেপ করলে অত্যধিক ঢেকুর তোলা কমানো যেতে পারে। যেমন, ধীরে ধীরে খাওয়াদাওয়া করা, কার্বোনেটেড পানীয়, চিউইংগাম কিংবা শক্ত ক্যান্ডি না খাওয়া, ধূমপান না করা, কয়েক দিন অন্তর দাঁত দেখানো, বেশি চলাফেরা করা, বুক জ্বালা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টাসিড বা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) খাওয়া ইত্যাদি। গ্যাস কমাতে হলে কিছু খাবার এড়িয়ে চলা ভাল। যেমন, বিনস, মটরশুঁটি, শাক, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, ব্রকোলি, ফুলকপি, মাশরুম, কিছু বিশেষ ফল।

গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে বাঁচতে ঠিক জীবনযাপন দরকার। যে খাবারগুলি শরীরের ক্ষতি করতে পারে, সেগুলি থেকে দূরে থাকুন।

এ ক্ষেত্রে এক-একটা খাবার না খেয়ে দেখা উচিত তাতে গ্যাসের সমস্যা কম হচ্ছে কি না। অনেক সময় দুধজাতীয় খাবার খেলে সমস্যা হয়। এই সব মানুষ ল্যাক্টোজ় ইনটলারেন্ট বলে এই সমস্যা হয়ে থাকে। ফলে এগুলি এড়িয়ে চলা ভাল বলেই অভিমত ডা. দাশগুপ্তের।

স্বভাবগত পরিবর্তনের কারণে ঢেকুর তোলা কিংবা খাবার পরিবর্তনের ফলে পেটে গ্যাস কমানো গেলে পেট ফোলার সমস্যা কমতে পারে। ফলে যে সব রোগীর ডিসপেপসিয়ার হালকা কিংবা মাঝারি লক্ষণ রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রোগটি সম্পর্কে জ্ঞান বিশেষ কাজে আসে। বারে বারে অল্প পরিমাণে খাওয়া, বেশি তেল-মশলা কিংবা ফ্যাটযুক্ত খাবার কম খাওয়া, ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করার পাশাপাশি অ্যাসপিরিন এবং এনএসএআইডি ব্যবহারে রাশ টানা প্রয়োজন। কিন্তু জীবনযাত্রার পরিবর্তনেও যাঁদের কাজ হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে ড্রাগ থেরাপি কাজে লাগতে পারে বলে জানালেন ডা. দাশগুপ্ত। প্রাথমিক ফার্মাকোথেরাপিতে পিপিআই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এইচ পাইলোরি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঠিক পরীক্ষা ও সেটি নির্মূল করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা উচিত। এ ছাড়া রোগী যদি মানসিক অবসাদে ভোগেন, তাঁরও চিকিৎসা করতে হবে।

ডা. মণ্ডলের মতে, গ্যাস্ট্রাইটিস কখনওই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ, এই রোগ বেশি দিন ফেলে রাখলে আলসার হতে পারে। তাই বাড়িতে চিকিৎসা না করে, সমস্যা হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত, যাতে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করে শীঘ্র চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব। কে বলতে পারে, এই সমস্যার মূলে ক্যানসারের মতো মারণরোগ লুকিয়ে আছে কি না। তবে, ডিসপেপসিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ জীবনযাপন এবং অত্যধিক মানসিক চাপ বর্জন করলে এই রোগের হাত থেকে অনেকটাই মুক্তি মেলে বলেই দাবি ডা. চৌধুরীর।

ছবি: অমিত দাস
মডেল: সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা, মোনালিসা পাহাড়ি শতপতি, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী
মেকআপ: ধীমান ঘোষ
পোশাক: অনুশ্রী মলহোত্রা (সায়ন্তনী), একচালা (দেবজ্যোতি)
ফুড পার্টনার: সোল দ্য স্কাই লাউঞ্জ, লিটল রাসেল স্ট্রিট
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা, চকগড়িয়া

এক চিলতে আমেরিকা

আমেরিকা মানেই এক আধুনিক ঝলমলে দেশ। কিন্তু সে দেশের মধ্যেও রয়েছে অনেক দেশ। আদতে তার অঙ্গরাজ্যগুলির ইতিহাস। রয়েছে নানাবিধ মানুষ। লিখছেন **কুন্তক চট্টোপাধ্যায়**

গেট পেরিয়ে ঢুকতেই গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন 'মেরিলিন মনরো'। একমুখ হাসি। যেন কত দিনের পরিচিত। থুড়ি মেরিলিন নন, বরং হলিউডের বিখ্যাত তারকার অবতার। তবে এক ঝলকে তফাত বোঝা দায়।

এটাই বোধ হয় জায়গার গুণ। পলকেই তৈরি করতে পারে মায়াজগৎ। তাই বিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়! জায়গার নাম ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো। হলিউডের সেরা সেরা সিনেমার নির্মাণস্থল। টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো পাড়া দেখে অবশ্য হলিউডি বিশালত্ব বোঝা দায়। তবে ছোট্ট একটা উদাহরণই দিলেই সহজে বোঝা যেতে পারে। ঠিকানা অনুযায়ী, ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো কোনও শহরে অবস্থিত নয়। কারণ, তার নিজস্ব একটি 'সিটি কোড' রয়েছে। অর্থাৎ শহরের নামই ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো!

শুধু ইউনিভার্সাল নয়, লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের বাইরে ডিজ়নি-সহ তাবড় সিনেমা নির্মাতা সংস্থার এক-একটি স্টুডিয়োই যেন ছোট ছোট এক-একটি শহর।

শহরের খতিয়ান ছেড়ে এ বার ফিরে আসি দর্শনবৃত্তান্তে। বাইরের যে মার্কিনি শহরের চেহারা, তা বদলে গেল ভিতরে পা দিতেই। টয় ট্রেনে চেপে স্টুডিয়ো ঘুরতে বেরিয়ে তো আরও বিস্মিত হলাম। রাস্তার আঁকেবাঁকে বদলে যায় দৃশ্যপট। ট্রেনে থাকা গাইড যুবক বেজায় রসিক। ট্রেন এসে একটি পুকুরের সামনে দাঁড়াতেই সে বলল, ‘‘এই হল সমুদ্র। এখানেই 'জস' সিনেমার সেই অতিকায় হাঙরের বাস।’’ ব্যাপারটিকে গল্প ভাবার সময়ও পেলাম না। আচমকা জল থেকে উঠে এল

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েস হল

দৈত্যাকায় হাঙর। তবে জ্যান্ত নয়, নেহাতই পুতুল। এ ভাবেই চোখের সামনে পেরিয়ে গেল একের পর এক সিনেমার সেট। আচমকা দেখি, অতিকায় একটি এরোপ্লেন। দেখেই মনে হচ্ছে, সদ্য ভেঙে পড়েছে। ধোঁয়াও বেরোচ্ছে! তবে দুর্ঘটনার শরিক আমরা ছিলাম না। স্টিভেন স্পিলবার্গের 'ওয়ার অব দ্য ওয়র্ল্ডস'-এর সেট। বিখ্যাত পরিচালক বাতিল হওয়া আস্ত বিমান এনে ভেঙে ওই দৃশ্যপট তৈরি করেছিলেন।

এ সব ঘটনাই বছর তিনেক পুরনো। কোভিড কী জিনিস, তা তখনও পৃথিবী জানত না। সেই সময়েই মার্কিন সরকারের একটি আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানে পাড়ি দিয়েছিলাম আমেরিকায়। একেবারে মার্কিন মুলুকের পূর্ব দিকের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ধাপে ধাপে পিটসবার্গ, ডেনভার পেরিয়ে পশ্চিমের রিভারসাইড, লস অ্যাঞ্জেলেস। আমেরিকা বললেই চটজলদি গগনচুম্বী বহুতল, ঝাঁ চকচকে দুনিয়া মনে পড়ে। তবে ঝাঁ চকচকে দুনিয়ার মধ্যেও আরও অনেক পৃথিবী বাস করে। সেই পৃথিবী আশ্রয়হীন মায়ের সন্তানকে নিয়ে ফুটপাথে থাকার পৃথিবী। সেই পৃথিবী পড়ন্ত বিকেলে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের নদীর পাড়ে বসে অতীত রোমন্থনের। সে পৃথিবীতে স্মিথসোনিয়ান মিউজ়িয়াম কিংবা নিউজ়িয়াম (সংবাদ বা নিউজ় সংক্রান্ত মিউজ়িয়াম) থাকে। সে পৃথিবীতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করতে আসা ব্রাজ়িলীয় তরুণ ভারতকে চেনেন শাহরুখ খানের নামে!

ওয়াশিংটন ডিসি-র কথাই যদি ধরি, সে এক মস্ত শহর। মার্কিন প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু তার বাইরে ছড়িয়ে আছে স্মিথসোনিয়ানের সম্ভার। সব ক'টি মিউজ়িয়াম ঘুরতে এক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। সে সুযোগ অবশ্য হয়নি। তাই তড়িঘড়ি টুঁ মেরেছিলাম ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজ়িয়ামে। সেখানেই তো রয়েছে নীল আর্মস্ট্রংয়ের স্পেস সুট। সেটা দেখার পরেই হাতে চাঁদ পেয়েছিলাম! প্রবাদ নয়,

হলিউড স্ট্রিট

পিটসবার্গের কেবল কার স্টেশন

নিউজ়িয়াম

'ওয়ার অব দ্য ওয়র্ল্ডস'-এর সেট

পিটসবার্গের প্রাক্তন মেয়র রিচার্ড ক্যালিগুরির মূর্তি

পিটসবার্গের রাগবি স্টেডিয়াম চত্বর

পাশেই এক টুকরো বার্লিনের পাঁচিল। সমাজতন্ত্রকে পরাস্ত করে ধনতন্ত্রের একাধিপত্যই তো আমেরিকার পরমার্থ।

কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। কারণ, সেখানেই চাঁদের এক টুকরো পাথর রয়েছে। দর্শকেরা তা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে পারেন। আর দেখেছিলাম, নিউজ়িয়াম। আমেরিকার সংবাদের ইতিহাসের তাবড় খবরের কাটিং, বিখ্যাত সাংবাদিকদের ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি রয়েছে। 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির' খবরের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। দেশের শাসকের সেই বিপদের সব বিবরণ রয়েছে সেখানে। এবং হ্যাঁ, আমেরিকার সর্বকালের সেরা 'যুদ্ধজয়ের' স্মৃতিও সাজানো রয়েছে। না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়। সোভিয়েত পতনের পরে লেনিনের মূর্তি ভাঙার ছবি এবং মূর্তির ভগ্নাংশও। পাশেই এক টুকরো বার্লিনের পাঁচিল। সমাজতন্ত্রকে পরাস্ত করে ধনতন্ত্রের একাধিপত্যই তো আমেরিকার পরমার্থ। জনজীবনের কথাই যদি ধরি তা হলে ওয়াশিংটন ডিসি নিঃসন্দেহে অনেকটাই নিঃসঙ্গ। চলতি কথায়, আমলা, রাষ্ট্রদূতেরা বাদে ওয়াশিংটন ডিসির বাসিন্দা বেশির ভাগই বয়োবৃদ্ধ ধনীরা। তার চেয়ে বরং অনেক বেশি প্রাণবন্ত পেনসিলভেনিয়ার পিটসবার্গ (তবে আদত উচ্চারণ নিয়ে বিস্তর মত আছে। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ উইলিয়াম পিট-কে লেখা চিঠিতে সেনাধ্যক্ষ জন ফোর্বস যে বানান লিখেছিলেন সেই অনুসারে পিটসবরা উচ্চারণও হতে পারে)। তবে সেই কবে আর এক ব্রিটিশ তো লিখেই গিয়েছেন, "হোয়াটস ইন আ নেম?" অ্যালেঘনি এবং মনোনগাহেলা নদীর পাড়ে প্রাণবন্ত। নদীর এ পারে শহর, ও পারে রাগবি স্টেডিয়াম পেরোলেই মাউন্ট ওয়াশিংটন। ছুটির দিনে দল বেঁধে লোকজন নদীর উপরে সেতু পেরিয়ে মাউন্ট ওয়াশিংটনে যায়। মাউন্ট ওয়াশিংটনে পৌঁছনোর উপায় কেবল কার। এক সময়ে খনি শ্রমিকদের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল এই যান। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখন পর্যটকদের চাহিদা মেটায়। ওয়াশিংটনের নামধারী পাহাড়ের উপরে ছোট বড় কাফে, পাব। এমনই এক পাবের ভিতরে ভরদুপুরে আলো-আঁধারি পরিবেশ। বার টেন্ডার যুবতী এক কোনায় বসে আর এক যুবকের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। আগন্তুক খদ্দেরকে দেখে অবশ্য হেসেই এগিয়ে এলেন বার টেন্ডার। খুদে খুদে গ্লাসে কয়েক রকমের ঘরোয়া বিয়ার চাখতে দিলেন। তার মধ্যে একটা পছন্দ করার পরে পেল্লায় মাপের গ্লাসে এল সেই পানীয়। ফেনাহীন, ঘন রঙের কষায়িত। চড়া রোদ থেকে ঢুকে শীতল সেই কষায়িত পানীয়ের স্বাদ কলকাত্তাইয়া

ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো

হলিউডের স্মারক-চিহ্ন

বার্লিন দেওয়ালের ভগ্নাংশ

বিয়ারের চেয়ে ঢের আলাদা।

পিটসবার্গ শহরের জন্ম পলাশির যুদ্ধের থেকেও দু' বছর আগে। উইলিয়াম পিটের নামানুসারেই এই শহরের নামকরণ। গোড়া থেকেই শিল্পনগরী হিসেবে উত্থান এই শহরের। এই শহরই ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উগ্র শ্রমিক আন্দোলন দেখেছে। তাতে অবশ্য শহরের ক্ষতিও হয়েছিল। পরে আইরিশদের হাত ধরে ফের গড়ে ওঠে এই শহর। ধীরে ধীরে শিল্প কারখানাও তৈরি হয়। মার্কিন ইস্পাত উৎপাদনেও এই শহরের অবদান ভোলার নয়। তবুও শহরটির হৃদয়ে ইস্পাত-কাঠিন্য নেই। বরং বিকেলে নরম সূর্যের আলো মেখে, মেপলের ঝরে পড়া পাতা মাড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে হাঁটার মধ্যে আলস্যের সুখ উদ্‌যাপন আছে। এই শহরেই দেখা হয়েছিল কাজাখস্তানের এক যুবতীর সঙ্গে। সে একটি কাফেতে কাজ করে। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে অচেনা মানুষকেও বন্ধু করে নেয়। বহু দূরে ফেলে আসা বাড়ি, সন্তানদের কথা বলে। ক'দিন পরেই ভিসার মেয়াদ ফুরোবে। আমেরিকা ছেড়ে আলমাটিতে ফেরার তাগাদা যেমন ছিল তার, তেমনই ছিল আক্ষেপ। ''আই ডোন্ট নো হোয়েদার আই উইল গেট অ্যানাদার জব হিয়ার অর নট। বাট আই শ্যাল বি গোয়িং টু মিস দিস প্লেস, দিজ় পিপল,'' বলেছিল সে। বেড়ানোর ফাঁকে এই টুকরো টুকরো ক্ষণস্থায়ী বন্ধুত্ব অমলিন হয়ে থাকে। ঠিক তেমন ভাবেই হয়তো টিকে আছে শহরের ইতিহাসও। পুরনো গথিক স্থাপত্যের বাড়ি, ডাকঘর, বাড়ির সামনে বসানো হেরিটেজ কমিটির ফলক। এক লহমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে দেড়শো-দু'শো বছর পিছনে। এই ঘুরপাক খেতে খেতেই ফুরোয় দিন। পরের গন্তব্য ডেনভার।

পিটসবার্গ শহরের জন্ম পলাশির যুদ্ধের থেকেও দু'বছর আগে। উইলিয়াম পিটের নামানুসারেই এই শহরের নামকরণ।

রকি পর্বতের এক দিকে অবস্থিত শহর ডেনভার। ব্যস্ত শহর, তাই চেনা আলস্যের জায়গা নেই। তবে সন্ধ্যা গড়াতেই বদলে যায় ছবি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে তখন আমোদের ধুম। অবশ্য এই শহরের

কেবল কারের স্মৃতি

লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তা

এক টুকরো স্থাপত্যের নিদর্শন

‘ইন্ডিয়া’ শুনেই তাদের মুখে শাহরুখ খানের নাম। ফাঁকা দোকানে তারা শুনিয়েছিল ‘তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম’।

পাবের ইতিহাস তো কম নেই। অতীতে কোনও কোনও পাবে গান গেয়েছেন বব ডিলান, জন ডেনভার। শহরের এক প্রান্তে অপেরা হাউস, থিয়েটার হল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে সেখানেই বিশ্ব থিয়েটার উৎসব হয়েছিল। এই শহরেই এক রাতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আলাপ হয়েছিল দুই তরুণের সঙ্গে। ‘ইন্ডিয়া’ শুনেই তাদের মুখে এসেছিল শাহরুখ খানের নাম। অতঃপর, ফাঁকা দোকানে তারা শুনিয়েছিল ‘তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম’। সুরে সুর মিলেছিল কিনা জানি না, তবে বুঝেছিলাম বিনোদনের ভাষা বোধ হয় গোটা পৃথিবীতেই অভিন্ন।

বিনোদনে মিল থাকলেও ভিনদেশি ভাষায় চেনা খাবারও অচেনা হতে পারে! তা না হলে ডেনভার ছেড়ে রিভারসাইডে গিয়ে ফুড কোর্টে অমন বেকুব হই? ফুড কোর্টের একটি স্টলের বোর্ডে লেখা ছিল, ‘এগপ্লান্ট ফ্রিটার্স উইথ টি’। বেশ কিছুক্ষণ মাথা চুলকানোর পরে বুঝলাম, বস্তুটি আর কিছুই নয়, বেগুনি এবং চা! শেষে সাহেবেও চা-তেলেভাজা খায়? দোকানের মালিক, চক্রবর্তী গিন্নি তো শুনে হেসেই কুটোপাটি! সাবেক চন্দননগরের বাসিন্দা, চক্রবর্তী দম্পতি বহু বছর ধরেই মার্কিন প্রবাসী। দেশীয় খাবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিদেশিদের খাওয়াচ্ছেন। তবে মনে-প্রাণে বাঙালি। চক্রবর্তী-নন্দিনী ভাষায়, উচ্চারণে মার্কিনি হলেও নামে খাঁটি বাঙালি, সূর্যতপা! উত্তমপ্রেমী বাপ-মায়ের সুবাদে পাওয়া নাম মার্কিন বন্ধুরা কী ভাবে উচ্চারণ করে সেই অনুসন্ধানে আর যাইনি। মার্কিন দেশে থেকেও বাঙালির চেনা আতিথেয়তা ভুলে যায়নি চক্রবর্তী পরিবার। সেই আতিথেয়তার জেরেই এক রাতে মুগ ডালের খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজার সঙ্গে ভেড়ার মাংসের কালিয়াও ছিল। এবং অবশ্যই ছিল বিলিতি ‘এগপ্লান্ট ফ্রিটার্স’।

রিভারসাইড ছেড়ে পরের গন্তব্য লস অ্যাঞ্জেলেস। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই শহর শুধু প্রমোদনগরী নয়, শিক্ষারও পীঠস্থান। সৌজন্যে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস। ১৮৮১ সালের ক্যালিফর্নিয়া স্টেট নর্মাল স্কুলের দক্ষিণ শাখা থেকে ১৯২৭ সালের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস হয়ে ওঠার যাত্রাপথ বিচিত্র। তবে তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক বিরাট ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশেলে নানা বিভাগীয় বাড়িগুলি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লাইব্রেরিও চমৎকার। যে কেউ পরিচয়পত্র দেখিয়ে সেখানে বই পড়তে পারেন। হাজার-হাজার বইয়ের সমাহারে তৈরি এই বিরাট লাইব্রেরির ভান্ডারের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনা টানা যেতে পারে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ পেরোলেই হলিউড স্ট্রিট। সেই ফুটপাথে হাঁটছি। পায়ের তলায় এক-একটি পাথরে খোদাই করা এক-এক জন চিত্রতারকার নাম। এই রাস্তার উপরেই সাবেক কোডাক থিয়েটার (বর্তমানে নাম ডলবি থিয়েটার),

সান্টা মনিকা বিচ

আকাশচুম্বী অট্টালিকার সারি, পিটসবার্গ শহরে

যেখানে প্রতি বছর অস্কারের আসর বসে। মূল দরজা দিয়ে ঢুকলেই বিরাট সিঁড়ি উঠে গিয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। সিঁড়িতে বিছোনো লাল মোটা কার্পেট। আদতে ‘রেড কার্পেট’ বলতে কী বোঝায়, চাক্ষুষ করলাম। সেই কার্পেটে হাঁটতে হাঁটতে এক সহযাত্রী বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিল, “ভাবো, এই কার্পেট দিয়েই মহাতারকারা হেঁটে গিয়েছেন। আমরাও হাঁটছি! কেমন নিজেদেরই সেলেব্রিটি মনে হচ্ছে!” থিয়েটারের উপরেই একটি টেলিস্কোপ রয়েছে। তাতে চোখ দিলে দূর পাহাড়ের গায়ে লেখা ‘হলিউড’ চাক্ষুষ করা যায়।
হলিউড স্ট্রিটের মতো বাহারি রাস্তা বোধ হয় মার্কিন মুলুকে দু’টি নেই। শুধু অস্কারের মঞ্চের জন্য নয়, রাস্তার দু’ধারে সার দিয়ে থাকা দামি পোশাকের দোকান হোক কিংবা স্যুভেনির শপ, রেস্তরাঁ— সব মিলিয়েই এক আশ্চর্য জগৎ! যার সঙ্গে ইউনিভার্সাল স্টুডিয়োর মিল রয়েছে।
ফিরে যাই গোড়ার কথাতেই। সেই যে স্টুডিয়োর মায়াদুনিয়ায় প্রবেশ করেছিলাম। টয় ট্রেনের সফরে চলছি। আচমকা সেই ট্রেন ঢুকে

হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটার

“ভাবো, এই কার্পেট দিয়েই মহাতারকারা হেঁটে গিয়েছেন। আমরাও হাঁটছি! কেমন নিজেদেরই সেলেব্রিটি মনে হচ্ছে!”

পড়ল এক গহিন সুড়ঙ্গে। আলো, আঁধারি পরিবেশ। আচমকাই প্রবল ঝাঁকুনি! ভূমিকম্প নাকি? কিছু ভাবার আগেই দেখি কিছুটা দূরে একটি মেট্রো রেল উল্টে গেল। বিদ্যুতের খুঁটি উপরে দাউদাউ করে আগুন ঝরছে। ফের সব কিছু স্বাভাবিক। গাইডের নাটুকে গলায় ঘোষণা, “নাও উই আর সেফ।” টয় ট্রেন সুড়ঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে এল। বুঝলাম, এ জীবনে সবই মায়া!
এ সবের বাইরেও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ওই শহরে আরও একটি জিনিস নজর কাড়তে পারে। তা হল মশলার বাজার। বিশেষ করে কারও যদি লঙ্কাপ্রীতি থাকে তা হলে ওই বাজারের মেক্সিকান দোকানগুলিতে পৃথিবীর ‘সেরা’ লঙ্কার সম্ভার মিলতে পারে। দুনিয়াকাঁপানো হ্যালাপিনো শুধু নয়, শুকনো লঙ্কার কত যে বৈচিত্র আছে তাও দেখেছিলাম। কেমনতরো সে লঙ্কা তা বুঝতে হলে জিভে চেখে দেখা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী ‘লঙ্কাকাণ্ড’-র দায় একান্তই খদ্দেরের!
এবং অবশ্যই তালিকায় ছিল সান্টা মনিকা বিচ। ‘ফরেস্ট গাম্প’-এর মতো সিনেমা কিংবা ‘বেওয়াচ’-এর মতো জনপ্রিয় টিভি সিরিজ়ের শুটিং স্থল হিসাবে এই বিচ এমনিতেই বিখ্যাত। কিন্তু শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত সৈকতভূমি কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সবুজ জলরাশির দেখার বাইরে যদি মার্কিন সমাজের অন্তর্নিহিত সুর বুঝতে হয়, তা হলে ওই সৈকতে বসতে হবে। দলে দলে লোক নিজের খুশিতে স্নান করছে, বিচ ভলিবল খেলছে কিংবা সঙ্গীর সঙ্গে আলাপে মত্ত। কেউ বা অনন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে একাকী সময়যাপনে ব্যস্ত! নেই শুধু অপরের বিষয়ে অপার কৌতূহল। শুধু এই সৈকতভূমিই নয়, মার্কিন শহরে যেখানেই গিয়েছি, মানুষের সঙ্গে মিশেছি, বন্ধুত্ব হয়েছে। পথেঘাটে নিতান্ত অপরিচিতও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু আগ বাড়িয়ে পরের জীবনে উঁকি মারার মানুষ খুঁজে পাইনি।

আবাহন

কৌশিক পাল

সন্ধে নামতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি। গমগম করছে আমাদের তালতলা শ্রীপল্লির চার পাশ। লাল কাপড়ে মোড়া, সাদা পালক লাগানো ইয়া বড়-বড় চল্লিশটা ঢাক এক ছন্দে বোল তুলেছে। একটু মন দিয়ে শুনলে মনে হবে, সেগুলি বুঝি একযোগে বলে চলেছে, 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন'! সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাঁসর-ঘণ্টার যোগসাজশ। চলছে গা-গরম পর্ব। পাড়ার মেয়েরা আজ সেজেছে লাল পাড় সাদা শাড়িতে, সঙ্গে মানানসই লাল ব্লাউজ়। তাদের সংখ্যাও চল্লিশ। চুল বাঁধার কায়দা এক-একজনের এক-এক রকম, তবে সকলের গলায় ও কব্জিতে গাঁদা ফুলের সাজ। প্রত্যেকের হাতে কারুকাজ করা বেতের তৈরি কুলো। কুলোর উপর বসানো রঙিন প্রদীপ। সরষের তেলে টইটুম্বুর। আজ দীর্ঘ সময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে তো! সেই প্রদীপকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বাসন্তী ও হলুদ গাঁদার মালা। কুলোর বাকি অংশ জুড়ে কুচো ফুলের সমাহার।

মেয়েদের ২০ জনের দুটি দলে ভাগ করে, লাইন দিয়ে দাঁড় করাতে হিমশিম খাচ্ছেন মিসেস রায়। মিসেস ঊষসী রায়। চালচলনে তাঁর

সাহেবি কেতা। সেই কারণেই পাড়ার বাকি সকলে দিদি-বৌদি-কাকিমা-জেঠিমা হলেও, ইনি 'মিসেস রায়'। শ্রীপল্লির পুজোর নতুন কালচারাল সেক্রেটারি। সহকারী হিসেবে এই পদে আমার নামও আছে, তবে আমি নেহাতই 'দুধ-ভাত'। মিসেস রায়ের কথায় তাল মেলানো ছাড়া আমার আর তেমন কোনও কাজ নেই। তাই সময় নষ্ট না করে যখন যা ঘটছে, সেগুলো যতটা সম্ভব ডিটেলে টুকে রাখি আমার ছোট্ট নোটবইটায়। কে জানে, কখন কী ভাবে কাজে লেগে যায়!

এবছর ৪০ বছর পূর্ণ করল দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত আমাদের এই দুর্গোৎসব। সেই উপলক্ষেই বিসর্জনের মেগা আয়োজন। বিশাল এই আয়োজনের পিছনে আরও একটা কারণ অবশ্য আছে এবং সেটাই মূল কারণ। তবে সে প্রসঙ্গে এখনই আমি বিশেষ মুখ খুলছি না। তা হলে গল্পের মজাটাই চলে যাবে।

আমার গুরুদেব, মানে সৌজন্যদা, যাঁর স্নেহধন্য হয়ে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়া ছোকরা হয়েও পাড়ার এই প্রাচীন পুজোয় 'সহকারী কালচারাল সেক্রেটারি'র পদটি পেয়েছি, তার কথা ধার করেই এক্ষেত্রে বলি, 'জীবন হোক বা গল্প, ধাপে-ধাপে এগোনোই ভাল'।

যাই হোক, আপাতত প্রতিমা নিরঞ্জনের এই পর্বটা নিয়ে আর একটু এগোই। নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় আছে ছৌ নাচের একটি দল। পুরুলিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের। মাসখানেক আগে মোহরকুঞ্জে আয়োজিত জঙ্গলমহল উৎসবে এদের স্পট করেছিল সৌজন্যদা। সেই কলাকুশলীরাই এখন ছৌ নাচের বিশেষ পোশাক পরে, মুখোশ হাতে নিয়ে একে-একে বেরিয়ে আসছে আমাদের তরুণতীর্থ ক্লাবঘরের কক্ষ থেকে। হ্যাঁ, আমিও এই ক্লাবের সদস্য। মাস আটেক আগেই হয়েছি। কাগজে-কলমে ক্লাবের মেম্বার ও পুজো কমিটি আলাদা, কিন্তু এতকাল বিষয়টা ছিল কিঞ্চিৎ অন্যরকম। এতকাল মানে, এই বছরের পুজোর আগে পর্যন্ত।

শোভাযাত্রার একদম সামনে থাকবে পুরুলিয়ার এই দলটিই। তাদের ঠিক পরেই থাকার কথা 'লাল পাড়, সাদা শাড়ি'র মেয়েদের। তাদের পিছনে মহাত্মা গান্ধী রোডের অন্যতম সেরা ব্যান্ড, 'আজ়হার আলম অ্যান্ড কোং'। ব্যান্ডপার্টির ঠিক পিছনে দশটি হাতে টানা রিকশায় চন্দননগরের আলোকসজ্জা। তিনটি ট্রাকের কনভয় থাকবে এর পর। প্রথমটিতে মা দুর্গা স্বয়ং। দ্বিতীয়টিতে মা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা

গণেশ এবং তৃতীয়টিতে দেবী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিক। পরিকল্পনামাফিক যে যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। সন্ধে প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই শুরু হবে শোভাযাত্রা।

এমনিতে তালতলা শ্রীপল্লির পুজো হত নেহাতই সাদামাঠা। তিন দিক খোলা মণ্ডপ, যাকে লোকজন মজা করে 'লরি প্যান্ডেল' বলে থাকে, তেমনটাই দেখতে অভ্যস্ত এখানকার মানুষ। পুজোর চারটে দিন এলাকায় পুজোর একটা আবহ তৈরি হয়, শ্রীপল্লির পুজোর গুরুত্ব এতদিন এর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। না, আরও একটা গুরুত্ব অবশ্য ছিল। শ্রীপল্লির আশপাশে বেশ কয়েকটি বড়-বড় পুজো হয়। এলাকায় অবস্থিত মেট্রো রেল স্টেশনটিতে নেমে সেই সব পুজো দেখতে যাওয়ার পথে কিংবা সেগুলো দেখে ফের মেট্রো রেল ধরার ফাঁকে শ্রীপল্লির এই মাঠটিতে খানিক জিরিয়ে নিত পুজো পরিক্রমায় বেরোনো আমজনতা। পুজো উপলক্ষে গজিয়ে ওঠা চিপ্‌স, কোল্ডড্রিঙ্ক, চাট, ফুচকার দোকান থেকে তারা ইচ্ছেমতো স্ন্যাকস কিনে এই মাঠে বসেই তা উদরস্থ করত। খানিক আড্ডা মেরে, নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেত পরের বড় পুজোর দিকে। শ্রীপল্লির ফাঁকা মাঠ একগুচ্ছ খালি স্ন্যাকসের প্যাকেট, ফাঁকা কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল, ঢাকনা, পরিত্যক্ত কাগজের প্লেট বুকে নিয়ে অপেক্ষা করত পরের মেট্রো রেল বয়ে আসা নতুন একঝাঁক দর্শকের অপেক্ষায়।

এত কাল এমনটাই দেখে এসেছি। তবে এ বার ব্যাপারটা পুরোপুরি অন্যরকম! ছোটবেলার কথা বাদ দিলে, বিগত দশ-বারো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার মনে হচ্ছে পুজোটা আমাদের! পাড়াটাও। কেন বললাম একথা? বলছি...

এই রে! সৌজন্যদা আসছে। মুখ-চোখ দেখেই মনে হচ্ছে, বেশ রেগে রয়েছে। আবার একটা কিছু নিয়ে বকুনি খাব! দাঁড়ান, একটু সামলে আসছি, হ্যাঁ?

''রুবাই, পুজো কমিটির নতুন ব্যানারটা কই? প্রদীপ্তজেঠু ও অম্লানজেঠু তো চলে এসেছেন...'' সৌজন্যদার গলার স্বর বলে দিচ্ছে, এটা আসলে কোনও প্রশ্ন নয়, আমার অপদার্থতার স্বীকারোক্তি আদায়ের কায়দা।

কোনও রকম ধানাইপানাই না করেই তাই আত্মসমর্পণ করলাম, ''প্রেস থেকে আনতে একদম ভুলে গিয়েছি গো! আমি এক্ষুনি ভোম্বলের সঙ্গে বাইকে করে নিয়ে আসছি। দশটা মিনিট দাও।''

''দশমীর দিন প্রেস খোলা রাখবে তোর কোন আত্মীয় রে?''

তাই তো! সামাল দিতে বললাম, ''প্রেসের কাকুকে একটা ফোন করে দেখি...'' বলেই পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করলাম প্রেসের কাকুর নম্বর।

''তুই না একটা আস্ত মর্কট। কী করে এটা ভুলে গেলি রুবাই!''

সৌজন্যদার রাগ করাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুটা নিরুপায় হয়ে, ফোনটা কানের পাশে ধরে রেখেই বললাম, ''সুমেধা এদিকেই আসছে সৌজন্যদা, প্লিজ় ওর সামনে আমাকে বকাবকি কোরো না।''

''তুই না... জাস্ট ইমপসিবল!'' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল সৌজন্যদা।

সুমেধা পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল, আমাদের না দেখার ভান করে! হোয়াইট অ্যান্ড মভ সালোয়ার, শ্যান্ডেলিয়র আর খোলা চুলে ভারী সুন্দর লাগছে ওকে।

আমি আহত গলায় বললাম, ''কাকুর ফোনটা বেজে যাচ্ছে... উনি ধরছেন না! এ বার কী হবে!''

সত্যিই বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। ব্যানারটার কথা সৌজন্যদা সেই পঞ্চমী থেকে আমাকে বলছে।

''ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না, তোমার দশমীর দিন পেলেই হবে তো,'' বলে আমি সৌজন্যদাকে আশ্বস্ত করে গিয়েছি। পরিকল্পনা অনুসারে, এই ব্যানারটি থাকার কথা শোভাযাত্রার একদম শুরুতে, পাড়ার দুই প্রবীণ মানুষ প্রদীপ্ত বসু ও অম্লান মিত্র-র সেটি বহন করার কথা। চল্লিশ বছর আগে এঁদের উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল আমাদের পাড়ার এই পুজো। বাবার মুখে শুনেছি, এঁদের হাত ধরেই পাড়ায় গড়ে উঠেছিল একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এঁরা ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের। এ বছর নতুন কমিটি গড়ে এই পুজো আমরা হাতে নেওয়ার সময়ই সৌজন্যদা বলেছিল, ''আমার সেই সব মানুষগুলোকে আবার যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে ফিরিয়ে আনব মূল স্রোতে, এই পাড়ার জন্য যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।''

এখন তাঁরা এসে উপস্থিত আর আমি কিনা ব্যানারটাই আনতে ভুলে গিয়েছি! বুঝতেই পারছি, আবার একটা তুলকালাম হবে। সম্মান দেওয়ার নাম করে ডেকে এনে অসম্মানিত করার পুরো দায়টা চাপবে সৌজন্যদার উপরেই। কারা চাপাবে, সেটাও পরিষ্কার। আর আমি একেবারেই চাই না, এই মানুষটার দিকে একটাও বাঁকা আঙুল উঠুক...

কী যে করি! আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। বিলুদা, রঘুদা, বাপ্পাদা, বান্টিদা, বিস্বো, জিকো... এদের কাউকেও তো দেখতে পাচ্ছি না!

''রুবাই শোন, ক্লাবের ছাদ থেকে পুজো কমিটির যে ব্যানারটা ঝোলানো হয়েছিল, দৌড়ে গিয়ে সেটা খুলে আন। আজ ওটা দিয়েই ম্যানেজ করতে হবে। ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়ে যা, জলদি। ওটা নিয়ে প্রসেশনের সামনে চলে আয়। আমি ওখানেই যাচ্ছি, অম্লানজেঠুদের সঙ্গে কথা বলছি...'' হনহন করে হাঁটা লাগাল সৌজন্যদা।

এই কারণেই লোকটাকে আমার এত ভাল লাগে। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, কোনও না-কোনও সলিউশন ওর কাছে আছেই! সৌজন্যদা আমার চেয়ে প্রায় এগারো বছরের বড়। আমাদের আলাপ বছর দুয়েক আগে, এই মাঠেই। সৌজন্যদা এপাড়ায় তখন নতুন এসেছে, নিজের ফ্ল্যাট কিনে। আমাদের আলাপের মাস খানেক আগে। তার পর থেকে লোকটাকে যত দেখেছি, তত ওর প্রেমে পড়েছি। প্লিজ় আমার ওরিয়েন্টেশন নিয়ে আবার ভাবতে বসবেন না, আই অ্যাম স্ট্রেট। ও হ্যাঁ, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন, আমি রুবাই। এই গল্পের আংশিক কথক। ভাল নাম, নীলেন্দু মৈত্র। কেমিস্ট্রি অনার্স, সেকেন্ড ইয়ার, সেন্ট জ়েভিয়ার্স কলেজ। তবে 'নীলেন্দু' নামে খোঁজ করলে পাড়ার কেউই আমার হদিস দিতে পারবে না। এখানে আমি শুধুই রুবাই।

ঢাকের আওয়াজ এখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, শুরু হয়েছে ব্যান্ডপার্টির জগঝম্প। ছৌ নাচের দল তাদের বাজনার সঙ্গে শুরু করেছে নিজেদের কারসাজি। ক্লাবের ছাদ থেকে আমাদের পুরো পাড়াটাকে যে কী অসাধারণ দেখাচ্ছে! শোভাযাত্রার একটা ওভারভিউ টুক করে ক্যামেরাবন্দি করে, আমি আর ভোম্বল ব্যানার নিয়ে নেমে এলাম দ্রুত।

তখনও আমরা জানি না, পরবর্তী দু'ঘণ্টায় ঠিক কী-কী হতে চলেছে... কী ভাবে ওলট-পালট হয়ে যেতে চলেছে সব কিছু!

২

মাস তিনেক আগে... জুলাই মাসের শেষের দিক

এক রবিবারের সকালে ক্লাবের আড্ডায় প্রস্তাবটা রাখল সৌজন্যদা, ''একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করলে কেমন হয়?''

ক্লাব সেদিন প্রায় ফুল হাউস। আমরা সকলে হইহই করে উঠলাম! ''এ তো দারুণ প্রস্তাব।''

ক্লাবে যা হয়, কেউ একটা হুজুগ তুললেই হল, নেচে উঠবে সকলে।

বিলুদা, রঘুদা সৌজন্যদারই পিঠোপিঠি বয়সি। বাপ্তুদা, বান্টিদা, শান্তুদা আর একটু ছোট। আমরা, মানে আমি ভোম্বল, বিম্বো, জিকো, জিঙ্গো, ভুটুন... ক্লাবের সবচেয়ে জুনিয়র ব্যাচ। কাঠের সেন্টার টেবিলের চারদিকে ঘিরে থাকা সেকেন্ড হ্যান্ড সোফাসেটগুলিতে আমরা সকলে এসে জড়ো হলাম, বসলাম ঠাসাঠাসি করে। প্রস্তাবটা সকলেরই মনে ধরেছে।

ক্লাবঘরের একটা কোণের দিকে পিচের ড্রামের উপর রাখা ক্যারমবোর্ডে গেম খেলছিল ক্লাবের মোস্ট সিনিয়র ব্যাচ। সৌজন্যদার প্রস্তাব তাদের কানেও পৌঁছেছে। আমাদের উৎসাহ দেখে, ওদেরই মধ্যে একজন, বোর্ডের দিকে তাকিয়ে স্ট্রাইকারটা জামায় ঘষতে-ঘষতে বলল, "যার-তার কথায় নাচিস না। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার লোকের এখন অভাব নেই।"

কথাটা যে সৌজন্যদাকে উদ্দেশ্য করেই বলা, অনুমান করতে কারও অসুবিধে হল না। আর সেটা যে তপনদা ছাড়া আর কেউ বলবে না, বোর্ডের দিকে না তাকিয়েও সেটা বুঝতে কারও বাকি রইল না।

বিলুদা বলল, "তপনদা, তোমার সমস্যাটা কী বলো তো? এটা তো জাস্ট একটা প্রস্তাব। আমরা সকলে একমত হলে তবেই এটা নিয়ে এগোনোর প্রশ্ন। এর মধ্যে গাছ-মই এসব টেনে আনছ কেন?"

"বাবা! বড্ড বুলি ফুটেছে দেখছি! এতদিন তো কিছু হলেই তপনদা-তপনদা করতিস, ইদানীং খুব ডানা ঝাপটাচ্ছিস যে!" বেসলাইনে বসে থাকা গুটিটা পকেটস্থ করে বলল তপনদা।

তপনদা পার্টি করে। শাসকদলের সক্রিয় সদস্য। তাই সকলে ওকে একটু সমঝে চলে। কিন্তু বিলুদা কিঞ্চিৎ ডাকাবুকো টাইপ। মুখে যা আসে, বলে দেয়। লোকে বলে, 'বিলুটা মাথামোটা', কিন্তু তাতে বিলুদার কিছুই যায় আসে না। বিলুদার সাফ কথা, "জীবনে চুরি করিনি, কারও ক্ষতি করিনি। তা হলে ভয়টা কিসের?"

ঠিক কথা। কিন্তু তা-ও, দিনকাল তো ভাল নয়। আর কেন জানি না, এই যে আমরা এত কাল মাঠে বসেই আড্ডা মারতাম, ক্লাবে পা দিতাম না— এখন বেশ কয়েক মাস ধরে ক্লাবে আড্ডা মারছি, ক্লাবের মেম্বারশিপ নিয়েছি, মাস গেলে কুড়ি টাকা করে চাঁদা দিচ্ছি, এটা যেন তপনদার ঠিক পোষাচ্ছে না।

সৌজন্যদা তপনদার কথার কোনও উত্তর দিল না। হাতের ইশারায় বিলুদাকে চুপ করতে বলে, আলোচনাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে বলল, "কী মনে হয় তোদের, টুর্নামেন্টটা করা যায়?"

বিলুদা বলল, "করা যায় মানে? এটা আমাদের করতেই হবে। আর শুধু ফুটবল কেন, এর পর আমরা একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টও করব," গলাটা একটু উঁচু করল, যেন তপনদাকে শোনানোর জন্যই।

"এই তোর এক সমস্যা। গাছে না উঠতেই কাঁদি-কাঁদি পেড়ে আনিস!" রঘুদা বলল বিলুদাকে, "আরে, আমরা কি কখনও কোনও টুর্নামেন্ট অরগানাইজ় করেছি নাকি! নিজেদের মধ্যে দল ভাগ করে স্রেফ বল পিটিয়েছি। ব্যাপারটা এতটাও সহজ নয়। খরচখরচারও একটা ব্যাপার আছে। আগে সৌজন্য বলুক ওর পরিকল্পনাটা। প্রস্তাব যখন দিয়েছে, তখন কিছু তো একটা ও নিশ্চয়ই ভেবেছে..."

গত এক দেড় বছরে সৌজন্যদা আমাদের সকলের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, দেখলে মনে হবে যেন সৌজন্যদা এই পাড়াতেই বড় হয়েছে, বিলুদা-রঘুদা তার ছোট্টবেলার বন্ধু। কে বলবে, তার আসল বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের বিক্রমগড়ে, চাকরিসূত্রে কলকাতায় এসেছে মাত্র বছর আটেক আগে। উত্তর কলকাতায় ছিল বছর খানেক, তার পর গ্রাহাম রোডের কাছে একটা ভাড়াবাড়িতে এবং অবশেষে আমাদের এখানে।

সৌজন্যদা বলল, "দ্যাখ, খুব ডিটেলে যে ভেবেছি, এমন নয়। প্রথম বছর খুব বড় করেও কিছু করা যাবে না। ব্যাপারটা এ বছর আমাদের পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভাল।"

সৌজন্যদা এটুকু বলার ফাঁকেই, পকেট থেকে ফোন বের করে রেকর্ডারটা অন করে দিয়েছে বিলুদা। এটা ওর পুরনো স্বভাব। আমাদের আড্ডা যখনই কোনও ইন্টারেস্টিং দিকে মোড় নেয়, রেকর্ডার অন করে সেটা রেকর্ড করতে থাকে বিলুদা।

"কেন এটা করো বিলুদা?" প্রশ্নটা করলে বিজ্ঞের মতো মুখ করে বলে, "আর্কাইভ বুঝিস, আর্কাইভ? যখন বুড়ো হব, শরীরে আর জোর থাকবে না, তখন এই আড্ডার ক্লিপিংগুলো চালিয়ে শুনব আর মনের টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে আসব এই সময়গুলোয়! দেখবি, তখন তোরাই আমার কাছ থেকে এই এক-একটা আড্ডার ক্লিপিং কিনছিস হাজার-হাজার টাকায়!"

"কিন্তু আমাদের পাড়ায় কি একটা টুর্নামেন্ট করার মতো এত প্লেয়ার পাওয়া যাবে?" রঘুদা কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করে।

সৌজন্যদা হেসে বলল, "একটা রাফ হিসেব করে দেখেছি, ছোট-বড় মিলিয়ে আমাদের পাড়ায় জনা তিরিশ-পঁয়তিরিশ জন পাওয়াই যাবে, যারা মাঠে নেমে খেলতে পারবে। সকলে যে সাংঘাতিক খেলবে, তা নয়। কিন্তু একটা ফান গেমে অংশ নিতে এদের কোনও আপত্তি থাকবে বলে তো আমার মনে হয় না।"

"বেশ, তার পর?"

"ফাইভ আ সাইড টুর্নামেন্ট। তুই, বিলু, বাপ্তু, জিঙ্গো, পুটাই... মানে আমাদের পাড়ার সেরা পাঁচজন, তোরা হবি আইকন প্লেয়ার, আইপিএল-এ যেমন হয় আর কী! তোদের সঙ্গে পাড়ার সিনিয়র একজন করে থাকবে মেন্টর হিসেবে..."

"আইপিএল! মেন্টর! কী বলছ গো সৌজন্যদা!" চোখ গোল-গোল হয়ে গিয়েছে জিকোর, "টাকাও থাকবে?" অপার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে সে।

"দ্যাখ, টাকা তো আমরা দিতে পারব না, পরিবর্তে প্রত্যেক আইকন প্লেয়ারের হাতে থাকবে একশো পয়েন্ট। আইকন প্লেয়ারদের বাদ দিয়ে, বাকি তিরিশ জনকে নিয়ে হবে নিলাম, আমাদের এই ক্লাবঘরে। খুব বুঝে-শুনে হিসেব করে ওই একশো পয়েন্টের মধ্যে নিজের-নিজের টিমের জন্য আরও পাঁচ জন করে প্লেয়ারকে তুলে আনবে আইকন প্লেয়ার, মানে ক্যাপ্টেনরা। তৈরি করবে নিজের-নিজের টিম। প্রত্যেক প্লেয়ারের জন্য একটা বেস পয়েন্ট থাকবে, নিলাম শুরু হবে সেখান থেকে। রাফলি ব্যাপারটা এ রকম। আর হ্যাঁ, নিলামের পুরো ব্যাপারটা লাইভ করা হবে আমাদের ক্লাবের ফেসবুক পেজ থেকে। কী, কেমন হবে?"

"সুপারডুপার হিট হবে!" চিৎকার করে উঠল বিলুদা। তার সঙ্গে যোগ দিলাম আমরাও।

রঘুদা বলল, "এই বেস পয়েন্টের কেসটা কী রে?"

"ধর, আইকন প্লেয়ারদের বাদ দিয়ে বাকি তিরিশ জনের তালিকায় জিকো সবচেয়ে ভাল প্লেয়ার। ওর বেস প্রাইস হবে সবচেয়ে বেশি। উম্মম... ধর পঁয়তিরিশ পয়েন্ট। এ বার ওখান থেকে ডাক শুরু হবে জিকোর জন্য। তুই বললি, আমি দেব ছত্রিশ পয়েন্ট, পুটাই বলল চল্লিশ, বাপ্তু বলল বিয়াল্লিশ, তুই আবার বললি পঁয়তাল্লিশ... দেখা গেল এর পর আর কেউ বেশি পয়েন্ট অফার করছে না। তখন জিকো হয়ে গেল তোর টিমের প্লেয়ার। কিন্তু সেই সঙ্গে তোর একশো পয়েন্ট থেকে বাদ চলে গেল পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট। পড়ে রইল পঞ্চান্ন। এ বার ওই পঞ্চান্ন পয়েন্টের মধ্যে তোকে বাকি চার জন প্লেয়ারকে নিতে হবে," বুঝিয়ে বলল সৌজন্যদা।

"আমার কিন্তু এখন থেকেই বেশ শিহরন হচ্ছে! টাকা না পাই, আমাকে নিয়ে যে দরাদরি হবে, এটাই বা কম কী!" জামার কলারটা একটু উঠিয়ে বলল জিকো।

"কিন্তু সবচেয়ে কম বেস পয়েন্ট কার হবে সৌজন্যদা, বিম্বোর? মোটুরামকে তো দুই পয়েন্ট খরচা করেও কেউ নেবে না গো!" বলে

উঠল ভোম্বল।

সকলে হেসে উঠল হোহো করে।

"আমি তো তা-ও দু'পয়েন্ট পাব, তোকে তো শালা টাকা দিয়ে টিমে ঢুকতে হবে রে!" ভোম্বলের মাথায় চাঁটি মেরে বলল বিম্বো।

হাসি চেপে সৌজন্যদা বলল, "না-না, যে-কোনও প্লেয়ারের মিনিমাম বেস প্রাইস থাকবে দশ পয়েন্ট।"

রঘুদা বলল, "সৌজন্য, এই তোর ডিটেলে কিছু না ভাবা! আসল ডিটেলস তা হলে কী হবে রে ভাই?"

সৌজন্যদা এ বার যেন একটু লজ্জা পেল।

কখন যে তপনদা ক্যারমবোর্ড ছেড়ে আমাদের আলোচনা শোনার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা আমরা খেয়াল করিনি। খেয়াল হল, যখন সে দাঁতের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি ঢুকিয়ে খোঁচাতে-খোঁচাতে বলল, "আইপিএল-এর স্টাইলে ফুটবল হবে এই পাড়ায়! বাবা! আর কত রঙ্গ দেখব কে জানে!"

বিলুদা সোফা ছেড়ে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। ওর হাত ধরে টেনে, সোফাতেই বসিয়ে রাখল রঘুদা।

"ভাল-ভাল। কিন্তু দেখিস বাবা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান থেকে এসে তোদের আবার তুলে না নিয়ে যায়! পাড়াটা আমাদের একদম ফাঁ-কা-কা হয়ে যাবে তা হলে..." দাঁত থেকে কাঠিটা বের করে, সেটা পর্যবেক্ষণ করতে-করতে ব্যঙ্গ করল তপনদা।

সৌজন্যদা বলল, "তপনদা, তোমাকে কিন্তু আমাদের পাশে থাকতে হবে...তুমি ছাড়া এই টুর্নামেন্ট নামানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

সৌজন্যদা এটা আবার কী বলছে! এত কাল এই তপনদার জন্যই তো আমরা কেউ ক্লাবে ঢুকতাম না। ক্লাবটা যেন হয়ে গিয়েছিল ওর পিতৃপুরুষের সম্পত্তি। ওর হাবভাব দেখলেই আমাদের গা জ্বলে যেত। সৌজন্যদার কথাতেই আমরা সকলে রাজি হয়েছি ক্লাবের মেম্বার হতে। বিলুদা-রঘুদারা একটা সময় ক্লাবের মেম্বার থাকলেও, তপনদার সঙ্গে একটা ঝামেলার পর বেরিয়ে গিয়েছিল ক্লাব ছেড়ে। ফিরে এসেছে প্রায় আট বছর বাদে। আর আজ আবার সেই তপনদাকেই কিনা আমাদের পাশে থাকার কথা বলছে সৌজন্যদা! এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

তপনদা কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সৌজন্যদার দিকে আঙুল তুলে বলল, "তোমার ওই নিমকি-ন্যাকামি না অন্য কোথাও দেখিয়ো। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে এখন আমার সঙ্গে আদিখ্যেতা মারাচ্ছ শালা..." বলেই গটমট করে বেরিয়ে গেল ক্লাবঘর থেকে।

বিলুদাকে সকলে মাথামোটা বলে, কিন্তু আমার তো মনে হয় মাথামোটামির প্রতিযোগিতায় তপনদাকে কেউ হারাতে পারবে না। না হলে একটা ভাল প্রস্তাবে কেউ এভাবে খচে যায়? মেজাজ হারায়? আসলে কী জানেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই লক্ষ করছি, তপনদার আসল রাগটা আমাদের কারও উপরেই নয়, পুরোটাই সৌজন্যদার উপর। কিন্তু কেন, সেটা ঠিক ধরতে পারছি না।

তপনদার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সৌজন্যদা বলল, "রাগের আমি রাগের তুমি, রাগ দিয়ে যায় চেনা!"

তার পর দ্রুত সুর বদলে বলল, "আমরা যারা চাকরি করি বা যাদের ব্যবসা আছে, তারা একটু বেশি টাকা চাঁদা দেব এই টুর্নামেন্টের জন্য। স্টুডেন্টরা যে যেমন পারবে কনট্রিবিউট করবে। কী বলিস, বিলু, রঘু..."

"একদম কারেক্ট আছে ভাই। আমরা তা হলে এক হাজার করে দিই, নাকি রে রঘু? বাপ্তু কী বলিস?"

সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল, যারা চাকরি বা ব্যবসা করে, তারা দেবে সাতশো টাকা করে, যারা টিউশন পড়ায়, তারা তিনশো টাকা আর যারা নেহাতই স্টুডেন্ট, তারা পঞ্চাশ-একশো যে যেমন পারবে। এটাও ঠিক হল, টাকার জন্য ক্লাবের সদস্য ছাড়া কারও কাছে কোনও রকম আবেদন করা হবে না।

টুর্নামেন্টটা যে-কোনও একটা রবিবারই করা যেত। কিন্তু সৌজন্যদা ১৫ অগস্ট, মানে স্বাধীনতা দিবসের দিন টুর্নামেন্ট করার প্রস্তাবটা দিতে, সকলে সেটাই লুফে নিল! ওর কথায় "বিশেষ কাজ বিশেষ দিনে শুরু করাই ভাল। ন্যাশনাল হলিডে, ওই দিন সকলকে পাওয়া যাবে।" ঠিক হল, পাঁচটা টিম নিজেদের মধ্যে লিগ পর্যায়ে খেলবে। প্রত্যেকে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটা করে ম্যাচ, মানে প্রতিটি দলের চারটি করে খেলা। লিগের শেষে যে চারটি দলের পয়েন্ট বেশি হবে, তাদের মধ্যে সেমি ফাইনাল। লিগ টেবিলের পয়েন্টস অনুসারে একের সঙ্গে তিনের আর দুইয়ের সঙ্গে সেমি ফাইনাল ম্যাচ হবে চারের। দিন-রাতের টুর্নামেন্ট, লিগ ম্যাচগুলো হবে দিনের আলোয় আর ফ্লাডলাইটে সেমি ফাইনাল-ফাইনাল! ব্লু-প্রিন্ট পুরো জমে দই।

"তা হলে আর দেরি কেন, হরির দোকানে চা-শিঙাড়া হয়ে যাক! এ রকম একটা উদ্যোগ, সেলিব্রেট না করলে চলে? আর আজকের সব খরচ কিন্তু সৌজন্যর, ঠিক আছে ভাই?" প্রাথমিক প্ল্যানে সকলের শিলমোহর পড়তেই বলে উঠল বিলুদা।

জিকো বলল, "তুমি কী গো বিলুদা! যে মানুষটা এত সুন্দর একটা প্ল্যান দিল, কোথায় তাকে আমরা সকলে মিলে খাওয়াব, তা নয়, তুমি সেই সৌজন্যদারই ঘাড় ভাঙার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ!"

"আমাদেরই খাওয়ানো উচিত, না? চল, তা হলে আমি আজ তোদের সকলকে চা-শিঙাড়া খাওয়াচ্ছি..." সোফা ছেড়ে উঠে, "চল-চল," বলে ক্লাবের দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েই, "এই কেলো করেছে..." বলে বিলুদা দ্রুত ফিরে এল ক্লাবঘরে। বলল, "এখন কেউ বাইরে বেরোবি না, তাকাবিও না দরজার দিকে, মুখ ঘোরা, মুখ ঘোরা সব..."

"কী হল রে! কাকে দেখে এ রকম মুখে নুনপড়া জোঁকের মতো গুটিয়ে গেলি!" অবাক হয় সৌজন্যদা।

কী হয়েছে, সেটা সৌজন্যদা ছাড়া আমরা সকলে বুঝেছি। মানে, পাড়ার পুরনো বাসিন্দা যারা। বিলুদার কথায় আমরাও সকলে দরজার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমাদের ভাবগতিক দেখে সৌজন্যদা ফের জিজ্ঞেস করল, "আরে, তোরা সকলে এ রকম করছিস কেন? বলবি তো কী হয়েছে?"

বিলুদা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এই লোকটাকে নিয়ে আর পারা যাবে না! আরে ভাই, কাজকর্ম না থাকে তো বাড়িতে বসে থাকুন না! পাড়াময় ঘুরে বেরিয়ে আমাদের বিপদে ফেলেন কেন? সব কেঁচিয়ে যাবে, এত ভাল প্ল্যান, সব ভেস্তে যাবে..."

"এই, তোরা কেউ আমাকে বলবি, কেসটা কী?"

জিকো বলল, "সৌজন্যদা, বিলুদা বিখ্যাতকাকুকে এদিকে আসতে দেখেছে, তাই এ রকম করছে..."

"বিখ্যাতকাকু? সেটা আমার কে!" সৌজন্যদা ক্লাবের দরজার দিকে তাকিয়ে ঢোলা পাজামার উপর হাফ শার্ট পরা লোকটিকে দেখে বলল, "উনি তো কৃতান্তকাকু, কৃতান্ত ধর। ওঁকে দেখে তোরা এ রকম করছিস কেন?"

"ব্যস, হয়ে গেল! নামটা তোকে নিতেই হল, না? নিয়েই যখন ফেলেছিস, তখন ওই নামটার মানেও নিশ্চয়ই জানিস?" চরম হতাশার সঙ্গে বলল রঘুদা।

"কৃতান্ত... কৃতান্ত মানে তো যম। তো?"

"আবার, আবার... তিন-তিন বার তুই মুখে নিলি নামটা। সৌজন্য, কোন বাপ-মা তার ছেলের নাম রাখে রে মৃত্যুর দেবতার নামে? ওর মতো অপয়া আমরা জীবনে আর দুটো দেখিনি রে। ওকে দেখে তুই মরবি না, কিন্তু তোর ভাগ্যের পুটকি মেরে রেখে দেবেন ভদ্রলোক... আমার তো মনে হচ্ছে না টুর্নামেন্টটা আর হবে বলে!" বলল রঘুদা।

"কী বলছিস! উনি তো আমাদের বিল্ডিংয়ের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটেই থাকেন। রাস্তার এপার-ওপার। আমি তো রোজ ওঁকে অফিস যাওয়ার সময় দেখি। ওই এক পোশাকে। রাস্তায় পায়চারি করেন... আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন, আমিও হাসি। তোদের কথা সত্যি হলে, আমার দিন তো রোজই খারাপ যাওয়ার কথা! তা ছাড়া এটা তো তোরা আগে কখনও বলিসওনি।"

"যত দিন জানবি না, তত দিন ওঁর এফেক্ট তোর উপর কাজ করবে না। এ বার জানলি... মজাটা টের পাবি... আর তোকে এটা বলিনি কেন? কারণ আমরা পারতপক্ষে ওকে নিয়ে কোনও আলোচনা করি না।"

সৌজন্যদা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমাদের কানে ভেসে এল বিখ্যাত খনখনে গলা, "কী ব্যাপার রঘু, আজ যে ক্লাব একেবারে জমজমাট, কী মতলব হচ্ছে সব ক'টায় মিলে?" ক্লাবের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এসেছেন তিনি! মানে, আমাদের বিখ্যাতকাকু।

রঘুদা, "না, মানে..." বলে কথা শুরু করার আগেই, মচাৎ করে একটা শব্দ। ভেঙে পড়ল ওদের সোফার এক দিকের পায়া!

"বাবা গো! গেলাম গো!" বলে চেঁচিয়ে উঠল শান্তদা।

৩

"কী হয়েছে তোমার বলো তো? কাল থেকেই দেখছি কেমন গুম মেরে বসে আছ!" অনিন্দিতা চায়ের কাপটা টি-টেবিলের উপর রাখে। তার পর স্বামীর কপালে-ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলে, "শরীরটরির খারাপ করেনি তো?"

"আহ! যাও তো, বিরক্ত কোরো না।"

"আরে, কী হয়েছে?"

"কিচ্ছু না।"

"তা কিছু যখন হয়নি, তা হলে এ বার চা-টা খেয়ে বাজারে যাও। বেলা দশটা তো প্রায় বাজতে চলল। এর পর বাজার থেকে যতসব পচা জিনিস ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে আসবে," অনিন্দিতার গলায় বিরক্তির সুর।

জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে এক দৃষ্টে বাড়ির সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছিল তপন তরাই। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল অনেক চিন্তা, অনেক সমীকরণ।

বউয়ের ঠেস দেওয়া কথায় ঝাঁঝিয়ে উঠল সে, "চব্বিশ ঘণ্টা খালি গেলা আর গেলা। এর বাইরে আর কোনও চিন্তা তোমার আছে?"

"তা তুমিই বা কোন রাজকার্যের চিন্তায় ডুবে আছ শুনি?"

"শোনো, যেটা জান না, বোঝ না, তা নিয়ে একদম কথা বলতে আসবে না," খিটখিট করে ওঠে তপন তরাই।

"বাইরে কোথায় কার সঙ্গে কী ঝামেলা পাকিয়ে আসবে, তার পর বাড়িতে এসে আমাদের উপর চোটপাট করবে। এর বাইরে আর কী পারো তুমি?"

"অনু শোনো, আমার মাথা এমনিই গরম হয়ে আছে। তুমি আর সেখানে আগুন লাগাতে এসো না!" তার পর জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে পাশের দেওয়ালটায় গুমগুম করে দুটো কিল মেরে বলে, "শালা, সেদিনের ছোকরা। পাড়ায় এসেই দলবাজি! ক্লাবের দখল নেওয়ার চেষ্টা। তপন তরাইকে টপকে বড় মুরুব্বি হওয়ার চেষ্টা! সাটা জ্যাম করে দেব শালা..." একটা পাঁচ অক্ষরের গালি দেয় তপন তরাই।

"তোমাকে কতবার বলেছি, মেয়েগুলো বড় হচ্ছে। বাড়িতে অন্তত তোমার ওই নোংরা ভাষাগুলো ব্যবহার কোরো না।"

মেয়েদের প্রসঙ্গ ওঠায় একটু যেন গুটিয়ে গেল তপন তরাই। ডিম্পি-রিম্পি তার প্রাণ। ডিম্পি, মানে অপর্ণা তরাই ক্লাস নাইনের পর আর লেখাপড়া করতে চায়নি। সে হিরোইন হতে চায়। তপন এক বাক্যে সেটা মেনে নিয়েছে। লেখাপড়ার চেয়ে মেয়ের ইচ্ছের দাম তার কাছে অনেক বড়। রিম্পি, মানে সুপর্ণা তরাই এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ক্লাস এইটে উঠেছে। মনে হয় সে-ও তার দিদির পথই অনুসরণ করবে। ইনস্টাগ্র্যামে তার রিল্‌স এখনই বেশ জনপ্রিয়।

তপনের পেটে বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর বেরোনোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। ক্লাস ফোর পর্যন্ত স্কুলে সে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

এখন সে এলাকার সিন্ডিকেটের মাথা। বয়স তার পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই।

পার্টির পরিচয় কাজে লাগিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে যথেষ্ট। ইট-বালি-সিমেন্ট-রড... পাড়ায় কোনও কনস্ট্রাকশন শুরু হলেই, সে প্রোমোটার যে-ই হোক না কেন, মাল নিতে হয় টি এস এন্টারপ্রাইজ়-এর কাছ থেকে। শম্ভু গুড়িয়া নামের বদখত দেখতে একটি লোক তপনের পার্টনার। সে অবশ্য তপনের পাড়ায় থাকে না। তার বাড়ি হরিদেবপুরে। লোকে বলে, ব্যবসার মূল টাকাটা নাকি ওই শম্ভুরই।

শুধু ফ্ল্যাট তৈরির কাঁচামাল সাপ্লাই-ই নয়, তার আগে পুরনো বাড়ি ভাঙার কাজের কনট্র্যাক্টও তপন-শম্ভুকেই দিতে হয়। এক্ষেত্রে ওদের লাভ হয় দু'দিক থেকে। যে প্রোমোটার পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট করবে, তার কাছ থেকে বাড়ি ভাঙার পারিশ্রমিকবাবদ টাকা আবার সেই বাড়ি ভাঙার পর পুরনো ইট, রড, দরজা-জানালার ফ্রেম বিক্রি করে আর-এক প্রস্থ ইনকাম। বিগত কয়েক বছরে তপন তরাই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

বাপ-ঠাকুরদার রেখে যাওয়া জমিতেও প্রোমোটারকে দিয়ে ফ্ল্যাট করিয়েছে তপন। তারই একটায় সে থাকে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে। পূর্বপুরুষের জমিতে উঠেছিল জি প্লাস ফোর। প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। তপনরা পেয়েছিল চারটে, বাকি চারটে বিক্রি করেছে প্রোমোটার।

তপনদের ভাগে থাকা বাকি তিনটি ফ্ল্যাটের একটিতে থাকে তপনের এক দাদা। অন্য দু'টি ফ্ল্যাটের একটি তার একমাত্র বোনের এবং টপ ফ্লোরের ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছে তারা। ভাড়ার টাকা ভাগ হয় তিন ভাই-বোনের মধ্যে।

তপনের দাদা তাপস তরাই খুব একটা সাতে-পাঁচে থাকে না। ডিভিশন খেলা ফুটবলার, সেই সূত্রে চাকরি জুটে যায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। তার রিটায়ারমেন্টের এখনও বছর ছয়েক বাকি। স্ত্রী আর এক ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। ছেলে তন্ময়ের বয়স তেইশ বছর, এই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে সে-ই। সুযোগ পেয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও। কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় থেকেই সে কাকার সঙ্গে ঢুকে পড়েছে সিন্ডিকেটের ব্যবসায়। কাঁচা টাকার মোহে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হয়নি বটে। কিন্তু কাকা-ভাইপো মিলে এখন রোজগার করছে ভাল। এতেই নিশ্চিন্ত তার বাপ-মা। সন্ধে হলে তিন পেগ, তাপস তরাইয়ের বিলাসিতা বলতে এটুকুই।

তপনের বিবাহবিচ্ছিন্না বোন অসীমা তরাই তার একমাত্র মেয়ে রেশমাকে নিয়ে থাকে তৃতীয় তলায়। রেশমার বয়স এখন ৬ বছর।

মেয়েদের কথা প্রসঙ্গে চুপ করে গেলেও, তপনের রাগ অবশ্য কমেনি। অনিন্দিতার কথায় সাময়িক থমকেছে বটে, কিন্তু জমি হারানোর একটা আশঙ্কা ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে। সৌজন্য সান্যাল ছেলেটাকে মোটেই সুবিধের লাগছে না তপনের। পাড়ায় এসেছে দু'বছরও হয়নি। এরই মধ্যে কিনা ক্লাব ছেড়ে যাওয়া ছেলেপুলেগুলোকে আবার ক্লাবে এনে ঢুকিয়েছে! জুটিয়েছে পাড়ার বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলোকেও। এই পর্যন্ত তা-ও মেনে নিয়েছিল তপন, কিন্তু এখন সেই ছোকরা কিনা পাড়ার সব ছেলেপুলেকে একত্রিত করে ফুটবল টুর্নামেন্ট করবে! সেটা

যদি ও সত্যিই করতে পারে, তা হলে ক্লাবে যে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসবে, সেটা তপন বেশ বুঝতে পারছে। এবং তার প্রভাব পড়বে গোটা পাড়াতেই। পাড়ার ছেলেরা তাকে গুরুত্ব না দিয়ে ওই সৌজন্য সান্যালের কথায় ওঠ-বোস করবে, ওর পিছন-পিছন ঘুরবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তপন তরাই। তবে একটা সময় তো নিজের স্বার্থেই কারণে-অকারণে ঝামেলা পাকিয়ে রঘু-বিলুদের পুরো ব্যাচটাকে তিতিবিরক্ত করে ক্লাব ছাড়তে বাধ্য করেছিল তপন তরাই নিজেই। শুধু ক্লাবের আধিপত্য নিজের হাতে রাখবে বলে। এখন সেই 'ফাঁক'টাকেই কাজে লাগিয়েছে ওই সৌজন্য নামের ছেলেটা...

রঘু-বিলুদের ব্যাচটা ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার ফলে, তরুণতীর্থ-র ক্লাবঘরটা যেন হয়ে গিয়েছিল তপন তরাইয়ের নিজের বাড়ির এক্সটেন্ডেড ড্রয়িংরুম, নিজের ব্যবসার অফিসঘর। ছোটখাটো গেটটুগেদার, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ক্লাবঘর ভাড়া দিয়ে, ক্লাবের মাঠ বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া দিয়ে টাকা আসছিল ভালই। প্রশ্ন করার কেউ খুব একটা ছিল না। কারণ, তপন তরাইয়ের বয়সি যে আট-দশজন ক্লাবে আসত, তারা পিছনে তপনকে নিয়ে হাজার কথা বললেও, তার সামনে থাকত স্পিকটি নট। বরং সেক্ষেত্রে 'কে তপনের কত কাছের', 'কে তপনের কত ভাল চায়', তা নিয়ে শুরু হয়ে যেত এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা! তাদের যে কিসের এত ভয়, তা হয়তো তারা নিজেরাই জানত না। যখনই তপনের অনুপস্থিতিতে গ্রুপের মধ্যে কেউ একজন বলত, ''তপন কিন্তু এটা ঠিক করছে না,'' সঙ্গে গলা মেলাত আর কেউ, তখনই ওদের মধ্যে কেউ না-কেউ বলে উঠত, ''ছাড় না,

এসব ঝামেলায় গিয়ে কী হবে? অফিস-কাছারি করে দিনের শেষে একটু আড্ডা মারতে আসি। ফালতু ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ? ও যা করছে করুক। বলতে যাবি, আবার বাপ-মা তুলে চারটে খিস্তি মারবে, মানসম্মান নিয়ে টানাটানি। তার পর পার্টি-পলিটিক্স, কী দরকার সুস্থ জীবনকে ব্যস্ত করার?'' তপন চিরকাল এই অ্যাডভান্টেজটাই নিয়ে এসেছে।

তপনকে নিজের মনে গজরাতে দেখে অনিন্দিতা বলল, ''কে তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে বলো তো?''

হাত দুটো কচলাতে-কচলাতে তপন তরাই বলল, ''পাকা ধানে শুধু মই দেয়নি, শালা পুরো ধানটাই খেয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওই সৌজন্য সান্যালকে আমি ছাড়ব না।''

''কে, ওই লম্বা মতো ফরসা করে ছেলেটা? কোঁচকানো চুল, রিমলেস চশমা পরে?''

অনিন্দিতার দিকে গোল-গোল চোখে তাকায় তপন তরাই, ''বাবা! তলে-তলে এত! আর কী জানো ওর সম্পর্কে একটু শুনি?''

''শুনেছি ভাল চাকরি করে। এর বেশি আর কিছু জানি না। তবে ছেলেটাকে আমার বেশ লাগে, কী সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার! সকলের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে! আমাদের ডিম্পিটার জন্য যদি এ রকম একটা জামাই জোগাড় করতে পারতে...''

''চুপ, একদম চুপ,'' চেঁচিয়ে ওঠে তপন তরাই, ''ওর নাম তুমি মুখে আনবে না। তা ছাড়া এত কিছু জানো, কিন্তু ওর যে বউ-বাচ্চা আছে, সেটা জানো না!''

''তোমার মাথায় কী আছে, সেটাই শুধু জানি না!'' হতাশ গলায় বলে অনিন্দিতা। তার পর গলাটা একটু নরম করে বলে, ''ওর কোনও ভাইটাই আছে নাকি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো না...''

তপন তরাই আর কোনও কথা বলতে পারে না। একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

৪

অগস্টের প্রথম সপ্তাহ, রবিবারের আর-একটা সকাল

আজ সকাল থেকেই একটা হইহই ব্যাপার। ক্লাবের ছাদে চোঙা বাঁধা হয়েছে। চারদিকে মুখ করে চারটে। মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার গদাধরদাকে ডেকে ক্লাবের আনাচে-কানাচে জমে থাকা ঝুল ঝাড়ানো হচ্ছে। এর পর ভাল করে ঝাঁটিয়ে, ধোয়া হবে গোটা ক্লাবঘর। ক্লাবের বিভিন্ন দেওয়ালে লাগানো মান্ধাতার আমলের ছবিগুলোও পরিষ্কার করতে হবে। আজ সন্ধেবেলা যে এসপিএল-এর নিলাম! 'এসপিএল—শ্রীপল্লি প্রাইম লিগ! লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ টেলিকাস্ট ফ্রম আওর ওন ক্লাবহাউজ়!' ক্লাবের বাইরের চাতালে মাউথপিস হাতে বসে, সেই কথাই অনবরত ঘোষণা করে চলেছে বান্টিদা। যা সরু তারের মধ্যে দিয়ে ছাদের চোঙা পর্যন্ত পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পাড়ায়।

পাড়ার মান্যগণ্য অতিথিরা আজ আসবেন ক্লাবে। তাই তাদের জন্য প্লাস্টিকের খান পনেরো চেয়ার নিতে এসেছি 'গুল্লু-বিল্লু ডেকরেটার্স'-এ। গুল্লু আর বিল্লু কল্যাণদার দুই ছেলে, তাদের নামেই ব্যবসা। কল্যাণ ঘোষের দোকানটা আমাদের ক্লাবের খুব কাছেই। কল্যাণদার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। লোকটা এমনিতে একটু খিটখিটে, মুখের ডগায় 'হবে না' কথাটা সর্বক্ষণ ঝুলে রয়েছে। তবে মনটা ভারী ভাল। এই যেমন আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্টের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে। বলেছে, 'যাক, বহুদিন পর পাড়ায় ভাল কিছু একটা হচ্ছে! ভাল, ভাল।'

মুখে অনেকেই অনেক কিছুকে ভাল বলে, কিন্তু কল্যাণদা যে মন থেকে খুশি হয়েছে, সেটা বোঝা গেল তার পরের কথাতে, যখন জিজ্ঞেস করা হল, ''চেয়ারগুলোর জন্য কত দিতে হবে গো কল্যাণদা?''

কল্যাণদা তাঁর ছোট্ট অফিস ঘরের সামনে জলের ছিটে দিতে-দিতে বলল, ''বিকেলে নিয়ে রাতে ফেরত দিবি তো? ও কিছু দিতে হবে না। নিয়ে যা। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে যাস। তবে দেখিস, ভাঙাভাঙি করিস না যেন! তা হলে কিন্তু পাই-পয়সা বুঝে নেব।'' তার পর গলা নামিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে ডেকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ''তপনটা কী বলছে রে?''

বললাম, ''কিছু না, একটু গুম মেরে আছে। দু'দিন হল, ক্লাবে পা রাখেনি।''

পাশ থেকে বিটু বলে উঠল, ''তুমি আমাদের ফ্রি-তে চেয়ার দিচ্ছ শুনলে, ওর বাড়ির বিশ্বকর্মা পুজোয় কিন্তু প্যান্ডেল করে, চেয়ার-টেবিল দিয়ে আর একটি পয়সাও পাবে না কল্যাণদা...''

কল্যাণদা ঠোঁট উল্টে বলল, ''কত যেন দেয়! যাক, তোরা এখন যা, আমার আর মুখ খোলাস না। মেলা কাজ পড়ে আছে।''

“কল্যাণদা, টাকা যখন পাও-ই না, তখন তুমি কেন করো ওর বাড়ির কাজগুলো?” ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল বিটু।

“ও তোরা বুঝবি না রে, ব্যবসাটা তো চালাতে হবে। না হলে খাব কী? পার্টির কাজগুলো তো ওর সূত্রেই পাই। ধরে নিই, ওর বাড়ির কাজগুলো আমার নজরানা!”

কল্যাণদার কথাগুলো শুনে মনটা কেমন যেন করে উঠল। এখন আমার বিলুদার উপর খুব রাগ হচ্ছে, ও যে কেন এত কল্যাণদার পিছনে লাগে! শুধু বলে, ‘শ্রাদ্ধের প্যান্ডেল করার জন্য আমাদের কল্যাণদার জুড়ি নেই! সাদা কাপড় দিয়ে কী দারুণ গ্যারাজ ঘেরে!’ এর পরের দিন করলে, আর কেউ না হোক, আমি বিলুদাকে বাধা দেব।

ক্লাবে ফিরে দেখি, একতলাটার পুরো ভোল বদলে গিয়েছে! এটা কি আমাদের ক্লাব? চিনতেই পারছি না! কোথাও সিগারেটের টুকরো, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে নেই। মেঝেয় পুরু ধুলোর স্তর নেই। কাগজের টুকরো নেই। নেই, চিপ্‌স-বাদামের খালি প্যাকেট। কোনও দেওয়ালের কোণে কোথাও একটুও ঝুল ঝুলে নেই। সামান্য একটা পাড়া-ফুটবলকে কেন্দ্র করে আমাদের ক্লাবটা যে এমন নবকলেবরে সেজে উঠবে, সেটা দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। কোনও একটা পজিটিভ কাজের কত অনুসারী এফেক্ট যে হতে পারে, তা যেন আমাদের আজকের এই ক্লাবঘরটিকে দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

যদিও শান্তদা এক হাতে ক্রাচ নিয়ে লেংচে-লেংচে এ-দিক ও-দিক করে বেড়াচ্ছে আর বলছে, “শালা, ওকে আমি ছাড়ব না। কত দিন পর একটা টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ এল আর দিল সব ভোগে পাঠিয়ে...”

আসলে সেদিন টুর্নামেন্ট নিয়ে আলোচনার সময় ক্লাবঘরে শান্তদা একটা সোফায় বসে পা-টা ছড়িয়ে দিয়েছিল, উল্টো দিকে রঘুদারা যে সোফায় বসেছিল তার তলায়। বিখ্যাতকাকু আচমকা ঢুকে আসায় যখন রঘুদাদের সোফার পায়া ভাঙল, তখন তার তলাতেই চাপা পড়ে শান্তদার পা। ভাগ্য ভাল, ব্যাপারটা শুধু বাম পায়ের উপর দিয়েই গিয়েছে! ভাঙেনি, জাস্ট হেয়ারলাইন ফ্র্যাকচার। তবে এই ‘ভাগ্য ভাল’ কথাটা বলায় আমাকে বেদম ঝাড় খেতে হয়েছে সকলের কাছে। ওদের বক্তব্য, ‘শান্তর ভাগ্য ভাল হলে বিখ্যাতকাকু এই পাড়ায় নয়, অন্য পাড়ায় জন্মাত।’

রঘুদা সৌজন্যদাকে বলেছিল, “হল তো, হাতে-নাতে প্রমাণ পেলি তো? শালা একেই প্লেয়ার কম, তার মধ্যে একটাকে শুরুতেই মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল।”

সৌজন্যদা নিচু গলায় বলেছিল, “তিন জনের সোফায় তোরা সাত জন বসলে ওই ভদ্রলোকের কি আর বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন আছে রে?”

“তুই শালা এখনও বিষয়টাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিস না। এর পর যেদিন নিজে বাম্বু খাবি ওই মালটার জন্য, সেদিন বুঝবি,” বেশ রেগে গিয়েই কথাগুলো বলেছিল বিলুদা।

সে কথায় পাত্তা না দিয়ে সৌজন্যদা একটা চোখ টিপে বলেছিল, “তা হলে নিলামের দিন ক্লাবে আসার জন্য তোদের বিখ্যাতকাকুকে আলাদা করে ইনভাইট করব না বলছিস?”

“এই বিষয়টাকে নিয়ে চ্যাংড়ামো করিস না ভাই... ওই একটা মানুষ কিন্তু একা সব ভেস্তে দিতে পারে!” ধরা গলায় বলেছিল রঘুদা।

তবে টিমের সঙ্গে পাড়ার সিনিয়র মানুষদের মেন্টর হিসেবে রাখার পরিকল্পনাটা দারুণ সাড়া ফেলেছে। প্রবীণ মানুষেরা প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করছিলেন বটে। কিন্তু আমরা সদলবলে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ঝুলোঝুলি করায়, তাঁরা যে খুশিই হয়েছেন এটা এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে তাঁরা এখন প্রায় ঢুঁ মারেন ক্লাবে, খোঁজ নেন প্রস্তুতির কত দূর কী হল? যে উমাজেঠু, কালীপদজেঠুরা ক্লাবের নাম শুনলে রেগে যেতেন, সেই তাঁরাই এখন বলছেন, “পাড়ায় ক্লাব থাকবে অথচ তার কোনও অ্যাক্টিভিটি থাকবে না, এটা কি কোনও কাজের কথা নাকি!”

নিলামের সময় আইকন প্লেয়ারদের পাশে চেয়ার পেতে বসানো হয়েছে মেন্টরদেরও। টিম তৈরির সময় তাঁদের মতামতও যেন নেওয়া হয়, কথাটা পইপই করে আমাদের পাঁচ আইকন প্লেয়ারকে বলে দিয়েছে সৌজন্যদা। মোদ্দা কথা, তাঁদের যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ক্লাবের ছোট্ট হলে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে নিলামের আসর। দু’টি করে চেয়ার পাশাপাশি, তার পর কিছুটা ফাঁকা জায়গা, তার পাশে আবার দু’টি চেয়ার। এইভাবে মোট পাঁচ সেট চেয়ার। রঘুদার পাশে বিজয়জেঠু, বিলুদার পাশে প্রশান্তজেঠু, বাপ্তুদার পাশে উমাজেঠু, জিঙ্গোর পাশে কালীপদজেঠু এবং পুটাইদার পাশে নির্মলজেঠু। ওদের সকলের হাতে একটা করে পিচবোর্ড, তাতে আটকানো একটা করে সাদা পাতা। সঙ্গে আছে দুটো করে পেনসিল। কাকে দলে নেওয়া হল, কত পয়েন্ট খরচা হল, হাতেই বা কত পয়েন্টে আছে, এই সব হিসেব-নিকেশ লিখে রাখার জন্য আর কী!

ওদের মুখোমুখি একটি টেবিল, তার পিছনে তিনটি চেয়ারে বসেছে সৌজন্যদা, কাশীজেঠু এবং বান্টিদা। নিলাম পরিচালনা করবে মূলত কাশীজেঠু, সৌজন্যদা ও বান্টিদা তাঁকে সাহায্য করবে। বাকিরা সকলে আইকন প্লেয়ার ও মেন্টরদের পিছনের দেওয়ালে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়েছে।

শুধুমাত্র আমি আর জিকো আছি একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে। ফেসবুক লাইভের দায়িত্বটা যে রয়েছে আমাদের উপরেই! হাতঘড়িটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সৌজন্যদা বলল, “রুবাই, তোরা রেডি?”

ট্রাইপডের উপর রাখা ডিএসএলআর-টা অন করে, ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রেখে, হাত তুলে কাউন্ট দিলাম, “থ্রি, টু, ওয়ান... উই আর লাইভ!”

নিলাম হল জমজমাট! সে কী উত্তেজনা সকলের মধ্যে! জিকো আর ভুটুনকে নিয়ে কী টানাটানি! সকলে নিজেদের টিমে চায় ওদের। শেষ পর্যন্ত পঁয়ষট্টি পয়েন্ট খরচা করে জিকোকে ‘কিনে নেয়’ জিঙ্গো আর বাষট্টি পয়েন্টে ভুটুনকে ‘কেনে’ পুটাইদা। কিন্তু এক জন প্লেয়ারের উপর অনেকটা পয়েন্ট খরচা করে ফেলায় ওদের বাকি টিমটা হয়েছে একটু নড়বড়ে। সবচেয়ে ব্যালেন্সড টিম হয়েছে রঘুদার। আসলে রঘুদা খুব বুদ্ধি করে নিলামটা সামলেছে। একটু ভুল হল, আসলে বুদ্ধিটা নাকি বিজয়জেঠুর। রঘুদার মেন্টর। নিলাম শেষে রঘুদাই বলল, “বিজয়জেঠুর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি কিন্তু সাংঘাতিক! আরে উনিই তো বললেন, ফলস বিড করে জিকো আর ভুটুনের দরটা যত সম্ভব চড়া করে দিতে! সেই ফাঁদে পা-ও দিল জিঙ্গো আর পুটাই!”

তবে সকলে মোটামুটি নিজের দল নিয়ে খুশি। খুশি পাড়ার প্রবীণ মানুষগুলোও। পুরো ব্যবস্থাপনাটাই ওঁদের বেশ মনে ধরেছে। সেকথা বলছেনও বার বার। সকলেই সৌজন্যদার সঙ্গে এসে হাত মিলিয়ে যাচ্ছে। এ রকম একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলছে, “সাবাস ইয়াং ম্যান! এ রকমই একটা কিছুর দরকার ছিল। তোমরা এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমাদের পাশে।”

অনেক দিন পর ক্লাবটা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে! ও হ্যাঁ, আমার জন্য সবচেয়ে ভাল খবর, আমি আর সৌজন্যদা, দুজনেই এক টিমে! সৌজন্যদাকে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট আর আমাকে বাইশ পয়েন্টে ‘কিনেছে’ বাপ্তুদা। আরও একটা ভাল খবর, আমাদের ফেসবুক লাইভটা ইতিমধ্যে সাতান্নটা শেয়ার হয়েছে, ভিউ ইতিমধ্যেই পাঁচশো ছাড়িয়েছে। সেটা নিশ্চিত ভাবে আরও বাড়বে পরের দু’-তিন দিনে। এবং আমি কিন্তু এরই ফাঁকে দেখে নিয়েছি, পুরো লাইভটা সুমেধা দেখেছে ঘাপটি মেরে। রিঅ্যাকশন দেয়নি কোনও, কিন্তু দেখেছে শেষ পর্যন্ত।

আচ্ছা, ও কি আমাকেই খোঁজার চেষ্টা করছিল সর্বক্ষণ?

৫

“তুমি কী বলো তো! দিনের মধ্যে আট থেকে ন’ঘণ্টা তোমার অফিস আর বাকি সময়টুকু পুরোটাই ক্লাব! আমাদের জন্য কি কোনও সময় থাকবে না তোমার? বাড়িতে কি শুধু ঘুমোনোর জন্য আসো?” বিছানার চাদরটা বদলাতে-বদলাতে বলল শ্রীময়ী সান্যাল।

ড্রেসিং টেবিলের পাশের টুলটায় বসে একমনে ফোন দেখছিল সৌজন্য সান্যাল। শ্রীময়ীর কথাগুলো তার ঠিক কানে গেল না।

“আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি সাম্য। ফোনটা থেকে দয়া করে একটু মুখটা তুলবে?”

ফোনের দিকে তাকিয়েই সৌজন্য বলল, “নিলামের লাইভটায় এরই মধ্যে সাড়ে আটশো ভিউ হয়ে গিয়েছে শ্রী!”

“ব্যস, তা হলে আর কী! বিশ্ববিজয় তো করেই ফেলছ। আর কোনও সমস্যাই রইল না! মিঠাইকে নিয়ে আমি তা হলে ক’টা দিন বাবা-মায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি...” চাদরের কোণগুলো ম্যাট্রেসের তলায় গুঁজতে-গুঁজতে বলল শ্রীময়ী।

শেষের লাইনটা কানে ঢুকেছে সৌজন্যর। সে তড়িঘড়ি ফোনের স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে বলল, “এই কথায়-কথায় বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে কী মজা পাও বলো তো! একটু নতুন কিছুও তো ভাবতে পারো?”

“সাম্য, একদম ইয়ার্কি মারবে না। আমি কিন্তু সিরিসাস,” শ্রীময়ীর গলায় অভিমানের ছোঁয়া।

সেটা টের পেয়ে একটু সচেতন হয় সৌজন্য। ফোনের ডিসপ্লেটা বন্ধ করে বউয়ের মান ভাঙাতে বলে, “তুমি বাপের বাড়ি চলে গেলে আমার কী হবে বলো তো শ্রী?”

“কী আর হবে, আরও বেশি করে ক্লাব নিয়ে মেতে থাকবে। নিশ্চিন্তে!”

“রাগ হয়েছে?”

“সেটা বোঝার ক্ষমতা আছে তোমার?”

“যদি না-ই বুঝতাম, তা হলে প্রশ্নটা করলাম কী করে?”

“তোমার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব না।”

“তা একটু শক্ত বটে,” বউকে জড়িয়ে ধরে বলে সৌজন্য।

“থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। ওঘর থেকে মিঠাইকে নিয়ে এসো তো। রাত্তির সাড়ে দশটা বাজতে চলল। সেই তখন থেকে অঞ্জুলাদির সঙ্গে বসে-বসে টিভি দেখছে।”

“দেখুক না একটু! সব সময় এত শাসন কোরো না। আর তিন বছরের মেয়েকে যদি এত শাসন করো, তা হলে ক্লাস ফাইভে ওঠার আগেই ও কিন্তু বোর্ডিং স্কুলে পালাবে! আচ্ছা শোনো, অঞ্জুলাদি সেদিন মাইনে বাড়ানোর কথা বলেছিল না তোমাকে... সেটা নিয়ে কি কিছু ভেবেছ?”

“বাবা! এসব কথাও তুমি খেয়াল করো তা হলে?” সৌজন্যর কথায় অবাক হয় শ্রীময়ী।

“সব দিকে আমার খেয়াল থাকে ম্যাডাম। যেমন খেয়াল আছে আগামী শনিবার রাত আটটায় মেয়ের ভ্যাকসিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওয়াটার পিউরিফায়ার থেকে জল লিক করছে, ওটার জন্য একটা সার্ভিস কল বুক করতে হবে। রান্নার দিদি কাল থেকে তিন দিন আসবে না, কারণ ওর দিদির মেয়ের বিয়ে— সেই ক’টা দিনের জন্য হোম ডেলিভারিতে খাবার অর্ডার করতে হবে। আর...”

“আর?”

“আর আমি এটাও জানি যে, পুরনো ফোনটা নিয়ে তুমি গত কয়েকদিন ধরেই বেশ স্ট্রাগল করছ। ওটা বদলানোর সময় হয়েছে।”

“আই অ্যাম ইমপ্রেসড!”

“তবে...” ভ্রু নাচিয়ে বলে সৌজন্য।

“কিন্তু আমাদের বেড়ানো, সেটার কী হবে? পুজোর ছুটিটা কি এ বারও আমরা তোমাদের বিক্রমগড়েই কাটাব?” সৌজন্যর গা ঘেঁষে বসে শ্রীময়ী।

“তা কেন? সপ্তমী অবধি তো কলকাতাতেই থাকব। অষ্টমীর দিন সকালে গাড়ি নিয়ে সো-জা বিক্রমগড়!” বলেই চোখ বন্ধ করে একটা লম্বা শ্বাস নেয় সৌজন্য সান্যাল। যেন দক্ষিণ কলকাতার এই এক হাজার পঁচাত্তর স্কোয়্যার ফুটের চৌখুপ্পিতে বসেই মেদিনীপুরের খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে গ্রামের বিশুদ্ধ বাতাস খানিকটা ফুসফুসের ভিতর ভরে নেয় সে।

“পুজোর সময় নিজের বাড়িতে ফেরার মজাই আলাদা! পুরনো পাড়া, ছোটবেলার বন্ধুবান্ধব, চেনা মানুষজনের মুখের ভিড় থেকে উড়ে আসা ডাকনাম...”

“ব্যস, আবার শুরু হল!”

“ঈর্ষা করছ তো?”

“না রে বাবা। কিন্তু সাম্য, আমি দেখেছি বিক্রমগড় নিয়ে কথা হলেই তুমি কেমন একটা অন্য জগতে চলে যাও!”

“আসলে কী জানো, প্রকৃতির কোলে এ রকম একটা জায়গায় বড় হয়ে ওঠার মজাটা যে কী, সেটা সত্যিই আমি তোমাকে কখনও বলে বোঝাতে পারব না। ওই জীবনটা যাপন না করলে, বোঝা ভারী শক্ত,” সৌজন্যর গলায় নস্টালজিয়ার ছোঁয়া।

শ্রীময়ী দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে। তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সবই ছিল দক্ষিণে। উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরিজীবী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সৌজন্যর সঙ্গে আলাপ অফিসের একটা পার্টিতে। ওরা তখন একই হাউজ়ে। সৌজন্য ছিল সেলসে আর শ্রীময়ী ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টসে। প্রথম আলাপে প্রায় সমবয়সি সৌজন্যকে যতটা না ভাল লেগেছিল শ্রীময়ীর, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভাল লেগেছিল তার কলিগ দেবাদৃতার। মূলত দেবাদৃতার উদ্যোগেই এর পর তাদের আলাপচারিতা বাড়ে। অফিসের পর সিনেমা দেখতে যাওয়া, লেটনাইট ডিনারের প্ল্যান... ক্রমশ দেবাদৃতাকে ছাড়াও আলাদা দেখা করতে শুরু করে সৌজন্য-শ্রীময়ী। কোর্ট-প্যান্ট-টাইয়ের আড়ালে সৌজন্যর মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা গ্রাম্য-বুনো ছেলেকে ক্রমশ নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে শ্রীময়ীর। সৌজন্যর আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, শিকড়ের প্রতি টান... একটা শক্তিশালী চুম্বকের মতো ক্রমাগত আকর্ষণ করছিল তাকে।

বিয়ের প্রস্তাবটা আসে শ্রীময়ীর তরফ থেকেই। সৌজন্যর আপত্তি করার কোনও কারণই ছিল না। লেকটাউনের পেয়িং গেস্ট ছেড়ে সে উঠে আসে দক্ষিণের গ্রাহামস রোডে, ভাড়াবাড়িতে সংসার পাতে শ্রীময়ীর সঙ্গে। এই বিয়ে নিয়ে শ্রীময়ীর বাড়ির সকলে যে খুব খুশি ছিল তা নয়, কারণ সৌজন্যের পে-প্যাকেজ। কিন্তু শ্রীময়ী ছিল একবগ্গা। এখন অবশ্য জামাইয়ের সাফল্যে শ্রীময়ীর বাবা-মা যারপরনাই আহ্লাদিত।

“সে তো বুঝলাম, কিন্তু সিরিয়াসলি বলো তো, আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কী হবে? ওটা প্লিজ় সময় থাকতে প্ল্যান করো... আমাকেও তো ছুটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে!”

“শ্রী, এই ফুটবল টুর্নামেন্টটা হয়ে যাক— নেক্সট প্রজেক্ট, মিশন হলিডে ডেস্টিনেশন। জানো, টুর্নামেন্টটা নিয়ে পাড়ার সকলে খুব এক্সাইটেড!”

“সে খুব ভাল কথা। কিন্তু দেখো, এসব করতে গিয়ে কোনও ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়ো। তুমিই তো সেদিন বলছিলে, পাশের কোন পাড়ায় একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে দুই দলের ওই মারামারির গল্পটা... একটা ছেলের নাকি চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল!”

কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি সৌজন্য, সে বলল, "অঞ্জুলাদির ব্যাপারটা কিন্তু ফাইনাল করে ফেলতে হবে। হাজার হোক, আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তো ওঁর দায়িত্বেই থাকে!"

"কথা ঘোরানোর আর্ট তোমার কাছ থেকে শিখতে হয় সাম্য!" হাত দুটো জড়ো করে নিজের কপালে ঠেকায় শ্রীময়ী।

৬

টুর্নামেন্টের বাকি আর মাত্র সাতদিন। তাই মাঠের ঘাসটা এ বার ছাঁটিয়ে ফেলতে হবে। না হলে বল ঠিকমতো রোল করবে না। বর্ষার পর-পরই আমাদের মাঠের ঘাস খুব দ্রুত হারে বাড়ে। কিন্তু পুজোর আগে পর্যন্ত এই ঘাস কখনও ছাঁটানো হয় না। কারণ, সেই খরচ নেহাত কম নয়। পুজোর আগে, বছরে ওই একবারই ছাঁটানো হয় ঘাস। পুজো কমিটির খরচে।

শ্রীপল্লির আমাদের এই মাঠটা খুব একটা বড় নয়, আবার দক্ষিণ কলকাতার পাড়ার মাঠ হিসেবে খুব ছোটও নয়। তা লম্বায় একশো কুড়ি ফুট আর চওড়ায় সত্তর-আশি ফুট তো হবেই। মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে, মাঠেরই কিছুটা অংশের উপর রয়েছে আমাদের ক্লাবঘর। তাই মাঠটাকে পুরো চৌকো হিসেবে ধরা যায় না।

আমাদের পাড়াটা এমনিতে খুব সুন্দর। এটা কোনও হাউজ়িং কমপ্লেক্স নয়, অথচ অনুভূতিটা সেরকমই। মাঠের চারদিকেই ষোলো-আঠারো ফুটের চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তার পাশে-পাশে, মাঠ ঘিরে বহুতলের সারি। যেন চারদিক থেকে দেওয়াল তুলে আগলে রাখছে এই এক টুকরো সবুজকে।

আমাদের ছোটবেলায় অবশ্য এগুলো সবই একতলা বা দোতলা বাড়ি ছিল। বিগত সাত-দশ বছরে বদলে গিয়েছে পাড়ার স্কাইলাইনটা। মাথা তুলেছে একের পর-এক ফ্ল্যাটবাড়ি। অনেক নতুন-নতুন মানুষ এসেছেন পাড়ায়, ফ্ল্যাট কিনে কিংবা ভাড়ায়। সৌজন্যদার পরিবারও তাদের মধ্যে একটি। পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরির একমাত্র ভাল দিক আমার কাছে এটাই। মাঠসংলগ্ন এলাকা ছাড়াও আমাদের পাড়াটা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অনেকটাই বিস্তৃত। মানে, আমাদের পাড়াটা লম্বাটে। এবং তার ফুসফুস হল, পাড়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্লাবসংলগ্ন এই মাঠ। বার্ডআই ভিউতে গোটা পাড়াটা দেখতে অনেকটা পালতোলা নৌকোর মতো লাগবে বলেই আমার মনে হয়।

যাই হোক, সেই মাঠের ঘাস ছাঁটাতে গিয়েই আমরা পড়লাম মহা ফাঁপরে! মাঠের অর্ধেকের একটু বেশি অংশের ঘাস তখন ছাঁটা হয়েছে, এদিকে ঘাস ছাঁটানো বাবদ যে বাজেট আমরা করেছিলাম, তা প্রায় শেষ। এ রকমটা হওয়ার কারণ, আমাদের অনভিজ্ঞতা। চারটে লোক যে তিন দিনে এই ঘাস কাটতে পারবে না, সেটা আমরা আন্দাজই করতে পারিনি। আসলে পুজোর সময় মাঠের ঘাস কাটানো হয় লন মোয়ার দিয়ে। তার যোগাযোগের নম্বর তপনদার কাছেই ছিল। ফি-বছর পুজোর সময় তপনদাই তো করায় কাজটা। সেই ভদ্রলোকের নম্বর চাইতে জিকো আর জিঙ্গো গিয়েছিল তপনদার কাছে। সরাসরি 'দেব না' বলেনি। বলেছিল, "ফোনটা তো চেঞ্জ করেছি রে। কেন জানি না, এই নতুন ফোনে নম্বরটা আসেনি। দেখি দাঁড়া, অন্য কারও কাছ থেকে জোগাড় করতে পারি কিনা!"

তিন দিন ঘোরানোর পর আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, ওই নম্বর তপনদা দেবে না। অগত্যা, ম্যানুয়াল লেবারারই ভরসা। বাঁশদ্রোণী বাজারের সামনে খুব সকালে গেলে এ রকম কাজের মানুষ পাওয়া যায়। যারা ঝুড়ি, কোদাল, কুড়ুল নিয়ে বসে থাকে কাজের অপেক্ষায়। সেখান থেকেই পুটাইদা নিয়ে এসেছিল চার জনকে। ওরা বলেছিল, তিন দিনে নামিয়ে দেবে কাজটা। নেবে ছ'হাজার টাকা। দরাদরি করে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় চুক্তি পাকা হয়। কিন্তু তিন দিনের শেষে তারা হাত তুলে দেয়। বলে, "মোরাও ঠিক বুঝিনি গো দাদাবাবুরা। এ মাঠের ঘাস বড় শক্ত গো। তোমরা চার হাজার টেকা দিছ, আমাদের আর টেকা দিতে হবেনি। কিন্তু বাকিটা আর ওই টেকায় করতে বোলোনি গো... আমাদের বড় লোসকান হয়ে যাবে..."

তখন বিকেল সাড়ে চারটে। সৌজন্যদা, রঘুদা, বিলুদা, মানে আমাদের সিনিয়ররা সকলেই নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত। কলেজ থেকে ফিরে মাঠে এসে একে-একে জড়ো হচ্ছি আমি, জিকো, বিম্বো, জিঙ্গো। আমাদের দেখেই এগিয়ে আসে লোকগুলো। জানায় ওদের অপারগতার কথা।

লোকগুলোর অবস্থা দেখে আমাদের সকলেরই খুব মায়া হল। ওদের পরিস্থিতিটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদেরটা এখন বুঝবে কে!

হাতে আর মাত্র চার দিন। এখন কী হবে?

এদেরই বা কী বলি? সৌজন্যদাকে একটা ফোন করব? জানি অফিসে কাজের মধ্যে আছে, তা-ও ফোন না করে কোনও উপায় নেই। ফোনটা বেজে গেল... দ্বিতীয় বার রিং করতেই, ফোনটা ডিসকানেক্ট হয়ে একটা টেক্সট ঢুকল আমার ফোনে, 'ইন আ মিটিং, উইল কল ইউ ব্যাক'।

রঘুদার ফোন বন্ধ। তৃতীয় ফোনটা করলাম বিলুদাকে, কথাটা শুনেই খ্যাঁক করে উঠল, বলল, "মালগুলোকে ধরে রাখ। চুক্তি যখন করেছে, তখন তো সেটা পূরণ করতেই হবে।"

আমি "আচ্ছা, আচ্ছা," বলে ফোনটা রেখে দিলাম।

নিজেরই এখন নিজের উপর রাগ হচ্ছে। বিলুদাকে যে কেন ফোনটা করতে গেলাম! বোঝে না কিছু, সব সময় খালি হাঁই হাঁই করে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমার ফোনটা বেজে উঠল, 'সৌজন্যদা কলিং'! ফোনটা রিসিভ করেই এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম জরুরি কথাগুলো। পুরোটা মন দিয়ে শুনে সৌজন্যদা ঠান্ডা মাথায় বলল, "ওদের যেতে দে। অফিস থেকে ফিরে দেখছি কী করা যায়। তুই বরং দ্যাখ, আজ সন্ধেবেলা সকলে একবার মাঠে আসতে পারবে কিনা। আমি রঘু-বিলুদের সঙ্গে কথা বলছি।"

৭

সন্ধে ছ'টা দশ। মাঠের মাঝে এখন আমরা ছড়িয়েছিটিয়ে বসে আছি। সকলে এখনও এসে পৌঁছয়নি। সৌজন্যদা অফিস থেকে ফিরে বাড়ি ঢোকেনি, ব্যাগপত্তরসহ ওই পোশাকেই চলে এসেছে মাঠে। বৌদিদের নিয়ে কোথাও নাকি একটা যাওয়ার আছে। এই আলোচনাটা সেরেই বেরিয়ে যাবে। এখন সে তার পা দুটো টানটান করে ছড়িয়ে, বাম হাতে ভর দিয়ে আধশোয়া। আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। রঘুদা একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়ে এক মনে তার গোড়াটা চিবিয়ে চলেছে। ভোম্বল কাকে যেন একটি নিবিষ্ট মনে হোয়াটসঅ্যাপ করছে। আর আমি... একটা ঢোক গিললাম। তার পর বললাম, "আচ্ছা, আমরা নিজেরাই যদি মাঠে নামি! মানে আমরা সকলে... ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনে দু'দিনে বাকি ঘাসটা ছেঁটে ফেলতে পারব না?"

আমি এমনিতে কাজের নাম শুনলেই দূরে পালাই। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কে যেন আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে নিল!

"সাবাস রুবাই! একজ্যাক্টলি। আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম। টিম বিল্ডিংয়ের জন্যও এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর হয় না," বলল সৌজন্যদা।

"কিন্তু এত কোদাল আমরা পাব কোথায়?" শুকনো মুখে বলল ভোম্বল।

"ঘাস কাটা বাবদ যে দেড় হাজার টাকা আমাদের হাতে এখনও আছে, তা দিয়ে দুটো বা তিনটে কোদাল হয়ে যাবে। ক্লাবের অ্যাসেটও

হবে, আমাদের কাজও। আর পাড়ায় খোঁজ করলে খানকতক ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। দু'দিনেই আমরা নামিয়ে দেব কাজটা। বাকিরা আসুক, দেখি কী বলে," সৌজন্যদার গলায় প্রত্যয়ের ছোঁয়া।

"কেউ কিচ্ছু বলবে না। কেউ কিচ্ছু করবে না..." অনেকদিন বেপাত্তা থাকার পর হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হল তপনদা। বোঝাই যাচ্ছে, পায়ে পা তুলে একটা ঝামেলা বাঁধানোর মতলব নিয়ে এসেছে। আমরা মাটিতেই বসে আছি, তপনদা দাঁড়িয়ে। মনে হল যেন কিঞ্চিৎ টলছে ওর পাগুলো।

সৌজন্যদা চোখের ইশারায় আমাদের সকলকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিল।

ওর কথায় আমরা কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছি না দেখে তপনদা আবার বলে উঠল, "মাঠের ঘাস চেনো চাঁদু, এসেছ টুর্নামেন্ট করতে! শালা, বেপাড়ার মাল।"

রঘুদা আর চুপ করে থাকতে পারল না, মাটিতে বসেই তপনদার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তপনদা, বেপাড়ার মাল কাকে বলছ?"

তপনদা ঝাঁঝিয়ে উঠল, রঘুদার দিকে তর্জনি তুলে বলল, "এই রঘু, তুই এর মধ্যে ঢুকিস না।"

তার পর সৌজন্যদার দিকে নির্দেশ করে বলল, "ক'দিন চিনিস ওই মালটাকে? তোদের সকলকে নাচাচ্ছে আর তোরাও ওর তালে-তালে নাচছিস! ওর শালা নির্ঘাৎ কোনও বড় স্কিম আছে, যেটা তোরা ধরতেই পারছিস না।"

সৌজন্যদা ওই তর্কে না ঢুকে খুব শান্ত গলায় বলল, "তপনদা, তুমি ঘাস চেনো তো? তা হলেই হবে..."

রঘুদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এ বার সৌজন্যদার দিকে তাকাল তপনদা। তার পর গর্জে উঠল, "চিনি মানে? আলবাত চিনি। এই মাঠের প্রতিটা ঘাসও আমায় চেনে। এখানেই আমার জন্ম, ছোট থেকে বড় হয়েছি রে শালা, এই পাড়ায়। তোর মতো উড়ে এসে জুড়ে বসেছি নাকি রে!"

মাঠের মধ্যে এ রকম একটা চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে, আশপাশের ফ্ল্যাটবাড়ির অনেক জানলাতেই ভিড় করেছে কালো-কালো বেশ কিছু মাথা। মাঠের আশপাশেও অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি জানি, পুরো সময়টা জুড়ে ওরা সব ওখানেই স্থির থাকবে। তপনদাকে দেখে কেউ এক পা-ও এগোবে না। কিন্তু আমাদের বাকি ছেলেগুলো গেল কোথায়? কারও যদি একটু সময় জ্ঞান থাকত!

সৌজন্যদা এ বার উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে রঘুদা। ওদের দেখাদেখি আমরাও। একটা হাতাহাতি না শুরু হয়ে যায়! আমার রীতিমতো ভয় করতে শুরু করেছে।

কিন্তু সৌজন্যদা সেসব কিছুই করল না। দু'হাত দিয়ে প্যান্টের পিছনটা ঝেড়ে বলল, "বলা হয়ে গিয়েছে, নাকি আরও কিছু বাকি আছে?"

"আছে তো বটেই। শোনো চাঁদ, পাড়ায় নতুন এসেছ, চুপচাপ থাকো। অফিস-কাছারি করো, বিকেল-সন্ধেয় বউ-বাচ্চাকে নিয়ে একটু বেড়ুবেড়ু করো... কিন্তু এই দলাদলিটা করতে যেয়ো না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে না..."

"বলো... শুনছি..."

"বেশি বাড়াবাড়ি করলে, ক্যাঁতক্যাঁত করে তিনটি লাথি মেরে পাড়া থেকে ভাগিয়ে দেব। শালা... শুয়োরের বাচ্চা!" গালিটা উচ্চরণের সময় গলার স্বরটা আরও দুই ধাপ চড়াল তপনদা।

সৌজন্যদা এ বার দু'পা এগিয়ে গেল তপনদার দিকে। একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পর তপনদার চোখে চোখ রেখে গলার স্বরটা যতটা সম্ভব নরম করে বলল, "তুমি না পার্টির নেতা! এই তোমার বুদ্ধি! সকলের সামনে নিজেকে বেইজ্জত করার জন্য ড্যাং ড্যাং করতে করতে চলে এলে?"

সৌজন্যদার কাণ্ড দেখে আমরা রীতিমতো ভড়কে গিয়েছি। তপনদাও বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছে।

সৌজন্যদা বলতে লাগল, "তোমার তো পাড়ায় একটা সম্মান আছে, নাকি? লোকে মান্যগণ্য করে, সমঝে চলে। এখন এই সকলের সামনে আমি যদি তোমাকে উল্টো-সোজা কিছু বলে বসি, কিংবা ধরো একটু হালকা ধুয়ে দিই, এদের কাছে তোমার সম্মানটা থাকবে? রুবাই, ভোম্বল কিংবা আর যারা-যারা বাড়ির জানালা থেকে দেখছে, তারা তোমাকে এর পর আর ভয় পাবে? কথাটা রাষ্ট্র হতেও কি খুব বেশি সময় লাগবে?"

চিৎকার করে ওঠে তপনদা, "ওই, কী বলছিস? কী বলতে চাইছিস তুই? আমি তোর গাঁ..."

"শ্‌শ্‌শ, চুপ। একদম চুপ," নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল এনে তপনদাকে চুপ করতে বলল সৌজন্যদা। তপনদাও ঘাবড়ে গিয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো চুপ করে গেল। আসলে, এসবই তো ওর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা! আজকের এই সন্ধের আগে পর্যন্ত কেউ কখনও ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে বলে তো মনে হয় না।

মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে সৌজন্যদা বলল, "অনেক বলেছ। এ বার আমি বলব আর তুমি শুনবে চাঁদ," তার পর গলাটা একটু উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে তপনদার চার দিকে চক্কর কাটতে-কাটতে বলতে লাগল, "তোমার মতো বাপ-ঠাকুরদার জমি প্রোমোটারকে দিয়ে টাকা আর ফ্ল্যাট আমি বাগাইনি। নিজের ঘামঝরানো টাকায় এই পাড়ায় ২/৯৫এ থার্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটটার ডাউন পেমেন্ট করেছি, ইএমআই দিই। সেটাও দু'বছর হয়ে গেল। তাই বেপাড়া নয়, আমি এই পাড়ারই 'মাল'। এবং কিছু ক্ষেত্রে, তোমার চেয়েও বাজে 'মাল'। তাই তুমি পাঁচ অক্ষর দিলে আমি যে সাত অক্ষর ফিরিয়ে দিতে পারি, সেটা মাথায় রেখো। এত কাল যেটা করে এসেছ, কেউ কিছু বলতে এলে তাকে খিস্তি দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছ আর তারাও নিজেদের সম্মান বাঁচাতে তোমাকে এড়িয়ে চলেছে এবং তুমি সেটাকে নিজের প্রতি ওদের সম্মান ভেবেছ— সেই খেলাটা আমার সঙ্গে চলবে না। আমার সম্মান এত ঠুনকো নয় তপন তরাই। আর আমাকে, আমার পরিবারকে লাথি মেরে পাড়া থেকে তাড়াবে? শোনো, লাথি মারা তো অনেক দূরের কথা, তুমি আমার গায়ে জাস্ট একবার টাচ করে দেখাও... দেখি তোমার ক'টা বাবা!"

সৌজন্যদার এই রূপ আমরা এর আগে কেউ কখনও দেখিনি। ইতিমধ্যে মাঠে এসে হাজির হয়েছে বিলুদা, জিকো, জিঙ্গো, পুটাইদা, বিম্বো... কিন্তু কেউ কোনও কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। সকলে সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সৌজন্যদার দিকে।

তপনদার বুকের ভিতরটা যে ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, সেটা ওর মুখ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবু যেন শরীরের সব শক্তি এক জায়গায় এনে একটা বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করল, "ভুল করছিস, খুব বড় ভুল করছিস। জানিস না তুই কার সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছিস..."

"কে তুমি? দেশের রাষ্ট্রপতি? প্রধানমন্ত্রী? এমপি, এমএলএ? কে তুমি? আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলার হওয়ার টিকিট পাবে বলে দিবাস্বপ্ন দেখছ। আরে শোনো, সেটা পেতে গেলেও না জনসংযোগটা ঠিক করতে হয়। জ-ন-সং-যো-গ। মানে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ। আজ যা হল, এতে যে তোমার কত পয়েন্ট কাটা গেল, কে জানে! তোমাকে কিন্তু সম্মান দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরি টু সে, সেটা নিতে গেলেও না, মিনিমাম একটা যোগ্যতা লাগে," সৌজন্যদার ঠোঁটের ডগায় আজ যেন সুনামির বান ডেকেছে!

তপনদা এ বার পুরোপুরিই ধসে পড়েছে। তবু ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না! বড়-বড় চোখ করে তাকাল সৌজন্যদার দিকে, তার পর ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে, কে আছে রে তোর সঙ্গে? কার জোরে তুই এত তড়পাচ্ছিস?"

সৌজন্যদা আবার এসে দাঁড়াল তপনদার মুখের সামনে। তার পর নিজের ডান হাতটা মুঠো করে, বাঁদিকের বুকের উপর টিপটিপ করে আঘাত করে একেবারে ফিল্মি হিরোদের কায়দায় বলল, ''স্রেফ এই কলজেটা।''

৮

কোন টিশার্টটা পরব, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। ডেনিমটা মোটামুটি ডিসাইডেড, স্টোনওয়াশড ব্লু শেডটাই বেস্ট। কিন্তু টি-শার্ট? খাটের উপর আমার প্রিয় আটটা টি-শার্ট ছড়ানো।

একটা গোপন খবর এই বেলা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। কাল রাতে সুমেধা আমায় মেসেঞ্জারে পিং করেছিল! তার পর বেশ কয়েক ডজন শব্দ আদান-প্রদান হয়েছে আমাদের মধ্যে। এর আগে আমার ফেসবুক পোস্টে দু'-একবার 'লাইক' দিয়েছে বটে, কিন্তু কোনওদিন কোনও কমেন্টও করেনি। আমিও যথেষ্ট হিসেব করে চলি। ইচ্ছে করে, ও কিছু পোস্ট করলেই তাতে 'লভ' রিঅ্যাকশন দিতে, কিন্তু জিকো আর জিঙ্গোর কথা ভেবে নিজের ইচ্ছেগুলোকে যথাসম্ভব চেপেচুপে রাখি। আমরা আসলে কেউ-কাউকে বুঝতে দিতে চাই না, সুমেধাকে আমরা কে ঠিক কতটা 'স্টক' করি। এমনিতে আমি-জিকো-জিঙ্গো খুবই ভাল বন্ধু। কিন্তু আমি জানি, সুমেধার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা চাপা টেনশন আছে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে কখনও কিছু বলিনি, কিন্তু এটা আমরা তিন জনই বুঝি।

সুমেধা এমনিতে আমাদের কাউকেই খুব একটা পাত্তাটাত্তা দেয় না, প্রেসিডেন্সির ইংলিশ অনার্স ফার্স্ট ইয়ার, বুঝতেই পারছেন তার ঝাঁঝ কী। কিন্তু নিজেদের মধ্যে টেনশনটা আমরা তিন জন বজায় রাখি। যাই বলুন, প্রতিযোগিতার একটা থ্রিল কিন্তু আছে। এই যেমন আমি, এই মুহূর্তে জিকো-জিঙ্গোর চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি! আমি শিওর, কাল রাতে সুমেধা শুধু আমাকেই পিং করেছে। কারণটা... না, সেটা ঠিক আমি নই। কিন্তু বিষয়টা খোঁজ নেওয়ার জন্য ও তো আমার উপরেই ভরসা করেছে! আসলে সৌজন্যদা ও তপনদার ঝামেলার ব্যাপারটা দাবানলের মতো সারা পাড়ায় ছড়িয়ে গিয়েছে। ইতিউতি কানাঘুষো চলছে কাল রাত থেকেই। সুমেধা সেটাই একটু ডিটেলে জানতে চেয়েছে আমার কাছে। একে আমি প্রত্যক্ষদর্শী, তার উপর আবার সৌজন্যদার 'এক নম্বর চেলা' হিসেবে কিঞ্চিৎ 'সুনাম' আছে। তবে আমার সিক্সথ সেন্স কিন্তু বলছে, ঘটনার খোঁজ নেওয়াটা জাস্ট একটা বাহানা। সুমেধা আসলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। ডেট? আমার তো তেমনই মনে হচ্ছে...

সুমেধার মনের ইচ্ছেটা যে আসলে কী, সেটা ধরতে পারলেও ওর প্রিয় রংটা কিছুতেই অনুমান করতে পারছি না। ওর ইনস্টা প্রোফাইলে ঢুকে রিসেন্ট পোস্ট করা ফটোগুলো আরও একবার দেখলাম। না, কোনও লাভ হল না। ও নিজেই এক-একদিন এক-একরকমের ড্রেস পরেছে! শুধুমাত্র ট্যানজেরিনটা এক বার রিপিট করেছে। কিন্তু আমার তো আবার ওই রংয়ের কোনও টি-শার্টই নেই! এ বার কী করি?

না, এত ভেবে কাজ নেই, সবচেয়ে সেফ অপশন ব্লু ডেনিম আর হোয়াইট শার্ট। আর যাই হোক, ওটা দেখে কেউ কখনও বিরক্ত হতে পারে না এবং আমার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে প্রশ্নও তুলবে না।

এই সেরেছে, অলরেডি চারটে পঁয়তাল্লিশ! সাড়ে পাঁচটায় সুমেধার আসার কথা 'লা লাজ়ানিয়া'য়। ক্যাফেটা আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। অটোতে মিনিট দশেক লাগে। পাড়ার কাছাকাছি কোথাও দেখা করতে সুমেধা রাজি হয়নি। গুগল করে ওই জায়গাটা আমিই তখন সাজেস্ট করি। সুমেধা বলেছিল, জায়গাটা ও চেনে। ক্যাফেটা নাকি বেশ ভাল। তার মানে, অপশন ছাড়াই আমার পছন্দ মনে ধরেছে সুমেধার!

আলমারি থেকে হোয়াইট লিনেন শার্টটা বের করে গায়ে চড়ালাম। চুলটা জেল দিয়ে সেট করে, প্যারিস থেকে কাকুর এনে দেওয়া ও ডি কোলনটা দুই কানের পাশে ও হাতের কব্জিতে লাগিয়ে একটু ঘষে নিলাম। কিছুটা ঢাললাম শার্টের উপরেও। বক্সারের উপর ব্লু ডেনিমটা গলিয়ে বেল্ট টাইট করছি, ঘরে ঢুকে এলেন আমার মাতৃদেবী।

''কী ব্যাপার রুবাইবাবু, এত সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?''

মা এমনিতে 'মাই ডিয়ার' মানুষ। কিন্তু সুমেধার ব্যাপারটা এখনই বলার সময় আসেনি। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম, ''ওই যে, তোমায় বলেছিলাম না মা, পিপি স্যারের সঙ্গে বসে টিউশনের ডেটগুলো ফাইনাল করতে হবে... ওঁর যা টাইট শেডিউল! আজ আমাদের সবকটা ব্যাচের স্টুডেন্টদের ডেকেছেন। কার কবে সুবিধে, সেই সব শুনে নতুন ব্যাচ ভাগ করবেন।''

''তা খাটের উপর ছড়ানো এই আটটা টি শার্ট কি পিপি স্যারকে ইমপ্রেস করতে?''

''আরে না রে বাবা। কোনটা-কোনটা কাচতে দেব, সেটাই দেখছিলাম।''

''লন্ড্রি থেকে আনা ধোয়া কাচা টি শার্টের পাট ভেঙে তুই দেখছিলি কোনটা কাচতে দিবি! বাঃ বাঃ, খুব ভাল!'' মায়ের গলায় চোর ধরে ফেলার তৃপ্তি স্পষ্ট।

''উফ মা! তোমার কাছে কি কোনওদিনও মিথ্যে বলে পার পাব না!''

''না, পাবি না। বুঝতে পারছি, তাড়ায় আছিস। তাই এখন আর আটকাব না। কিন্তু ফিরে এসে পুরো গল্পটা আমায় বলতে হবে, ঠিক আছে?''

মাকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা হামি খেয়ে বললাম, ''প্রমিস।''

''ও হ্যাঁ, দেখেছিস যেটা বলতে এসেছিলাম, সেটাই ভুলে গেলাম তোর টি শার্ট আর পারফিউমের চক্করে। রুবাই, সৌজন্যকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসিস তো,'' বলল মা।

আমি একগাল হাসি নিয়ে বললাম, ''আজই বলছি সৌজন্যদাকে। ও ফিরুক অফিস থেকে...''

কাল রাতে খাবার টেবিলে বসে যখন বাবা-মা ও আমার দুই পিসিকে সৌজন্যদা আর তপনদার ঝামেলার কথাগুলো বলেছিলাম, তখন কেউই সেটা ঠিক বিশ্বাস করেনি। বাবা ভেবেছিল, তপনদাকে যেহেতু আমরা মোটেই সহ্য করতে পারি না, তাই সৌজন্যদার কীর্তিতে রং চড়িয়েছি। কিন্তু আজ সকালে বাজার করতে গিয়ে বাবা যা শুনে এসেছে, তার পর থেকে আমার প্রতি বিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। এখন মা সৌজন্যদাকে বাড়িতে নিয়ে আসার কথা বলায় বুঝলাম, এটা আসলে বাবার ইচ্ছে। কারণ যা-ই হোক, সৌজন্যদাকে বাড়িতে ডাকার বিষয়টা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

''রুবাইদা, আমি কিন্তু চিকেন খাই না,'' লা লাজ়ানিয়ার মেনু কার্ডের উপর চোখ বুলিয়ে বলল সুমেধা।

''চিকেন? আমিও তো খাই না,'' ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

আসলে আমি তো মুগ্ধ নয়নে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। আমরা বসেছি লা লাজ়ানিয়া-র একটা কর্নারে, কাপল টবিলে। মুখোমুখি। সুমেধা এসেছে একটা হোয়াইট কটন অ্যাঙ্কল লেংথ ড্রেস পরে। তার উপর একটা ব্লু চেকার্ড ক্রপড কোট। কানে পার্ল হুপস। পায়ে মাল্টি কালার্ড স্নিকার্স। চুলে সফট কার্লস। সুমেধা যেন পারফেক্ট ফ্যাশনিস্তা! যে-কেউ দেখলে বলবে, আমরা বুঝি কালার কো-অর্ডিনেট করে পোশাক পরেছি আজ। এত মিল আমাদের মনের!

আমার ঘোর কাটল সুমেধার কথায়, ''পার্ক স্ট্রিটের ওই চাইনিজ়

রেস্টুরেন্টে চিকেন ললিপপের উপর তোমার কামড় বসানোর ছবিটা, যেটা ইনস্টায় দিয়েছিলে, ওটা কিন্তু দারুণ ছিল। কে তুলেছিল গো ছবিটা? তুমি তো আবার পিকচার কার্টসি দাও না!''

বুঝলাম, অফসাইডে গোল খেয়ে বসেছি। রেফারিও বাঁশি বাজাতে ভুলে গিয়েছে। সামনে রাখা কাচের গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে, একটা ছোট্ট বিষম সামলে বললাম, ''তখন চিকেন খেতাম, এখন আর খাই না।''

সুমেধা ভ্রু তুলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন ওই শ্যেন দৃষ্টিতে বজ্র হানবে আমার বুকে। আমার মিথ্যে বলার অপরাধে।

এ বার একটু করুণ সুরে বললাম, ''তখনও খেতাম, এখনও খাই। কিন্তু আজ খাব না। আজ শুধু তোমার পছন্দের খাবার। এ বার ঠিক আছে?''

সুমেধা গাম্ভীর্য ধরে রেখে বলল, ''তখন খেতে, এখনও খাও, আজও খাবে। আমি একটা ফিশ প্ল্যাটার অর্ডার করছি, তুমি তোমার ফেভারিট চিকেন মেনু অর্ডার করো।''

তার পর একটু গাম্ভীর্য ভেঙে বলল, ''বি কুল রুবাইদা। বি রিল্যাক্সড। জাস্ট বি ইয়োরসেলফ।''

তার পর আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল।

সৌজন্যদা সম্পর্কে, আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পর্কে, ক্লাবের পরিবেশ সম্পর্কে, তপনদার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল সুমেধা। ওর সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমার খুব ভাল লাগছিল। পাড়া নিয়ে ওর যে এতটা আগ্রহ আছে,

তা সত্যিই আমাকে খুব অবাক করেছিল। আসলে সৌজন্যদার মতো সুমেধারাও তো এপাড়ার আদি বাসিন্দা নয়। সুমেধারা পাড়ায় এসেছে বছর চারেক আগে। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, ওর বাবা একটি বিখ্যাত ফাইভস্টার হোটেল-চেনের অপারেশনসে আছেন। মা কলেজে পড়ান। সুমেধা ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু ওর আসল ভাল লাগা ফিল্ম মেকিং। ও পরিচালক হতে চায়। কিন্তু ওর মা বলেছেন, ওর যা ইচ্ছে, সেটাই ও করতে পারে। কিন্তু সব কিছুর আগে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করতে হবে। প্রেসিডেন্সির এন্ট্রান্স টেস্টে সুমেধা সেকেন্ড হয়েছিল শুনে ওর প্রতি সম্মান আমার আরও অনেকটা বেড়ে গেল। আরও খুশি হলাম, যখন ও বলল, ''রুবাইদা, তোমার কাছে একটা হেল্প চাইব। না বলতে পারবে না কিন্তু...''

আমি তো এ রকমই একটি মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম! বললাম, ''প্লিজ় বলো। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে, নিশ্চয়ই করব।''

''তোমাদের ক্লাবের এই পালাবদলের পর্বটা নিয়ে আমি একটা ডকুমেন্টরি করতে চাই। আমি তো বিশেষ কাউকে চিনি না। তুমি যদি একটু...''

পালাবাদল... সত্যিই হয়ে গেছে বুঝি? সেই প্রশ্নে না ঢুকে বললাম, ''আরেব্বাস! এ তো দারুণ ব্যাপার! খুব ভাল হবে... এই প্রজেক্টে আমি তোমার পাশে আছি,'' বলেই হাতটা টিস্যু পেপারে মুছে এগিয়ে দিলাম সুমেধার দিকে।

হাত বাড়াল সুমেধাও। আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ''থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ!''

আমি অনুভব করলাম, সুমেধার হাতটা কী ভীষণ নরম...

৯

কচি পাঁঠার ঝোল, সঙ্গে গরম-গরম ভাত এবং পাতি লেবু। শেষ পাতে আমসত্ত্ব-খেজুরের চাটনি আর মেজকার দোকানের গরম রসগোল্লা। সিম্পল মেনু, কিন্তু যেন অমৃত! রাতে আমি কখনওই খুব একটা বেশি খাই না। কিন্তু আজ অনেকটা ভাত খেয়ে নিয়েছি। বাড়িতে যা খাই, তার প্রায় ডাবল। মাটন নিয়েছি সাত পিস! ভাবছি, হাড়ে লাগা আর একটা পিস অন্তত নেব। লাউড স্পিকারে গান বাজছে, 'আভি তো পার্টি শুরু হুই হ্যায়!'

পার্টি অবশ্য শুরু হয়েছে গতকাল, ১৫ অগস্টের সকাল থেকেই। শুরু হয়েছিল মাঠে। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ অম্লানজেঠু বাঁশি বাজিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করার মুহূর্ত থেকেই। বলিউডের স্পোর্টস মুভির বিখ্যাত গানগুলো বাজছে একের পর-এক। আর তার মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে আইপিএল-এর থিম টিউনটা। আমাদের পাড়ায় এ রকম একটা আবহ, আমি তো এর আগে কখনও দেখিনি।

প্রথম ম্যাচ থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। বিলুদা ও রঘুদার মধ্যে তো লিগ পর্যায়েই বচসা বেঁধে গেল একটা ফ্রি-কিক দেওয়াকে কেন্দ্র করে। খেলার সময় যা হয় আর কী। এবং সেই সুযোগটা কাজে লাগানোর একটা জোর চেষ্টা চালিয়েছিল তপনদা। হঠাৎ করে কোথা থেকে মাঠের মধ্যে ঢুকে আসে তপনদা। চিৎকার করে বলতে শুরু করে রুঘুদাদের দলের পক্ষ নিয়ে। ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি? হয়তো সেটাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা খুব সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করে সৌজন্যদা। মাঠে ঢুকে শুধু বলে, ''তপনদা, তুমি প্লিজ় মাঠের বাইরে বেরিয়ে এসো। রেফারি তো আমাদের পাড়ার নন। তাই পক্ষপাতিত্বের কোনও প্রশ্নই নেই। উনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই রঘু এবং বিলু মেনে নেবে। কী রে, তাই তো?'' মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে রঘুদা এবং বিলুদা। হাতে হাত মিলিয়ে দু'জনে কোলাকুলি করে, তার পর রেফারির দিকে ফিরে রঘুদা বলে, ''রেফ, ফ্রি কিকটা ওরা কোথা থেকে নেবে, বলটা সেখানে বসিয়ে দিন।''

গ্রুপ লিগে চারটে ম্যাচের মধ্যে তিনটি ম্যাচই হেরে একমাত্র দল হিসেবে আমরা বিদায় নিই প্রথম রাউন্ড থেকেই! চার ম্যাচে আমরা করেছিলাম মোট পাঁচটা গোল। তার মধ্যে দুটো সৌজন্যদার, একটা আমার ও দুটো আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন বাপ্পাদার। খেয়েছিলাম মোট পনেরোটা গোল। গ্রুপ লিগ থেকে আমরা ছিটকে যাওয়ার পর জিঙ্গো এসে টিটকিরি দিয়ে যায়, ''তোদের প্রত্যেকের জন্য তিনটে করে! কম হলে বলিস, বাকিগুলো পরের বছর দিয়ে দেব।''

লিগ থেকে বিদায় নিয়ে আমার অবশ্য বেশ সুবিধেই হয়েছিল। কেন? আরে বাবা সুমেধা যে এই খেলাটারও কিছু-কিছু অংশ শুট করছিল মাঠের চারপাশ ঘুরে-ঘুরে! টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায়, ওর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম আমিও। হাজার হোক, কথা দিয়েছিলাম, ওর প্রজেক্টে ওকে যতটা সম্ভব সাহায্য করব...

মাঠের চিৎকার, মাইকের শব্দ— বেশ কিছু সময় সুমেধার অনেক কথাই আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ওকে অনেক সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা বলতে হচ্ছিল— কিন্তু আমি তো জিকো-জিঙ্গোকে চিনি, মাঠের ভিতর থেকে ওরা সে-সব দেখে আমাকে নির্ঘাৎ শাপশাপান্ত করছিল! ভাবছিল, আমি হয়তো ইচ্ছে করেই সুমেধার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করছিলাম, যাতে সুমেধা আমার আরও কাছাকাছি আসতে বাধ্য হয়। অবশ্য তাতে আমার বয়েই গিয়েছে। সুমেধার প্রজেক্টটা যাতে ভাল হয়, আমি শুধু মন থেকে সেই চেষ্টাই করছিলাম। সেমি ফাইনালে গোলকিপারের পিছন থেকে টাইব্রেকারটা ক্যামেরাবন্দি করার আইডিয়াটা তো আমিই ওকে দিয়েছিলাম। সুমেধা ভেবেছিল, শটটা নেবে শুটার এবং গোলকিপারের পাশ থেকে। কিন্তু তাতে কি আর জালে বলটা জড়িয়ে যাওয়ার এফেক্টটা ভাল ভাবে ধরা পড়ে? আমার যুক্তিটা সুমেধার মনে ধরেছিল। কিন্তু দেখুন, কী থেকে কী হয়ে গেল— শট নিতে এসে সুমেধাকে দেখেই কিনা জানি না, জিকো বল উড়িয়ে দিয়েছিল গোলপোস্টের পাঁচ হাত উপর দিয়ে! ভাগ্যিস বিখ্যাতকাকু সেই মুহূর্তে গোলপোস্টের পিছনে এসে পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জিকোরাই ম্যাচটা জিতেছিল, নাহলে নির্ঘাৎ ভাবত, সুমেধাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের হারানোর চক্রান্তও করেছিলাম আমি!

ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠার পর জিঙ্গো দৌড়ে এসেছিল আমার কাছে। নেহাত সুমেধা ছিল পাশে, তাই কথাটা বলেছিল চাপা গলায়, ‘‘স্কিমটা ভালই করেছিস রুবাই! তবে দেখিস, ফাইনালে জিতলে ও কিন্তু আমারই ইন্টারভিউ নেবে, তোর নয়।’’

জিঙ্গোর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে আমিও বলে দিয়েছিলাম আমার প্রিয় নায়কের সেরা ডায়লগটা, ‘‘কভি কভি জিতনে কে লিয়ে কুছ হার না ভি পড়তা হ্যায়, ওউর হার কে জিতনে ওয়ালো কো বাজ়িগর কহতে হ্যায়!’’

জিঙ্গো মুখটা বেঁকিয়ে বলেছিল, ‘‘আহা! সো অরিজিনাল!’’

যোগ্য দল হিসেবেই ফাইনালে ওঠে রঘুদা ও জিঙ্গোদের টিম দুটো। খেলাটাও হয় দুরন্ত! জিকো আর জিঙ্গোর যুগলবন্দি সত্যিই ছিল দেখার মতো। ফাইনাল ম্যাচেই আসলে টের পাওয়া গেল, কেন জিকোর জন্য নিলামের সময় ওভাবে ঝাঁপিয়েছিল জিঙ্গো। ফাইনাল ম্যাচের সময় মাঠের চার পাশে অক্ষরিক অর্থেই যেন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আমাদের এই শ্রীপল্লিতে যে এত মানুষ থাকেন, তা এর আগে কখনও একসঙ্গে দেখিনি! বান্টিদা ছিল কমেন্ট্রির দায়িত্বে। জনগণের উৎসাহ দেখে বান্টিদা বলে ওঠে, ‘‘যুবভারতী আজ ভরে উঠেছে কানায়-কানায়। এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকের উল্লাসে আজ ফুটবলের নবজন্ম হল আমাদের এই বাংলার মাটিতে...’’ মুখে যা আসছিল, বলে যাচ্ছিল বান্টিদা। ওর কমেন্ট্রিতে অবশ্য সকলে বেশ মজাই পাচ্ছিল।

ফাইনাল ম্যাচ তখন ৩-৩ ড্র চলছে। এক্সট্রা টাইমের আর দেড় মিনিট বাকি। লেফ্ট উইং থেকে জিকোদের পেনাল্টি বক্সের উপর একটা লম্বা ক্রস ভাসিয়ে দিয়েছে পল্টুদা। উড়ে আসা সেই বলে গোলের দিকে পিছন করে শরীরটা ভাসিয়ে দিল রঘুদা। একটা নিখুঁত ব্যাক ভলি, জিঙ্গোদের দলের গোলরক্ষক সৌরিশদাকে নড়ার সুযোগ না দিয়ে বল জড়িয়ে গেল জালে... গোটা মাঠ জুড়ে আওয়াজ উঠল গো-ও-ও-ও-ল-ল-ল! মাইক হাতে বান্টিদা নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলে উঠল, ‘‘মনে পড়ে যাচ্ছে ইতালির বিরুদ্ধে জলটান ইব্রাহিমোভিচের সেই বিখ্যাত বাইসাইকেল কিকের কথা! শ্রীপল্লির মাঠে এ রকম একটা আন্তর্জাতিক মানের গোল করে রঘুবীর মণ্ডল নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেললেন ইতিহাসের পাতায়... আজ, এই মুহূর্তে আমি শ্রীবীরেন্দ্রশঙ্কর নায়েক এই দাবি জানাচ্ছি যে, রঘুবীরের পা দুটো মুড়ে দেওয়া হোক সোনার পাদুকা দিয়ে...’’

বান্টিদার কথায় তখন অবশ্য আর কারও কান দেওয়ার সময় নেই। সকলে মেতে উঠেছে রঘুদাকে নিয়ে। অ্যামেচার লেভেলের একটা ফুটবল টুর্নামেন্টে এ রকম একটা গোল, সত্যিই ভাবা যায় না! সবচেয়ে ভাল ব্যাপার হল যে, সৌরিশদাকে বোকার মতো দাঁড় করিয়ে রেখে জালে বল জড়িয়ে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি জিতে নিয়েছিল রঘুদারা, সেই সৌরিশদাই তখন রঘুদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তবে জিকো-জিঙ্গোরা তো এখনও সৌরিশদার মতো বড় হয়নি। ম্যাচ হেরে মাঠের মধ্যেই বসে ছিল মাথা নিচু করে। কেউ বা চিতপটাং হয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ওদের জন্য তখন আমার সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াই ওদের কাছে। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে বসি জিঙ্গোর পাশে। ওর ঘামে ভেজা মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলাম, ‘‘মন খারাপ করিস না ভাই। আজ তো আসলে আমরা কেউই হারিনি রে, বরং জিতেছি সকলে...’’

চোখের জলটা তখন আর ধরে রাখতে পারেনি জিঙ্গো, ওকে জড়িয়ে ধেরে কেঁদে ফেলেছিল জিকোও।

এখন আমরা পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। আমি, জিঙ্গো, জিকো, ভোম্বল, বিল্টো, ভুটুন এবং পাড়ার বাকি সব কুচোকাঁচারা। আজ ওদেরও নিমন্ত্রণ আমাদের ক্লাবে। গত কাল টুর্নামেন্টের সময় ভলান্টিয়ার হিসেবে ওরা সকলে দারুণ সার্ভিস দিয়েছে। বিশেষ করে বল কুড়িয়ে আনার ক্ষেত্রে। আমাদের মাঠের চারপাশেই তো ফ্ল্যাটবাড়ি। তাই একটু উঁচু শট হলেই বল গিয়ে ঢুকছিল ফ্ল্যাটের গ্যারাজে। বুকুন, টুপাই, টুম্পাই, রাজু, জীপু— গ্যারেজ থেকে সেই সব বল ফিরিয়ে দিচ্ছিল মাঠে। সেই কাজটা কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

সৌরিশদা তপনদাদের ব্যাচের হলেও, বাকিদের চেয়ে একটু আলাদা। টুর্নামেন্টের সাফল্যে খুশি হয়ে, আজকের খাওয়াদাওয়াটা মূলত সে-ই স্পনসর করেছে। সৌজন্যদা, রঘুদা, পুটাইদা, বিলুদা, প্যান্টের উপর গামছা বেঁধে এখন আমাদের পরিবেশন করছে। এর পর ওরা বসবে খেতে আর আমরা পরিবেশন করব।

‘‘কী রে, তোদের আর কারও কিছু লাগবে নাকি? কী রে জিঙ্গো, দেব, আর-একটা পিস?’’ মাংসের বালতিটা আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে বলল সৌজন্যদা।

রঘুদা চাটনির গামলাটা পাশের টেবিলে রেখে বলল, ‘‘সৌজন্য, মিস্টার রোমিওর দিকে একটু নজর দে... বেচারা তো প্রায় কিছুই খাচ্ছে না!’’

কথাটা যে আমার উদ্দেশেই বলা, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু খাল কেটে কুমির আর কে-ই বা আনতে চায়? আমি হাড়ে লাগা মাংসের টুকরোতেই মনোনিবেশ করলাম।

পুটাইদা বলল, ‘‘খাচ্ছে না কী রে! আমিই তো তিন বারে প্রায় দশ পিস মাংস দিলাম ওকে!’’

আমি তা-ও চুপ। প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানেই মেনে নেওয়া, রোমিওটি আসলে আমি। মাথা নিচু করে নলির হাড়ের মজ্জা চুষে খাওয়ার যতই চেষ্টা করি না কেন, সকলের চোখ যে এখন আমার দিকে, সেটা ঘাড় না তুলেও বুঝতে পারছি। আর জিকোর ঠোঁটে যে ফিচেল হাসিটা এসে আটকে আছে, সেটা অনুমান করতেও কোনও অসুবিধে হল না।

এ বার সৌজন্যদা আর কোনও রাখঢাক না করেই বলল, ‘‘তা জুলিয়েটকে তো আজ নিমন্ত্রণ করতে পারতিস রুবাই। ক্যামেরা হাতে তোর খাওয়ার ফুটেজও না হয় কিছু তুলে রাখত। কাজে ঠিকই লেগে যেত।’’

এ বার মুখ তুললাম আমি, ‘‘সৌজন্যদা, শেষ পর্যন্ত তুমিও! বাচ্চারা আছে তো!’’

‘‘ওরে বাবা! কে আমার ঠাকুরদাদা এলেন রে!’’ আমার গালটা

জোরে টিপে দিয়ে বলল পুটাইদা। তার পর আমাকেই বলল, "দে তো আমার মুখে একটা ছোট্ট টুকরো, দেখি মাংসটা কেমন সেদ্ধ হয়েছে..."

এরই মাঝে তপনদা এসে ঢুকল ক্লাবে। সোজা চলে এল সৌজন্যদার কাছে। তার পর আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়ে সৌজন্যদার পিঠে আলতো করে দুটো চাপড় মেরে বলল, "ভাই, তুমি যা করেছ, তা এককথায় অসাধারণ! ওই পেরাইড না পেরাউড কী যেন বলে, আমি তোমার জন্য তাই।"

সৌজন্যদা একগাল হেসে বলল, "ইউ আর প্রাউড অফ মি?"

তপনদা কী বুঝল কে জানে, কান এঁটো করা হাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওটাই।"

তপনদার কাণ্ড দেখে আমরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। তপনদার হঠাৎ হল কী! এ যেন পুরো 'বিড়াল বলে মাছ খাব না, কাশী যাব' কেস! এটা কি তপনদার অন্য কোনও চাল?

হঠাৎ আমার চোখ পড়ল রঘুদার দিকে। দেখলাম, বিলুদার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কী যেন একটা বলাবলি করল ওরা।

সৌজন্যদা তপনদার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "রাতের ডিনারটা বাড়িতে অফ করেছ তো? আজ কিন্তু আমরা একসঙ্গে বসে খাব।"

"সে আর বলতে! তোমাকে আমি সত্যিই ভুল বুঝেছিলাম ভাই, আমাকে তুমি মাফ কোরো," বলেই, তপনদা জড়িয়ে ধরতে গেল সৌজন্যদাকে।

ঠিক তখনই, বিলুদার দিকে তাকিয়ে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে রঘুদা বলল, "ভাল কথা তপনদা, কাল সকালেই কথাটা তোমাকে বলব ভাবছিলাম। ভালই হল, আজ তুমি নিজেই এলে। শোনো না, আমরা ভাবছি, পাড়ার পুজোটা এ বার আমরাই করব।"

একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ হল যেন।

মনে হল, কেউ যেন অতি শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে নিমেষে শুষে নিল তপনদার চোখ-মুখের যাবতীয় আলো!

১০

প্ল্যানটা যে রঘুদা আর বিলুদা মিলে আগেই করেছিল, সেটা আমরা প্রায় কেউই জানতাম না। সৌজন্যদা তো নয়ই। কিছুটা জানত পুটাইদা। আসলে সেদিন ঘাস কাটা নিয়ে ওই ঝামেলাটার পরপরই সৌজন্যদা বৌদি আর মিঠাইকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মিঠাইয়ের ভ্যাকসিন ছিল সেদিন। যাওয়ার আগে শুধু রঘুদাকে বলে যায়, "আমি রুবাইয়ের সঙ্গে একমত। বাকি ঘাসটা আমরা নিজেরাই কাটব। তুই বিলুদের বাকিটা বল, আমি ফিরে আসছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।"

তপনদা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর একটা কথাও না বলে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এখানেই শেষ হবে না, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। মাঠের পরিবেশটা কেমন থমথমে হয়ে গিয়েছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম না, ব্যাপারটা ভাল হল, না খারাপ। তপনদার এ রকম একটা ধাক্কার খুব দরকার ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ তো অন্তত চোখে চোখ রেখে ঠিক-ভুলের ফারাকটা ওকে বলতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? সৌজন্যদার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল ঠিকই, আবার আশঙ্কার একটা মেঘও কিন্তু দানা বাঁধছিল মনের ভিতর।

কিছু ক্ষণের মধ্যে ভোম্বল এসে খবর দেয়, তপনদা নাকি পার্টি অফিসের সামনের চায়ের দোকানটায় বিতান দত্তর সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে কী সব কথা বলছে। পাশে আরও জনা চারেক ছেলে। তাদের সকলকে ও চেনে না, কিন্তু পার্টির মিছিলে পতাকা নিয়ে হাঁটতে দেখেছে। বিতান দত্ত আমাদের এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রাজেন দত্তর ভাই।

জলটা যে খারাপ দিকে গড়াতে চলেছে, সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম। তাই সেদিন আমরা আর মাঠে বেশি ক্ষণ বসিনি। রঘুদাই বলেছিল, "আজ আর এখানে বসে থেকে লাভ নেই, তোরা যে যার বাড়ি চলে যা। পরে তোদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।" তার পর বিলুদাকে বাইকের পিছনে চড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল নিজেও।

রাত ন'টা। শ্রীপল্লির মাঠের পাশে যে আন্ডার-কনস্ট্রাকশন ফ্ল্যাটটা ওই একই অবস্থায় পড়ে আছে বছরের পর-বছর, তার ছাদে তখন নড়াচড়া করছে দুটো ছায়ামূর্তি। তাদের দু'জনের হাতেই বিয়ারের ক্যান।

"বাঘের বাচ্চা! এ রকমই একটা কাউকে দরকার ছিল আমাদের," ক্যানের লিডটা খুলে তাতে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল রঘুবীর মণ্ডল।

"ভাই, সুযোগটা কিন্তু কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। এই ঝটকাতেই ক্লাবছাড়া করতে হবে ওই শালা তপনাকে," ছাদের গার্ড ওয়ালে বাঁ হাতের ভর রেখে মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল বিপ্রকাশ বর্ধন। ডান হাতে ধরা ক্যানে একটা লম্বা চুমুক দিল সে।

শুধু ক্লাব থেকে তপন তরাইকে তাড়ানো তো নয়, রঘুবীর মণ্ডলের মাথায় তখন চলছে আরও বড় একটা গেম প্ল্যান।

"পার্টি অফিসে এর রিপার্কেশন কী হল, সেটা আজ রাতেই খবর পেয়ে যাব। আমার কিন্তু মন বলছে পার্টি এই বিষয়টায় খুব একটা বেশি ঢুকবে না।"

"কেন বলছিস এ কথা?" অবাক হয় বিপ্রকাশ।

"হিসেবটা খুব সহজ বিলু। প্রথমত, গন্ডগোলটা খেলা নিয়ে। জমি দখল, সিন্ডিকেট কিংবা তোলাবাজি নিয়ে নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা এত ছেলে এই টুর্নামেন্টের মধ্যে ইনভলভ্‌ড। পার্টি কখনওই চাইবে না, এক্ষেত্রে তপন তরাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে এত ভোট অগ্রাহ্য করতে। আর ভোট তো শুধু আমাদের নয়, আমাদের পরিবারের লোকজনেরগুলোও তো আছে। মাথায় রাখিস, বছর ঘুরলেই কিন্তু পুরসভা ইলেকশন," একটা লম্বা চুমুক দিয়ে, হাতের ক্যানটা গার্ড ওয়ালের উপর রেখে একটা সিগারেট ধরায় রঘুবীর।

"কিন্তু এলাকাতে তপনদার জমি নড়বড়ে হলে সেটা তো পার্টির জন্যেও ভাল হবে না রঘু?" অঙ্কটা বিপ্রকাশের মাথায় ঢোকে না। নিজের কথায় যুক্তি সাজায় সে, "বিশেষত একটা খবর যখন আছেই, জেনারেল থেকে এ বার আমাদের ওয়ার্ডটা এসসি ক্যান্ডিডেটের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে তপনদার টিকিট পাওয়ার একটা ফেয়ার চান্স আছে!"

"বাল আছে," ক্যানটা শেষ করে সেটা ছাদের এক কোণে ছুড়ে ফেলে রঘুবীর। তার পর বলে, "তপন একটা আস্ত গাঁড়ল। তাই এটা ও ভাবে। শালা সই করতে বললে পেন দিয়ে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে, আর ওকে নাকি কাউন্সিলার ভোটের টিকিট দেবে পার্টি! তপন... শালা গান্ডুচরণ!"

"কিন্তু তপনদা তো রাজেন দত্তর খাস লোক রে!"

"খাস না, বল খাসি। যখন যে ভাবে খুশি কাটে। তপনাকে দিয়ে শুধু ওই ফ্ল্যাগ বওয়ায়, দেওয়ালে পোস্টার সাঁটায়, ফ্লেক্স টাঙানো করায়। আরে, এই কাজগুলো করার জন্যেও তো পার্টিতে লোক লাগে, নাকি? রাজেন দত্ত-ও সেকারণে তপনাকে একটু বার খাইয়ে রাখে। এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা ওই তপনার নেই," সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে এ বার আকাশের দিকে মাথা তুলে খুব ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে রঘুবীর বলে, "শোন ভাই, একটা কথা খুব ভাল করে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে। যদি আমাদের এই ওয়ার্ড সত্যিই জেনারেল থেকে এসসি সিট হয়, তাহলে এখানকার নতুন কাউন্সিলারের নাম হবে... রঘুবীর মণ্ডল..."

মুখে নেওয়া ড্রিঙ্ক সবে গিলতে যাচ্ছিল বিপ্রকাশ। একটা বড়সড়

বিষম খেল সে। তার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, ‘‘কী বলছিস কী তুই? এক ক্যান বিয়ারেই তোর তার কেটে গেল নাকি!’’

‘‘যা বলছি, একদম ঠিক বলছি। আমি হব পৌর প্রতিনিধি আর তুই হবি আমার সহকারী।’’

‘‘রঘু, একটু জল খাবি?’’ কাতর গলায় বলে বিপ্রকাশ।

‘‘তুই খা, নিজের চোখেমুখে দে, তার পর আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন।’’

‘‘বেশ, বল।’’

দ্বিতীয় ক্যানের লিড ওপেন করে, গার্ড ওয়ালে পিছন দিক করে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় রঘুবীর মণ্ডল। তার পর বলতে শুরু করে, ‘‘সৌজন্য সান্যাল হবে আমাদের তুরুপের তাস।’’

‘‘এর মধ্যে সৌজন্য এল কোথা থেকে!’’

‘‘তুই কি একটু চুপ করে শুনবি কথাগুলো?’’

‘‘আচ্ছা বল।’’

‘‘এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুবাদে সৌজন্যর বাজার এখন চড়া। ওকে সামনে রেখে এর পর আমরা দখল নেব পাড়ার দুর্গাপুজোর। সৌজন্যর আইডিয়া ভাল, কনট্যাক্টস আছে। আছে কলজের জোরও। এই সব ক'টাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পাড়ার পুজোটাকে এ বার অন্য একটা লেভেলে নিয়ে যাব। এবং সেটাই হবে আমাদের জনসংযোগের প্রথম ধাপ।’’

‘‘তার পর?’’

‘‘অক্টোবরে পুজো, তার পর নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি... চার মাসে চারটে ভাল ইভেন্ট। আমাদের কাজই সকলকে বুঝিয়ে দেব, পাড়ায় একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন কতখানি। সৌজন্যর অফিসের যা শেডিউল, তাতে ও তো খুব বেশি সময় পাড়ায় দিতে পারবে না, সেটা দেব আমি আর তুই। প্রাইমারি স্কুলে পড়ানোর কিছু সুবিধে তো আমরা পাব, নাকি? তার পর জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে পার্টি অফিসের কোনও একটা আলোচনায় কেউ একজন আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কোট-আনকোট সম্ভাবনাময় প্রার্থী হিসেবে হালকা করে ভাসিয়ে দেবে আমার নাম— একবার আলোচনার কেন্দ্রে নামটা উঠে এলে, বাকিটা করবে আমার কপাল! আমার বিশ্বাস, নামটা একবার উঠলে, সহজে কেউ ফেলে দিতে পারবে না। পার্টি কিন্তু এ বার নতুন মুখ চাইছে। ফ্রেশ ব্লাড... অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস, আই অ্যাম নট আ ব্যাড চয়েস, রাইট?’’

গোল-গোল চোখে বিপ্রকাশ তাকিয়ে থাকে রঘুবীরের দিকে। বলে, ‘‘তোর প্ল্যান কত দূর সফল হবে জানি না রঘু, তবে তুই ভেবেছিস মারাত্মক!’’

‘‘বলছিস?’’ তৃপ্তির হাসি রঘুবীরের চোখে-মুখে। কিন্তু পর ক্ষণেই মুখটা সিরিয়াস করে বলে, ‘‘তবে সাবধান, এই প্ল্যানের কথা এখন যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়। এটা আপাতত তোর আর আমার মধ্যেই থাকবে।’’

‘‘কিন্তু কেন?’’ অবাক হয় বিপ্রকাশ। বলে, ‘‘তপনার থেকে তো তুই এনিডে বেটার চয়েস। সকলে তোকে সাপোর্ট করবে... তা হলে তোর ভাবনার কথা আমাদের গ্রুপের বাকিদের বলবি না কেন?’’

‘‘ধীরে বৎস ধীরে। সৌজন্যকে এখনই পুজো করার প্ল্যানটা দিলে, ও তৎক্ষণাৎ ‘না’ করে দেবে। টুর্নামেন্ট ঘিরে বেচারার উপর দিয়ে যা যাচ্ছে! তা ছাড়া ও সেলসে আছে, পুজোর আগের দু'-তিন মাস ওর অফিসের প্রবল চাপ থাকে। গত বছর দেখিসনি? ওকে ব্যাপারটা এমন সময় জানাতে হবে, যখন ও আর ‘না’ বলতে পারবে না, আমাদের প্রস্তাবে ওকে রাজি হতেই হবে,’’ সিগারেটের বাটটা টোকা মেরে ছাদের বাইরে ফেলে রঘুবীর যোগ করে, ‘‘নে, আপাতত পুটাইকে একটা ফোন কর। লাইনটা ধরে আমাকে দে।’’

‘‘পুটাইকে কেন? এই তো বললি কাউকে এখন কিছু বলবি না!’’

‘‘দ্যাখ না কী বলি...’’

বিপ্রকাশ ফোনে ধরল জীবনবিমা এজেন্ট অর্ণাশিস লাহিড়িকে। তিনটে রিং সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই উত্তর এল ওপার থেকে, ‘‘হ্যাঁ বিলু বল, সব ঠিক আছে তো?’’

‘‘এখনও পর্যন্ত তো আছে। পাড়া পুরো শুনশান। নে ধর, রঘু তোর সঙ্গে কথা বলবে,’’ বিপ্রকাশ ফোনটা বাড়িয়ে দেয় রঘুবীরের দিকে।

রঘুবীর গলার মধ্যে একরাশ উত্তেজনা জড়ো করে বলে, ‘‘সময় এসে গেছে ভাই! পাড়ার বারোয়ারি পুজোটাকে আর ‘তরাই বাড়ির পুজো’ হিসেবে রাখতে দেব না। এ বার এটা হবে আমাদের পুজো, আমাদের সকলের পুজো! মনে আছে, তিন বছর আগে পাটুলিতে চা-খেতে খেতে কী বলেছিলি? ‘একদিন এই পুজোটা আমরা হাতে নেব। বাবা, অম্লানজেঠুরা যে ভাবে পুজো করত, সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনব—’ তুই ভুলে গেছিস ভাই, আমি কিন্তু ভুলিনি...’’ রঘুবীর মণ্ডল জানে, কাকে ঠিক কোন কথাটা বললে সেটা তার কোথায় গিয়ে আঘাত করে।

‘‘কে বলল তোকে, আমি ভুলে গেছি?’’ দপ করে জ্বলে উঠল অর্ণাশিষ লাহিড়ির মাথার ভিতরটা। তার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘‘আজ সৌজন্যকে তপনের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছিল, ইস এই ছেলেটা যদি আর কয়েকটা বছর আগে আমাদের পাড়ায় আসত! বাবা বেঁচে থাকলে, সৌজন্যকে দেখে খুব খুশি হত রে,’’ আবেগে ধরে আসে অর্ণাশিষ লাহিড়ির গলা।

‘‘ভাই, কাকুর অপমান আমাদের সকলের অপমান। তুই কোথায় আছিস বল, আসছি আমি আর বিলু...’’

ব্যাপারটা যে ক্রমশ তার পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে, এটা ভেবে বেশ খুশি হয় রঘুবীর মণ্ডল।

কাল পিকনিকের পর সৌজন্যদা চেপে ধরেছিল রঘুদাকে, ‘‘কী ছেলেমানুষের মতো কাজ করিস বল তো রঘু! তপনদাকে ফস করে বলে দিলি, ‘পুজোটা এ বার আমরা করব!’ ওরে, এটা দুর্গাপুজো। তোর আমার বাড়ির লক্ষ্মী পুজো বা সরস্বতী পুজো নয়, যে পুজোর আগের দিন বাজারে গিয়ে ফর্দ ধরে সব কিনে এনে, পরের দিন পুজো হয়ে যাবে!’’

‘‘সব বুঝতে পারছি ভাই। তোর সঙ্গে ওরকম একটা বাওয়াল করার পর, তপনদার ওই ভালমানুষির নাটকটা দেখে না পিত্তিটা জ্বলে গিয়েছিল। তাই তো ওর আসল চেহারাটা ধরিয়ে দিতে দুম করে বলে ফেলেছি পুজোর কথাটা। দ্যাখ, সকলের সামনে বলে যখন ফেলেছি, তখন পিছিয়ে আসি কী করে বল? তবে তোর আপত্তি থাকলে... আমি না হয় তপনদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। বলব, মালের ঘোরে বলে ফেলেছি!’’ রঘুদার গলায় অভিমানের ছোঁয়া।

‘‘থাক, তোকে আর এখন নাটক করতে হবে না, নৌটঙ্কি শালা,’’ রঘুদার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিল সৌজন্যদা, ‘‘চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েই ফেলেছিস, তখন সেটা তো আর ফেলে দেওয়া যায় না!’’

‘‘এই না হলে সৌজন্য সান্যাল! একটা ধাসু প্ল্যান নামাতে হবে ভাই। তোর ভরসাতেই কিন্তু বড় মুখ করে কথাটা বলেছি,’’ বলেছিল রঘুদা।

‘‘সে তো বুঝলাম। কিন্তু কী জানিস, ফুটবল শেষ হতে না-হতেই পুজো নিয়ে মাতামাতি— শ্রীময়ী এ বার আমাকে সত্যি-সত্যিই বাড়ি থেকে বের করে দেবে!’’

রঘুদা ওর গাল দুটো চটকে বাঁ চোখটা হালকা টিপে বলেছিল, ‘‘আজ না হয় একটু বেশি করে আদর করে দিস!’’

রঘুদার কথাটা কানে আসতেই, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সুমেধার মুখটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে! কেন কে জানে...

১১

তপন তরাই আন্দাজই করতে পারেনি ব্যাপারটা দুম করে এদিকে গড়িয়ে যাবে। এখন তার নিজেরই নিজের উপর রাগ হচ্ছে। কেন যে সেদিন ঘাস-কাটা নিয়ে সৌজন্যর সঙ্গে লাগতে গেল... মান-সম্মান তো গেলই, এখন মনে হচ্ছে পুজোটাও হাতছাড়া হতে চলেছে!

গত ছ'-সাত বছর ধরে এই পুজোর উপর মৌরসিপাট্টা কায়েম করেছে তরাই পরিবার। পুজোর সেক্রেটারি তপন স্বয়ং। ক্যাশিয়ার ওর বোন অসীমা তরাই। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডক্টর শুভঙ্কর বটব্যালের নাম থাকে বটে, কিন্তু সেটা তিনি মোটা টাকা চাঁদা দেন বলে। ডাক্তারবাবু পাড়ার চার দিকে পুজো উপলক্ষে লাগানো ব্যানারে নিজের নাম দেখেই খুশি। পুজোর সময় বা তার আগে-পরে, মাঠের দিকে পা-ও বাড়ান না। তিনি হার্টের ডাক্তার, দু'হাতে পয়সা রোজগার করেন। পুজোর হিসেবের জমা-খরচে তার কোনও আগ্রহ নেই। পাড়ায় তপনের চেলাচামুণ্ডা বেশ কিছু আছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তপনের সঙ্গে ঘোরে সিন্ডিকেট থেকে দু'পয়সা আয়ের আশায়। তারাই পুজোর আগে পাড়ার ফ্ল্যাটগুলোতে ঘুরে-ঘুরেই চাঁদা আদায় করে। সেই দলের নেতৃত্ব দেয় তপনের ভাইপো তন্ময়। চাঁদার পরিমাণ ফি-বছরই লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে, ফ্ল্যাটের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই পুরো সময়টা জুড়ে তপনের দলবল চাঁদার পয়সায় রাতের ডিনার সারে বড় রাস্তার উপরের 'অক্ষয় কেবিন' থেকে। রোজ। তিন দিনে এক দিন রুটি-পাঁঠার মাংস বাঁধা। এ ছাড়া পুজোর দিনগুলোয় দেদার মদ, খাওয়াদাওয়া— পুজো শেষে কমিটির টাকায় মন্দারমণি অথবা তাজপুর ট্রিপ।

অসীমা তরাই নামেই পুজো কমিটির ক্যাশিয়ার, বাস্তবে ক্যাশ হ্যান্ডেল করে তপন নিজে। অসীমার নামটা এক্ষেত্রে তার ঢাল। লেখাপড়ায় গাড্ডা খেলে কী হবে, টাকা-পয়সার হিসেবে সে বরাবরই পাকা। কী করে কোথা থেকে কতটা গুপি করলে সহজে কারও নজরে আসবে না, তা সে ভাল জানে। তবে নজরে এলেই বা কী! কেউ কি তার মুখের উপর বলার সাহস রাখে, 'গত বছরের পুজোর হিসেবটা কিন্তু এখনও দিলে না তপন...' এই পুজো তাই তার কাছে সোনার ডিম পাড়া হাঁস।

কিন্তু এ বার সে ভয় পেয়েছে। এই দেদার টাকা নয়-ছয় করার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয়। পাড়ায় আধিপত্য হারানোর ভয়। সবচেয়ে বড় কথা, মাঠের ওই ঝামেলার পর পার্টি তপনকে সমর্থন করেনি। রাজেন দত্ত সাফ বলে দিয়েছিল, "গাল বাড়িয়ে চড় খেয়েছিস। এ বার যা, গিয়ে আর একটা গাল পেতে দে। ভোটের আগে আমি কিন্তু কোনও অশান্তি চাই না তপন।"

তাই তো টুর্নামেন্টের পরের দিন ক্লাবের পিকনিকের সময় তপন গিয়েছিল সৌজন্যদের সঙ্গে ভাব জমাতে। এগোচ্ছিলও ঠিকঠাক। কিন্তু রঘুর পুজো করার 'আবদার'টা কানে পড়তেই যেন একটা ছোট্ট আগ্নেয়গিরি ব্লাস্ট করে তপনের মাথার ভিতর। কোনওরকমে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। কিন্তু খেলাটা তো এভাবে ছেড়ে বেরিয়ে আসা যাবে না। সে বান্দা আর যে-ই হোক, তপন তরাই অন্তত নয়। এবং এই ব্যাপারে স্ত্রী অনিন্দিতাকে পাশে পেয়েছে সে। অনিন্দিতার উদ্যোগেই আজ তপনের বাড়িতে বসেছে মিটিং। শ্রীপল্লির পুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। মূলত পরিবারের লোকজনই, আর আছে তপনের কিছু চেলাচামুণ্ডা। মিটিংয়ে উপস্থিত তপনের বড় মেয়ে ডিম্পিও। বাবার অপমান গায়ে লেগেছে তারও। ডিম্পির একটা অন্য ইন্টারেস্টও আছে। এই পুজো তপনের হাতছাড়া হলে তারও যে বেজায় লোকশান! কারণ পুজোর সময় যত শাড়ি প্রণামী হিসেবে পড়ে মায়ের পায়ে, পুজো শেষে সেই সব শাড়িই ডিম্পি বিক্রি করে মোটা টাকায়। এলাকাটা ভাল। মাকে খুব সস্তার শাড়ি কেউই দেয় না। গত বছর শাড়ির সংখ্যা নব্বইয়ের ঘর ছাড়িয়েছিল। এই শাড়ির উপর আর কারও কোনও অধিকার নেই। তপন এই ভার মেয়ের উপরই ছেড়ে রেখেছে। আবার নবমীর মহাভোগের বাজারহাট, মশলাপাতি, ক্যাটারিং, এসবের দায়িত্বে ভাইপো তন্ময়। সেটাও বেশ মোটা টাকার ব্যাপার। চাঁদার বখরা তো আছেই। পুজোকে কেন্দ্র করে বাড়ির সকলের জন্য কিছু না-কিছু বন্দোবস্ত তপনের করা আছে।

মিটিংয়ের শুরুতেই তন্ময় বলল, "আমার একটা প্ল্যান আছে..."

তন্ময় কথাটা বলায়, সকলে বেশ নড়েচড়ে বসল। কারণ, তন্ময়ের মাথাটা যে চলে শকুনির মতো, এটা মোটামুটি সকলেই জানে।

বউয়ের মান ভাঙাতে সৌজন্য আজ শ্রীময়ী ও মিঠাইকে নিয়ে এসেছে গুরুসদয় রোডের বিখ্যাত চাইনিজ় জয়েন্টে।

একগুচ্ছ পেপার ন্যাপকিন ও ফাঁকা জলের গ্লাস নিয়ে মিঠাই খেলছে মনের আনন্দে। সৌজন্য ও শ্রীময়ী বসেছে মুখোমুখি টেবিলে, শ্রীময়ীর পাশে মিঠাই। সৌজন্য টেবিলের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে শ্রীময়ীর পায়ে একটা আলতো ঠেলা দিয়ে বলল, "এ বার অন্তত একটু হাসো শ্রী।"

শ্রীময়ী নিজের মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে বলল, "তোমার মুখটা দেখলেই এখন আমার বিরক্ত লাগছে সাম্য। যে-কোনও মানুষের কথার একটা মিনিমাম দাম থাকে!"

"কী করব বলো! ওরা পরিস্থিতিটা এমন তৈরি করে বসল..."

"একদম ন্যাকামো করবে না," শ্রীময়ী মুখ ফেরায় সৌজন্যর দিকে, "পাড়ায় হিরো হওয়ার শখ তোমারও তো কম নয়। না হলে যে সৌজন্য সান্যাল পুজোর সময় বিক্রমগড় যেতে না পারলে পাগল হয়ে যায়, সে কী করে সিদ্ধান্ত নিল যে পুরো পুজোটা এ বার কলকাতাতেই কাটাবে! এখন আর তোমার স্কুলের বন্ধু, ছোটবেলার চেনা মানুষজন কারও কথা মনে পড়ছে না, না? তা ছাড়া তোমার বাবা-মা? তাঁরাও তো এই কটা দিনের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকেন সারা বছর। সেটাও তোমার মাথায় থাকল না?"

"তুমি যা বলছ, তার একটা কথাও ফেলে দেওয়ার মতো নয় শ্রী। কিন্তু রঘু যে ওরকম ফস করে পুজো করার কথাটা তপনদার সামনে বলে বসবে, সেটা কী করে বুঝব বলো। আমাকে যদি আগে একটি বারও জিজ্ঞেস করত, আমি কখনওই রাজি হতাম না।"

"ও সব ছেলেভোলানো কথা আমাকে একদম বলতে আসবে না। রঘুর মুখ ফসকে বলা কথার গুরুত্ব যখন তোমার কাছে এতটাই, তখন সংসারটা ওর সঙ্গে করলেই তো পারো!" শ্রীময়ী যে কতটা রেগে আছে, তা ওর কানগুলো দেখে টের পাচ্ছে সৌজন্য। লাল আভা ছড়াচ্ছে সে দু'টি। রাগের সঙ্গে এ বার মিশল অভিমান, শ্রীময়ী যোগ করল, "আমি জানি তো, এ বার পুজোর কাজের ব্যস্ততায়, বাহানায় আমাদের বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাটা চলে যাবে পিছনের সারিতে।"

"এক্সকিউজ় মি স্যার, মে আই টেক ইয়োর অর্ডার প্লিজ়?" ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছেন ওদের টেবিলের সামনে। মোক্ষম সময়ে এসে ঝড়ের মুখ থেকে তিনি যেন সাময়িক নিস্তার দিলেন সৌজন্যকে। সৌজন্য বলল, "ওহ শিয়োর। কুড ইউ প্লিজ় গিভ আস ফিউ মিনিটস টু ডিসাইড?"

"শিয়োর স্যার," বাও করে চলে গেলেন ওয়েটার ভদ্রলোক।

মেনু কার্ডটা শ্রীময়ীর দিকে এগিয়ে দিল সৌজন্য। শ্রীময়ী সেটা সৌজন্যর দিকে ঠেলে রেস্তরাঁর ইন্টিরিয়ার দেখতে লাগল। সৌজন্য মনে-মনে ভাবল, মেনুটা আজ ব্যাটে-বলে করতেই হবে। ওটাই আপাতত শ্রীময়ীর মন ভোলানোর একমাত্র পথ। খুঁটিয়ে মেনু কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে একটা সি-ফুড কোরিয়েন্ডার সুপ, একটা মাশরুম জিঞ্জার

চিলি, একটা প্যান ফ্রায়েড বার-বি-কিউ ফিশ আর একটা টেরিয়াকি চিকেন ডিশ পছন্দ করল সৌজন্য। সঙ্গে একটা মিক্সড হাক্কা নুড্‌লস। তার পর শ্রীময়ীর দিকে তাকিয়ে নিজের পছন্দগুলো শুনিয়ে বলল, ‘‘এটা কি ঠিক আছে ম্যাডাম? নাকি আর কিছু বলব?’’

শ্রীময়ী মুখের গম্ভীর ভাবটা ধরে রেখে বলল, ‘‘মাশরুম জিঞ্জার চিলিটা বাদ দাও।’’

সৌজন্য বুঝল, বাকিটা মনে ধরেছে শ্রীময়ীর। এ বার সে আস্তে-আস্তে ঠান্ডা হবে।

ওয়েটারকে হাতের ইশারায় আসতে বলে, সৌজন্য অর্ডার প্লেস করল। সবটা বলে যোগ করল, ‘‘সুপটা কিন্তু ওয়ান বাই টু হবে।’’

‘‘শিয়োর স্যার,’’ ছোট্ট বাও করে বিদায় নিলেন ওয়েটার।

ওয়েটার ভদ্রলোক চলে যেতেই সৌজন্য টের পেল ঝড়টা মোটেই থেমে যায়নি। ঝোড়ো হাওয়াটা আবার বইতে শুরু করেছে। ওয়েটারের ডাকে যেখানে বাধা পেয়েছিল, ঠিক সেখান থেকেই বলতে শুরু করল শ্রীময়ী, ‘‘বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা যদি সত্যিই ভেস্তে যায়, তা হলে ডিসেম্বরে তোমার জেঠতুতো ভাইয়ের বিয়েতে আমি কিন্তু যাচ্ছি না। এটা তুমি জেনে রেখো। আর অফিসের অ্যাসাইমেন্টের অজুহাতে আমার যেতে না পারার কারণটা তোমার বাবা-মাকে বোঝাতে যে আমার খুব একটা অসুবিধে হবে না, সেটা তুমি ভাল করেই জানো।’’

মোক্ষম জায়গায় ইয়র্কার! ব্যাট-প্যাড জুড়ে কোনও রকমে নিজের পতন রোধ করতে সৌজন্য বলল, ‘‘তার ঢের আগে আমরা যাব বেড়াতে! ক’টা দিন সময় দাও, হোটেলের বুকিং থেকে শুরু করে এয়ার টিকিট, সব এনে জমা দিচ্ছি তোমার হাতে। তুমি শুধু ডিসাইড করো, পাহাড় নাকি সমুদ্র।’’

মুহূর্তে সব রাগ গলে যেন জল হয়ে গেল শ্রীময়ীর। সে একগাল হেসে বলল, ‘‘জঙ্গল!’’

খবরটা সুমেধাকে দিতে, লাফিয়ে উঠল সে! বলল, ‘‘ডকুমেন্টারির জন্য এর চেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে রুবাইদা? কালার প্যালেটটা একবার ভাবতে পারছ! ক্লাব, ফুটবল টুর্নামেন্ট আর এ বার দুর্গাপুজো—আই অ্যাম সো এক্সাইটেড!’’

সুমেধার চোখে-মুখে এই খুশির আভাটা দেখার জন্যই তো এতটা পথ উজিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম ওর কলেজের গেটের সামনে। ইচ্ছে করেই ফোনে কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম, ‘‘একটা দারুণ খবর আছে তোমার জন্য। আমরা কি একবার দেখা করতে পারি?’’

এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল সুমেধা। বলেছিল, ওর লাস্ট ক্লাসটা শেষ হবে তিনটে পঁয়তাল্লিশে। আমি যেন সেই সময় চলে আসি প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে। এমনিতে এখন আমরা রোজ রাতেই টুকটাক চ্যাট করি, হোয়াটসঅ্যাপে। সুমেধা লেখে কম, পড়ে বেশি। এই ক’দিনেই মোটামুটি আমার নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে নিয়েছে। আমার লাস্ট ব্রেক আপ, স্ন্যাপ চ্যাট আইডি, আমার প্রিয় লেখক, সৌজন্যদার সঙ্গে আমার ইকুয়েশন, আমার অ্যাম্বিশন— সব। যদিও নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বলেছে খুবই কম। তবে আমার বিশ্বাস, আর কয়েক দিনের মধ্যে সেই দেওয়ালটাও আমি ভেঙে ফেলতে পারব।

এখন আমরা কলেজ স্কোয়ারের বিখ্যাত শরবতের দোকানে কাঠের টেবিল-বেঞ্চে মুখোমুখি বসে ডাব শরবতে চুমুক দিচ্ছি। একটু আগে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া দিয়ে ওর সঙ্গে হেঁটে আসতে কী যে ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল যেন কোনও একটা অদৃশ্য ক্যামেরায় শুটিং চলছে আমাদের প্রেমের গল্পটার। আচ্ছা, সুমেধা তো পরিচালক হতে চায়। ওর মাথার মধ্যে কেন খেলা করছে না প্রেমের এই দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করার কথা? ভিডিয়ো না হোক, একটা সেলফি তোলার কথা তো ও বলতেই পারত... আমি না হয় লাজুক, ও তো নয়। এত ভাল একটা খবর যখন ওকে কলেজ বয়ে দিতে এলাম, তার একটা কিছু ইনসেনটিভ থাকবে না!

কিন্তু না, সুমেধা মগ্ন ডাব শরবতেই।

স্ট্র-টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গ্লাসের শেষ বিন্দুটি শুষে নিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল, ‘‘তোমার এখন কী কাজ আছে রুবাইদা?’’

‘‘কাজ, মানে... না, তেমন কিছু তো নেই।’’

‘‘তা হলে চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি। নোলানের নতুন ছবিটা আমার দেখা হয়নি এখনও।’’

‘‘সিনেমা! তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’’ এতটা আমি আশাই করিনি!

পার্স থেকে শরবতের দামটা বের করতে-করতে সুমেধা বলল, ‘‘তা হলে কি জিকো আর জিঙ্গোকে ডেকে নেব?’’

এ বার আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। সুমেধাকে এত দিন এত কিছু বলেছি, কিন্তু জিকো-জিঙ্গোর সঙ্গে ওকে নিয়ে আমার প্রতিযোগিতার কথাটা তো কখনও বলিনি! কোনও রকম কোনও আভাসও দিইনি। ও এটা জানল কোথা থেকে?

এই জন্যেই বোধ হয় বলে, মেয়েদের সিক্সথ সেন্স আর হাতির ইন্টেলিজেন্স, উপেক্ষা করেছ, কী মরেছ!

১২

বন্ধুগণ, একটি বিশেষ ঘোষণা। এতদ্দারা তালতলা শ্রীপল্লির সমস্ত অধিবাসীবৃন্দকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ২৮ অগস্ট, রবিবার, সন্ধে সাড়ে ছ’টায় তরুণতীর্থ ক্লাবকক্ষে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। যে সভায় আলোচনার মূল বিষয়বস্তু আসন্ন দুর্গাপুজো এবং সেই উপলক্ষে একটি নতুন কমিটি গঠন। উক্ত সভায় যোগদানের জন্য শ্রীপল্লির সমস্ত অধিবাসীবৃন্দের কাছে আমরা আবেদন রাখছি। সভায় উপস্থিত থেকে আপনারা আপনাদের সুচিন্তিত ও মূল্যবান মতামত এবং উপদেশ আমাদের দেবেন, সেই আশা রাখি। মনে রাখবেন, আগামী রবিবার, ২৮ অগস্ট, সন্ধে সাড়ে ছ’টায়...

একটি সাইকেল রিকশায় দু’দিকে দুটো চোঙা বেঁধে, ব্যাটারি ও মাউথপিসসহ তুলে দেওয়া হয়েছিল বান্টিদা ও বাপ্তদাকে। বান্টিদা সারা পাড়া ঘুরে-ঘুরে বলে গিয়েছে সৌজন্যদার লিখে দেওয়া লাইনগুলো। রঘুদা পইপই করে বান্টিদাকে বলে দিয়েছিল, ‘‘এই লেখার বাইরে একটি কথাও তুই বলবি না। কোনও বাড়তি শব্দ নয়। বাপ্ত, তুই এটা খেয়াল রাখিস। এক বার পড়া শেষ হবে, আবার প্রথম লাইন থেকে শুরু করবি।’’

‘‘বার বার এক কথা বললে, ব্যাপারটা কেমন একঘেয়ে হয়ে যাবে না? ক্রিয়েটিভিটি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে, নাকি?’’ মুখ কুঁচকে বলেছিল বান্টিদা।

‘‘একঘেয়ে যখনই মনে হবে, বাপ্ত গান চালিয়ে দেবে। ঠিক আছে? সেদিন খেলার মাঠে মাইক হাতে তুই যা সব বলছিলি! বিশ্বকাপে ইতালির বিরুদ্ধে ইব্রাহিমোভিচের বাইসাইকেল কিকে গোল, সোনার পাদুকা— মাথায় রাখিস, এটা কিন্তু খেলার মাঠ নয়, ইট্‌স আ ভেরি সিরিয়াস থিং। তাই নো ছ্যাবলামি,’’ বান্টিদার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল রঘুদা।

সিরিয়াস তো বটেই। ঘোষণাটা হওয়ার পর থেকেই পাড়ায় একটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কারণ, বিগত ৭-৮ বছরে পুজোর জন্য এ রকম কোনও সাধারণ সভা আয়োজনের কথা শ্রীপল্লির কেউ শোনেনি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে পাড়ার চার দিকে শুধু লাগিয়ে দেওয়া হত বেশ কিছু ফ্লেক্স, যেখানে কমিটির নাম থাকত অপরিবর্তিত, বদলাত শুধু বছরের জায়গাটা। সঙ্গে, পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানানো হত এলাকার অধিবাসীদের। তাই এ রকম একটা ঘোষণা, সকলকে বেশ অবাক করেছে।

আজ সেই সভার দিন। কল্যাণদার কাছে আবার আমরা গিয়েছি চেয়ারের জন্য। আমরা মানে আমি, বিল্টো, জিকো। কল্যাণদা যারপরনাই খুশি। বলল, ‘‘বেশি করে চেয়ার নিয়ে যাও। আজ তো তোমাদের ক্লাবে তিলধারণের জায়গা থাকবে না!’’

আমি বললাম, ‘‘তোমার কাছে কি কোনও বিশেষ খবর আছে নাকি?’’

‘‘আরে, আছে-আছে। মর্নিং ওয়াক গ্রুপের সকলে বলাবলি করছিল, ‘পারলে এই ছেলেগুলোই পারবে, পাড়াটায় ভাল কিছু করতে’। আরে তোমরা তো জানো না, দেরি করে ঘুম থেকে ওঠো, আমার কাছে শোনো। গত দু’সপ্তাহ ধরে তপন তরাই ওদের দলে ভেড়ার চেষ্টা করছে। লবি করছে, লবি... কিন্তু ওখানে চিঁড়ে ভিজবে না।’’

‘‘কারা আছে গো এই মর্নিং ওয়াক গ্রুপে?’’ জিকো জিজ্ঞেস করল।

‘‘আরে, পাড়ার অনেক সিনিয়র মানুষই আছেন। মুখার্জিদা, সুবোধবাবু, তপাদার সাহেব, শিকদার বাড়ির বড় ছেলে... এই গ্রুপটা কিন্তু বেশ বড়। রোজ সকালে এরা হাঁটতে বেরোয়, তার পর মাঠে এসে টুকটাক ব্যায়ামট্যায়াম করে। এটুকু বলতে পারি, ওদের সাপোর্ট তোমরা পুরোটাই পাবে।’’

পকেটে ফোনটা বাজছে। বের করে দেখি সৌজন্যদা। হাতের ইশারায় কল্যাণদাকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে রিসিভ করলাম ওর ফোন, ‘‘হ্যাঁ সৌজন্যদা, বলো।’’

স্বভাবমতোই সরাসরি প্রশ্নে ঢুকে গেল সৌজন্যদা, ‘‘রুবাই, তুই গান শিখেছিস কতদিন?’’

‘‘গান? মানে... কেন বলো তো?’’

‘‘সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে পারিস না?’’

‘‘না মানে ওই... ক্লাস থ্রি থেকে টুয়েলভ, ন’বছর।’’

‘‘ইউটিউবে তোর গানগুলো দেখছিলাম, ভাল লাগল,’’ বলেই সৌজন্যদা ফোনটা কেটে দিল।

ফোনটার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকল না! যাক গে, পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।

আমি ফোনটা রাখার পরেই কল্যাণদা বলল, ‘‘তোমাদের এই সৌজন্য ছেলেটা কিন্তু চমৎকার! যেমন বিচক্ষণ, তেমনি সোজা শিরদাঁড়া। সেদিনের মাঠের ওই ঘটনার পর, সকলে কিন্তু ওর সাহসের প্রশংসা করছে। তবে ওকে একটু সাবধানে থাকতে বোলো রুবাই। সকলে ওকে তোল্লাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে, কিন্তু যখন

ও নিজে বিপদে পড়বে, তখন দেখবে পাশে কেউ নেই! কম দিন তো হল না এই পাড়ায়, কিছু-কিছু মানুষকে দেখলে না, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে যায়। মানুষ কী করে এত দু'মুখো হয়, কে জানে বাবা!''

''কাদের কথা বলছ গো?'' আমি বেশ কিছুটা অবাক হয়েই জানতে চাইলাম।

''থাক সে কথা। শোনো, আর ক'টাকে ডাকো, পাঁচটা-পাঁচটা করে বার কয়েকে নিয়ে চলে যাও চেয়ারগুলো। এইটুকুর জন্য ভ্যান ডাকতে গেলে আবার দুশো-আড়াইশো টাকা নিয়ে নেবে। আর শোনো, আজ ওই চল্লিশটা চেয়ারের জন্য তোমরা আমাকে একশোটা টাকা দিয়ো,'' প্রসঙ্গ বদলে নেয় কল্যাণদা।

কিন্তু ওর বলা কথাগুলো একটা অবাধ্য মাছির মতো ভনভন করতে লাগল আমার কানের কাছে। বিপদ? সৌজন্যদার? কিছু কি আঁচ করতে পারছে কল্যাণদা?

সন্ধে ছ'টা পঁয়তাল্লিশ। ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ! চল্লিশটা চেয়ার ছাড়াও ক্লাবের সোফা, বেঞ্চ, টেবিল, কোনও কিছুই ফাঁকা নেই। তার পরেও আমরা চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে রয়েছি। রিম্পি ছাড়া পুরো তরাই পরিবার হাজির। বিভিন্ন বয়সি মাথায় ক্লাবঘরটা এখন যেন মহামিলন ক্ষেত্র। গমগম করছে গোটা পরিবেশটা। ও হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে সুমেধাও কিন্তু এসেছে। নতুন কমিটি গঠন পর্বের ডকুমেন্টেশনটা তো ওর প্রজেক্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজই প্রথম ক্লাবের অন্দরে পা দিল ও।

''সকলে মোটামুটি এসে গেছেন, তা হলে এ বার আমরা শুরু করে দিই নাকি?'' গলা তুলে বলল রঘুদা।

ঠিক সেই সময় ক্লাবের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এলেন বিখ্যাতকাকু, বললেন, ''সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল!''

আমরা মনে-মনে প্রমাদ গুনলাম। রঘুদা মুখটা নিমতেতো করে বলল, ''না-না। কিচ্ছু দেরি হয়নি। আপনি আসুন। তা হলে শুরু করি আমরা?''

''হ্যাঁ, তবে তার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে,'' উঠে দাঁড়িয়েছে তপনদা, ''আমি কি বলতে পারি?''

কথা বলার জন্য অনুমতি চাইছে তপন তরাই? ভাবাই যায় না!

রঘুদা বলল, ''নিশ্চয়ই তপনদা। তুমিই তো বিদায়ী সেক্রেটারি। প্রেসিডেন্ট যখন নেই, তুমিই তো বলবে।''

''বেশ। প্রথমে আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ দিতে

চাই, আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় আজ এখানে দিতে রাজি হয়েছেন বলে। বিগত আট বছর ধরে আমি এই পুজোর সেক্রেটারি, যথা সম্ভব চেষ্টা করে গিয়েছি, যাতে পুজোটাকে একটা নিজস্বতা দেওয়া যায়। আমাদের এই জাঁকজমকহীন পুজোই আমাদের ঐতিহ্য। সেটা অন্তত আমি এবং আমার কমিটি মেম্বাররা করে দেখাতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে আপনি যত ভাল কাজই করুন না কেন, কোনও একটা জায়গায় এসে তো আপনাকে থামতে হবে। ব্যাটন তুলে দিতে হবে নতুন প্রজন্মের হাতে। আজ আমাদের জন্য সেই মুহূর্ত উপস্থিত। মূলত আমার অনুরোধেই রঘুরা আজ এই মিটিংটা ডেকেছে। আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ওদের ব্যাচের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি আর বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করব না। রঘুকে অনুরোধ করব, মিটিংটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।'' সকলের প্রতি জোড়হাত করে নমস্কার জানিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল তপন তরাই।

একটা গুঞ্জন শুরু হল সভাগৃহ জুড়ে। চটাপট চটাপট শব্দে হাততালিও দিয়ে উঠল অনেকে।

তপনদার কথায় চোখে যেন জল চলে এসেছে অনিন্দিতাবৌদির। ছলছল করছে ডিম্পির চোখগুলোও।

সুমেধা দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। ওখান থেকেই ক্যামেরাবন্দি করছিল তপনদার কথাগুলো। এখন ক্লোজ়আপে ধরেছে অনিন্দিতাবৌদির মুখ। সেই অবস্থাতেই আমার পেটে একটা হালকা গুঁতো মেরে বলল, ''কেসটা কী হল বলো তো রুবাইদা? এ তো পুরো বেড়াল তপস্বী মনে হচ্ছে!''

আমি একটা ছোট্ট 'উফ' করে বলে উঠলাম, ''কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না!''

সত্যি কথা বলতে কী, তপনদার কথায় আমরা সকলে হতবাক! এত গুছিয়ে, এত সুন্দর করে কথা বলতে তপনদাকে কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। এটা পরিষ্কার, এই কথাগুলো তপনদার মাথা থেকে বেরোয়নি। নিশ্চয়ই কেউ একটা ওকে লিখে দিয়েছে। আর ও সেটা ভাল করে মুখস্থ করে এসে এখানে উগরে দিয়েছে। কিন্তু একথা সত্যি, এটা আমরা কেউই আশা করিনি। বিশেষত, 'আমার অনুরোধেই রঘুরা আজ এই মিটিংটা ডেকেছে', এই লাইনটা তো জাস্ট মাস্টারস্ট্রোক। নিজের সম্মানও বাঁচল আবার উদারতাও দেখানো গেল। যে-ই তপনদাকে এই বুদ্ধিটা দিয়ে থাকুক না কেন, তাকে মনে-মনে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই।

তপনদার শাগরেদরা সব ক্লাবের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে বসেছিল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ গলা তুলল, ''তপনদা, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমিই থাকো দাদা।''

কেউ বলল, ''তুমি তো বেশ করছিলে পুজোটা। সরে যাওয়ার কথা কেন বলছ দাদা?''

তপনদা হাত তুলে তাদের সকলকে শান্ত হতে বলল।

রঘুদা এসেছিল একেবারে অন্যরকম একটা প্রস্তুতি নিয়ে। শুরুতেই একটা আউট অফ সিলেবাস প্রশ্ন পড়ে যাওয়ায় একটু ঘেঁটে গেছে। সেটা ওর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তপনদা এসে বসেছিল সৌজন্যদার ঠিক পাশের চেয়ারটাতেই। এখন সৌজন্যদার কানে-কানে কিছু একটা বলছে। আর সৌজন্যদা ঘাড় নেড়ে-নেড়ে ওর কথায় সায় দিচ্ছে। কী বলছে কী লোকটা?

হাততালির রেশ কমে আসার মধ্যে রঘুদা নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়েছে। এ বার সে বলল, ''তপনদাকে অনেক ধন্যবাদ। তা হলে এ বার আমরা চলে যাই মূল আলোচনায়। মানে আমাদের নতুন কমিটি গঠনের দিকে। তার আগে আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কেউ কিছু বলতে চান... প্লিজ়, আপনারা মন খুলে বলুন।''

শুরুটা কে করবেন, তা নিয়ে হয়তো ইতস্তত বোধ করছিলেন সকলে। আইস ব্রেকটা করলেন অম্লানজেঠু, বললেন, ''সকালে হাঁটতে গিয়ে পায়ে একটু টান লেগেছে বুঝলে। তা আমি কি বসে-বসে বলতে পারি?''

''প্লিজ় জেঠু...'' বলল বিলুদা।

''ধন্যবাদ। শোনো, বিশেষ কিছুই বলার নেই। শুধু এটুকুই বলব, তোমাদের আয়োজন করা ফুটবল টুর্নামেন্টটা তো দেখলাম। আমাদের দারুণ লেগেছে! তোমাদের উপর আমাদের ভরসা জন্মেছে। আমাদের বিশ্বাস, পুজোর দায়িত্বটা যদি তোমরা নাও, তা হলে সেটা ভালই হবে। কী হল বিভাস?''

বিভাসজেঠু অম্লানজেঠুরই বয়সি। তবে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ''অম্লানের সঙ্গে আমি এবং আমরা, মানে পাড়ার প্রবীণ নাগরিকেরা সকলেই একমত। একটা নতুন কমিটি তৈরি করা হোক। তা ছাড়া তপনও তো সেটাই চাইছে। আমি তপনকে এই জন্য হার্দিক অভিনন্দন জানাই।''

তপনদা গদগদ মুখ করে মাথা নাড়তে থাকে।

অম্লানজেঠু বললেন, ''দেখো বাবা, তোমরা কে কী বলবে আমি জানি না, তবে আমি এই পুজোর সেক্রেটারি হিসেবে সৌজন্যর নাম প্রস্তাব করছি।''

পুটাইদা বলে উঠল, ''আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।''

হইহই করে সহমত পোষণ করল বাকিরাও।

অম্লানজেঠু যে এভাবে দুম করে সৌজন্যদার নামটা সেক্রেটারি হিসেবে প্রস্তাব করে দেবে, এটা বোধ হয় রঘুদা আন্দাজ করতে পারেনি। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যেন ওর ঠিক মনে ধরেনি। অবশ্য পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে, গলা তুলে বলল, ''আমিও সমর্থন করছি এই প্রস্তাব।''

সৌজন্যদা উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে নমস্কার জানাল সকলকে, তার পর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, ''আপনাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে আমি অভিভূত। এই মাত্র কয়েক দিনে আপনারা আমাকে যে ভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাকে আপনারা মাফ করবেন। এই পদ নিতে আমি অপারগ।''

''কেন বাবা, আমরা কি তোমার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেলেছি?'' অভিমানমাখানো গলায় জানতে চাইল অম্লানজেঠু।

''ছি ছি, এ কী বলছেন মেসোমশাই! আপনারা আমার গুরুজন। আপনারা আমাদের অনুরোধ নয়, আদেশ করবেন। আসলে, কারণটা শুধু আমার ব্যক্তিগত নয়, অফিশিয়ালও। আমি যে চাকরি করি, সেই সংস্থার শর্ত অনুসারে আমি এ রকম কোনও পদ গ্রহণ করতে পারব না। তবে কথা দিচ্ছি, সবরকম ভাবে এই পুজোর সঙ্গে থাকব, যে ভাবে পারি, যতটুকু পারি সাহায্য করব। এবং আপনাদের অনুমতি নিয়েই, আমি এই পুজোর সেক্রেটারি হিসেবে রঘুবীর মণ্ডলের নাম প্রস্তাব করছি।''

সৌজন্যদার 'না' বলার কারণটা জেনুইন। তাই আমরা আবার যথারীতি হইহই করে রঘুদার নাম সমর্থন করে দিলাম।

রঘুদার চোখমুখ বলে দিচ্ছিল, দায়িত্বটা পেয়ে ও যারপরনাই খুশি। বিভাসজেঠু বলল, ''কী বাবা রঘুবীর, তোমার আবার কোনও আপত্তি নেই তো?''

''আপনাদের আর্শীবাদের হাত মাথার উপর থাকলে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব আপনাদের আস্থার মর্যাদা রাখতে,'' মাথা নিচু করে নিজের সম্মতি প্রদান করল রঘুদা।

হঠাৎই বলে উঠলেন বিখ্যাতকাকু, ''রঘুর উপর আমাদের অনেক আস্থা...'' কথাটা শেষ করতে পারলেন না, তার আগে অদ্ভুত ভাবে টং করে একটা শব্দ হল। তার পরের আওয়াজটা সরররররর, ঠক!

আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগে দেখলাম, মাথার উপরে বনবন করে ঘুরতে থাকা ফ্যানটার একটা ব্লেড মাঝখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেঁথে গিয়েছে একটা কোণে রাখে কাঠের আলমারিটার গায়ে! ফ্যানটা দুলতে শুরু করেছে বিশ্রী ভাবে। রঘুদা লাফিয়ে গিয়ে ফ্যানের সুইচটা বন্ধ না করলে আরও বড়সড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

ক্লাবে উপস্থিত প্রত্যেকটা মানুষ হতবাক। ফ্যানের ব্লেড যে এভাবে মাঝখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারে, এমন ঘটনার কথা না কেউ কখনও শুনেছেন, দেখার তো প্রশ্নই নেই! ঘটনার আকস্মিকতায় কারও মুখেই প্রায় কথা সরছে না।

বিখ্যাতকাকু-ই ভাঙলেন নীরবতা, চোখ গোলগোল করে বললেন, ‘‘ভাগ্যিস ব্লেডটা কারও গায়ে লাগেনি। তা হলে একটা বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত!’’

বিলুদা খুব খারাপ একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর হাতটা টেনে ধরে ওকে বিরত করল পুটাইদা।

আকস্মিকতা কাটিয়ে আবার শুরু হল মিটিং। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল, প্রতি বছর ঠাকুরের দামটা যখন ডাক্তারবাবুই দেন, তখন সভাপতি হিসেবে ওঁর নামটাই রাখা হোক। ক্যাশিয়ার হিসেবে সকলে সমর্থন করল পুটাইদার নাম। এবং ওর সহকারী হিসেবে থাকবে বিজনদা। বিজনদা সবে অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স কমপ্লিট করে একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি পেয়েছে। বিজনদা উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বলে উঠলেন মিসেস রায়, স্বভাবসিদ্ধ আদুরে গলায় বলতে লাগলেন, ‘‘দেখুন, মনে কিছু করবেন না। একটা কথা খুব খোলাখুলি ভাবে বলতে চাই। পুজোর সময় পাড়ায় যে অনুষ্ঠানগুলো হয়, সেগুলো কিন্তু বড্ড সাবস্ট্যান্ডার্ড। পাঁচ মিনিটের বেশি বসে থাকা যায় না। আমার মনে হয়, এদিকটায় আপনাদের একটু নজর দিতে হবে।’’

মিসেস উর্মিলা রায়। সুন্দরী। সেরকমই স্টাইলিশ। অসম্ভব ন্যাকা। কিন্তু ডাউন টু আর্থ। একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং পাড়ার কিছু বাচ্চাকে নাচ শেখান। সেটা অবশ্য শখে। ওঁর স্বামী অমিতাভ রায় একজন নামী অ্যাডভোকেট। বছরের বেশির ভাগ সময়টাই হিল্লি-দিল্লি করে মামলা লড়ে বেড়ান। মিসেস রায় সৌজন্যদাদের বয়সি হবেন বলেই মনে হয়।

মিসেস রায়ের কথাটা মিথ্যে নয়। গত কয়েক বছরে পুজোর সময় যেটুকু দেখেছি, মাঠের পশ্চিম কোণে একটা দশ ফুট বাই বারো ফুটের মঞ্চ বাঁধা থাকত। পুজোর মণ্ডপের মতো তারও তিন দিক খোলা। মঞ্চের মাঝে খানকতক মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডের সঙ্গে দাঁড় করানো। পাড়ার বাচ্চাকাচ্চারা যে-যখন পারত, ইচ্ছেমতো সেই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে, ছড়া, কবিতা, গান শুনিয়ে যেত। আর কারও নাচতে ইচ্ছে করলে, মাইক্রোফোনগুলো সরিয়ে রাখা হত এক কোণে, তার পর সাউন্ড সিস্টেমে পেনড্রাইভ গুঁজে চালিয়ে দেওয়া হত নাচের গান। শুরু হয়ে যেত নৃত্যানুষ্ঠান।

তাই মিসেস রায়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে সৌজন্যদা বলল, ‘‘কালচারাল পার্টটার দায়িত্ব যদি আপনি নেন, তা হলে খুব ভাল হয় মিসেস রায়।’’

মিসেস রায় লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘‘না-না, ওসব আমি একা করতে পারব না।’’

‘‘একা করবেন কেন, রুবাই থাকবে না হয় আপনার সঙ্গে, সহকারী হিসেবে...’’ খুব সহজ ভাবে কথাটা বলল সৌজন্যদা। বলেই আমার দিকে তাকাল।

এত ক্ষণে মাথায় ঢুকল, সৌজন্যদা সকালে ফোনটা কেন করেছিল।

সুমেধা আমার পেটে আবার একটা গুঁতো মেরে বলল, ‘‘সৌজন্যকে তো ভালই বশ করেছ দেখছি রুবাইদা! কী করে করলে গো?’’

‘‘কী বললে তুমি?’’

‘‘কেন, শুনতে পাওনি? তা হলে আর শুনতে হবে না।’’

সৌজন্যদা অ্যাসিস্ট্যান্ট কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করায় আমি যতটা না অবাক হলাম, তার চেয়ে ঢের বেশি হলাম, সুমেধার ওকে ‘সৌজন্য’ বলে সম্বোধন করায়!

১৩

তপন তরাইয়ের হোয়াটসঅ্যাপ ঢুকল রঘুবীর সিংহের মোবাইলে, তাতে লেখা শুধু তিনটে শব্দ, ‘কী, কেমন দিলাম!’

দেখেই মাথাটা গরম হয়ে গেল রঘুবীরের। পুজোর জন্য সার্বজনীন মিটিং ডাকার ক্রেডিটটা গতকাল তপন তরাই যে ভাবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল, সেটা এখনও ঠিক হজম করতে পারেনি রঘুবীর।

রঘুবীর আর বিপ্রকাশ চা খাচ্ছিল পাটুলির ফায়ার স্টেশনের উল্টো দিকের চায়ের দোকানটায়। বাইকটা ডাবল স্ট্যান্ড করে তার উপর বসেছিল রঘুবীর, বিপ্রকাশ উল্টো দিকের বেঞ্চে। বিপ্রকাশকে তপনের পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপটা দেখিয়ে রঘুবীর বলল, ‘‘দেখেছিস, মালটা কীরকম হারামি। কাল ওই ঢ্যামনামোটা করেও শান্তি হয়নি, এখন আবার ট্রিপ নিচ্ছে!’’

তপনের মেসেজের কোনও উত্তর দেয় না রঘুবীর।

বিপ্রকাশ মাটির ভাঁড়ে শেষ দুটো চুমুক দিয়ে বলল, ‘‘সে তো করবেই ভাই। জ্বালা কি ওরও কম হচ্ছে? তবে যা-ই বল, মালটা কিন্তু গেমটা হেব্বি খেলেছে,’’ তার পর চায়ের ভাঁড়টা পাশে রাখা প্লাস্টিকের বড় ডাস্টবিনটার ভিতর ছুড়ে দিয়ে বলল, ‘‘একটা সত্যি কথা বল রঘু, কাল যখন অম্লানজেঠু সেক্রেটারি হিসেবে সৌজন্যর নামটা প্রস্তাব করল এবং সকলে সমর্থনও করল, তখন সেই মুহূর্তে তোর মনের মধ্যে কী চলছিল?’’

‘‘সত্যি কথা বলব? আমি একশো পার্সেন্ট শিয়োর ছিলাম, সৌজন্য কোনও পদ নিতে রাজি হবে না।’’

‘‘কেন ঢপ মারছিস ভাই? সেই মুহূর্তে তোর মুখের এক্সপ্রেশনটা কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি।’’

‘‘আচ্ছা বাবা, তোর সাংঘাতিক অবজ়ারভেশন পাওয়ার। নে এ বার বাইকে ওঠ। পৌনে সাতটা বাজে। সৌজন্যর অফিস থেকে ফেরার সময় হয়ে গেল। ওর সঙ্গে আজ একটু বসা দরকার। প্ল্যানিংটা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ছকে ফেলতে হবে। পুজোর আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিন বাকি!’’ বাইকটা স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে কিক স্টার্ট করে রঘুবীর।

মিসেস উর্মিলা রায় তাঁর ফেসবুক স্টেটাস আপডেট করেছেন। ‘কালচারাল সেক্রেটারি অ্যাট এসএসডি’। আমাদের মধ্যে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর হাসাহাসি। বাপ্তদা বলল, ‘‘রুবাই, তুইও এ বার স্টেটাসটা দিয়েই দে, ‘এসিএস অ্যাট এসএসডি।’’’

বিল্টো বলল,, ‘‘এসএসডি-টা তো ঠিক আছে, শ্রীপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব, কিন্তু এসিএস-টা আবার কী গো বাপ্তদা?’’

আমি বললাম, ‘‘আরে বুঝলি না, অ্যাসিস্ট্যান্ট কালচারাল সেক্রেটারি। আওয়াজ দিচ্ছে আমাকে।’’

‘‘আওয়াজ কোথায় দিলাম? এটা তো সত্যি। আমি কিন্তু মিসেস রায়কে ফুল সাপোর্ট করছি। আরে, এতে তো আমাদেরই পুজোর ব্র্যান্ডিং হচ্ছে!’’ বাপ্তদা বলল কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

‘‘পুজোর ব্র্যান্ডিং নয় গো, সেটা করতে হলে উনি অ্যাব্রিভিয়েশনে যেতেন না। পুরো শব্দগুলো লিখতেন। এটা আসলে ওঁর নিজের ব্র্যান্ডিং। লোকে তো ভাববে এসএসডি-টা নির্ঘাত কোনও বড় সংস্থা। উনি তার কালচারাল সেক্রেটারি! এত বড় এক জন অ্যাডভোকেটের বউ কিন্তু হ্যাংলামোটা দ্যাখো!’’ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল জিকো।

জিঙ্গো বলল, "বাট উই আর হ্যাপি ফর ইউ রুবাই। মিসেস রায়ের নাচ আমরা দেখিনি, কিন্তু তোর গান তো শুনেছি। সত্যি বলছি, গানটা নিয়ে না তুই সিরিয়াসলি একটু ভাব। সুমেধাকে বল, একটা ভাল মিউজ়িক ভিডিয়ো শুট করে দেবে। ইউটিউবে তোর গানগুলো ভাল, কিন্তু ভিডিয়োগুলো বড্ড অ্যামেচারিশ।"

জিকো-জিঙ্গো মনে হয় এতদিনে বুঝে গিয়েছে, সুমেধা ওদের ক্ষেত্রে গন কেস। তাই হাল মোটামুটি ওরা ছেড়েই দিয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে দেখছি, আমার সামনে সুমেধার প্রসঙ্গ তুলতে ওদের আর কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না।

কাঁধের উপর এ বার একটা হাত এসে পড়ায় ঘুরে তাকলাম। সৌজন্যদা!

"কী খিচুড়ি পাকাচ্ছিস রে তোরা?" ট্র্যাক প্যান্ট ও ঢলা টি শার্ট পরেছে ও। চুলটা এখনও ভেজা। তার মানে অফিস থেকে ফিরে, ফ্রেশ হয়েই মাঠে এসেছে।

"ওই একটু রুবাইয়ের ফিউচার প্ল্যান নিয়ে ডিসকাস করছিলাম আর কী!" ফিচেল একটা হাসি হেসে বলল বিম্বো।

সৌজন্যদা হাতগুলো বুকের দু'ধারে পাখির ডানার মতো মেলে দিয়ে কোমরটা এ-দিক ও-দিক ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, "তা তোদের রঘুদা আর বিলুদা কোথায়? পুটাইটাকেও তো দেখছি না! আজ যে পুজোর প্ল্যানিংয়ের একটা খসড়া বানাবে বলল!"

"আরে দ্যাখো না, গ্রুপে তো রঘুদা সেরকমই লিখল। আজ আমার পুজো শপিংয়ে যাওয়ার ছিল, আমি তো বাবাকে না বলে দিলাম। এখন রঘুদা নিজেই এল না!" ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল বিম্বো।

"ওরে আমার মান্তু সোনা রে, বাবার সঙ্গে শপিংয়ে যাবে! এ বার বেচারার কী হবে গো..." বিম্বোর চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে আধো-আধো গলায় বলল ভোম্বল। হেসে উঠলাম আমরা সকলে।

জিকো বলল, "পুজোর দেড় মাস আগে কে যায় রে পুজো শপিংয়ে! তুই কি ক্লাস থ্রি-তে পড়িস?"

"ক্লাস থ্রিয়ের কথায় মনে পড়ল," স্ট্রেচিং শেষ, এ বার মাটিতে বসে পড়েছে সৌজন্যদা। তার পর বলতে শুরু করল, "জানিস তখন আমি ওই থ্রি বা ফোরেই পড়ি। বাবা পুজোর বোনাস পেলেই, আমরা চার জনে মিলে, মানে আমি-দিদি-বাবা-মা, বেরিয়ে পড়তাম পুজো শপিংয়ে। জামা-প্যান্ট-জুতো কিনে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরতাম। আর তার পরের এক মাস ধরে চলত আমার ট্রায়াল পর্ব! জামা-প্যান্টগুলো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কত বেশি সংখ্যক কম্বিনেশন তৈরি করা যায়, চলত সেই এক্সপেরিমেন্ট! শুনলে তোরা হাসবি, ওই এন্টায়ার পিরিয়ডটায় রাতে শোয়ার আগে আমি আর দিদি পুজো উপলক্ষে কেনা সব জামা-প্যান্ট নিয়ে শুতাম মাথার কাছে, এমনকী জুতো জোড়াও থাকত সেখানে!"

"তোমরা মাথার কাছে জুতো নিয়ে শুতে!" অবাক চোখে তাকায় বিম্বো।

"তা হলে আর বলছি কী! কী রকম পাগল ছিলাম ভাব!"

বলতে-বলতে সাড়ে পাঁচশো সিসির বাইকে ভুট ভুট আওয়াজ করতে-করতে মাঠের পাশে এসে দাঁড়াল রঘুদা। পিছনের সিটে বিলুদা। বাইকটা মাঠের বাইরে স্ট্যান্ড করে, ওরা উঠে এল মাঠে।

"ওহ, তোরা সকলে এসে গিয়েছিস! সৌজন্য কি আজ একটু জলদি ফিরেছিস নাকি?"

"হ্যাঁ রে, লাস্ট ক্লায়েন্টটা মিট করলাম আনোয়ার শা-র এখানে। ওখান থেকে আর অফিসে ফিরিনি। বসকে বলে সোজা বাড়ি চলে এসেছি। তা বল, তোর জরুরি তলবটা কিসের?"

"বোস-বোস, বলছি। এই সকলে একটু পিছিয়ে-পিছিয়ে বোস। গোলটা একটু বড় কর তো," রঘুদার কথায় আমরা সকলে একটু করে পিছিয়ে, একটা বড় গোল করে বসলাম, যাতে সকলে সকলের মুখ দেখতে পায়। ইতিমধ্যে পুটাইদাও চলে এসেছে।

বিলুদা হঠাৎ বলে উঠল, "মাথা নিচু কর ভাই, আবার মালটা আসছে! উফ, এই লোকটাকে না... আমি সিরিয়াসলি বলছি, এ বার পুজোর বাজেট থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে সাইবেরিয়াতে রেখে আসব!"

বিখ্যাতকাকুর 'এফেক্ট'-এর কথা এখন কিছুটা হলেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সৌজন্যদা। বিশেষ করে, সেদিন ক্লাবে ওই ফ্যানপর্বটা ঘটার পর। শুধু অপয়া তো নন, লোকটা ভীষণ ইরিটেটিং। একবার যদি কাউকে ধরেন, একই কথা বার-বার জিজ্ঞেস করে যান। আর ভীষণ ভাবে পার্সোনাল জিনিসে ঢুকে পড়েন। সেই অভিজ্ঞতা সৌজন্যদারও হয়েছে। একদিন তো অফিস যাওয়ার সময় ওকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "এত কম বয়সে এই পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছ, গাড়িও আছে, কত মাইনে পাও গো তুমি?"

সৌজন্যদা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পর হাসিমুখে বলেছিল, "ওই কোনওরকমে চলে যায়। মাসের শেষে ধার করতে হয় না, এই আর কী।"

ভোম্বল একটু আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "চলে গেছে। এ বার তোমরা মুখ তুলতে পারো।"

রঘুদা একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলল, "কী জ্বালা বল তো! যাক ছাড়, সৌজন্য তুই কি কিছু ভাবলি? মানে আমরা কোথা থেকে কী ভাবে শুরু করব?"

"তোরা তো আগে একটা সময় এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলি, তখন কী ভাবে কাজ হত? পুটাই কি কিছু বলতে পারবি?" জানতে চাইল সৌজন্যদা।

"দ্যাখ, আমরা তখন নেহাতই ছোট। বাবা-কাকা-জেঠুরা পুরোটা দেখত। আমরা মূলত দৌড়ঝাঁপের কাজগুলো করতাম। কোথাও থেকে কিছু আনতে হলে বা কাউকে কিছু দিতে হলে, সেগুলো আমরা করতাম। আমার মনে হয় রঘু-বিলুদের অভিজ্ঞতাও এর বেশি কিছু নয়," বলল পুটাইদা।

"বেশ, বুঝলাম," মাথা নাড়তে থাকে সৌজন্যদা। তার পর বলে, "দ্যাখ আমার মনে হয়, আমাদের প্রাথমিক কাজ একটা বাজেট ঠিক করা। চাঁদা, সুভেনির কিংবা অন্য কোনও স্পনসরশিপ থেকে থাকলে সেখান থেকে কতটা কী আসতে পারে তার একটা আন্দাজ করা। আমার মনে হয় না তপনদা এই ব্যাপারে আমাদের কোনওরকম কোনও হেল্প করবে বলে। মানে পুরনো পুজোর কোনও ট্র্যাক আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে বলে..."

"একদমই তাই। তবে বড়দের মুখে শুনেছি, সুভেনির থেকে লাখ দেড়েক টাকা প্রতিবারই ওঠে আর তার সবচেয়ে বড় অংশটা জোগাড় করে দেয় ব্রতীনদা, মানে ওই বিএলআরও ব্রতীন চক্রবর্তী," বলল রঘুদা।

"গুড। চাঁদার হিসেবটাও বেরিয়ে যাবে। আমাদের পাড়ায় রাফলি কতগুলো ফ্ল্যাট আছে বল?"

পুটাইদা বলল, "তা প্রায় চারশোর কাছাকাছি।"

"অ্যাভারেজ পাঁচশো টাকা করেও যদি ধরি, তা হলেও লাখ দুয়েক টাকা। আর স্পনসরশিপ থেকে লাখখানেক চলেই আসবে। তার মানে আমাদের বাজেটটা সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে রাখতে হবে। কী, তাই তো?"

"মাত্র পাঁচ লাখ! এত কমে কী করে দুর্গাপুজো হবে গো সৌজন্যদা? উদয়ভানু সংঘ তো শুনছি এ বার শুধু থিম ডিজ়াইনার ও আর্টিস্টকে পারিশ্রমিকই দিচ্ছে কুড়ি লাখ টাকা!" বেজার মুখে বলে বিম্বো।

"চিন্তা করিস না বিম্বো, কেউ এজ-এ বড় হয়, কেউ ইমেজ-এ। আমরা হব ভাবনায় বড়। সিম্পলিসিটিতে বাজিমাত করব আমরা।"

"এই পাঁচ লাখ টাকায় তুই কি থিম পুজোর কথা ভাবছিস নাকি!" অবাক হয় রঘুদা।

“ইয়েস ব্রাদার। একমাত্র থিমই পারবে পাঁচ লাখের পুজোর গায়ে পঁচিশ লাখের জ্যাকেট পরাতে। ভাবনাটা তো ভাবব আমি, তার জন্য তো আর তোদের কুড়ি লাখ খরচা করতে হবে না রে বাবা!” সৌজন্যদার গলায় আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া।

তালতলা শ্রীপল্লিতে হবে থিম পুজো! এ তো আমরা ভাবতেই পারি না! সৌজন্যদার আত্মবিশ্বাস দেখেই কিনা জানি না, জিকো চেঁচিয়ে উঠল, “থ্রি চিয়ার্স ফর সৌজন্যদা।”

গলা মেলালাম আমরা সকলে, “হিপ হিপ হুররে!”

১৪

টেডি বিয়ার? না, ওটা বড্ড ন্যাকা-ন্যাকা হয়ে যাবে। তা হলে কি একটা ভাল ইয়ারপড? যখনই গান শুনবে, শুধু আমার কথা ভাববে!

ধুর, কী যে সব বোকা-বোকা ভাবনা মাথায় আসছে! না, বই। এটাই সবচেয়ে ভাল উপহার। লেখাপড়া করা মেয়ে, পড়তে ভালবাসে। এটাই বেস্ট চয়েস! কিন্তু কী বই? এই মরেছে, যে বই দেব, সেটা যদি ওর কাছে আগে থেকেই থাকে! এবং সেটার সম্ভাবনাই তো বেশি! ধুর বাবা, ভাল লাগে না।

কাল সুমেধার জন্মদিন আর আমি এখনও ঠিক করে উঠতে পারলাম না কী গিফ্ট দেব! আমি সত্যিই একটা আস্ত উজবুক। এ রকম সাত-পাঁচ ভাবছি, আর তার মধ্যে আমার ঘরের দরজায় টোকা। আমি নিশ্চিত, মা ছাড়া এসময় আর কেউ আসবে না। বললাম, “চলে এসো, খোলা আছে তো।”

মায়ের হাতে বেদানার জুস। গ্লাসটা আমার হাতে ধরিয়ে বলল, “তখন থেকে কী বিড়বিড় করছিস রে?”

“মা! তার মানে তুমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলে?”

“শুনলাম বলেই তো আইডিয়াটা মাথায় এল।”

“আইডিয়া! কিসের আইডিয়া?”

“রুবাই, হাতে সময় কম। এখন এই সব অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করবি, নাকি আসল কথাটা শুনবি?”

“উফ, তুমি না মা... বেশ, সবটা যখন ধরেই ফেলছ, তখন এ বার আমাকে একটু সাহায্য করো,” আত্মসমর্পণ করেই ফেললাম, “সুমেধাকে কী দেব মা? প্লিজ় একটা কিছু সাজেস্ট করো...”

মা খুব কাব্যিক স্টাইলে বলল, “গিফ্ট শপ থেকে কী কিনে দিবি, সেটা বলতে পারব না। তবে বাঙালি ছেলে প্রেমে পড়বে অথচ কবিতা লিখবে না, সেটা কি হয়?”

“কী বলছ মা, আমি লিখব কবিতা!”

“পারলে নিজে লিখবি। না হলে ধার করবি। একটা সুন্দর সাদা কাগজে আমার প্রিয় কবিতাটা চাইলে তুই ওকে সুন্দর হাতের লেখায় লিখে দিতেই পারিস... মনে হয় না ওর অপছন্দ হবে!”

“কোন কবিতাটা মা?”

এ বার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মা। সেখান থেকে দেখা যায় কাঠচাঁপার গাছটা। সাদা-সাদা ফুল ধরেছে তাতে। সেদিকে তাকিয়ে মা বলতে শুরু করল—“‘সে যদি তোমাকে অগ্নিতে ফেলে মারে?’
বিনা চেষ্টায় মরে যাব একেবারে

– ‘সে যদি তোমাকে মেঘে দেয় উথান?’
বৃষ্টিতে, আমি বৃষ্টিতে খানখান

– ‘সে যদি তোমাকে পিষে করে ধুলোবালি?’
পথ থেকে পথে উড়ে উড়ে যাব খালি

– ‘উড়বে?’– আচ্ছা, ছিঁড়ে দেয় যদি পাখা?’
পড়তে পড়তে ধরে নেব ওর শাখা

– ‘যদি শাখা থেকে নীচে ফেলে দেয় তোকে?’
কী আর করব? জড়িয়ে ধরব ওকেই

বলো কী বলব, আদালত, কিছু বলবে কি এরপরও?
– ‘যাও, আজীবন অশান্তি ভোগ করো!’”

মা যে এত সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে, সেটা আজই প্রথম জানতে পারলাম। আমি মুগ্ধ চোখে মায়ের দিয়ে তাকিয়ে বললাম, “কী সুন্দর লিখেছ মা!”

জানলার পাশ থেকে সরে এসে আমার মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে মা বলল, “পাগল ছেলে আমার। এই লেখা আমি লিখব! এটা জয় গোস্বামীর লেখা, ‘ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ’। আমার ভীষণ প্রিয় কবি।”

আমি হেসে বললাম, “আজ থেকে উনি আমারও প্রিয় হয়ে গেলেন! আমি জানি, এটা সুমেধারও ভীষণ পছন্দ হবে। থ্যাঙ্ক ইউ মা,” মাকে জড়িয়ে ধরলাম আমি।

“নে, অনেক হয়েছে। এ বার লিখে ফ্যাল তো সুন্দর করে,” মায়ের গলায় প্রশ্রয়।

“হ্যাঁ, লিখছি। তবে আবৃত্তির চর্চাটা কিন্তু তোমার করা উচিত মা। আমি আজই বাবাকে বলছি, দিনে অন্তত একঘণ্টা করে তোমাকে যেন ‘মি-টাইম’ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না,” এক্কেবারে বড়দের মতো করে বললাম কথাগুলো।

“আর জ্যাঠামো করতে হবে না। ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ডাইনিং টেবিলে আয়।”

“আজ কী হয়েছে গো মা?”

“তোর প্রিয়। কিমা পরোটা আর চানা মসালা। জলদি আয়,” স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ‘টোপ’টা দিয়ে আমার রুম থেকে বেরিয়ে গেল মা।

চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের কাছে, ইন্ডিয়ান কফি হাউজে সুমেধা সরকারের মুখোমুখি বসে আরাত্রিকা রায়। আরাত্রিকা সুমেধার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওরা ইয়ার-মেটও বটে। ওদের বন্ধুত্ব সেই ক্লাস ফাইভ থেকে। আরাত্রিকা এখন পড়ে শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে। ওর মেজর ইকনমিক্স। দু’জনেই কলেজ থেকে সোজা এখানে এসেছে। সুমেধা এখানে প্রায়ই আসে। অনেক ক্ষণ ধরে কফি খায় আর বাইরে কাউকে একটা দেখে। এই প্রথম সুমেধা অন্য কারও সঙ্গে এখানে এসেছে। আজ এক প্লেট ফিশ ফিঙ্গার, দুটো চিকেন আফগানি ও দুটো হট কফি অর্ডার করেছে সুমেধা।

খাবার এখনও সার্ভ করা হয়নি। আরাত্রিকা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। বলল, “এত জরুরি তলব দিয়ে যখন ডেকে পাঠালি, তখন সেটা বলার জন্য এত সাসপেন্স কেন ক্রিয়েট করছিস তুই? আমার কিন্তু এ বার বিরক্ত লাগছে সামু।”

সুমেধা হাতঘড়িটার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, “এত ক্ষণ যখন ওয়েট করেইছিস, তখন আর একটু না হয় কর। বেশি আগে থেকে বললে, তুই প্রশ্নের পর-প্রশ্ন করে যাবি আর সব কেঁচিয়ে দিবি। এই তো, আমাদের খাবার চলে এসেছে!”

বৃদ্ধ ওয়েটার টেবিলের উপর প্লেটগুলো নামিয়ে বললেন, “আর কিছু লাগলে বোলো মা।”

সুমেধাকে এখন উনি চিনে গিয়েছেন।

“নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ,” ওয়েটারকে বিদায় জানিয়ে একটা ফিশ ফিঙ্গার হাতে তুলে নেয় সুমেধা। তাড়া দেয় আরাত্রিকাকে, “ওরে নে,

ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ভাল লাগবে না।"

"সামু, এটা কী ইয়ার্কি হচ্ছে বল তো? এলগিন রোড থেকে আমাকে টেনে আনলি চাঁদনি চকে। তুই তো এখান থেকে মেট্রো ধরে টুক করে বাড়ি চলে যাবি। আমাকে বাস ধরে ফিরতে হবে কেষ্টপুর। কত সময় লাগবে জানিস? আসল কথাটা না বলে তখন থেকে খালি হেঁয়ালি করে যাচ্ছিস!" একটু বিরক্ত হয় আরাত্রিকা।

"আচ্ছা বেশ, শোন। আমাদের হাতে আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ মতো সময় আছে। তোকে আমার একটা উপকার করতে হবে।"

"তা সেটা এত ক্ষণ বলতে কী হচ্ছিল? তুই না সামু! আমি ভাবলাম কী না কী বলবি!"

"উপকারটা খুব সামান্য নয় আরু। তোর এই উপকারের উপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে," হাতে ধরা ফিশ ফিঙ্গারের বাকি অংশটা মুখের ভিতর চালান করে একটা টিস্যু পেপার হাতে নেয় সুমেধা।

"আচ্ছা বল, শুনি।"

"শোন, একটু পরে বাইরের ওই চায়ের দোকানটায় একটা ছেলে এসে দাঁড়াবে। রোজকার অভ্যেসমতো ওখানে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে একটা চা খাবে। তার পর একটা সিগারেট ধরাবে। যেই ও সিগারেট ধরাবে, আমাদের অ্যাকশন শুরু হবে।"

আরাত্রিকা গোল-গোল চোখ করে বলে, "অ্যাকশন! মারধর করবি নাকি? এই সামু, তোর মতলবটা কী বল তো?"

"উফ, তুই না বড্ড বাজে বকিস। একটু শোন না মন দিয়ে।"

"আচ্ছা বল..."

"আমি আর তুই হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ব ওর সামনে। ছেলেটা আমার দিকে তাকালেই আমি বলব, 'আরে সৌজন্যদা, তুমি! তুমি এখানে!' ছেলেটা তার পর নিশ্চয়ই কিছু একটা বলবে। তোর ওসব শোনার দরকার নেই। তুই শুধু একটু ন্যাকামি করে সুর টেনে বলবি, 'ও! তা হলে এই তোর সৌজন্য! হুমম...' একটু রহস্য রেখে বলবি, ব্যস। এটুকুই।"

"কী করতে চাইছিস সামু? আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!"

"তোকে এখন আর কিচ্ছু বুঝতে হবে না, পরে সব বুঝিয়ে বলব। নে, এখন তাড়াতাড়ি এগুলো শেষ কর তো। সময় কিন্তু হয়ে এল," কফির কাপে চুমুক দিয়ে সুমেধা বলল, "ইস, এক্কেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে!"

১৫

""নাটমন্দিরে পুজোর সুর, আমার প্রাণের নিশ্চিন্তপুর', কেমন লাগছে রে শুনতে?" সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল সৌজন্যদা।

"এটা কী গো? তোমার লেখা কবিতা?" বোকা-বোকা মুখে প্রশ্ন করে বিম্বো।

"আমারই লেখা, তবে কোনও কবিতার লাইন নয়। এটা এ বার আমাদের পুজোর থিম!"

রুঘুদা বলল, "ভাই, জানিসই তো আমরা একটু কম বুঝি। একটু ভেঙে বলবি?"

গল্পের গন্ধ পেয়ে যথারীতি ফোনের ভয়েস রেকর্ডারটা অন করে দিয়েছে বিলুদা।

"বলছি," বলে হাতে ধরা রোল করা কাগজটা ক্লাবের সেন্টার টেবিলটার উপর মেলে ধরল সৌজন্যদা। আমরা দেখলাম একটা অসাধারণ ছবি। একটা গ্রাম্য পরিবেশ। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা বিরাট বড় বট গাছ, সেটাকে ঘিরে একটা বড় বেদি। বট গাছের চার দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চারটে আটচালা মতো। সেখানে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে আছেন কিছু মানুষ। বটগাছটার সোজাসুজি, একটু দূরে অনেকটা বড় আর একটা আটচালা। তার পাশে একটা ছোট্ট পুকুর, তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকটা হাঁস!

"বিষয়টা হল, এ বার শ্রীপল্লির মাঠে আমরা তুলে আনব আমাদের স্বপ্নের একটা গ্রাম। বলতে পারিস এটা আমার নস্টালজিয়ার একটা প্রতিফলন," বলতে শুরু করল সৌজন্যদা, "যে জিনিসগুলো প্রায় হারিয়ে গিয়েছে— মানে ধর আমাদের গল্প শোনানোর সেই বুড়োদাদুরা, কিংবা ঠাকুরমার হাতের নকশিকাঁথা, কিংবা খুব দুপুরে ঢুগঢুগি বাজিয়ে ঘাড়ে একটা বাক্স নিয়ে বায়োস্কোপওয়ালাদের আনাগোনা, অথবা ধর গ্রামের বুড়ো মানুষদের নিখাদ আড্ডা— এই চারটে আটচালায় আমরা তুলে আনব এ রকম কিছু সিচুয়েশন। এই যে বড় আটচালাটা, এটা আসলে একটা নাটমন্দির, গ্রামে যে-রকম থাকে। সারা বছর এই নাটমন্দিরেই হয় সব পুজো-পার্বণ। নাটক-যাত্রা— নানাবিধ অনুষ্ঠান। বলতে পারিস, গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হল এই নাটমন্দির। কোনও প্যান্ডেল নয়, আমাদের পুজোটা হবে এই নাটমন্দিরেই। ছিমছাম একচালার ঠাকুর।"

আমরা সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছি সৌজন্যদার কথা। ও বলে চলে, "আটচালা বল বা নাটমন্দির, সব কিছুরই হবে মাটির দালান, খড়ের চাল। দেওয়ালগুলো আমরা বানাব চট দিয়ে, তার উপর থাকবে মাটিগোলা প্রলেপ। তাতে খরচ অনেকটা কমে যাবে..."

গ্রাম আমরা কেউই খুব একটা দেখিনি। কিন্তু সৌজন্যদা এত সুন্দর করে পুরো ব্যাপারটা বলছে, আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের শ্রীপল্লির এই মাঠটা যেন রূপান্তরিত হয়েছে একটা অপরূপ সুন্দর গ্রামে। যেখানে নেই কোনও অশান্তি, ঝুটঝামেলা। আছে শুধু অপার শান্তি আর ভাল লাগা। এ রকম একটা গ্রামের নাম 'নিশ্চিন্তপুর' ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

বিম্বো বলল, "আটচালাগুলোতে কি সত্যিকারের মানুষ থাকবে? মানে সত্যিই কোনও গল্পদাদু বসে গল্প শোনাবে?"

'গুড কোয়েশ্চেন বিম্বো," বলল সৌজন্যদা, "ওটা করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তাতে খরচটা অনেক বেড়ে যাবে রে। এক-একটা আটচালায় অন্তত চার-থেকে পাঁচজন করে জুনিয়র আর্টিস্টের প্রয়োজন এবং সেটাও অন্তত দুটো শিফ্টে। তার মানে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ জন মতো আর্টিস্টের পাঁচ দিনের পেমেন্ট, তার উপর তাদের থাকা-খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। তাই এগুলো সবই মূর্তি দিয়েই করতে হবে। তবে চিন্তা করিস না, সেগুলো এতটাই রিয়েলিস্টিক হবে, মনে হবে সত্যিই কোনও মানুষ স্ট্যাচু হয়ে বসে আছেন! তবে হ্যাঁ, পুকুরে যে হাঁসগুলো চরে বেড়াবে, সেগুলো কিন্তু হবে সব আসল।"

"অনবদ্য ভেবেছিস ভাই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা বল, ছবি দেখে কিংবা তোর কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে, এই বট গাছটাকে ঘিরেই যা-কিছু রয়েছে গ্রামে। কিন্তু আমাদের এই মাঠের মধ্যে বট গাছটা কোথা থেকে আসবে? আর বট গাছটা না থাকলে পুরো ভিসুয়ালটাই তো অন্যরকম হয়ে যাবে..." বলল রঘুদা।

সৌজন্যদা মুখে একটা স্বস্তির হাসি ফুটিয়ে বলল, "ডোন্ট ওরি ব্রাদার। সে ব্যবস্থাও আছে। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আমতলার ওদিকে বেশ কিছু বড়-বড় নার্সারি আছে, যারা এই ধরনের বড় গাছ সাপ্লাই করে। মানে আস্ত বট গাছ কিংবা অন্য যা গাছ চাই, ওরা ট্রাকে করে তুলে এনে বসিয়ে দেবে। আবার আমাদের কাজ হয়ে গেলে, ওরাই এসে সেই গাছ তুলে নিয়ে চলে যাবে। আমাদের কাজ হবে, ওই ক'টা দিন নিয়ম করে জল দিয়ে গাছগুলোকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা..."

জিকো বলল, "আস্ত বট গাছ এনে বসিয়ে দেবে! এ রকম হয় নাকি!"

"না হলে আর বলছি কী?" আশ্বাস দেয় সৌজন্যদা, "একটা ছোট্ট ধানখেতও বানিয়ে দেব, বুঝলি?"

বট গাছ, ধানখেত, পুকুর... তাতে চরে বেড়াচ্ছে হাঁস— আশ্চর্য আমরা বাকিরাও যে হইনি, তা তো নয়। তবে ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তা হলে কিন্তু সকলে চমকে যাবে। সৌজন্যদা আরও বলল, "গ্রামটা রিয়েলিস্টিক করতে আরও বেশ কিছু ছোট-বড় গাছ লাগবে, সেগুলো সবই ওখান থেকে নিয়ে আসব। ক্যারিং কস্টটা যখন একই লাগবে, তখন আর খান ছয়-সাতকে গাছ আনতে অসুবিধে কী?"

বিলুদা বলল, "কিন্তু সৌজন্য, তুই যা বলছিস এ তো বিশাল ব্যাপার! বাজেটটা ঠিকমতো করেছিস তো ভাই? সেদিন মিটিংয়েই তো তপনদা সাফ বলে দিল, গত বছরের ঘাটতি নাকি ছিল তেইশ হাজার টাকা। তার মধ্যে প্রেসের কাকুই পায় চোদ্দো হাজার টাকা। প্রেসের টাকাটা তো সকলের আগে মেটাতে হবে রে, না হলে তো উনি এ বছরের কাজে হাতই দেবেন না! আর বিল বই ছাপা হয়ে না এলে, চাঁদা তোলাও তো শুরু করা যাবে না।"

"তা ছাড়া এই এত আটচালা, নাটমন্দির, ঠাকুর, এত অন্যান্য মূর্তি, সেসব গড়বে কে? যদি কাউকে পাস-ও, সে-ও তো অনেক টাকা নেবে..." পুটাইদার প্রশ্নটা আমার মনেও ঘুরছিল।

"ক্যাচটা তো এখানেই!" হাতে তালি দিয়ে বলে সৌজন্যদা, "তোদের কী মনে হয়, এই পুরো ব্যাপারটা নামাতে কত খরচ হতে পারে?"

রঘুদা একটু মিনমিন করে বলল, "আমার তো ধারণা লাখ আট-দশেকের নীচে এ জিনিস নামবে না!"

সৌজন্যদার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি! ভাবখানা এমন, যেন এই পুরোটা তার অর্ধেকেরও কম টাকায় নামিয়ে দেবে!

"আমার এক ছোটবেলার বন্ধু আছে, বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ প্রধান। আমার বিক্রমগড়ের বন্ধু। ওখানকার একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ায়। অসাধারণ স্কাল্পটর। একটু ঘরকুনো, বড্ড বেশি লাজুক। আমাদের গ্রামের স্কুলের মাঠের পুজোর মূর্তিটা প্রতি বছর ও আর ওর ভাই মিলে গড়ে। সে মূর্তির যে কী রূপ, তা তোরা ভাবতেও পারবি না। গ্রামে ওর একটা ছোট্ট স্টুডিয়ো আছে। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই ওর ওখানে কাটে। নিজের মনে কাজ করে আর গ্রামের বাচ্চাদের ও আগ্রহী কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের স্কাল্পটিং শেখায়। বিনা পারিশ্রমিকে। ওদের হাতের কাজ দেখলে না তোদেরও মনে হবে, ইস এরা যদি শহুরে কাজ করতে পারত! একটু এক্সপোজ়ার পেত!" এত দূর বলে, চুপ করে যায় সৌজন্যদা। যেন মুহূর্তে ও চলে গিয়েছে এখান থেকে একশো পঁচাশি কিলোমিটার দূরে, ওর গ্রামের বাড়িতে।

সৌজন্যদাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিম্বো একরাশ উত্তেজনা গলায় নিয়ে বলে ওঠে, "আচ্ছা, আমরা তোমার ওই বন্ধু বিশ্বজিৎদাকে দিয়ে আমাদের এ বারের পুজোর কাজটা করাতে পারি না?"

হেসে ফেলে সৌজন্যদা। জিকো খুব গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, "কী অসাধারণ ভেবেছিস রে বিম্বো! এটা তো আমাদের কারও মাথায় এল না!"

হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা সকলে।

সৌজন্যদা বলল, "অ্যাই, তোরা সকলে কেন ওর পিছনে লাগছিস বল তো! ও তো সরল মনেই কথাটা বলেছে। আসলে কী জানিস, এই সারল্যটাই তো আজকালকার দিনে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে রে..."

"ও সরল না গো, একটা আস্ত গাধা," বলে ওঠে ভুটুন, "সেদিন কী করেছে জানো? কে একটা ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছে, 'হ্যালো, আর ইউ সপ্তাংশু?' তার উত্তরে বিম্বো বলেছে, 'যা শালা! সপ্তাংশু তো আমার নাম। তোমার নামও সপ্তাংশু নাকি!'"

আবার একপ্রস্থ হেসে উঠলাম আমরা সকলে!

"আচ্ছা শোন, কাজের কথাটা শেষ করে নিই," আমাদের ট্র্যাকে ফেরাতে বলল সৌজন্যদা, "কাল রাতে আমি বিশ্বজিৎকে ফোন করেছিলাম। ওকে বললাম পুরো আইডিয়াটা। আমি এখানে এক টুকরো বিক্রমগড় তুলে আনতে চাইছি জেনে, ও খুব খুশি হয়েছে। নিজে থেকেই বলেছে, 'সাম্য, এটা আমাকে বানাতে দিবি?' আমি এ রকমই একটা কিছু উত্তর ওর কাছ থেকে আশা করছিলাম। কারণ, বিশ্বজিতের থেকে ভাল আর কেউ এটা এগজ়িকিউট করতে পারবে না। কিন্তু সমস্যাটা হল, রেমুনারেশন নিয়ে ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যাবে না। প্রসঙ্গটা তুললে, ও হয়তো আসতেই চাইবে না। সেক্ষেত্রে আমি একটা বাজেট ভেবেছি, তবে পুরোটাই নির্ভর করছে তোদের মতামতের উপর..."

"আরে বল না রে বাবা..." অধৈর্য হয়ে বলে রঘুদা।

"দ্যাখ, এই কাজটা নামাতে বিশ্বজিতের সঙ্গে আরও অন্তত পাঁচ থেকে ছ'জনকে ওর লাগবে। তাদের সকলকে ও আমাদের গ্রাম থেকেই নিয়ে আসবে। ঠাকুরের মূর্তি গড়া, অন্যান্য হিউম্যান স্ট্রাকচার, আটচালা বানানো, খড় ছাওয়া, আলপনা দেওয়া— সব ওরাই করবে। বিশ্বজিতের জন্য আমি ধরেছি চল্লিশ হাজার টাকা, ওর সঙ্গে যারা থাকবে তাদের প্রত্যেকের জন্য সাত থেকে দশ হাজার টাকা করে। মানে, নব্বই থেকে পঁচানব্বই হাজার টাকার মধ্যে আমাদের এই পার্টটা কমপ্লিট। এ বার থাকে র-মেটিরিয়াল। সেটাও জাস্ট ওই মাটি, খড়, চট, কিছু ইট, বাঁশ আর রং। বাঁশটা আমরা কল্যাণদার কাছ থেকেই ভাড়ায় নেব। আই মিন, স্ট্রাকচারগুলো বানানোর দায়িত্ব ওকেই দেব। সেটা কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে হয়ে যাবে। বাকি মেটিরিয়ালে আমার মনে হয় না চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি খরচ হবে! তা-ও আমি হায়ার সাইড ধরেই বলছি।"

"তার মানে তুমি এত যা কিছু বললে, সেগুলো স-অ-ব এক লক্ষ সত্তর-আশি হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে!" বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে আমার।

"না, সব হবে না। আর তিনটে খরচ ধরতে হবে। একটা ওই গাছের ভাড়া এবং ট্রান্সপোর্টেশন, সেটা কুড়ি হাজার মতো ধরে চল, দুই বিশ্বজিৎদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার খরচ এবং তিন, আলোকসজ্জার টাকা। সেটাও নেহাতই সামান্য, কারণ এই থিম ফুটিয়ে তোলার জন্য কম আলোই আমাদের প্রয়োজন। ব্যস, এর বাইরে আমি তো আর কিছু দেখছি না!"

"ব্রিলিয়ান্ট সৌজন্য, ব্রিলিয়ান্ট!" দুই হাতে তালি দিয়ে উঠল রঘুদা, "আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি, এই পুরো ব্যাপারটা এত কম টাকায় হতে পারে। কিন্তু তুই যা হিসেব দিলি— জাস্ট মাইন্ডব্লোয়িং ভাই!"

বিলুদা সোফা ছেড়ে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল সৌজন্যদাকে। বলে উঠল, "কোথায় ছিলে ওস্তাদ! এতদিন কোথায় ছিলে!" আবেগের চোটে থরথর কর কাঁপছে বিলুদা। তার পর নিজেকে একটু সামলে

নিয়ে বলল, ''বিশ্বজিৎদেরকে ফোন করে ইমিডিয়েটলি কনফার্ম কর। ভাই, এ বার আমাদের চল্লিশতম বর্ষ। এমন ধামাকা দেব না, সব্বার বোলতি বন্ধ হয়ে যাবে!''

সৌজন্যদাকে ছেড়ে এ বার ক্লাবের উত্তর দিকের জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রঘুদা। ওখান থেকে সরাসরি দেখা যায় তপনদাদের বাড়িটা। সেদিকে তাকিয়ে, জানালার রডগুলো ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বিলুদা বলতে লাগল, ''দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি রে ব্যাটা তপন তরাই... দেখ শালা, কী করতে পারি আমরা!''

রঘুদার কথায় আমাদের খেয়াল হল, সত্যিই তো, এ বার আমাদের চল্লিশতম বর্ষ! ভাল বছরে পুজোটা হাতে নিয়েছি তো আমরা!

১৬

প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে! চাঁদা তোলা শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। হাতে সময় খুব কম। রোজ সন্ধেবেলা দল বেঁধে বেরোচ্ছি আমরা। আফিস-কলেজ-টিউশন যে যার কাজ সেরে সকলে সাড়ে সাতটার মধ্যে জমায়েত করছি ক্লাবের সামনে, তার পর দুটো দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ছি। দুটো দলের মধ্যে একটার নেতৃত্বে সৌজন্যদা-পুটাইদা, তাদের দায়িত্ব মাঠের সেন্টার পয়েন্ট থেকে পাড়ার পূর্ব দিকের সব ফ্ল্যাট-বাড়ি এবং বড় রাস্তার উপরের দোকানগুলো। অন্য দলটার নেতৃত্বে রঘুদা ও বিলুদা। ওদের দায়িত্ব পশ্চিম দিকটার। বলা বাহুল্য, আমি সৌজন্যদাদের দলে। সুমেধাদের বাড়িটাও তো ওই দিকেই...

সৌজন্যদার কথা বলার মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্মোহনী ব্যাপার আছে... ওর সঙ্গে কয়েক দিন চাঁদা তুলতে বেরিয়ে সেটা আরও টের পেলাম। পাড়ার বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই ওর সে ভাবে আলাপ নেই। পাড়ায় দীর্ঘ দিন থাকার সুবাদে আমাদের হয়তো কিছুটা মুখ চেনা। আবার নতুন-নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে পাড়াটা ভরে ওঠায় অনেক মুখ আমাদেরও অচেনা। কিন্তু তাদেরও সৌজন্যদা যে ভাবে চাঁদার জন্য অ্যাপ্রোচ করছে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দাদা, মাসিমা, জেঠু, মেসোমশাই— যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেই সম্বোধন দিয়ে শুরু করে বলছে, ''নমস্কার, আমরা এই পাড়া থেকেই আসছি। আমাদের একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে। আসলে এ বছর আমরা এই পাড়ার পুজোটাকে নিয়ে একটু অন্য রকম ভাবে ভাবছি। তাই গত বছর যা চাঁদা দিয়েছেন, তার থেকে দয়া করে যদি একটু বাড়িয়ে দেন, খুব ভাল হয়।''

জানি না, তপনদার দলবল অনুরোধ করত, নাকি জোরজুলুম। তবে সৌজন্যদার কথায় সকলেই যা বলছেন তার সারবত্তা এই, ''দ্যাখো বাবা, তোমাদের কথায় এ বছর চাঁদাটা আমরা একটু বাড়িয়ে দিতেই পারি। কিন্তু পরের বছর আবার ওটাই আমাদের নামের পাশে 'মিনিমাম অ্যামাউন্ট' হয়ে যাবে না তো?'' সেসব ক্ষেত্রে সৌজন্যদা গলাটা আরও নরম করে বলছে, ''যদি আমাদের প্রচেষ্টা আপনাদের মনের মতো না হয়, তা হলে কথা দিচ্ছি, যে টাকা আপনারা সাধারণত দেন, আগামী বছর তার থেকে এই বাড়তি চাঁদাটুকু কেটে নিয়েই দেবেন। আপনি চাইলে বিলের পিছনে আমরা সেটা লিখেও দিতে পারি।''

স্বাভাবিক ভাবেই এর পর অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে, ''না-না বাবা। তোমরা মুখে বলছ, এতেই আমরা ভরসা করছি। তা তোমাদের সব ক'টা মুখই তো প্রায় নতুন দেখছি— ভাল-ভাল।''

অনেকে তখনই চাঁদাটা দিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বলছেন, ''মাস পড়লে নিয়ে যেয়ো,'' কেউ বলছেন, ''চাঁদা তুলে এখনকার দিনে কী আর পুজো হয়! স্পনসর জোগাড় করো। বড় স্পনসর ছাড়া ভাল কিছু করা খুব কঠিন।''

সৌজন্যদা তাঁদের প্রত্যেককেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছে, ''আপনারা প্লিজ় এ বার পুজোর সময় মাঠে আসবেন... আপনাদের পুজো, আপনারা না এলে সেটা কি সম্পূর্ণ হয়?''

মনে হয় না, এর আগে কেউ কখনও ওঁদের এভাবে পুজোর সময় মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তো বলেই দিলেন, ''তুমি এ ভাবে বললে, বড় ভাল লাগল বাবা। আমরা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, ওটা আমাদেরও পুজো। ভাবতাম, চাঁদা দেওয়াটুকুই বুঝি আমাদের কর্তব্য! জানো, দশ বছর হয়ে গেল এ পাড়ায় আছি। পুজোর প্রসাদের একটা ফলের টুকরোও কেউ কখনও হাতে তুলে দেয়নি!''

অভিমান জমতে-জমতে সেটা সত্যিই যেন পাহাড় হয়ে গিয়েছে। সৌজন্যদা পুরনো প্রসঙ্গে না ঢুকে, ভদ্রলোকের দুই হাত চেপে ধরে শুধু বলল, ''এ বার মণ্ডপে আসুন মেসোমশাই। খুব ভাল লাগবে। আর অষ্টমীর ভোগ কিন্তু এ বার আমরা বাড়িতে-বাড়িতে এসে দিয়ে যাব।''

ভদ্রলোকের চোখের কোণটা কি একটু চিকচিক করে উঠল?

অনেক ক্ষেত্রেই পাড়ার পুরনো বাসিন্দারা আমাকে চিনতে পারছেন, কখনও বিল্টোকে কখনও বান্টিদাকে, কখনও পুটাইদাকে। তাদের সকলের সঙ্গে সৌজন্যদার আলাপ করিয়ে দিয়ে পুটাইদা বলেছে, ''জেঠু, ও হল সৌজন্য। আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছে। পুজোর থিমটা এ বার ওর-ই করা।'' সঙ্গে ট্যাগলাইনের মতো জুড়ে দিচ্ছে,''ক'দিন আগে যে ফুটবল টুর্নামেন্টটা হল না, সেটাও কিন্তু ওর-ই উদ্যোগে।''

সকলেই প্রাণ ভরে আমাদের নতুন উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাড়ছে বাড়ি প্রতি চাঁদা আদায়ের গড়।

তবে সকলেই তো আর সমান নন! চাঁদা তুলতে গিয়ে প্রায় রোজই নতুন-নতুন ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি আমরা। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। একদিন এক ভদ্রলোক তো বেজায় খেপে গেলেন, আমরা 'পাঁচশো টাকা' চাঁদা চেয়েছি বলে। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশি-র গোড়ায়। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, ''বাড়ি পিছু দু'টাকা চাঁদায় আমরা একসময় কী পুজো করেছি জানো? ঠিক উল্টো দিকের পাড়ায়, ওই আদি শ্রীপল্লির মাঠে, তখন এখানে ওই একটাই পুজো হত... পাঁচদিন ধরে লোক খাওয়াতাম আমরা...''

বান্টিদা এমনিতেই ফক্কড় টাইপের। গলাটা খুব গম্ভীর করে বলল, ''তা দাদু, আপনার নামে তা হলে ওই দু'টাকাই লিখি, নাকি?''

ভদ্রলোক আরও খেপে গেলেন, ''ঠ্যাংড়ামো করছ তুমি আমার সঙ্গে? এই ছোকরা, তুমি কী করো গো?''

বান্টিদা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, ''এস কে রিয়েলিটিতে কাজ করি দাদু।''

''কী বলছ! আরে ওটা তো মিস্টার ঝা-র কোম্পানি। আমি দীর্ঘদিন ওদের অডিট করেছি। তা তুমি ওখানে শেখর মিত্তল-কে চেনো? আমার খুব বন্ধু মানুষ।''

বান্টিদা এ বার একটু ঘাবড়ে গিয়েছে। বুড়ো তো সত্যিই চেনে ওখানকার লোকজনকে। কিন্তু শেখর মিত্তল— বান্টিদা গলায় একরাশ দুঃখ নিয়েই খবরটা দিল ভদ্রলোককে, ''দাদু, উনি তো গত বছর মারা গিয়েছেন। সিরোসিস অফ লিভার...''

বান্টিদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক বললেন, ''ওঁকে গিয়ে বোলো আমার কথা। বোলো, জনার্দন পাকড়াশির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। এবং তুমি আমার পাড়ায় থাকো। দেখবে তোমার খাতিরটা...''

বান্টিদা তা-ও ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ''দাদু, উনি তো এখন আর নেই! না ফেরার দেশে চলে গেছেন...''

''ঠিক আছে, ফিরলে বোলো।''

খবরটা মৃত্যুর হলেও, আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারিনি!

এ রকমই এক সন্ধেয় ঘটল ঘটনাটা। তপন তরাই ও তার ভাইপো তন্ময় এসে যোগ দিল আমাদের দলটায়। তখন আমরা সবে ক্লাবের

সামনে থেকে বিল বই হাতে বেরোনোর তোড়জোড় করছি। তপনদা এসে খপ করে ধরে ফেলল সৌজন্যদার হাতগুলো, তার পর বলল, ‘‘ভাই সৌজন্য, তুমি কোনও কথা বললে আমি কি আর না করতে পারি! তাই চলেই এলাম।’’

আমরা সকলেই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। সকলের মনেই বোধ হয় উঁকি মারছে ওই একটাই প্রশ্ন, সৌজন্যদা আবার তপন তরাইকে কী অনুরোধ করল? আমাদের মুখগুলোর অবস্থা দেখে তপনদা নিজেই বলতে লাগল, ‘‘সৌজন্য কিন্তু ঠিকই বলেছে, কমিটিতে নেই তো কী হয়েছে, তাই বলে কি পুজোতে থাকতে নেই! আজ থেকেই আমি তোমাদের সঙ্গে বেরোব সৌজন্য। তন্ময়ও থাকবে। আর এই যে তুমি দুটো দলে দায়িত্বটা ভাগ করে দিয়েছ না, এটা কিন্তু দারুণ করেছ। কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।’’

এ-যেন ভূতের মুখে রাম-নাম। সৌজন্যদা আর কথা বাড়াল না। বলল, ‘‘তপনদা, তোমাকে তো সেই ফুটবল টুর্নামেন্টের সময় থেকেই বলছি, তুমি আমাদের পাশে থেকো। তুমিই তো আমাদের কেমন পর-পর ভাবছিলে! বেশ, চলো। আর কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, কাজে নেমে পড়ি।’’

তার পর গলা তুলে বলল, ‘‘রঘু-বিলু, আমরা এগোলাম রে। সাড়ে ন’টায় এখানেই দেখা হচ্ছে।’’

সৌজন্যদা যতটা সহজে তপনদাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল, আমরা কেউই সেটা মন থেকে পারছি না। আর রঘুদা ও বিলুদার মুখ দেখে তো বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওরা রীতিমতো বিরক্ত তপনদার এই গায়ে-পড়া হাবভাব দেখে। অগত্যা একটা লোক নিজে থেকে এগিয়ে এসে হাত মেলাচ্ছে আমাদের কাজে, তাকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করা যায়!

কিন্তু তা-ও... তপনদার ভাবগতিকের মধ্যে যেন একটা আঁশটে গন্ধ। সৌজন্যদা ছাড়া মনে হয় আমরা সকলে সেটা টের পাচ্ছিলাম।

১৭

বিশ্বজিৎদা ওর দলবল নিয়ে এসে গিয়েছে তিনদিন আগে। ওরা মোট সাতজন এসেছে। লোকগুলো যে কী ভাল! আর কী সুন্দর কথাবার্তা... বিশ্বজিৎদাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে ক্লাবের দোতলাতেই। কল্যাণদার কাছ থেকে ভাড়া করা হয়েছে বিছানা, বালিশ, মশারি। ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে অক্ষয় কেবিন-এ। মাঠে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে শুরু হয়ে গিয়েছে কাজ। হাতে আর মাত্র আটাশ দিন! ১৪ অক্টোবর ষষ্ঠী। আমার শুধু আশঙ্কা হচ্ছে, পুরো কাজটা এর মধ্যে শেষ হবে তো?

সকাল সাড়ে আটটা। সুমেধা আর আমি এখন বিশ্বজিৎদাদের কাজের ছোট্ট-ছোট্ট ক্লিপিং সংগ্রহ করছি। বিশ্বজিৎদার একটা ছোট্ট বাইটও নিল সুমেধা। এবং ওই সময়টুকুতেই আমরা বুঝতে পারছিলাম, সৌজন্যদার প্রতি কী অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল এই মানুষটা! ও, আপনাদের বলা হয়নি, সেদিন আমার দেওয়া বার্থডে গিফ্‌টটা সুমেধার খুব পছন্দ হয়েছিল! জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কবিতাটা আমার লেখা কি না!’ আমি মিথ্যে বলিনি কিন্তু, তক্ষুণি বলে দিয়েছি কবির নাম। তবে আমার কী ভাল লেগেছে জানেন? ওই যে ও ভাবল, আমিও এ রকম লেখা লিখতে পারি! তার মানে আমার সম্পর্কে ও বেশ উচ্চ ধারণাই পোষণ করে, তাই না?

সুমেধা ক্যামেরাটা অফ করে সেটা কেসের মধ্যে রেখে, অবাধ্য চুলগুলোকে একটা ক্লাচার দিয়ে আটকে রাখার মাঝে হঠাৎ বলে উঠল, ‘‘আচ্ছা, তোমার যদি কাউকে ভাল লাগে, তা হলে তুমি কী করবে রুবাইদা?’’

সুমেধা কি তা হলে মানসিক ভাবে প্রস্তুত! আনন্দে নেচে উঠল আমার মন। তার মানে কি ও নিজে থেকেই আজ বলবে কথাটা? আমি সামলে নিলাম নিজেকে। গলাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, ‘‘সিম্পল, তাকে ফলো করব আর যথা সম্ভব পাশে-পাশে থাকার চেষ্টা করব।’’

‘‘ফলো করবে, দ্যাটস পারফেক্ট। কিন্তু ধরো যদি তার পাশে-পাশে থাকার সুযোগ তোমার কাছে না থাকে, তা হলে?’’

‘‘এই রে, প্রশ্নটা কেমন যেন সিলেবাসের বাইরে পড়ে গেল!’’ আমার মুখ ফুটে অস্ফুটে বেরিয়ে এল শব্দগুলো।

‘‘কিছু বললে?’’

‘‘না, মানে। পাশে থাকতে পারবে না কেন?’’

‘‘কারণ অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপায় কী?’’

‘‘সেক্ষেত্রে তাকে সরাসরি মনের কথা বলে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না,’’ মনের মধ্যে তৈরি হওয়া লক্ষাধিক বুদবুদগুলোকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রেখে বললাম।

‘‘বলছ?’’ আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সুমেধা।

‘‘একদম। আমার মনের কথা,’’ চোখের পাতা দুটো মুহূর্তের মতো ফেলে, আবার খুললাম। ঘাড় নেড়ে আশ্বস্ত করলাম সুমেধাকে।

‘‘থ্যাঙ্ক ইউ রুবাইদা...’’ আমার দিকে হাত বাড়াল সে।

‘‘ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম সু... সুমেধা,’’ খুব ইচ্ছে করছিল ওকে শুধুই ‘সু’ বলে ডাকতে।

সুমেধা বলল, ‘‘চলো, আমি এ বার বেরোই। কলেজ যেতে হবে।’’

‘‘মানে!’’ বেশ ঘাবড়ে গিয়েছি আমি। এ রকম একটা সিচুয়েশন মাঝপথে বিগড়ে দিয়ে মনে পড়ল কলেজ যাওয়ার কথা! বললাম, ‘‘আর কিছু বলবে না তুমি?’’

সুমেধা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘‘তোমার কলেজ নেই? যাও... ফার্স্ট ক্লাসটা মিস করবে তো না হলে।’’

মাঠ থেকে নেমে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে সুমেধা। আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওর যাওয়ার পথের দিকে। একবারও কি ফিরে তাকবে না আমার দিকে?

বড় দেবদারু গাছটা পেরিয়ে বাঁক নেওয়ার আগে পর্যন্তও মনে হচ্ছিল, একবার নিশ্চয়ই পিছন ফিরে ‘বাই’ বলবে সু।

মিসেস রায়ের বাড়িতে আনাগোনা বেড়েছে পাড়ার বাচ্চাদের। সঙ্গে বাচ্চার মায়েদেরও। পুজোর সময় পাড়ার যে মঞ্চ এতকাল প্রায় সময়ই ফাঁকা পড়ে থাকত, এ বছর সেই মঞ্চে ওঠার জন্য যেন শুরু হয়ে গিয়েছে একটা চাপা প্রতিযোগিতা। বাচ্চাদের মধ্যে যতটা না, তার চেয়ে ঢের বেশি বাচ্চার মায়েদের মধ্যে। সৌজন্যদা বলে দিয়েছে, পাড়ার কোনও বাচ্চা যেন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু প্রতিভার নিরিখে ঠিক হবে, কে কোনও দিন বা কোন সময় স্টেজে ওঠার সুযোগ পাবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শুধু মাত্র মিসেস রায় ও আমার! সেই কারণেই কিনা জানি না, পাড়ার দিদি-বৌদিরা ইদানীং আমাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা আমিও বেশ উপভোগ করছি। তবে আমার চেয়েও বেশ কয়েক গুণ সেটা উপভোগ করছেন মিসেস রায়।

মিসেস রায় ঘোষণা করেছেন, তিনি এ বার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। বলাবাহুল্য, তিনি নিজে হবেন শ্যামা, তা তাঁর নিজের কমপ্লেকশন যতই ফেয়ার হোক না কেন! বাকি চরিত্রগুলোর জন্য এখন চলছে অডিশন পর্ব। যার ফল বেরোবে আগামিকাল। পাড়ার একেবারে বাচ্চাদের নিয়ে হবে নাটক, সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’। নাটকের নির্দেশনার জন্য মিসেস রায় অনুরোধ করেছেন তাঁর প্রিয় বান্ধবী সমাদ্রিতা সেনের স্বামী তৃষিত সেনকে। তৃষিতবাবু নাকি ছোটবেলায় স্কুলে ‘তাসের দেশ’ নাটকে একবার ‘পঞ্জা’র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ‘অয়ি গিরি

নন্দিনী’ নামের একটি নৃত্যালেখ্যও হবে। সেটির নির্দেশনায়, অবশ্যই মিসেস রায়। এবং মূল চরিত্রে তাঁর আর এক প্রিয় বান্ধবী মালবিকা সোম। শুনছি, সেখানে নাকি নিজের মেয়ে পাঞ্চালীর জন্য একটি ভাল চরিত্র রেখেছেন মিসেস রায়। সেখানে উনি স্বয়ং ‘দুর্গা’ হলেও আমি বিশেষ আশ্চর্য হব না। এককথায় স্বজনপোষণের চূড়ান্ত!

হরির লুটের বাতাসার মতো মিসেস রায় অবশ্য আমার দিকেও একখানা ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, “রুবাই, একটা জমাটি বাংলা ব্যান্ড পারফরম্যান্স কিন্তু আমি তোমার নেতৃত্বে দেখতে চাই!”

আমি এখন সেটির জন্য একজন ভাল গিটারিস্টের সন্ধানে আছি। সিন্থেসাইজ়ারে অনেক পার্ট আমি সামলে নিতে পারব, কিন্তু লিড গিটারিস্ট একজন লাগবেই। ড্রামার হিসেবে জিঙ্গো-ই আমার প্রথম পছন্দ। এই ব্যান্ডের পার্টটুকু বাদ দিলে, আর কোনও কিছুতেই আমাকে বিশেষ জড়াতে চাইছেন না মিসেস রায়। বলছেন, “তোমার তো পুজোসংক্রান্ত অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্যস্ততা, তুমি বরং মন দিয়ে ওদিকটা সামলাও রুবাই। এদিকটা আমি দেখে নিচ্ছি। সৌজন্যকেও বোলো, নিশ্চিন্তে থাকতে।”

সৌজন্যদাকে বলতে গিয়েছিলাম সে কথা, ও তখন বিশ্বজিৎদার সঙ্গে নাটমন্দির নিয়ে কোনও একটা গভীর আলোচনায় মগ্ন। সবটা শুনে বলল, “সব নোট রাখিস, পুজোর পরে বসব। আপাতত একটু মানিয়ে-গুছিয়ে নে।”

পাড়ায় মিসেস রায়দের দশ-বারো জনের একটা গ্রুপ আছে। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি, ওদের গেটটুগেদার লেগেই থাকত। মিসেস রায় সেই গ্রুপের মধ্যে একটু প্রভাবশালী। তাঁর নেতৃত্বের অন্যতম প্রতিযোগী, বিএএলআরও ব্রতীন চক্রবর্তীর স্ত্রী, সোমদত্তাবৌদি। পুজোর মিটিংয়ে মিসেস ঊষসী রায়ের নামটা কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে নির্ধারিত হওয়ার পর থেকেই যেন একটু কমেছে এই গ্রুপের গেটটুগেদারের সংখ্যা। সোমদত্তাবৌদিকে ইদানীং বেশ কয়েক বার দেখা গিয়েছে তপনদার স্ত্রী অনিন্দিতাবৌদির সঙ্গে। পাড়ার মধ্যে সদ্য গজিয়ে ওঠা কফি শপটায়। এটা আমরা জানতাম না। সেদিন জিঙ্গো এসে খবরটা দিল। তার মানে কি দানা বাঁধছে অন্য কোনও ইকুয়েশন?

১৮

“পুজোর সময় ভূরিভোজ! ভদ্রলোক আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ দেননি, কী বলিস পুটাই?”

“কোন ভদ্রলোক? আবার কী আইডিয়া দিল তোকে?” রঘুদা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

পুটাইদার চোখেও প্রশ্ন, কোন আইডিয়ার কথা বলছে সৌজন্যদা?

“আরে, ওই পাকড়াশি ভদ্রলোক। বললেন না, পুজোর সময় পাঁচ দিন পাত পেড়ে খাওয়াতেন লোকজনকে...”

“ওর ঢপের চপ, তুইও খেলি! পারিসও বাবা!” পুটাইদার গলায় বিরক্তি স্পষ্ট।

“না রে, পুরোটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। ইন ফ্যাক্ট, ওটাও কিন্তু হতে পারে আমাদের পুজো কমিটির আয় বাড়ানোর একটা উৎস!” সৌজন্যদার গলায় সেই চেনা আত্মবিশ্বাস, “বিল্টো, হরিদাকে বল তো... আমরা ক’জন আছি... এক, দুই, পাঁচ, সাত, এগারো, ” আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমাদের মাথাগুলো কাউন্ট করে সৌজন্যদা বলল, “এগারোটা চা দিতে বল। সঙ্গে ওই ঝাল-ঝাল লাঠি বিস্কুটটা। আর ওই শোন, টাকাটা নিয়ে যা।”

“আরে টাকা দেওয়ার কী আছে? বিল্টো, হরিদাকে বল, পুজো কমিটির অ্যাকাউন্টে লিখে রাখতে,” বলে উঠল রঘুদা।

“রঘু প্লিজ়, এই ভুলগুলো আমরা অন্তত করব না। পুজো কমিটির একটা টাকাও আমরা নিজেদের পিছনে খরচা করব না। তা হলে তপন তরাইদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা কী রইল?”

“আরে বাবা, আমরা কি মণ্ডা-মিঠাই খাচ্ছি নাকি! তা ছাড়া এটা তো পুজোর মিটিং চলছে। সেখানে চা-বিস্কুটও কি আমরা নিজেদের টাকায় খাব নাকি?” যুক্তি সাজায় রঘুদা।

পুটাইদা বলল, “রঘু, তোর কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় সৌজন্যর কথাটাও ফেলে দেওয়ার নয়। আমরা তো সত্যিই পুজোর টাকায় মণ্ডা-মিঠাই খেতে যাচ্ছি না। তাজপুরও যাব না। তা হলে এই সামান্য চা-বিস্কুটটুকু খেয়ে একবালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা-ই বা ফেলতে যাব কেন?”

রঘুদা চুপ করে যায়। কথাটা ওর মনে ধরছে। বলে, “ভূরিভোজের ব্যাপারটা কী বলছিলি সৌজন্য? আর ওখান থেকে কমিটির ইনকামের ব্যাপারটা...”

“দ্যাখ, পুজোর সময় আমাদের মা-কাকিমা-বৌদিদেরও কি রান্না করতে ইচ্ছে করে? ওঁদেরও তো মনে হয় যে, পুজোর ক’টা দিন রান্নাঘর থেকে ছুটি পেলে কী ভালই না হত!” সৌজন্যদা বলতে শুরু করে, “ধর, এই পুজোর চারটে দিন দুপুর ও রাতের খাবারটা আমরা যদি এখানে ব্যবস্থা করি? নবমীর দিন পাড়ার সকলকে তো এমনিতেই পাত পেড়ে খিচুড়ি, ছ্যাঁচড়া, চাটনি, পাঁপড়, পায়েস খাওয়ানো হয়। তপনদারাও সেটা করে গিয়েছে। মানে, ট্র্যাডিশনটা ধরে রেখেছিল। এর পাশাপাশি বাকি সাতটা বেলার জন্য আমরা যদি কুপন সিস্টেম করি? প্রত্যেক বেলার জন্য আলাদা-আলাদা মেনু করলাম, তার পর ক্যাটারারের কাছ থেকে সেই প্লেট অনুযায়ী একটা রেট নিলাম। সেই রেটের উপর পার প্লেটে কুড়ি বা পঁচিশ টাকা অ্যাড করে আমরা কুপন ছাপালাম! রান্না করা বা বাজার করার কোনও চাপ আমাদের থাকবে না, আমরা শুধু কুপনটা বিক্রি করার দায়িত্ব নেব। কেউ পুরো সাত বেলার কুপন কাটলে, তাকে না হয় একটা স্পেশ্যাল ডিসকাউন্টও করে দেব। এখান থেকে যে টাকাটা আসবে, সেটা আমরা বিসর্জনের সময় ব্যবহার করতে পারি, যাতে শোভাযাত্রাটাও মনে রাখার মতো হয়। আফটার অল, আমাদের চল্লিশতম বর্ষ বলে কথা! কী বলিস রঘু?” এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রঘুদার দিকে তাকায় সৌজন্যদা।

“চমৎকার আইডিয়া। আই অ্যাম গেম। কুপন বিক্রির দায়িত্ব তুই আমার উপর ছেড়ে দে!” তুড়ি মেরে বলল বিলুদা, “বান্টি, তুই শুধু ভাল করে অ্যানাউন্সমেন্টটা করে দিস!”

রঘুদা বলল, “ব্যস, শুরু হয়ে গেল... তুই একটু থামবি বিলু? সৌজন্য, আমার একটা প্রশ্ন আছে। ফর অ্যান এগজ়াম্পল, ধর আমার পরিবারেই আছে চার জন। এখন এই চার জনের সাত বেলার কুপন কাটতে গেলে তো অনেক টাকা লেগে যাবে! আমার মতো সকলেই নিশ্চয়ই এই হিসেবটা কষবে, তাই না? ক্যাটারারকেও একটা মিনিমাম নাম্বার অফ প্লেটস তোকে এনশিওর করতে হবে। না হলে সে-ই বা পুজোর সময় এই কাজটা নেবে কেন? এ বার দ্যাখ, যদি সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক কুপন আমরা বিক্রি করতে না পারি, তা হলে তো সেই টাকাটা আমাদের কমিটি থেকেই যাবে!”

“একদম ঠিক বলছিস, সেই একটা রিস্ক তো অবশ্যই আছে,” মাথা নাড়ে সৌজন্যদা, “কিন্তু তুই তো চাইলে সকলের জন্য একবেলার কুপনও কাটতে পারিস। সেই অপশন তো থাকছেই। কাকিমা যদি পুজোর সময় একটা বেলাও রান্নাঘর থেকে ছুটি পান, সেটাই বা কম কী? তা ছাড়া পুজোর সময় কিন্তু সকলেরই বাইরে খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকেই। সেই গ্রুপটাকে যতটা সম্ভব কেটার করতে পারলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।” তার পর যোগ করে, “দ্যাখ, তা-ও তোর কথাটা মাথায় রেখেই বলি, সেক্ষেত্রে ক্যাটারারের সঙ্গে কথা বলার সময় এই মিনিমাম অ্যাশিওরেন্সটা যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে। আর আমরা তো সকলে অন্তত কুপন কেটে খেতেই পারি। সেখানেই তো কুড়ি-বাইশ জন হয়েই যাবে। কম কী!”

"হুমমম," মাথা নেড়ে সায় দেয় রঘুদা।

ভোম্বল বলে ওঠে, "মেনুটা কী হবে? আমার তো এখনই খিদে পেয়ে গেল!"

"সেটা একটু ভাবতে হবে। সকলে বল, কার প্রিয় খাবার কী? এভাবেই শুরু করা যাক..." আমাদের উসকে দিল সৌজন্যদা।

অনেক তর্ক-বিতর্ক চেঁচামেচির পর ঠিক হল, সপ্তমীর দুপুরে ভাত, মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, ঝিরিঝিরি করে কাটা আলুভাজা, ঘি, ইঁচড়ের ডালনা, পারশে মাছের ঝাল, আমসত্ত্ব-খেজুরের চাটনি, পাঁপড় আর মিষ্টি। রাতে ফ্রায়েড রাইস, ফিশ ফ্রাই আর চিলি চিকেন। অষ্টমীর পুজো ও অঞ্জলির কথা মাথায় রেখে ওই দিন দুপুরে ও রাতে অথেন্টিক নিরামিষ খাবার, স্পেশ্যাল ডিশ হিসেবে দিনের বেলা কাঁচকলার কোপ্তা, রাতে মালাই পনির। নবমীর দুপুরে তো সকলের জন্য খিচুড়ি ভোগ যেমন আছে থাকছেই, রাতের বেলা বাসন্তী পোলাও ও মাটন ডাকবাংলো, সঙ্গে মিষ্টি। আর দশমীর দিন দুপুরে, পাত পেড়ে বাঙালি খাবার, স্পেশ্যাল আইটেম কচি পাঁঠার ঝোল। রাতে? ঠাকুর বিসর্জন করে ফিরে এসে মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ!

মেনু সুপারহিট!

সৌজন্যদা বলার চেষ্টা করেছিল, "পরপর তিন বেলা মাটন! পেটে সইবে রে?"

আমরা সকলে হইহই করে উঠেছিলাম, "অষ্টমীর দিনের নিরামিষ খাবারটাকে কমপেনসেট করতে হবে তো!"

"আমার সিজ়ন টিকিট কনফার্মড," ঠোঁট চাটতে-চাটতে বলল ভোম্বল।

রঘুদা বলল, "বিলু, রতন গোলদারকে ফোনটা কর। ব্যাটা বহুদিন ধরে বলছে, 'একটা সুযোগ দাও, দেখো কেমন রান্না করি!' দেখি ব্যাটাচ্ছেলে কী রেট দেয়?"

১৯

"সৌজন্যদা..."

পিছন থেকে চেনা গলাটা কানে আসতে ফিরে তাকায় সৌজন্য সান্যাল, "আরে সুমেধা! তুমি এখানে? আজ আবার কী ব্যাপার?"

"তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে," ঠান্ডা গলায় বলে সুমেধা।

"রুবাইয়ের ব্যাপারে? কোনও কমপ্লেন?"

"না। তোমার ব্যাপারে।"

"আমার ব্যাপারে? এই রে!"

চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের এক নম্বর গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে সৌজন্য সান্যাল। ঘাড় ঘুরিয়ে মেট্রোর ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে দেখল, কবি সুভাষ যাওয়ার পরের ট্রেন আর তিন মিনিটের মাথায়। রাসবিহারীতে একটা ক্লায়েন্ট মিট করে, সোজা পাড়ায় ফেরার প্ল্যান ছিল তার। পুজোয় যিনি আলোর কাজ করছেন, সেই ভদ্রলোকের আসার কথা। তার সঙ্গে বসতে হবে আটচালা ও নাটমন্দিরের স্পট আলোর পজ়িশনিং নিয়ে।

"চলো, মেট্রোতে যেতে-যেতে শুনি। তুমি বাড়ি ফিরবে তো, নাকি?"

"না।"

"না মানে? আরও কোথাও যাওয়ার আছে বুঝি?"

"না মানে, না। আমার কোথাও যাওয়ার নেই। আমরা এখানে কোথাও বসতে পারি?" কেটে-কেটে কথাগুলো বলল সুমেধা।

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সৌজন্য দেখল, আধঘণ্টা মতো ম্যানেজ করাই যায়। হাতে সময় রেখে কোথাও বেরোনো তার চিরকালের অভ্যেস। বলল, "এই ইলেকট্রনিক মলটার উপরে একটা কফি শপ আছে। চলো, আমরা ওখানে গিয়ে বসি।"

মনের মধ্যে একটা ছোট্ট ঝড় উঠেছে সৌজন্য সান্যালের। কারণ কয়েকদিন আগে, এই চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের উল্টো দিকের ফুটপাথে যখন সুমেধা সরকার তার উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ে, সেদিন ব্যাপারটা খুব একটা স্বাভাবিক মনে হয়নি সৌজন্যর। সুমেধা বলেছিল, বন্ধুর সঙ্গে সে নিউ মার্কেট থেকে বিরিয়ানির মশলা কিনতে এসেছিল। পরের দিনই ছিল সুমেধার জন্মদিন। সে বলেছিল, প্রতি বছরই তো মা এই দিনটিতে তার পছন্দমতো পদ রান্না করে খাওয়ায়। তাই এ বছর সে ঠিক করেছে, নিজেই মায়ের পছন্দের বিরিয়ানি রান্না করে মা-বাবাকে সারপ্রাইজ় দেবে! সুমেধার সঙ্গে ওর এক বন্ধু ছিল, নামটা এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারছে না সৌজন্য। তবে মনে আছে, সেদিন সেই মেয়েটা কিছু একটা গড়বড় করেছিল। সুমেধার সঙ্গে সৌজন্যর ধাক্কাটা লাগার পরই, মেয়েটির একটি ফোন আসে এবং সে ওই ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সুমেধা যখন ওর বন্ধুর সঙ্গে সৌজন্যর আলাপ করাতে যায়, তখন মেয়েটি বাঁ হাতে ফোনটা কানে চেপে রেখেই, ডান হাত বাড়িয়ে শুধু বলতে পেরেছিল, "নাইস টু মিট ইউ," তার পর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফোনে। সুমেধা সেই সময় যে ভাবে কটমট করে তাকিয়েছিল ওর বন্ধুর দিকে, যেন সে কী একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ করে ফেলেছে! সেই সময় সুমেধার মুখ-চোখ বলে দিচ্ছিল, কোনও একটা বিষয়ে মেয়েটির উপর ও সাংঘাতিক রেগে গিয়েছে। সৌজন্যও তাড়ায় ছিল। তাও সুমেধার সঙ্গে যে মিনিট দুই-তিনেক ওখানে দাঁড়িয়ে কথা হয়েছিল, সেই পুরো সময়টাই ওই মেয়েটা ফোনে ব্যস্ত ছিল। সুমেধাকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে, এগিয়ে গিয়েছিল সৌজন্য।

মলের ঠান্ডা আবহে ঢুকে বেশ স্বস্তি হল। সেপ্টেম্বর মাস প্রায় শেষ হতে চলল, তা-ও গরম যেন পিছু ছাড়ছে না। লিফ্টে চড়ে ওরা সোজা উঠে এল তিন তলায়। ছোট্ট গোল টেবিল, মুখোমুখি দুটো চওড়া বেতের চেয়ার বসল ওরা।

সৌজন্য বলল, "বলো, কী খাবে?"

সৌজন্য যে নিজের কাজ ফেলে ওর সঙ্গে বসে কথা বলতে কফি শপে এসেছে, সেটা বেশ ভাল লেগেছে সুমেধার। সে বলল, "তোমার জন্য যা অর্ডার করবে, জাস্ট সেটাই আর একটা বলে দাও।"

দুটো কোল্ড কফি উইথ ভ্যানিলা স্কুপ অর্ডার করে, অর্ডার নম্বরের ছোট্ট স্ট্যান্ডটা টেবিলে রেখে সুমেধার মুখোমুখি বসল সৌজন্য। "শুনি, কী বক্তব্য তোমার?"

সুমেধা চুপ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সৌজন্যর দিকে।

অস্বস্তি বোধ করে সৌজন্য। যে আশঙ্কাটা ও মনে-মনে করছে, সুমেধা কি তা হলে সেই পথেই এগোবে? আশঙ্কার মেঘটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য সৌজন্য বলে, "তোমার ডকুমেন্টারির শুট কেমন চলছে? রুবাই ঠিকমতো অ্যাসিস্ট করছে তো?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে সুমেধা। পরক্ষণেই দু'হাতের ভর টেবিলের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে সৌজন্যর দিকে, "তুমি কিছুই বোঝো না, না?"

"কী ব্যাপারে বলো তো?" সতর্ক হয়ে যায় সৌজন্য।

সৌজন্যকে ডিফেন্স গোছানোর কোনও সুযোগ না দিয়ে অল আউট অ্যাটাকে ঢুকে পড়ে সুমেধা, "আমি তোমাকে ভালবাসি সৌজন্যদা।"

"সে তো আমিও তোমাকে ভালবাসি সুমেধা..." গলাটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে সৌজন্য।

কাউন্টার অ্যাটাকে সে নিজেই গোল খেয়ে গেল নাকি! সুমেধা চোখ গোল-গোল করে বলল, "তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ। তোমাকে, রুবাইকে, জিকো-জিঙ্গো, বিম্বো, রঘু-বিলু... আমি সকলকে এই কয়েক দিনে খুবই ভালবেসে ফেলেছি। তোমরা যে ভাবে

আমাকে আপন করে নিয়েছ...”

“এই যে তুমি বুঝেও না বোঝার ভান করছ, এটা কিন্তু আমি একদম পছন্দ করছি না,” সুমেধার গলাটা এ বার একটু কর্কশ শোনায়।

কফির লম্বা ঠান্ডা গ্লাস দুটো, সঙ্গে দুটো টিস্যু পেপার ও দুটো লম্বা চামচ ওদের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে যায় সার্ভিসের মেয়েটি। তুলে নিয়ে যায় টোকেন নম্বর লেখা ছোট্ট বোর্ডটা।

কফির একটা গ্লাস সুমেধার দিকে এগিয়ে, একটা চামচ দিয়ে নিজের কফি গ্লাসের উপর ভেসে থাকা ভ্যানিলা স্কুপটা নাড়তে থাকে সৌজন্য। যেন কিছু একটা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। এমন একটা কিছু, যা একেবারে চুপ করিয়ে দেবে সুমেধাকে। চামচ নাড়ানো থামিয়ে এ বার সুমেধার দিকে সোজাসুজি তাকায় সৌজন্য। তার পর খুব ঠান্ডা গলায় বলে, “সুমেধা, তুমি জানো আমি বিবাহিত, আমার একটা তিন বছরের মিষ্টি মেয়ে আছে?”

“কেন জানব না!” বিস্ময় সুমেধার চোখে-মুখে।

“তার পরেও তুমি আমাকে...” ততোধিক বিস্মিত এ বার সৌজন্যও।

“ইয়েস! আই ডু। আই বিলিভ, লাভ ইজ়ন্ট ব্লাইন্ড। ইট সিজ় বাট ইট জাস্ট ডাজ়ন্ট মাইন্ড!”

“সিনেমা বানানোর চক্করে মাথাটা কি তোমার এক্কেবারে গেছে? জীবনটা সিনেমা নয় সুমেধা। টেক ইট ফ্রম মি, ইটস জাস্ট অ্যান ইনফ্যাচুয়েশন। কয়েক দিনে সব কেটে যাবে।”

“তুমি জানো, আমার বাবার একটা সিরিয়াস অ্যাফেয়ার আছে?” সৌজন্যর কথায় কোনও রকম গুরুত্ব না দিয়ে বলে সুমেধা।

এ বার সত্যিই খুব অস্বস্তি বোধ করে সৌজন্য, “তুমি এসব আমাকে কেন বলছ সুমেধা?”

“আমার ধারণা, মা-ও সেটা জানে। আমিও সবটা জানি, তবে সেটা বুঝতে দিই না ওদের।”

“এসব কেন আমাকে বলছ তুমি! এটা তোমাদের পারিবারিক বিষয়...”

“সেই পরিবারের অংশ তোমাকে হতে বলছি না সৌজন্যদা। শুধু বলছি আমার জীবনের একটা অংশ হতে,” সুমেধা এ বার মরিয়া, “বাড়িতে স্ত্রী-মেয়েকে রেখে আমার বাবা যদি এই বয়সে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারে জড়াতে পারে এবং খুশি থাকতে পারে দুই ক্ষেত্রেই, তা হলে তোমার অসুবিধেটা কোথায়?”

“তুমি কি বাবার কৃতকর্মের বদলা নিতে চাইছ?”

“না। আমি শুধু তোমাকে বোঝাতে চাইছি, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।”

“সুমেধা, আমার কথা শোনো...”

“তুমি আমার কথা শোনো। কেন তুমি ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ? তুমি বিবাহিত বলে, তোমার একটা সন্তান আছে বলে আমি তোমার প্রেমে পড়তে পারি না!”

“সুমেধা, এটা হয় না। আর একটা কথা শোনো, রুবাই খুব ভাল ছেলে। ও তোমাকে খুব ভালবাসে, খুব...”

“আমি জানি রুবাইদা খুব ভাল। আমারও ওকে খুব ভাল লাগে। কিন্তু বন্ধু হিসেবে।”

“আমিও তোমাকে ভালবাসি, আমার ছোট বোন হিসেবে। তুমি চাইলে, আমরাও ভাল বন্ধু হতে পারি।”

“আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি সৌজন্যদা...” এ বার কাতর শোনায় সুমেধার গলা।

“এসব পাগলামো কবে থেকে মাথায় ঢুকলো বলো তো?” সৌজন্য ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করে।

“যেদিন তুমি তপন তরাইকে মাঠে দাঁড়িয়ে ওর মুখের সামনে একটা আয়না ধরলে। ওকে বোঝালে, বাবারও বাবা থাকে, সেদিন থেকে। এখনও আফসোস হয়, ঘটনাটা নিজের চোখে দেখতে পাইনি বলে। সৌজন্যদা, আজকালকার দিনে তোমার মতো শিরদাঁড়া ক'টা মানুষের আছে?”

সৌজন্য হেসে বলল, “না দেখেই এই! তা হলে দেখলে কী করতে?”

“তুমি ভাবছ, আমি তোমার সঙ্গে টাইমপাস করছি, না?”

“ঠিক তা নয়। কিন্তু আই অ্যাম রিয়েলি সরি সুমেধা, এ বার আমাকে উঠতে হবে, একটা খুব জরুরি কাজ আছে,” কফিটা এক চুমুকে শেষ করে, ল্যাপটপের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিতে উদ্যত হয় সৌজন্য।

“তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছ,” সুমেধার গলায় অভিমান স্পষ্ট।

“সত্যিই আমার কাজ আছে সুমেধা,” এ বার উঠে দাঁড়ায় সৌজন্য। ওকে দেখাদেখি সুমেধাও। ওর কফির গ্লাসে তখনও একটা চুমুকও পড়েনি। সেদিকে চোখ পড়তেই সৌজন্য বলে, “ওপ্‌স সরি, আমি বসছি। তুমি কফিটা শেষ করে নাও।”

“আমার খাওয়া হয়ে গেছে,” বলেই, টেবিলের উপর রাখা মোবাইল ও পাশের চেয়ারে রাখা কলেজের ব্যাগটা কাঁধে তুলে, গটগট করে কফি শপ থেকে বেরিয়ে যায় সুমেধা।

এ বার নিজেকেই মৃদু ভর্ৎসনা করে সৌজন্য। তার মনে হয়, সুমেধার প্রতি ও হয়তো একটু বেশিই রুড ব্যবহার করে ফেলেছে।

২০

সৌজন্যদা এসে খবরটা দিতেই আমরা সকলে লাফিয়ে উঠলাম। একটা সিঙ্গল ডিলে এত টাকা! আর শুধু তো ওই টাকাটাই নয়, তার সঙ্গে মঞ্চ তৈরির খরচ, সাউন্ড সিস্টেম কোনও কিছু নিয়েই আমাদের আর ভাবতে হবে না!

হয়েছে কী, সৌজন্যদা সেদিন গিয়েছিল গ্যালাক্সি বাংলা চ্যানেলের অফিসে, পুজোর বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা বলতে। সেটা ছিল ওর অফিসেরই কাজ। একটা ডিল সাইন করানোর ব্যাপার ছিল। সেখানে ঘটনাপ্রসঙ্গে ওর কানে আসে, ওই জিইসি চ্যানেলটি নাকি পুজো শেষেই নিয়ে আসতে চলেছে লোকগান-নির্ভর একটি রিয়্যালিটি শো। এবং সেই কারণে গোটা কলকাতা জুড়ে প্রায় কুড়িটি পুজোতে ওরা চায় কিছু না-কিছু ইউনিক অ্যাক্টিভিটি করতে। প্রিন্ট-টেলিভিশন-হোর্ডিং, সেই সব প্রোমোশন তো থাকবেই। তার পাশাপাশি ওরা চায় পুজো টাই-আপ।

যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই পুজোর ডিলগুলো করছে, তারাও সেদিন ওই জিইসি-র অফিসে। প্রবল ঝাড় খাচ্ছে চ্যানেলের রিজিওনাল বিজ়নেস হেডের কাছে। কারণ, পুজোর আর বারো দিন বাকি, কিন্তু এখনও দক্ষিণ কলকাতার তিনটি পুজো কমিটির সঙ্গে ওরা টাই-আপ করে উঠতে পারেনি। ওই পুজো কমিটিগুলো নাকি অনেক বেশি টাকা চাইছে। গ্যাল্যাক্সির রিজিওনাল বিজ়নেস হেডকে কাজের সূত্রে দীর্ঘ দিন ধরে চেনে সৌজন্যদা। যদিও সৌজন্যদার কথাবার্তা বেশি হয় চ্যানেলের সিনিয়র এগজ়িকিউটিভ অয়ন ক্ষেত্রীর সঙ্গেই। পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অয়ন ক্ষেত্রীকে একটা মেসেজ করে সৌজন্যদা। ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে অফিসে ছিলেন না। মেসেজ পেয়ে সৌজন্যদাকে সঙ্গে-সঙ্গে কল ব্যাক করেন এবং বলেন, ‘‘আপনি আমাদের অফিসেই আছেন তো? আমাকে জাস্ট দশটা মিনিট দিন।’’

তারপরেই একটা ফোন আসে গ্যালাক্সির রিজিওনাল বিজ়নেস হেডের কাছে এবং তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনি সৌজন্যদাকে ডেকে নেন নিজের চেম্বারে। এই ধরনের ডিল ফাইনাল করার কথা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিরই। কিন্তু রিজিওনাল বিজ়নেস হেডের মাথায় এখন প্রবল চাপ। তাই নিজেই বসেছেন আলোচনায়। আজ বিকেলের মধ্যেই ফাইনাল রিপোর্ট পাঠাতে হবে মুম্বইয়ের হেড অফিসে। তার পর?

ক্লাবের সোফায় আমরা সকলে মিলে সৌজন্যদাকে ঘিরে বসেছি। মন দিয়ে গিলছি ওর কথাগুলো। সৌজন্যদা বলল, ‘‘তার পর আর কী? ভদ্রলোক তো আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। বললেন, ‘অয়ন আমাকে ফোন করে বলল, আপনার কাছে নাকি কি কনসেপ্ট আছে?’ আমাদের পুজোর লে-আউটটা তো আমার ফোনে পিডিএফ করাই ছিল, ওই যেটা তোদের প্রথম দিন দেখিয়েছিলাম, সেটা দেখালাম ভদ্রলোককে। ছবি, থিম পুরোটা ডিটেলে বললাম ওঁকে। ভদ্রলোক তো পারলে আমাকে জড়িয়েই ধরেন। কিন্তু খাঁটি কর্পোরেট ঘুঘু তো, নিজের আবেগ যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললেন, ‘আই অ্যাম ইমপ্রেসড। বাট আপনাদের ফুটফল কত?’’’

‘‘ফুটফল মানে?’’ শিশু ভোলানাথের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করে বিপ্লো।

‘‘উফ! আচ্ছা গাধা তুই। ফুটফল মানে পুজোর সময় কত লোকের পা পড়ে আমাদের এই পুজোয়,’’ বিপ্লোর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলে জিকো, ‘‘তুমি কী বললে গো? সত্যিই তো আমাদের এখানে পুজো দেখতে খুব বেশি লোক আসে না!’’

সৌজন্যদা হেসে বলল, ‘‘মণ্ডপের সামনে অবধি হয়তো সত্যিই আসে না, কিন্তু মেট্রো থেকে নেমে মাঠের পাশ দিয়ে উদয়ভানু সংঘের পুজো দেখতে কত লোক যায় বল তো? কত লোক বসে বিশ্রাম নেয় আমাদের এই মাঠে?’’

‘‘তুমি এই সবগুলোকে আমাদের দর্শক হিসেবে দেখিয়ে দিলে!’’ এ বার বিস্ময় প্রকাশ করে জিঙ্গো।

‘‘ঠিক দেখালাম না, বোঝালাম। বোঝালাম, উদয়ভানু সংঘের অন্তত চল্লিশ শতাংশ ট্র্যাফিক যায় আমাদের এই পাড়া দিয়ে। সেই লোকগুলোকে চাইলেই আমরা শ্রীপল্লির মাঠে দীর্ঘ ক্ষণের জন্য আটকে দিতে পারি একটা ভাল অনুষ্ঠান দিয়ে। ‘নিশ্চিন্তপুরের লোকগান’ হল সেই অনুষ্ঠান। নাটমন্দিরের সামনে যে বড় বট গাছটা আমরা বসাচ্ছি, তার তলায় প্রতি সন্ধেয় ১ ঘণ্টা অন্তর পনেরো মিনিটের জন্য এক জন করে শিল্পী এসে বসবেন। শোনাবেন লোকগান। শিল্পীর যাবতীয় যা বন্দোবস্ত, ব্যয়ভার সেটা চ্যানেলই করবে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য যে স্টেজটা আমরা করছি, সেখানে পুজোর চারটে দিন দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলবে রিয়্যালিটি শো-এর অডিশন। পুজোর থিমের সঙ্গে এ রকম ইন্টিগ্রেশন উনি নিজেও ভাবেননি...’’

‘‘কিন্তু আমাকে একটা কথা বল সৌজন্য, ওই লোকগানের অনুষ্ঠানটাকেও আমরা স্টেজে করতে পারি না? আর ওই পনেরো মিনিট করে না ভেঙে, যদি রোজ টানা এক ঘণ্টার একটা লোকগানের অনুষ্ঠান হয়, তা হলে ইমপ্যাক্ট অনেক বেশি হবে না কি?’’ প্রশ্ন করে রঘুদা।

‘‘তুই ঠিকই বলেছিস, ইমপ্যাক্ট হয়তো বেশি হবে। কিন্তু এটাও তো মাথায় রাখতে হবে, মিসেস রায়ের নেতৃত্বে পাড়ার বাচ্চাগুলো এত দিন ধরে রিহার্সাল দিচ্ছে পুজোর অনুষ্ঠানের জন্য। ওরা তো তা হলে আর সে ভাবে সুযোগই পাবে না! আর একটা কথা কী বল তো, ব্যাপারটাকে পনেরো মিনিট করে ভেঙে দিলে, ওই অনুষ্ঠান শুনতে অনেক লোক দাঁড়িয়ে পড়বে। কারণ চ্যানেল ভাল শিল্পীই পাঠাবে। সেই সুবাদে আমাদের পাড়ার কচিকাঁচাদের অনুষ্ঠানেরও দর্শক বাড়বে, ওরাও উৎসাহ পাবে।’’

‘‘ঠিক বলেছিস। এভাবে সত্যিই ভেবে দেখিনি,’’ সৌজন্যদার পিঠে হাত রেখে রঘুদা বলে, ‘‘তুই একসঙ্গে এত কিছু কী করে ভাবিস বল তো?’’

হেসে ফেলে সৌজন্যদা, ‘‘আরও একটা কারণ আছে ভায়া। বাজেটের কারণে বট গাছের বেদিটা ভেবেছিলাম চট দিয়েই করতে হবে। কিন্তু লোকগানের শিল্পীদের সেখানে বসাতে হলে, ওটা তো আর চলবে না। বেদি বানাতে হবে পাকাপোক্ত। ইট-সিমেন্ট দিয়ে এখন সেটা চ্যানেলই বানিয়ে দেবে! এ ছাড়া অডিশনের জন্য মূল স্টেজ-সাউন্ড-লাইট সেগুলো তো করবেই। বট গাছের বেদিটা সিমেন্টের হলে বুঝতে পারছিস, ইমপ্যাক্টটা কেমন হবে? কতটা রিয়েলিস্টিক হবে ব্যাপারটা?’’

‘‘ফাটিয়ে হবে ভাই!’’ দুই আঙুল জিভের তলায় দিয়ে ‘হু হুউউউউ’ করে জোরে একটা শিস দিয়ে বলল বিলুদা।

‘‘দাঁড়া দাঁড়া, এ বার আসল কথাটা শোন,’’ গুছিয়ে বসল সৌজন্যদা, ‘‘বাকি সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে এই পুরো টাই-আপটার জন্য চ্যানেল আমাদের পুজো কমিটিকে কত টাকা দেবে জানিস?’’

‘‘দশ হাজার টাকা?’’ প্রবল উৎসাহ নিয়ে বলে বিপ্লো।

বিপ্লো বসেছিল সৌজন্যদার পাশেই। সৌজন্যদা এ বার ওর কাঁধে ডান হাতটা রেখে বলল, ‘‘না বিপ্লোবাবু। দশ, বিশ বা পঞ্চাশ নয়। আমরা পাব, পুরো আড়াই লক্ষ টাকা!’’

অঙ্কটা শুনে আমরা সকলে যেন মুহূর্তে স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছি! কারও মুখ থেকেই কোনও কথা বেরোচ্ছে না। বিলুদা কোনও রকমে বলল, ‘‘কী বলছিস ভাই! মানে পুরো পুজো বাজেটের অর্ধেক এই একটা ডিলেই কাভার!’’

‘‘আমি তো পুরো পাঁচ লক্ষেরই ডিম্যান্ড রেখেছিলাম রে। জানতাম নেগোশিয়েট করবে। আসলে কী বল তো, আমাদের কাছে গত কয়েক বছরের পুজোর যদি একটা ভাল প্রেজ়েন্টেশন থাকত, তা হলে পাঁচ কেন, দশ লক্ষের ডিমান্ডও রাখা যেত!’’

আমাদের চোখ গোল-গোল। শ্রীপল্লির এই পুজোর জন্য কোনও টিভি চ্যানেল আড়াই লক্ষ টাকা দিচ্ছে, সেটাই আমরা এখনও হজম করতে পারছি না। আর সৌজন্যদা বলে কিনা...

আমাদের অবস্থা দেখে সৌজন্যদা বলল, ‘‘সিরিয়াসলি বলছি। এই ডিল যদি ওরা উদয়ভানু সংঘের সঙ্গে করতে যেত, তা হলে ওরা কোনও মতেই কুড়ি-পঁচিশ লাখের নীচে রাজি হত না।’’

বিলুদা ঘোর কাটিয়ে বলল, ‘‘ভাই, আমাদের কাছে এই আড়াই লক্ষ, কুড়ি লাখেরই সামিল। তুই আর বলিস না ভাই। আমার হার্ট দুর্বল, এ বার সত্যিই জবাব দেবে!’’

২১

আজ তিন দিন হয়ে গেল, সুমেধা আমার ফোন ধরছে না! মেসেজেরও কোনও উত্তর দিচ্ছে না। ওদের বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যত বার গিয়েছে, একটি বারের জন্যেও বারান্দায় দেখতে পাইনি ওকে। নিজের মিষ্টি মুখের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি সরিয়ে সেখানে এখন রেখেছে একটা ক্যাকটাসের ছবি। স্টেটাসে লেখা, 'লাইফ ইজ় টু শর্ট টু স্ট্রেস ইয়োরসেলফ উইথ পিপ্‌ল হু ডোন্ট ইভন ডিজ়ার্ভ টু বি অ্যান ইসু ইন ইয়োর লাইফ!' এটা কি আমাকেই উদ্দেশ করে লেখা? আমি আবার কী করলাম রে বাবা!

হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশনটাও অফ করে রেখেছে। আমার মেসেজগুলো আদৌ দেখছে কিনা, সেটাও বুঝতে পারছি না। মনটা আমার একদম ভাল লাগছে না।

এদিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করে চলেছে বিশ্বজিৎদার টিম। কী অসাধারণ সুন্দর যে হয়ে উঠেছে আমাদের মাঠটা! গতকাল রাতেই সেই বিশাল বট গাছটা এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমতলার নার্সারির লোকেরা। প্রায় কুড়ি জন এসেছিল ওরা। হাত লাগিয়েছিলাম আমরাও। বিরাট একটা গর্ত করে, প্রায় ছ'ফুট গভীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গাছের শিকড়। ওরা বলে গিয়েছে, আমরা যেন নিয়ম করে সকালে ও বিকেলে অন্তত দুই-চার বালতি করে জল দিই বট গাছটার গোড়ায়। শুরুতে পরিকল্পনা ছিল, গাছটা আনা হবে তৃতীয়ার দিন। যাতে আমাদের যত্ন নেওয়ার সময়টুকু যথাসম্ভব কম করা যায়। কিন্তু এখন যেহেতু গাছের চার দিক ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে বেদি বানানো হবে, তাই সেটা সম্ভব নয়। কারণ বেদি শুকোতেও তো দিন চার-পাঁচেক লাগবে। বড় গাছটার পাশাপাশি আরও খান আটেক মাঝারি মানের গাছ এসেছে একই সঙ্গে। সেগুলো বসবে বিশ্বজিৎদার পরিকল্পনা মতো। খড় দিয়ে আটচালা ও নাটমন্দিরগুলো ছেয়ে দেওয়ার পর মনে হচ্ছে, যেন আস্ত গ্রামকে কেউ তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে আমাদের এই শ্রীপল্লির মাঠে। আটচালাগুলোর মধ্যে যে মূর্তিগুলো বসানো হবে, সেগুলো প্রায় সম্পূর্ণ। কয়েকটার যা চোখ আঁকতে বাকি। আমাদের সব পুরনো জামাকাপড়, মায়েদের সুতির শাড়ি, ধুতি নিয়ে আসতে বলেছিল বিশ্বজিৎদা। সেখান থেকেই বাছাই করে কিছু পরানো হয়েছে মূর্তিগুলোর গায়ে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হচ্ছে, সত্যিই বুঝি কোনও মানুষ স্ট্যাচু হয়ে বসে আছে! বিশ্বজিৎদাদের কাজ এতটাই জীবনসদৃশ।

এই গড়ে ওঠাটুকুর কিছুই ক্যামেরাবন্দি করছে না সুমেধা! আমার বার বার মনে হচ্ছে, এগুলো হাইপারল্যাপসে শুট করে ওর ডকুমেন্টারিতে যদি এই পুরো ব্যাপারটা রাখে, তা হলে খুব ভাল লাগবে দেখতে। আচ্ছা, আমি কি একবার চলেই যাব ওদের বাড়ি? না, থাক, যদি খেপে যায়! আর একটা দিন দেখি। কাল তো মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনা। দেখা যাক, আমার দেবীর মুড ঠিক হয় কি না!

এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। গ্যালাক্সি চ্যানেলের লোক এসেছে আজ। সব ঠিকঠাক এগোচ্ছে কিনা সরেজমিনে দেখে নিতে। সৌজন্যদা ওদের সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, আমিও ওর সঙ্গেই আছি। মাঠের একটা কোণে রঘুদা, বিলুদা, পুটাইদা আর বান্টিদা বসেছে সব হিসেব নিয়ে। চাঁদা, সুভেনির কোথা থেকে এখনও পর্যন্ত কী কালেক্ট হয়েছে, কত টাকা এখনও পাওয়া যেতে পারে, তার একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে। চ্যানেলের লোকগুলো চলে গেলেই, সৌজন্যদা বসবে ওদের সঙ্গে। বলেছে, চ্যানেলের স্পনসরশিপটা যখন পাওয়াই গিয়েছে, তখন প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাটাও যাতে স্মরণীয় করে রাখা যায়, তার একটা পরিকল্পনা করবে।

পুজোর চার দিনের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাও ফাইনাল হয়ে গিয়েছে আগেই। রতন গোলদার দুরন্ত রেট দিয়েছে। ওর রেটের উপর পুজো কমিটির লাভের অংশ ধরে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, সাত বেলার খাবার মাত্র চোদ্দোশো টাকায়! ওটা অবশ্য আলাদা-আলাদা করে কুপন কাটলে। কেউ যদি পুরো সাত বেলার খাবার কুপনই একসঙ্গে কাটে, তাকে দিতে হবে মাত্র বারোশো টাকা।

ভোম্বল এই মাত্র প্রেস থেকে খাবারের ডিটেল্‌ড মেনুসহ হ্যান্ডবিল এবং কুপন নিয়ে এসেছে। এক-এক বেলার জন্য এক-এক রঙের কুপন। সেই সব কুপন জমা পড়ল বিলুদা ও বান্টিদার জিম্মায়। কারণ কুপন সংগ্রহের জন্য হ্যান্ডবিলে ওদেরই নাম-নম্বর ছাপা হয়েছে। জিকো, জিঙ্গো, ভোম্বল আর বিম্বোকে ডেকে রঘুদা বলল, "এই, তোরা যা তো, এই হ্যান্ডবিলগুলো সব ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে দিয়ে আয়। সকলকে মুখে বলবি, অন্তত এক বেলার জন্য হলেও তাঁরা যেন আমাদের এই মেনু ট্রাই করেন।"

চ্যানেলের লোক চলে গিয়েছে। সৌজন্যদা আর আমি গিয়ে যোগ দিলাম রঘুদাদের সঙ্গে। সৌজন্যদা বলল, "কী রে রঘু, কী বুঝছিস?"

"ভাই, এখনও পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তোর বিসর্জন শোভাযাত্রার জন্য লাখ দেড়েক টাকা তো থাকবেই।"

"সাবাশ! তা হলে ছৌয়ের দলটাকে আজই কনফার্ম করে দিই? তোদের বলেছিলাম না... মোহরকুঞ্জে ওদের অনুষ্ঠান দেখে জাস্ট ছিটকে গিয়েছিলাম রে!"

"সৌজন্য, হিসেব ছাড়। আগে বউকে অ্যাটেন্ড কর," মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে তাকিয়ে বলল বিলুদা।

দেখলাম, শ্রীময়ীবৌদি ছোট্ট মিঠাইয়ের হাত ধরে হেঁটে আসছে এদিকেই। সৌজন্যদা হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। তার পর এগিয়ে গেল শ্রীময়ীবৌদিদের দিকে। মিঠাইকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

রঘুদা বৌদিকে উদ্দেশ করে বলল, "আপনার বরকে কিন্তু আমরা হাইজ্যাক করে নিয়েছি বৌদি!"

শ্রীময়ীবৌদি হেসে বলল, "ওকে আলাদা করে হাইজ্যাক করতে হয় না। মনের মতো কাজ পেলে ও নিজেই হাইজ্যাকড হয়ে বসে থাকে!"

হেসে উঠলাম আমরা সকলে।

পুটাইদা সৌজন্যদাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "ওই, যা বৌদিকে একবার ঘুরিয়ে দেখা, কী কাণ্ডটাই না করছিস!"

শ্রীময়ীবৌদি হেসে বলল, "সেটাই তো দেখতে এলাম। জগৎ-সংসার ভুলে কী করছে আমিও একবার দেখি।"

সৌজন্যদা মিঠাইকে কোলে নিয়ে এগোল আটচালাগুলোর দিকে, শ্রীময়ীবৌদির হাতটা আলতো করে ধরল আর-এক হাতে।

কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হল তপনদা! রঘুদাকে বলল, "কী রে, ডিউ কালেকশনে কখন বেরোবি? আমাকে কিন্তু আজ একটু তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে ভাই। রাতে পার্টির একটা মিটিং আছে। থাকতেই হবে ওখানে। বিতানদা বার বার করে বলেছে।"

কেউ তার কাছে এত কৈফিয়ত চায়নি। তা-ও গায়ে পড়ে কথাগুলো শুনিয়ে দিল তপনদা।

"সেরকম হলে তুমি আজ ছেড়ে দাও না। আমরা তো আছিই..." বলল রঘুদা।

"মাঝপথে কাউকে ছেড়ে যাওয়া তপন তরাইয়ের স্বভাব নয় ভাই। চল-চল, বেরোই আমরা।"

কথা বলতে-বলতেই মাঠে এসে হাজির হল পাড়ার বৌদিদের একটা দল। তপনদার স্ত্রী মানে অনিন্দিতাবৌদিও আছে সেই দলে। সঙ্গে সোমদত্তাবৌদি, কাজরীকাকিমা, সম্পালিবৌদি এবং আরও অনেকে। কথাটা তুলল সোমদত্তাবৌদিই। রঘুদাকে উদ্দেশ করে বলল, "এই যে রঘু, তা আমাদের দাবিদাওয়ার কথাটা কি তোমাকে বললেই হবে, নাকি তোমাদের হিরোকেই ডাকতে হবে?"

"কী দাবি বৌদি?"

"আগে বলো, তোমাকে বললে কাজ হবে কি না?"

রঘুদা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, "মানে কী দাবি, সেটা না জানলে..."

সম্পালিবৌদি বলল, "এই তোমাদের এক সমস্যা। কিছু একটা বললেই তোমরা ওই নতুন ছেলেটার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকো। আরে, তোমরা পাড়ার পুরনো ছেলে, নিজেরাও কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত নাও।"

সম্পালিবৌদির কথার টোনটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। মনে হল, তপনদার পিঠোপিঠি এই বৌদের এখানে এসে পড়াটা নেহাতই কাকতালীয় নয়।

ইতিমধ্যে আটচালা-নাটমন্দির ঘুরিয়ে শ্রীময়ীবৌদি ও মিঠাইকে নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে সৌজন্যদা।

ওরা কাছে আসতেই শ্রীময়ীবৌদির উদ্দেশে বিলুদা বলল, "কেমন লাগল বৌদি? ব্যাপারটা পুরো জমে গেছে না?"

শ্রীময়ীবৌদি হেসে বলল, "যাই বলুন, আপনাদের বন্ধু কিন্তু খুব চালাক। পুজোর সময় নিজের গ্রামের বাড়িতে যেতে পারবে না বলে, নিজের গোটা গ্রামটাকেই তুলে নিয়ে এসেছে কলকাতায়! এখন বুঝলাম, কেন ও পুজোর সময় এখানে থেকে যেতে রাজি হল।"

বিলুদা অবাক হয়ে বলল, "সৌজন্য, সত্যিই তোদের গ্রামটা এতটাই সুন্দর!"

"এর চেয়ে অনেক বেশি ভাই! পুজো শেষে একটা প্ল্যান কর, সকলে মিলে একবার যাই চল। দেখবি, গ্রামবাংলার আসল রূপ," বলল সৌজন্যদা।

"এই যে, আমাদের ডাকবেন না?" কথাটা বলল অনিন্দিতাবৌদি। সুর মেলাল কাজরীকাকিমাও। এঁদের সকলের সঙ্গে শ্রীময়ীবৌদির আলাপ নেই। তপনদা রঘুদাকে উদ্দেশ করে বলল, "আরে রঘু, সকলের সঙ্গে সৌজন্যর বউয়ের আলাপ করিয়ে দে। এই দেখো, আমি নিজেই এখনও আমার পরিচয় দিইনি! নমস্কার বৌমা, আমি তপন তরাই, এই পাড়ারই বহু পুরনো বাসিন্দা।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনার নাম আমি সৌজন্যর মুখে অনেক শুনেছি," প্রতি-নমস্কার করে বলে শ্রীময়ীবৌদি।

"নাম কেন বলছ বৌমা! বদনাম বলো!" বলেই হোহো করে হেসে উঠল তপনদা। তার পর বলল, "কী হল রে রঘু, সকলের সঙ্গে বৌমার আলাপটা করিয়ে দে। সৌজন্যর সঙ্গেও তো মনে হয় সকলের সে ভাবে আলাপ নেই!"

রঘুদা এক-এক করে সকলের সঙ্গে শ্রীময়ীবৌদির আলাপ করিয়ে দিল। পাড়ার কয়েকজন বৌদির সঙ্গে সৌজন্যদারও।

সোমদত্তাবৌদি এ বার শ্রীময়ীবৌদির উদ্দেশে বলল, "যাই বলুন ভাই, আপনার বরকে কিন্তু আমাদের সকলের খুব পছন্দ। মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের পাড়ার পুরো ভোল বদলে দিয়েছে!"

তার পর শ্রীময়ীবৌদির হাতটা চেপে ধরে, চোখটা অল্প টিপে বলল, "চোখে-চোখে রাখবেন ভাই। না হলে কবে কে ফুঁসলে নিয়ে কেটে পড়ে!"

শ্রীময়ীবৌদি মুখে একটা রহস্যময় হাসি খেলিয়ে বলল, "আমার অভ্যেস আছে।"

তার পর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, "তা আপনি একটা সুযোগ নিয়ে দেখবেন নাকি!"

বৌদিরা সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে। সম্পালিবৌদি বলল, "বা ভাই, আপনার তো নিজের বরের উপর দারুণ কনফিডেন্স!"

শ্রীময়ীবৌদি হেসে বলল, "তা একটু আছে।"

"শোন-শোন, অনেক হাসিঠাট্টা হয়েছে, এ বার কাজের কথাটা বলে নিই," বলে সৌজন্যদার দিকে কিছুটা এগিয়ে এল সোমদত্তাবৌদি। বলল, "সৌজন্যবাবু, আপনার টিমমেটরা তো কেউ আপনার মতামত ছাড়া একটি পা-ও ফেলতে চায় না। একটা ছোট্ট দাবি নিয়ে এসেছিলাম, রঘু তো কিছু বলতেই চাইছে না!"

"না-না বৌদি। এ রকম কোনও ব্যাপার নয়। আসলে আমরা সব কিছুই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করি তো— বলুন না, আপনাদের কী দাবি?"

"দেখুন, আপনার কালচারাল সেক্রেটারি মিসেস রায়ের স্ক্রিনিংয়ে তো আমরা পাশ করতে পারিনি। কোনও অনুষ্ঠানেই আমাদের কোনও জায়গা হয়নি। তাই আমাদের দাবি, আমাদের জন্যও কিছু একটা করতে হবে। যেখানে আমরা প্রাণ খুলে আনন্দ করব," একটু ঠেস দিয়েই কথাগুলো বলল সোমদত্তাবৌদি।

সৌজন্যদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে রুবাই, সহকারী কালচারাল সেক্রেটারি, কোনও একটা আইডিয়া দে... বৌদিদের জন্য কী করা যায়?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "না মানে, হাতে তো আর তেমন সময়ও নেই যে, কিছু একটা ভেবে সেই মতো রিহার্সাল করা যাবে..."

সৌজন্যদা দুম করে বলল, "নবমীর রাতে ডিজে নাইট। নো রিহার্সাল, নো টেনশন— ওনলি ফ্রিস্টাইল ডান্স! চলবে বৌদি? কী রে রঘু, বিলু, পুটাই... কী বলিস তোরা?"

"চলবে মানে? এ তো দৌড়বে!" হাতে তালি দিয়ে উঠল সোমদত্তাবৌদি। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল বাকিরাও।

সম্পালিবৌদি বলল, "আমাদের বর-রা তো আর কোনও দিন ডিস্কে নিয়ে যাবে না! দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাই না হয়। সৌজন্যবাবু, আপনার আইডিয়াটাকে কুর্নিশ না জানিয়ে পারছি না।"

অনিন্দিতাবৌদি বলল, "না রঘু, এ বার বুঝলাম কেন তোমরা সকলে 'সৌজন্য' 'সৌজন্য' করো!"

আমি খেয়াল করলাম, রঘুদার মুখে এক টুকরো বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল ঠিকই, কিন্তু তা যেন ফুটে উঠল একরাশ কালো মেঘের বুক চিরে।

২২

ভোর চারটে।

তিন বার শাঁখের আওয়াজ।

তার পর 'ইয়া চণ্ডী মধুকৈটবধী দৈত্যদলনী'— গান শেষে ছড়িয়ে পড়ল সেই বিখ্যাত কণ্ঠস্বর— যা বলে উঠল, 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা...' তালতলা শ্রীপল্লির আকাশে-বাতাসে মিলেমিশে গেল দেবীর আগমনবার্তা। সে যে কী অবর্ণনীয় আবহ! ভোরের আলো ফুটতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি।

এই পরিকল্পনাটাও ছিল সৌজন্যদারই। গোটা পাড়া জুড়ে মোট ছ'টি জায়গায় বাঁধা হয়েছিল চোঙা, যার নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদের ক্লাবঘরে। মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে পিতৃপুরুষের তর্পণকালে বাণীকুমার-পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর অমর সৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র সুর সারা পাড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা। রেডিয়োতে যেসময় এর সম্প্রচার শুরু হয়, ঠিক সেই সময়।

কিছুটা নিমরাজি ছিল রঘুদা। বলেছিল, "এত সকালে মাইক চালিয়ে লোকজনের ঘুম ভঙিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? অনেকেই কিন্তু বেশ বিরক্ত হবেন— তা ছাড়া পাড়ায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন।"

সৌজন্যদা বলেছিল, "আমার মনে হয় সকলে খুশিই হবেন রে। আসলে কী বল তো, আগের রাত্তিরে শুতে যাওয়ার সময় আমরা সকলে হয়তো ভাবি, কাল ঠিক ভোর চারটের সময় উঠে রেডিয়ো চালিয়ে অনুষ্ঠানটা শুনব। ইচ্ছে থাকে ষোলো আনা। কিন্তু বহু মানুষই ওই সময় বিছানার আরাম ছেড়ে উঠে রেডিয়োটা চালানোর

মতো এনার্জিটা আর জুটিয়ে উঠতে পারেন না। তাই আমরা যদি এই মহিষাসুরমর্দ্দিনী শোনানোর ব্যবস্থাটা করি, তাহলে সকলে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই এটা উপভোগ করতে পারবেন। ট্রাস্ট মি রঘু, এটা এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করবে আমাদের সারা পাড়ায়!''

সৌজন্যদার পরিকল্পনাটা আমাদের বেশ ভাল লেগেছিল। বাকি সকলের উৎসাহ দেখে, রাজি হয়ে যায় রঘুদাও। এবং ঠিক হয়, পাড়ার অধিবাসীবৃন্দের জন্য ব্যাপারটা থাকবে একটা সারপ্রাইজ়।

ভোর চারটের সময় সিডি প্লেয়ারে মহিষাসুরমর্দ্দিনী চালানোর দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে নিয়েছিল জিকো-জিঙ্গো আর বান্টিদা। ঠিক হয়, আগের দিন রাতটা ওরা ক্লাবেই থাকবে। বিশ্বজিৎদাদের সঙ্গে। সৌজন্যদা ওদের পইপই করে বলে দিয়েছিল, ''তোরা তিন জনই নিজেদের মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করে রাখবি। পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে। সময়ে চালাতে না পারলে কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি!''

না, একেবারে ঠিক-ঠিক দায়িত্ব পালন করেছে ওরা। আমি কখনও এত ভোরে উঠি না। কিন্তু আজ যেন সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, ক্লাবে কেন থেকে গেলাম না ওদের সঙ্গে! বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠ এখন ঘোষণা করছে 'চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন'! কী যে অপূর্ব লাগছে শুনতে... আচ্ছা, সুমেধাও কি শুনছে এই অনুষ্ঠান? কেমন লাগছে ওর? এত কিছুর মাঝে ওর এক বারও কি মনে পড়ছে না আমার কথা?

সৌজন্যদা কাল আমাকে এক বার জিজ্ঞেস করেছিল সুমেধার কথা। 'কেমন আছে ও', 'আমাদের ডকুমেন্টারির কাজ কেমন চলছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিন দিন ধরে যে সুমেধা আমার ফোন ধরছে না, কোনও যোগাযোগ করছে না, এটা শুনে সৌজন্যদা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, সন্দেহজনক কোনও একটা গন্ধ হয়তো ও পেয়েছে। কিন্তু সেটা এখনই আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছে না। সুমেধাকে আমার বরাবর স্ট্রেট ফরোয়ার্ড বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু কেন যে হঠাৎ এ ভাবে নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিল, সেটা বুঝতে পারছি না।

''না তপনদা, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না,'' জোরে-জোরে মাথা নাড়তে থাকে রঘুবীর মণ্ডল।

''তুই বিশ্বাস না করতে চাইলে করিস না, কিন্তু সৌজন্য সান্যাল যে এই গেমটা খেলছে, সেটা কিন্তু ঘটনা...'' ফস করে দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে দুই হাত দিয়ে আগুনটা আড়াল করে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল তপন তরাই। তার পর আধপোড়া কাঠিটা টোকা দিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে বলল, ''তুই পাড়ার বৌদিদের দেখলি না, কী ভাবে এসে তোকে বলল, 'আমাদের দাবি-দাওয়ার কথাটা কি তোমাকে বললেই হবে। নাকি তোমাদের হিরোকেই ডাকতে হবে?' পুরো পাড়াটাকে কিন্তু ও ক্যাপচার করে ফেলেছে রঘু। 'রঘুবীর মণ্ডল নামেই সেক্রেটারি, পুজোর আসল মাথা সৌজন্য সান্যাল,' এই কথাটা কিন্তু জানতে কারও বাকি নেই,'' সিগারেটে এ বার একটা লম্বা টান দেয় সে।

অধৈর্যের মতো পায়চারি করতে থাকে রঘুবীর। তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, ''সেটা তো ওর কাজের জন্য তপনদা। এটা খুব স্বাভাবিক, সৌজন্য আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ। ওর পরিকল্পনাতেই পুরো পুজোটা হচ্ছে। তাই ওর একটা বাড়তি গুরুত্ব তো থাকবেই। কিন্তু সৌজন্য প্ল্যানমাফিক আমাকে কাঠি করতে চাইছে, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না,'' মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে সেগুলো টানতে থাকে রঘুবীর মণ্ডল।

রঘুবীর মণ্ডলকে ফোন করে ঊষার মাঠে ডেকেছে তপন তরাই। জায়গাটা শ্রীপল্লি থেকে একটু দূরে। আদি গঙ্গার খালটা পেরিয়ে। দুপুরবেলার এই সময়টায় প্রায় ফাঁকাই থাকে মাঠটা। আগে মহালয়ার দিন এই মাঠে একটা বড় টুর্নামেন্ট হত। বছর পাঁচেক হল, বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেটা। ঊষার মাঠের পাশে যে কাঠের বেঞ্চগুলো আছে, তারই একটায় বসে আছে তপন তরাই। রঘুর বাইকটা পাশে দাঁড় করানো। তপন এসেছে হেঁটে। রঘুর স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছে। তাই এ সময় আসতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। যদিও তপন তরাই লোকটা যে সুবিধের নয়, তার ডাকে আদৌ এখানে আসাটা ঠিক হবে কিনা, সেটা নিয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধায় ছিল রঘুবীর। কিন্তু একথা সত্যি, কাল মাঠে পাড়ার বৌদিরা যে ভাবে তাকে 'অপমান' করেছে, তার পর থেকে তার মনের মধ্যেও শুরু হয়েছে একটা ছোট্ট দোলাচল। বিশেষ করে, 'কিছু বললেই হাঁ করে সৌজন্যর দিকে তাকিয়ে থাকো' এটা মোটেই ভাল ভাবে নিতে পারেনি রঘুবীর। কোনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কি এতটাই অক্ষম? সব সিদ্ধান্ত সৌজন্য নেবে, আর ওদের দিয়ে 'হ্যাঁ ভাই, দারুণ ভেবেছিস' বলিয়ে নেবে, এটা তো সত্যিই কোনও কাজের কথা নয়।

''পুজো করার কথাটা সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রথম কে বলেছিল রঘু?'' রঘুর মনের অস্থিরতার আন্দাজ করে আর একটা ক্লু তার সামনে রেখে দেয় তপন তরাই।

''আমি।''

''পাড়ার সকলকে নিয়ে জেনারেল মিটিং ডাকার কথাটা?''

''আমি।''

''সেগুলো পাড়ার ক'টা লোক জানে? মানে, তুই যে প্রথম এই ব্যাপারটা নিয়ে এগিয়েছিলি, সেটা কত জন জানে? সকলে তো ভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের মতো পাড়ার পুজোটা হাতে নেওয়ার পরিকল্পনাটা ওই সৌজন্য সান্যালেরই!''

রঘুবীর মণ্ডলের মাথাটা ক্রমশ ঘেঁটে দিতে থাকে তপন তরাই।

এ বার গলাটা আরও শীতল করে তপন বলে, ''তোর কী মনে হয়, সেদিন ওই মিটিংয়ে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম, সেগুলো আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল?''

''কী বলতে চাইছ তুমি?'' রঘুবীরের গলায় অবিশ্বাসের ঝাঁঝ।

''পাড়ার সকলকে নিয়ে পুজোর জেনারেল মিটিং ডাকার পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও ক্রেডিট যাতে তুই নিতে না পারিস, তাই আমার বক্তব্যের পুরো স্ক্রিপ্টটা লিখে দিয়েছিল ওই সৌজন্য সান্যাল-ই। মনে আছে বিদায়ী ভাষণে আমার বলা ওই লাইনটা, 'মূলত আমার অনুরোধেই রঘুরা আজ এই মিটিংটা ডেকেছে। আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ওদের ব্যাচের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' পুরো বক্তব্যের মধ্যে এই লাইনটা যাতে কোনও ভাবেই মিস না হয়, সেটা পইপই করে আমাকে বলে দিয়েছিল তোদের ওই সৌজন্য সান্যাল। কী, এ বার কিছু মাথায় ঢুকছে?''

রঘুবীর মণ্ডলের মাথাটা যেন ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে দৃশ্যগুলো। নিজের বক্তব্য শেষ করে তপন তরাই গিয়ে বসেছিল সৌজন্যর পাশে, তার পর ওর কানে-কানে কী সব বলছিল তপন। হেসে-হেসে মাথা নাড়ছিল সৌজন্য।

ছিঃ, এই পৃথিবীটা এতটাই নোংরা! সামান্য একটা মিটিং ডাকার ক্রেডিট ছিনিয়ে নিতে এত নোংরা খেলা খেলেছিল সৌজন্য!

''আমি জানি, আমার মুখের কথা তুই বিশ্বাস করবি না। তাই তো আমার সেই ভাষণটা, যেটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল সৌজন্য, তার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছিলাম। কবে বলতে কবে কোন চ্যাট ডিলিট হয়ে যায়!'' রঘুবীরের চোখের সামনে তপন তরাই তুলে ধরল নিজের মোবাইল স্ক্রিন, ''এই দ্যাখ, ওর পাঠানো সেই ভাষণের কপির স্ক্রিনশট,'' রঘুবীরের মাথায় অবিশ্বাসের শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল তপন তরাই।

রঘুবীর মণ্ডল দেখল, স্ক্রিনশটের বাঁ দিকের কোণে জ্বলজ্বল করছে সৌজন্যর হাসিমাখা মুখের ডিপি। যেন ওর দিকে তাকিয়েই ছুড়ে দিচ্ছে একরাশ তাচ্ছিল্য!

'টিং' শব্দে একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঢুকল সৌজন্য সান্যালের ফোনে। স্ক্রিনটা আনলক করে নোটিফিকেশন লগে চোখ বুলিয়ে সে দেখল, মেসেজ ঢুকেছে একটি অচেনা নম্বর থেকে। হোয়াটসঅ্যাপের ইনবক্স খুলে ডিপি-র জায়গায় ট্যাপ করতেই সেটা বড় হয়ে খুলল স্ক্রিনের অর্ধেক অংশ জুড়ে। ছবিটি একটি ক্যাকটাসের, তাতে হালকা বেগুনি রংয়ের ফুল ধরেছে কিছু। ছবির নীচে ডানদিকের কোণে লেখা প্রোফাইলটির হোয়াটসঅ্যাপ নেম, 'বেলাচাও'। মেসেজের প্রথম দুটো লাইনে চোখ বুলিয়েই সৌজন্য বুঝল, এটি এসেছে কার নম্বর থেকে। একটা লম্বা মেসেজ। বাংলায় লেখা। একটু অবাক হয় সৌজন্য। মেসেজটি ইংরেজিতে হওয়াই যেন স্বাভাবিক ছিল তার কাছে।

সৌজন্য বাড়িতেই ছিল। একটু আগেই অফিস থেকে ফিরেছে। একটু ফ্রেশ হয়ে, যাবে ক্লাবে। বিশ্বজিতের সঙ্গে অনেক কথা আছে তার। মহালয়ার সন্ধে। অনেক বড় কালেকশন হওয়ার কথা আছে আজ। পুজোর প্রেসিডেন্ট মানে ডক্টর শুভঙ্কর বটব্যাল আজ আসবেন বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখবেন বলে। প্রাথমিক ভাবে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন, যেদিন ওরা সকলে মিলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আজ হয়তো উনি আরও কিছু টাকা তুলে দেবেন পুজো কমিটির হাতে। শ্রীময়ী এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। অঞ্জুলাদি মিঠাইকে নিয়ে বেরিয়েছে, মাঠের চারপাশে ওকে হাঁটাবে বলে। তার আগে ঢাউস একটা কাপে মধুসহ গ্রিন টি দিয়ে গিয়েছে সৌজন্যকে। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে, তাতে হালকা চুমুক দিতে-দিতে 'বেলাচাও'-এর মেসেজে মন দেয় সৌজন্য— মেসেজ নয়, এটিকে একটি চিঠি বলাই ভাল।

প্রিয় সৌজন্যদা,

আশা করি তুমি খুব ভাল আছ। পুজো, পাড়া, অফিস, বাড়ি, তোমার মেয়ে-বউ— সব কিছু নিয়ে। আমি গত কাল অবধি ভাল ছিলাম না। কিন্তু আজ অনেকটা ভাল আছি। আমার বিশ্বাস, এ বার থেকে ভালই থাকব।

আসলে কি জানো তো, পুরো ব্যাপারটা রিয়েলাইজ় করতে একটু সময় লাগল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, সেই রিয়েলাইজ়েশনটা করানোর জন্য তুমি আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছ বলে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, 'আমি আবার কী করলাম!' না-না, সত্যিই তুমি কিছু করোনি। আর এই যে কিছু করোনি, এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, জানো?

সেদিন কফি শপ থেকে ওভাবে বেরিয়ে আসার পর, আজ সপ্তম দিন। এই সময়টুকুর মধ্যে তুমি একটিবারও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করোনি, আমি কেমন আছি? আমার মন কেমন আছে? জানি, এ বার তুমি নিজের মনে যুক্তি সাজাবে, 'আমার কাছে তো সুমেধার ফোন নম্বর-ই ছিল না! কী করে যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে!' তোমার অবগতির জন্য জানাই, আমার একটা ফেসবুক প্রোফাইল আছে, সেখানে মেসেঞ্জার নামক একটি বস্তু আছে। মন চাইলে তুমি অবলীলায় সেখানে একটা পিং করতে পারতে। ব্যস, এটুকুই। এর বেশি কিছু আমি তোমার কাছ থেকে এক্সপেক্টও করিনি।

তুমি জানো, এই ক'দিনে রুবাইদা আমাকে কতগুলো হোয়াটসঅ্যাপ করেছে? একশো বাইশটা। শুধু এটা জানতে, আমার কী হয়েছে? কেন আমি চুপ করে গিয়েছি? কেন আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করছি না? মেসেঞ্জারে পিং করেছে ঊনত্রিশবার! তুমি ভাবতে পারো, আমার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে বেচারা কতটা উতলা হয়েছে? কী ভাবে অপেক্ষা করেছে, আমার একটা মেসেজের জন্য!

তোমার কাছে অবশ্য এসবের কোনও গুরুত্ব নেই। এগুলো হয়তো সব ছেলেমানুষি। বোক-বোকা ব্যাপারস্যাপার। তবে কী জানো তো, মাঝেমধ্যে না এই বোকা-বোকা ব্যাপারগুলোও অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যায়। যেটা তোমার স্মার্টনেস, সততা কিংবা শিরদাঁড়া পারে না।

ভাল থেকো, পুজো ভাল কাটুক। শ্রীময়ীদি ও মিঠাইকে আমার ভালবাসা জানিয়ো।

সুমেধা।

কাটা-কাটা বাক্যে লেখা সুমেধার মেসেজটা আরও দু'বার পড়ল সৌজন্য। মেয়েটার অভিমান করাটা মোটেই অন্যায় নয়। সত্যিই কি সৌজন্য পারত না, মেসেঞ্জারে পিং করে একটা খবর নিতে? সেটা ও করতেই পারত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস করেনি। তা হলে হয়তো হিতে বিপরীত-ই হত। সুমেধা কি তা হলে পারত, এত সহজে ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে? সৌজন্যর 'ঔদাসীন্য' সুমেধাকে সাময়িক কষ্ট দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছে আরও বড়সড় সমস্যার হাত থেকে। মনে-মনে খুশি হয় সৌজন্য সান্যাল।

তবে এ বার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন সুমেধাকে। সে লেখে—

প্রিয় সুমেধা,

তুমি ভাল আছ জেনে আমি খুব খুশি। আসলে অনেক কাজ নিয়ে এত বাজে ভাবে আটকে আছি যে, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। প্লিজ় কিছু মনে কোরো না।

খুব ভাল থেকো। পুজোর দিনগুলো হয়ে উঠুক আনন্দময়।

শুভেচ্ছা নিয়ো,
সৌজন্যদা।

সৌজন্য সান্যাল জানে, এই মেসেজটা দেখে তার উপর আরও অনেক-অনেক বেশি রাগ হবে সুমেধার। বিশেষ করে, কাজের অজুহাতে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে না পারার কারণটায়। সুমেধা যে তার প্রায়োরিটি নয়, এটা বোঝানোর জন্য এই লাইনটা লেখা জরুরি ছিল। ও জানে, এটা পড়ে সুমেধা আরও অনেক বেশি আঘাত পাবে। কিন্তু সে তো এখন এটাই চায়। সুমেধার ভালর জন্যই।

২৩

পুরো গ্রামটাকে চটের তৈরি 'পাঁচিল' দিয়ে ঘিরে দিয়েছে বিশ্বজিৎদা। সেই পাঁচিলের গায়ে কী যে অপরূপ সব আলপনা এঁকেছে ওরা, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। 'গ্রাম'-এর প্রবেশপথ একটাই। সেটা দিয়ে ঢুকলে, সামনেই পড়বে বট গাছটা। বটের সবচেয়ে নিচু ডাল থেকে ঝুলছে লাল-হলুদ সুতো, তাতে বাঁধা ছোট-ছোট পাথরের টুকরো। গ্রামবাংলায় কোনও বিশেষ ইচ্ছেপূরণের জন্য মানুষ নাকি মন্দিরের কাছে থাকা গাছের ডালে এ রকম রঙিন সুতো দিয়ে ছোট-ছোট পাথর বাঁধে। একে বলে, মানত করা। পাশের ছোট্ট পুকুরে ফুটে আছে বেশ কিছু শালুক। তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো দুধসাদা পাতি হাঁস। গরুর গাড়ির পাশে খুঁটিতে বাঁধা দুটো গরু। সত্যিকারের। সেগুলোও দুধসাদা। তারা আপন মনে খেয়ে চলেছে মাঠের ঘাস। আটচালাগুলোর উপরে বসে আছে বেশ কিছু পাখি। অনেক ক্ষণ ধরে তাকিয়ে না থাকলে বোঝা সম্ভব নয় যে, সেগুলো আসলে নকল। আটচালাগুলো থেকে ঝুলছে সত্যিকারের হ্যারিকেন, তার আলোয় পাঠাভ্যাস করছে একদল কচিকাঁচা।

আসল-নকল মিশিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে এমন ভাবে তুলে ধরেছে

বিশ্বজিৎদা ও তার সহকারীরা যে, আমাদের পুজোর উদ্বোধন করতে এসে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার সঞ্জয় সমাজপতি বলেই দিলেন, ''ভাবছি পরের মাসে সুন্দরগ্রাম যাওয়ার প্ল্যানটা ড্রপ-ই করে দিই। যা দেখার, সে তো এখানেই দেখা হয়ে গেল!''

সমাজপতিবাবু আমাদের পাশের পাড়াতেই থাকেন। একসময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ময়দান। কিন্তু ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর, বাড়ি থেকে সচরাচর বেরোন না। ওঁকে ডাকার কথাটা বলেছিল বিজয়জেঠু। ওঁরা আসলে স্কুলের বন্ধু। বিজয়জেঠুর কথায় 'না' বলতে পারেননি সমাজপতিবাবু। এবং ওঁর টানেই হয়তো গুটিকয়েক মিডিয়ার ক্যামেরাও এসে হাজির হয়েছে আমাদের এই অখ্যাত পুজোপ্রাঙ্গণে। পাড়ার মানুষজনও এসেছেন বিস্তর। ওদিকে মিসেস রায়ের তত্ত্বাবধানে মঞ্চে শুরু হয়ে গিয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজ মঞ্চে কুচোকাঁচাদেরই ভিড় বেশি। তবে ষষ্ঠীর সন্ধেতেই আমাদের পুজো জমজমাট!

আজ রঘুদাকে দেখছি অতিসক্রিয় রূপে। সঞ্জয় সমাজপতিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে গোটা পুজোটা। পুজোর সেক্রেটারি হিসেবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ঠিক কোন ভাবনা থেকে আমরা এই থিম নিয়ে কাজটা করেছি। ওদের পিছনে-পিছনে ঘুরছে মিডিয়ার ক্যামেরা। আর তাদের পিছনে আছি আমরা সকলে। সৌজন্যদাও। মনে হচ্ছে, আজ যেন ও স্বেচ্ছায় নিয়েছে ব্যাকসিট। রঘুদার সঙ্গে কি কিছু হয়েছে সৌজন্যদার? আজ সকালে কলাবউ স্নান করাতে যাওয়ার সময়ও ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আঁচ করেছিলাম। যদিও ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, সামথিং ইজ় মিসিং

বিটুইন দেম!

ঠিক যেমনটা আমার ও সুমেধার মধ্যে। পুজো শুরু হয়ে গেল, তা-ও সুমেধার কোনও খবর নেই! আমার একটা মেসেজেরও উত্তর দিচ্ছে না! সব ভুলে আজ বিকেলে গিয়েছিলাম ওর বাড়ি, ওর মাকে বলার জন্য একটা অজুহাতও ভেবে নিয়েছিলাম মনে-মনে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, ওদের ফ্ল্যাটের দরজায় কোলাপসিবল গেটটা টানা, সেখানে ঝুলছে একটা বড়সড় তালা। জানি না, পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে বেড়াতে চলে গেল নাকি! তা সে যেতেই পারে, কিন্তু একটা কিছু তো জানিয়ে যাবে। আমি যে প্রতিটা মুহূর্তে অপেক্ষা করছি ওর জন্য, সেটা কি একটা বারের জন্যও অনুভব করছে না ও!

সপ্তমীর দুপুরের মেনুতে পারশে মাছের সাইজ় নিয়ে একটা হুলস্থুল শুরু করল তপনদা। সকলের প্লেটে ছ'ইঞ্চিরও বড় মাছ আর চক্রান্ত করে ওর এবং অনিন্দিতাবৌদির প্লেটে নাকি দেওয়া হয়েছে চার ইঞ্চিরও ছোট পিস। পুটাইদা ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকে, কোনও রকমে ঠান্ডা করেছে তপনদাকে। অনিন্দিতাবৌদি চুপ করেই ছিল। কিন্তু তপনদা তো কোনও কথা শুনতেই চাইছিল না। মাঝখান থেকে রঘুদা এসে ঝেড়ে দিল বিলুদাকে, ''এই জন্যই খাওয়াদাওয়ার মধ্যে ঢুকতে না করেছিলাম আমি। এ বার ঠ্যালা সামলা। যত্তসব ফালতু হুজ্জুতি। টাকা দিয়ে প্রত্যাশা মতো জিনিস না পেলে, লোকে তো বাওয়াল করবেই। আমি তো অন্তত এক্ষেত্রে তপনদার কোনও দোষ দেখছি না। আমি বলছি, এখনও সময় আছে। লোকের টাকা ফেরত দিয়ে এই চব্যচোষ্য এখনই বন্ধ কর।''

সৌজন্যদা সামনেই ছিল। ওকে অবশ্য সরাসরি কিছু বলেনি রঘুদা। কিন্তু আমার যেন মনে হল, কথাগুলো আসলে ওকেই শোনানো হল, ভায়া বিলুদা। কারণ ওর পরের কথাগুলো আরও বেশি করে কানে লাগল আমাদের। পুটাইদা শুধু ওকে বলতে গিয়েছিল, ''কেন এ ভাবে মাথা গরম করছিস রঘু? মাছ কি আর বিলু গিয়ে কিনেছে নাকি? এবেলার খাওয়াদাওয়াটা মিটে যাক। তার পর যা বলার রতনদাকে গিয়ে বলিস।''

রঘুদা হঠাৎ গলার স্বরটা নামিয়ে বলল, ''পুটাই, এই পুজোর সেক্রেটারি আমি। তাই এর ভাল-মন্দ সব দায় ঘুরেফিরে আমার কাঁধেই এসে পড়বে। সেই দায়টা যখন কেউ ভাগ করে নেবে না, তখন আমি যেটা বলছি, সেটাই কর।''

পুটাইদা হেসে বলল, ''আবার সেই 'আমরা' থেকে ব্যাপারটাকে 'আমি'র দিকেই নিয়ে গেলি রঘু! দ্যাখ, যেটা তোর ভাল মনে হয়, কর।''

কুপন কেটে এই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাদের মাঠের পাশে সমীরজেঠুদের বিল্ডিংয়ের গ্যারাজে করা হয়েছিল। সবে দুটো ব্যাচের খাওয়া শেষ হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়া সেরে বিল্ডিংয়ের পিছনের কলে হাত ধুতে এসেছেন। সেখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম আমরা। আমাদের ভিতরের কথাকাটি তাই তাঁদের অনেকেরই কানে গিয়েছে।

বিজয়জেঠু কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেই এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। বললেন, ''বাসনকোসন পাশাপাশি থাকলে একটু ঠোকাঠুকি লাগে, জানো তো? কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে কেউ বলে ওঠে না, 'আমি বাবা এ বার থেকে বেডরুমে থাকব' কিংবা 'আমি ড্রয়িংরুমে!' ঠোকাঠুকি হলেও, তারা কিন্তু রান্নাঘরেই থাকে। আর যাই বলো না কেন, রতনের রান্নাটা কিন্তু চমৎকার! আমি তো ভাতই নিয়ে ফেললাম তিন বার!''

পুটাইদা হেসে বলল, ''থ্যাঙ্ক ইউ জেঠু। আর হ্যাঁ, রাতের মেনুটা কিন্তু আরও জবরদস্ত!''

সন্ধে সাড়ে সাতটা। লোকসঙ্গীতের সুরে ভেসে যাচ্ছে আমাদের সারা পাড়া। বট গাছের বেদিতে আজ বসেছেন এক ঝুমুরশিল্পী। উনি এসেছেন ঝাড়গ্রাম থেকে। গ্যালাক্সি চ্যানেলের তরফ থেকে একটু আগে পুজো পরিদর্শনে এসেছিলেন জনা ছয়েক ব্যক্তি। আমাদের পুজোর আবহ দেখে আগামী তিন বছরের জন্য একই দরে কনট্র্যাক্ট সাইন করতে চেয়েছিলেন আজই। থিম, ইন্টিগ্রেশন— এসব কোনও কিছুর কথা না জেনেই। কিন্তু সৌজন্যদা রাজি হয়নি। বলেছে, পুজোর পর এটা নিয়ে এক দিন ওদের অফিসে বসবে। রঘুদা চেয়েছিল ডিলটা আজই সাইন হোক। কিন্তু সৌজন্যদা যখন আলাদা করে ওকে ডেকে নিয়ে বোঝায়, 'পরের বছর এই ডিলটারই ভ্যালু বাড়তে পারে পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ,' তখন সেটা মেনে নেয় রঘুদা।

আমাদের পুজোর সঙ্গেও যে এ রকম বড় কোনও সংস্থা অগ্রিম চুক্তিতে আগ্রহী হতে পারে, সেটা আমরা কেউ-ই কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তবে পুজোটা যে একটা বড় দিকে যেতে চলেছে, সেটা

আমরা আন্দাজ করেছিলাম ষষ্ঠীর রাত থেকেই। কারণ ‘নিশ্চিন্তপুর’-এ ঢোকার লাইনটা সেই রাতেই পৌঁছে দিয়েছিল প্রায় মেট্রো স্টেশনের মোড় পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে তা প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো ফুট তো হবেই! শ্রীপল্লির পুজোয় লাইন আর অমাবস্যায় চন্দ্রদর্শন, ব্যাপারটা এত দিন ছিল এ রকমই। ক্লাবের ছাদ থেকে এই সব ‘বিরল ঘটনা’র ফুটেজ আমি একটু-একটু করে নিজের মোবাইলেই নিয়ে রাখছি। কখন কার কাজে লেগে যায়! ও হ্যাঁ, ভাল কথা। ইতিমধ্যে একটি সংস্থা এসে যোগাযোগ করে গিয়েছে বিশ্বজিৎদার সঙ্গে। রাজারহাটে সংস্থাটির নতুন বিনোদন পার্কের জন্য বেশ কয়েকটি স্কাল্পচারের অর্ডার দিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই! প্রস্তাবটি শুনে বিশ্বজিৎদার তো পুরো মাটিতে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা! তবে বিশ্বজিৎদার সাফল্যে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছি।

আমাদের অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে এখন ‘বজ্রসেন’ ও তাহার ‘বন্ধু’।

বন্ধুটি নেচে-নেচে গাইছে, ‘তুমি ইন্দ্রমণির হার/এনেছ সুবর্ণদ্বীপ থেকে।/তোমার ইন্দ্রমণির হার–/ রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে’।

মিসেস রায়ের পরিচালনায় শুরু হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’। কাল দুপুর থেকে বান্টিদাকে দিয়ে মাইকে অ্যানাউন্স করিয়ে-করিয়ে বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট হাইপ ক্রিয়েট করিয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়, সেটা দেখার আগ্রহ আমাদের সকলের। বৌদিদের যে গ্রুপটা এখন মিসেস রায়ের ঘোষিত ‘অ্যান্টি লবি’ হিসেব পরিচিত, তারাও সকলে মঞ্চের সামনে চেয়ার দখল করে বসে। পান থেকে চুন খসলেই, জমবে খেলা। তবে হাতে ‘ক্ষমতা’ থাকায়, মিসেস রায়ের গোষ্ঠীর ইদানীং পাল্লা একটু ভারী। পুজোর পরে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়, সেটা সময়ই বলবে।

ক্লাবের ছাদ থেকে নেমে এসেছি আমিও। দেখলাম জিকো-জিঙ্গো, ভোম্বল, বিল্টো সব আগে থেকেই স্টেজের সামনে জড়ো হয়েছে। মাঠের ঘাসে পা ছড়িয়ে বসেছে সকলে। বান্টিদা, পুটাইদাও আছে ওখানে। সৌজন্যদার বাবা-মা এসেছেন গতকাল। সৌজন্যদাই নাকি গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়েছে ওঁদের, বৌদিকে দিয়েছে এক চরম সারপ্রাইজ়! মাসিমা-মেসোমশাই ও শ্রীময়ীবৌদিকে তিনটে চেয়ারে বসিয়ে, মিঠাইকে বৌদির কোলে দিয়ে, ও নিজেও এসে বসেছে ঘাসে। আমি গিয়ে বসলাম ওদের পাশে। ঠিক তখনই মঞ্চে আর্বিভূত হলেন মিসেস রায়! ‘শ্যামা’র রূপে। নেচে-নেচে গেয়ে উঠলেন, ‘ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই, / যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই’

রং মেখে মুখের কমপ্লেকশন কিছুটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন মিসেস রায়, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর হাতের রঙের নেই কোনও মিল! সেজেছেন সুন্দর। কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ কিম্ভূতকিমাকার লাগছে পুরো ব্যাপারটা। বিল্টো বলে উঠল, ‘‘শালা আমি চাই কী করে আর একটু ফরসা হব, আর উনি কিনা শখ করে কেলটি সেজেছেন!’’

বিল্টোর কথা শুনে ওর ঘাড়ে একখানা অর্ধচন্দ্র দিয়ে পুটাইদা বলল, ‘‘তোর লজ্জা করে না রে, এই সময় দাঁড়িয়ে বর্ণবৈষম্য নিয়ে কথা বলতে!’’

বিল্টো ‘উফ’ করে উঠে বলল, ‘‘তোমার আবার সবেতেই বাড়াবাড়ি!’’

মিসেস রায় তখন মঞ্চে হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গেয়ে চলেছেল, ‘পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা / আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা।’

ভদ্রমহিলা নাচছেন ভাল। কিন্তু কেন জানি না, ওঁকে দেখলেই আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ চিৎকার, ‘ধর ধর ওই চোর ওই চোর...’ ‘বজ্রসেন’-কে তাড়া করে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে ‘কোটাল’। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে! বজ্রসেন আকুল গলায় গেয়ে উঠল, ‘নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর / অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে...’

বজ্রসেন-এর ব্যাকুল স্বর তখন আমার কানে ঢুকছে না। আমার চোখ আটকে কোটাল-এর উপর। চোখ কচলে ভাল করে দেখার আগেই, ‘ওই বটে ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর,’ বলে বজ্রসেনকে তাড়া করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল মঞ্চ থেকে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে পাশ থেকে জিকো বলে উঠল, ‘‘ওটা সুমেধা না! গোঁফ লাগিয়ে, ব্যাপক লাগছে কিন্তু!’’

‘‘রিহার্সাল করল কবে!’’ বোকার মতো বলে উঠলাম আমি।

২৪

‘‘অঞ্জলির পয়সাগুলো কেউ ছুড়ে-ছুড়ে দেবেন না। আমরা প্রত্যেকের কাছে যাব। অনুগ্রহ করে পয়সাগুলো আপনারা সেই পাত্রে দিন।’’

প্রত্যেক ব্যাচ অঞ্জলির শেষে মাইক্রোফোন হাতে এই একই লাইনগুলো একই সুরে বলে চলেছেন ঠাকুরমশাই।

মহাষ্টমীর সকাল।

এই নিয়ে তিনটে ব্যাচের অঞ্জলি হয়ে গেল। কিন্তু এখনও সুমেধার দেখা নেই! গতকাল নৃত্যনাট্যের শেষে ব্যাকস্টেজে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে বড্ড ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পাড়ার এত মেয়ে এবং তাদের মায়েরা সেখানে ছিল যে, লজ্জা কাটিয়ে ওই পর্যন্ত আর গিয়ে উঠতে পারিনি। অভিনয় শেষে সুমেধাও আমার সঙ্গে দেখা করার কোনও রকম চেষ্টা করেনি। অনুষ্ঠানের আগে সাত দিন না হয় রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু অভিনয় মঞ্চস্থ হওয়ার পরেও কেন দেখা করল না কে জানে! আসলে কাল মাঠে খুব ভিড় ছিল, সেই কারণেই হয়তো ও আর আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেনি।

পেট আমার খিদেতে চুঁই চুঁই করছে। না, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। বিল্টো, ভোম্বল, জিকো, জিঙ্গো ওদের সকলের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন গিয়ে হরিদার দোকানে কচুরি-ছোলার ডাল আর জিলিপি সাঁটাচ্ছে। আমাকেও বার বার বলেছিল। কিন্তু...

চতুর্থ ব্যাচের লোকজন হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। ভিড়ের মধ্যে থেকেই গলা তুললাম আমি, ‘‘ঠাকুরমশাই, এদিকে একটু ফুল-বেলপাতা দেবেন প্লিজ়...’’

আমার কানের পাশে কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, ‘‘একটু বেশি করে নিয়ো।’’

ঘাড় ঘুরিয়ে চমকে উঠলাম, সুমেধা!

সাদা-হলুদ কম্বিনেশনের হ্যান্ডলুম শাড়িতে কী অপরূপ লাগছে ওকে! সদ্য স্নান করা ভিজে চুল, লেপটে রয়েছে কপালে, গালে। কিছুটা ছড়িয়ে রয়েছে ওর পিঠের উপর, বাকিটা ডান কাঁধের উপর দিয়ে এসে পড়েছে সামনে। চুলের জলে ইতস্তত ভিজেছে ওর শাড়িখানা।

সুমেধা মিষ্টি হেসে বলল, ‘‘কী, আমি পুষ্পাঞ্জলি দেব না বুঝি!’’

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ‘‘তা হলে এত দেরি করলে কেন?’’

‘‘অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করছ?’’

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, ‘‘হ্যাঁ, সেই সকাল সাতটা থেকে।’’

আবারও মিষ্টি করে হাসল সুমেধা। ভিড়ের মধ্যেই টের পেলাম, আমার বাঁ হাতটা চলে গিয়েছে একটা নরম তুলতুলে হাতের জিম্মায়।

সুমেধা আমার কানে-কানে বলল, ‘‘সিনেমায় কিন্তু এ রকমই হয়—’’

আমি জানি আপনারা ভাবছেন, এ তো সেই স্টিরিয়োটাইপ। প্রেমের গল্পে নতুনত্ব কই? কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার না ভীষণ ভাল লাগছে! পুরনো জিনিসের স্বাদও যে এত অন্যরকম হয়, তা সত্যিই আগে কখনও টের পাইনি!

‘সকলে ফুল পেয়েছেন তো?’ বলে উঠলেন ঠাকুরমশাই। তার পর টেনে-টেনে বলতে লাগলেন, “নিন বলুন, নমঃ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং...”

সৌজন্য সান্যাল নামটা যেন আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না রঘুবীর মণ্ডল।

দুপুরে খাবার ওখানে অম্লান মজুমদার যখন বিজয় চৌধুরী ও সরোজ সামন্তদের বলছিলেন, “ওই একটা ছেলে এসে কী ভাবে সকলকে এক করে দিল!” তখন সেটা একেবারেই নিতে পারেনি রঘুবীর। সবই ওই সৌজন্য সান্যালের একার কৃতিত্ব? তাদের কোনও অবদান নেই? এই লোকগুলো কী? এরা তো পারলে আজকের দুপুরের কাঁচকলা কোপ্তা রান্নার কৃতিত্বও ওই সৌজন্য সান্যালকে দিয়ে দেয়! মনে-মনে গজরাতে থাকে রঘুবীর।

ঠিক যেন তার মনের কথাটা ধরে ফেলে তপন তরাই। বলে ওঠে, “তবে অম্লানদা, আপনারা যা-ই বলুন না কেন, রঘু-বিলুদের মতো উদার মনের ছেলেদের কৃতিত্বটাও কিন্তু কম নয়। ওরা যে ভাবে সৌজন্যকে আপন করে নিয়েছে, সেটাও কিন্তু দেখার মতো...”

“তা তো বটেই, তা তো বটেই,” বলে ওঠেন সরোজ সামন্ত।

“তবে কী জানো, সাধারণ সিপাহীও প্রকৃত যোদ্ধা হয়ে ওঠে একজন যোগ্য সেনাপ্রধানের হাতে পড়লে। এক্ষেত্রে ওই সৌজন্য-ই কিন্তু সেই সেনাপ্রধান! এটা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। কী বলো রঘু?” যোগ করেন অম্লান মজুমদার। একইভাবে আজ সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ‘সৌজন্য সান্যাল ও তার টিম’-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে যায় শিশুদের নাটকের পরিচালক তৃষিত সেন। যে টিমের অংশ হতে পেরে কিছু দিন আগেও গর্ব বোধ করছিল রঘুবীর মণ্ডল— সকলের সামনে, বিশেষত তপন তরাইদের ব্যাচের সামনে বুক ফুলিয়ে বলছিল সে কথা— আজ সেই টিমে থাকার জন্যই নিজেকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে তার!

দুপুর-সন্ধের সেই কথাগুলোই এখন নতুন করে রঘুবীর মণ্ডলের সামনে তুলে আনছে তপন তরাই। ষাট এমএল-এর চেয়ে একটু বড় পেগ-ই বানিয়েছে তপনের ভাইপো তন্ময়। জল ঢেলে সেটা একটু নরম করার আগেই, প্লাস্টিকের গ্লাসটা তুলে, এক নিঃশ্বাসে পুরো হুইস্কিটা গলায় ঢেলে নিল রঘুবীর।

পাশে বসে বিপ্রকাশ। বাধা দেয় তন্ময়কে, “এই, তুই ওকে আজ আর মদ দিস না। পাঁচ পেগ হয়ে গেছে, এখন র-টাই মেরে দিচ্ছে!” চার পেগ চড়িয়েছে বিপ্রকাশও। নেশা তারও কম হয়নি।

রাত সাড়ে এগারোটা। ‘নিশ্চিন্তপুর’-এর বাইরে এখনও লম্বা লাইন। ক্লাবের পাশের সেই আন্ডার কনস্ট্রাকশন চারতলা বিল্ডিংয়ের ছাদে এখন ওরা চার জন। তপন, তন্ময়, বিপ্রকাশ এবং রঘুবীর।

তন্ময়কে মদ ঢালতে বাধা দেওয়ায়, বিপ্রকাশকে একটা কাঁচা খিস্তি মেরে রঘুবীর বলল, “বৌদিদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি! লবি করছে শালা, লবি!” কথাটা যে সৌজন্য সান্যালের উদ্দেশে বলা, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হল না।

তপন আজ গলায় খুব একটা ঢালেনি। তবু সে জিভটা জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, “মিসেস উষসী রায়। কালচারাল সেক্রেটারি। ডটার অফ শ্রীচিরন্তন রায়। পার্টির জোনাল সেক্রেটারি। তাকে দিয়ে পার্টিতে এখন নিজের নামে সুপারিশ করাচ্ছে, শালা!” এ বার একটা পাঁচ অক্ষর উচ্চারণ করল তপন তরাই।

ঢিলটা এক্কেবারে ঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে। “পার্টিতে সুপারিশ! তপনদা, কী বলছ তুমি?” নেশার ঘোরেও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না রঘুবীরের।

তপন জিভ জড়িয়েই বলে, “তা না হলে আর বলছি কী? তোদের বলেছিলাম না, মালটার নিশ্চয়ই কোনও একটা বড় গেম প্ল্যান আছে। শুনিসনি তো আমার কথা! নে, এ বার কাউন্সিলার ভোটে দাঁড়ানোর স্বপ্নটা ওই পচা গঙ্গার খালে ভাসিয়ে দে।”

তপনের কথায় নেশা প্রায় ফেটে গেছে রঘুবীরের। “তুমি কী করে জানলে আমার ওই কাউন্সিলার ভোট, প্ল্যান অ্যান্ড অল...”

“তোর বিলু, সব হেগে দিয়েছে আমার সামনে,” ফিক করে হেসে ওঠে তপন তরাই।

রঘুবীরের মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল, লাফিয়ে উঠে দুটো কলার চেপে ধরল বিপ্রকাশের, “শুয়োরের বাচ্চা, পেটে তোর কিচ্ছু থাকে না, না?”

তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে রঘুবীরকে জড়িয়ে ধরে তপন তরাই, “আরে ছাড়া ওকে। ওর উপর রাগ ঝেড়ে কী হবে? কাজের কথা শোন।”

“কাজের কথা? বলো...” বিপ্রকাশের কলারটা ধরে থাকে রঘুবীর।

প্রবল নেশা হওয়ার ভান করেই তপন বলতে থাকে, “প্রথমত, আমাদের ওয়ার্ডটা সংরক্ষিত হচ্ছে না। তাই আমার আর কোনও চান্স নেই। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির প্রশ্নে পার্টি এ বার আর কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না। কারণ, তার পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন, ইমেজ ক্লিন করাটা পার্টির জন্য জরুরি। সে দিক থেকে দেখলে অবৈধ নির্মাণ, জমি দখল আর তোলাবাজির কারণে, রাজেন দত্ত এ বার আর টিকিট পাচ্ছে না। কোনও ভাবেই না। তাই পার্টির চাই নতুন মুখ। সব দিক থেকে অনেক ভেবেচিন্তে নিজের ঘুঁটিটা খুব ভাল সাজিয়েছে ওই সৌজন্য সান্যাল।”

“এটা তো আমার প্ল্যান তপনদা!” রাগে কাঁপতে থাকে রঘুবীর।

“কিন্তু এখন আর ওটা শুধু তোর একার নেই রে রঘু। তোর মাঠে ঢুকে পড়েছে ওই সৌজন্যও, তোকে কোনওরকম রেয়াত না করে,” সাপের মতো হিসহিসে গলায় বলল তপন তরাই।

ওদিকে সন্ধিপুজোর ঢাক বাজছে। একশো আটটা প্রদীপ জ্বলে উঠছে এক-এক করে। বাজছে কাঁসর, ঘণ্টা। পাড়ার মেয়ে-বৌরা হাতের চাপে একশো আটটা পদ্মের কুঁড়ি থেকে পাপড়ি মেলে-মেলে সেগুলিকে ফুলের আকার দিতে ব্যস্ত।

তপন তরাইকে এখন একমাত্র ভরসাযোগ্য লোক মনে হচ্ছে রঘুবীর মণ্ডলের। সে অসহায়ের মতো প্রশ্ন করে, “এখন তা হলে কী হবে তপনদা?”

“আমার কথা মতো যদি চলিস, তা হলে সৌজন্য পাবে রেড কার্ড আর মাঝমাঠের দখল নিবি তুই!” একটা অদ্ভুত হাসি তপন তরাইয়ের চোখেমুখে।

“কী করতে হবে, তুমি শুধু বলো। টিকিট আমার চাই তপনদা,” অধৈর্য শোনায় রঘুবীরের গলা।

“পাড়ার ছেলেকে উড়িয়ে দিয়ে জাঁকিয়ে বসবে উড়ে এসে জুড়ে বসা মাল, সেটা আমিও কখনও হতে দেব না রঘু। তুই আমার পাড়ার ছেলে। তোর আর আমার মধ্যে যত লড়াই-ই থাক না কেন, আমি তোর পাশেই থাকব।”

“আমাকে কী করতে হবে তুমি শুধু বলো,” অস্থির শোনায় রঘুবীরের গলা।

“একটা চাকু চলবে, একটু রক্ত ঝরবে। তার পর সব ফরসা!” নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদ থেকে পুজোমণ্ডপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলে তপন তরাই।

“খুন! সৌজন্যকে! এসব তুমি কী বুদ্ধি দিচ্ছ তপনদা?” প্রতিবাদ করে ওঠে বিপ্রকাশ।

“আহা, তুই থাম তো বিলু! আগে ভাল করে শুনতে দে, কী বলতে চাইছে তপনদা...” রঘুবীর এখন মরিয়া।

তন্ময় আর একটা করে পেগ বানায় সকলের জন্য। তার পর সেটা

হাতে তুলে, তাতে মৃদু চুমুক দিতে-দিতে তপন তরাই বুঝিয়ে দেয় তার পরিকল্পনা...

সন্ধিপুজো তখন প্রায় শেষ লগ্নে। শুরু হচ্ছে নবমীর ভোর। ঢাকের আওয়াজে খানখান হয়ে যাচ্ছে সেই ভোরের নিস্তব্ধতা।

২৫

আজ, এই মুহূর্তে...

ধামসা, ঢোল, চড়চড়ি, মহুরি, খরকা, সানাই— বেজে উঠেছে একই ছন্দে। যেন শুরু হয়েছে এক দক্ষযজ্ঞ। ছৌ শিল্পীরা সকলেই পুরুষ। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সেজেছেন নারী। মুখোশের আড়ালে তাদের আসল অবয়ব বোঝা দুষ্কর। তাদের অনবদ্য নৃত্যশৈলী, শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার ধরন, দৃপ্ত ভঙ্গিতে হাঁটাচলা— দখল নিয়েছে ৬ নম্বর এনএসসি বোস রোডের অর্ধেক অংশ।

তালতলা শ্রীপল্লির প্রতিমা চলেছে নিরঞ্জনের পথে।

পাড়ার অধিকাংশ মানুষ যোগ দিয়েছেন এই নিরঞ্জন শোভাযাত্রায়। তাদের হাসিমাখা মুখ বলে দিচ্ছে, 'তরাই বাড়ির পুজো' প্রকৃত অর্থে 'সর্বজনীন' হয়ে ওঠার আনন্দ সকলের মধ্যে ঠিক কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে।

গতকাল, মানে নবমীর রাতে সৌজন্যদা যখন স্টেজে উঠে ঘোষণা করল— 'ধার-বাকি সব মিটিয়ে কমিটির ফান্ডে উদ্বৃত্ত হতে চলেছে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা', তখন এই মুখগুলোতেই লেগেছিল বিস্ময়ের ছোঁয়া। শুধু কি তাই? পুজোয় প্রণামী হিসেবে পড়া একশো বারোটা শাড়ি যখন আজ দুপুরে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিলিয়ে দেওয়া হয় পাড়ার পঁয়ত্রিশ জন কাজের মাসি ও পুরসভার বারো জন সাফাইকর্মী দাদা-দিদিদের মধ্যে, তখনও এঁদের মুখে ছিল একই রকম বিস্ময়। কারণ, এসব ঘটনার সবই তো তাদের কাছে নতুন, যেন কোনও রূপকথা! প্রণামীর সেই সব শাড়ি যখন মাসি-দিদিদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন উমাজেঠু, কালীপদজেঠু, কাশীজেঠু, অম্লানজেঠু, প্রদীপ্তজেঠুরা— তখন তাদের মুখের ঔজ্জ্বল্য ছিল দেখার মতো। গর্বের হাসিতে ঝলমল করছিল তাদের চোখ-মুখ। পাড়ার পুজোটা যে এতদিন পর উঠেছে যোগ্য হাতে, এসব ছোট-ছোট ঘটনাগুলোই তো তার এক-একটা পাহাড়প্রমাণ উদাহরণ! যা কেউ কখনও ভাবতেও পারেনি, তা-ই করে দেখিয়েছে পাড়ারই গুটিকয়েক ছেলে। এবং তাদের নেতৃত্বে এমন একজন, যে এপাড়ায় এসেছে মাত্র বছর কয়েক আগে! আজ দুপুরে ঠাকুরবরণের সময়ও তো পাড়ার দিদি-বৌদিরা সৌজন্যদার গাল ভরে দিয়েছে সিঁদুরে-সিঁদুরে। সকলের ভালবাসা-স্নেহের আভায় ও যেন আজ দীপ্তময়। সৌজন্যদাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল না, এমন কোনও জটলা মনে হয় না তৈরি হয়েছে বিগত কয়েকটা দিনে।

আজ আমার সত্যিই বড় গর্ব হচ্ছে ওর জন্য। তরাই পরিবারও যেন আজ নতমস্তকে মেনে নিয়েছে সৌজন্য সান্যালের 'অভিষেক'। কিন্তু কেন জানি না, এক্ষেত্রে দুটো মানুষকে আমার একটু অদ্ভুত ঠেকছে। এক, রঘুদা। এবং দুই, সুমেধা। রঘুদা তা-ও সৌজন্যদার সঙ্গে কাজের কথাগুলো বলছে কিন্তু সুমেধা কেমন যেন এড়িয়ে চলছে ওকে। একটু আগেও তো, সৌজন্যদার সঙ্গে যখন ওই ব্যানার নিয়ে কথোপকথনটা হচ্ছিল, তখনও ও যেন আমাদের চেনেই না, এমন একটা ভাব করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কী অদ্ভুত, এখন আবার নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় সুমেধা আমার পাশে-পাশেই হাঁটছে! বুঝতে পারছি, ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওর হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার হাত, কিন্তু সেটা ওর মুখের ভাব দেখে বোঝে, এমন সাধ্য কার!

আমাদের শোভাযাত্রা এখন ফর্টিফাইভ বাসস্ট্যান্ডের মোড় থেকে পাটুলির রাস্তায় পড়েছে। ব্যান্ডপার্টির ছন্দে উন্মাদের মতো নাচছে জিকো-জিঙ্গো, বান্টিদা, বিপ্সো, ভোম্বল। আমার খুব ইচ্ছে করছে ওদের সঙ্গে পা মেলাতে। কিন্তু মন চাইছে না সুমেধাকে ছেড়ে যেতে। এদিকে ঢাকের তালে কোমর দোলাতে শুরু করেছে পাড়ার দিদি-বৌদিরা। হঠাৎই তাদের চোখ পড়ল সৌজন্যদার উপর। শ্রীময়ীবৌদি ও মিঠাইকে নিয়ে ওদের পাশাপাশিই হাঁটছিল সৌজন্যদা। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে সৌজন্যদার সামনে দাঁড়াল অনিন্দিতাবৌদি। বলল, ''কাল ডিজের তালে আমাদের নাচিয়ে দিয়ে খুব তো কেটে পড়েছিলে শরীর খারাপের অজুহাতে। আজ আর তোমায় ছাড়ছি না। আমাদের সঙ্গে পা তো তোমায় মেলাতেই হবে ভাই!'' শ্রীময়ীবৌদি সৌজন্যদাকে ঠেলা দিয়ে কিছু একটা বলল। সৌজন্যদা মিঠাইকে শ্রীময়ীবৌদির কোলে দিয়ে, এগিয়ে গেল অনিন্দিতাবৌদির সঙ্গে।

সত্যি, কাল একটা ডিজে নাইট হয়েছে বটে! রাত্তির সাড়ে দশটায় 'ডিজে রিত' যখন ঘোষণা করল, 'ফাইভ মোর মিনিটস টু গো' তখন আর আমাদের কারও শরীরে কোনও শক্তি অবশিষ্ট নেই। তবু, ওই শেষ পাঁচ মিনিট একটা মহূর্তের জন্যও আমরা কেউ বসিনি। ''এসব ডিজে-টিজে-তে পাড়ার কালচার নষ্ট হবে,'' বলে মিসেস রায় একটা মৃদু আপত্তি প্রাথমিক ভাবে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু কাল তিনিও মেতে উঠেছিলেন ডিজে-র ট্র্যাকে। তপনদা তো নেশার ঘোরে ''এ বার একটা রফির গান চালানো হোক,'' বলতে-বলতে মাঝপথেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে মাটিতে। তার আগে অবশ্য সৌজন্যদাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল ভেউ ভেউ করে। বান্টিদার হামাগুড়ি নাচ, দেবদত্তাবৌদির ঘুড়ি ওড়ানো স্টেপ, কাজরীকাকিমার লুচি বেলার স্টেপ— কত যে ইনোভেশন কাল উঠে এসেছিল শ্রীপল্লির মাঠে, তা সতিই ভোলার নয়। রঘুদা তো পুরোটা সময় হাওয়ায় ব্যাটিং করে ছয়ের পর-ছয় মেরে গেল!

রঘুদা! তাই তো। ওকে কোথাও দেখছি না। বিলুদাকেও না! বিকেল থেকে এক বারও দেখতে পাইনি ওদের। গেল কোথায় ওরা? আর তো কিছু ক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব পাটুলির বিসর্জনের ঘাটে।

হঠাৎ চোখ পড়ল বৌদিদের জমায়েতের দিকে। সৌজন্যদার সঙ্গে ওখানে ওটা কে নাচছে? আরে, ওটাই তো বিলুদা! কী হাল করেছে জামা-কাপড়ের! কোথায় ছিল এত ক্ষণ? দেখলাম, সৌজন্যদাকে জড়িয়ে ধরে ওর কানে-কানে কিছু একটা বলছে যেন। কী বলছে ও? রঘুদাই বা গেল কোথায়? ব্যাপারটা সুমেধার চোখেও পড়েছে। কিন্তু আমি খেয়াল করলাম, দ্রুত সৌজন্যদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ও।

বিপ্রকাশের সঙ্গে সৌজন্য সান্যাল এখন এসে দাঁড়িয়েছে ছৌ নাচের দলটার মাঝে। দলকর্তা নাকি কিছু একটা জানতে চায় সৌজন্যর কাছ থেকে। বিপ্রকাশ অন্তত তাকে এমনটাই বলে ডেকে এনেছে। প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল, এখনও তারা নেচে চলেছে একই এনার্জিতে। কখনও লাফাচ্ছে, কখনও উল্টো দিকে ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনও হাওয়ার উড়ে শূন্য দু'পাক খেয়ে ঘুরে বসছে পিচরাস্তার উপর— দু'পায়ের হাঁটু মুড়ে!

তাদের এহেন অনবদ্য কসরত রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে যে সব দর্শর্ক দেখছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো খেয়াল করলেন, ছৌ শিল্পীদের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল বছর বত্রিশের একটি ছেলে। কোঁকড়া চুল, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। তার পরনের সাদা লিনেন জামা ভেসে যাচ্ছে কালচে লাল তরলে! যদিও তাদের কারও চোখেই ধরা পড়ল না, একটি ছৌ মুখোশের আড়ালে প্রতিশোধস্পৃহায় চকচকে একজোড়া চোখ। মুখে তার এখন নৃশংস হাসি!

কাজ সেরে, হাতের চাকুটা ভাঁজ করে সে অবলীলায় চালান করে দিল পাজামার দড়ির ভাঁজে।

২৬

নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে সৌজন্য সান্যাল এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, রঘুবীর মণ্ডল নামের ছেলেটিই তার প্রাণ সংশয়ের জন্য দায়ী! রঘু কেন এই কাজটা করতে গেল, কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না তার।

গতকাল অপারেশনের পর যখন জ্ঞান ফিরল, তার পর থেকেই সে মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল। কিছুই স্পষ্ট মনে পড়ছিল না। শুধু কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি ভেসে উঠছিল চোখের সামনে, মাথার মধ্যে সেগুলো জোড়ার চেষ্টা করার আগেই যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল ছবিগুলো। এটুকু মনে পড়ছে, জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিল পুটাই, চিৎকার করছিল, ‘‘একটু জল... অ্যাম্বুলেন্স... গাড়ি... রিকশা’’ এই সব বলে। তপনদার মুখটাও আবছা মনে পড়ছে তার।

পেটের বাঁ দিকে পাঁচটা সেলাই পড়েছে সৌজন্যর। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ‘‘ক্ষতটা আর ইঞ্চি তিনেক উপরে হলেই পাকস্থলীটা বাজে ভাবে ড্যামেজ হতে পারত।’’

মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই কথাগুলোও।

বিকেলে ভিজ়িটিং আওয়ার্সে শ্রীময়ী এসে যখন বলল, ‘অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার কেস’-এ গ্রেফতার হয়েছে রঘু, তখন যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না সৌজন্যর। আরও অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল শ্রীময়ীর পরের কথাগুলো, ‘রঘুকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে তপনদা পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছে!’ তপনদার তৎপরতাতেই নাকি নিরঞ্জন শোভাযাত্রার ভিড় থেকে রঘুকে দ্রুত গ্রেফতার করতে পেরেছিল পুলিশ। উদ্ধার করতে পেরেছিল, আক্রমণে ব্যবহৃত অস্ত্র, রঘুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহ। রঘু নাকি ছৌ নাচের পোশাকে আত্মগোপন করে চালিয়েছিল এই হামলা!

তার মানে, রঘুর এই হামলার ছকটা ছিল পূর্বপরিকল্পিত... আর ঘটনাচক্রে তপনদা হল প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু তা-ও, জিগশ পাজ়লের টুকরোগুলো যেন কিছুতেই ঠিক-ঠিক জায়গায় বসছে না।

‘‘অ্যাটাক করল তপনদা, তাকে ধরিয়ে দিল রঘু... ব্যাপারটা এ রকম হলেই হিসেবটা মিলত শ্রী...’’ বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিড়বিড় করতে থাকে সৌজন্য সান্যাল।

‘‘তোমাকে আর কোনও হিসেব মেলাতে হবে না সাম্য। বাড়ি ফেরো। তার পর এই ক্লাব, পাড়া, খেলা, পুজো— সব কিছু থেকে বেরিয়ে এসো। এ বার দয়া করে আমাদের একটু শান্তি দাও...’’ শ্রীময়ীর চোখ ভরে এসেছে জলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সৌজন্যর পাশে এসে দাঁড়ায় শ্রীময়ী, জড়িয়ে ধরে তাকে। সৌজন্যর মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে এ বার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সে।

শ্রীময়ীকে একটু সময় দেয় সৌজন্য। তার পর আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করে, ‘‘আমি কবে বাড়ি যাব শ্রী?’’

চোখ মুছে শ্রীময়ী জবাব দেয়, ‘‘বলছে তো পরশু ছুটি দেবে।’’

‘‘যাক বাবা! আচ্ছা শ্রী, মা-বাবা, মিঠাই ওরা সকলে ভাল আছে তো?’’

‘‘ওদের ভাল থাকার কোনও উপায় তুমি রেখছ? মা তো সেই পরশু থেকেই হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছেন ঠাকুরঘরে। বাবা এসেছেন, নীচে অপেক্ষা করছেন। আমি যাই, গিয়ে ওঁকে কার্ডটা দিই,’’ তার পর দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘‘এই রে, আর মোটে দশ মিনিট বাকি! আমি আসছি। কাল আবার আসব। বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’’ সৌজন্যর কপালে একটা ছোট্ট চুম্বন এঁকে, তার মাথার চুলগুলো আলতো করে ঘেঁটে দিয়ে, ৪১০৫ নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যায় শ্রীময়ী সান্যাল।

তপন তরাইকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ। পাটুলি থানার বাইরে বাইকটা পার্ক করে, চাবির রিংটা তর্জনির মধ্যে গলিয়ে, সেটা ঘোরাতে-ঘোরাতে থানায় ঢোকে সে। কনফিডেন্স এখন তার তুঙ্গে। রঘুবীরের কেসটায় এখনও পর্যন্ত সে-ই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। মানে, যে রঘুবীরকে অস্ত্রটা চালাতে দেখেছে। সেই সুবাদে এখন যে তাকে প্রায়শই থানায় আসতে হবে, এতে আর আশ্চর্যের কী!

তপন তরাইয়ের পরিকল্পনা পুরোপুরি খেটে গিয়েছে। সৌজন্য সান্যালের উপর রঘুবীরকে দিয়ে অ্যাটাক করিয়ে তার পর রঘুকেই গ্রেফতার করানো— অ্যাটেম্পট টু মার্ডার কেসে রঘুর সহজে ‘মুক্তি’ নেই। আর ওদিকে সৌজন্য সান্যালের বাড়ির লোক নির্ঘাৎ ঘাবড়ে গিয়ে, বেচারাকে আর পাড়ার কোনও ব্যাপারেই থাকতে দেবে না। সৌজন্য সান্যালকে মেরে ফেলার কোনও পরিকল্পনাই তপনের ছিল না, সে চেয়েছিল ভদ্র বাড়ির ছেলেকে একটা ছুরির খোঁচা ও সামান্য কিছু রক্তের বিনিময়ে জাস্ট প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। খুন করার কথা বললে, রঘুও কী আর রাজি হত! তবে রাগের চোটে রঘুবীর ছুরিটা একটু বেশি গভীরে চালিয়ে দিয়েছে, এই যা। যাক গে, এক ঢিলে দুই পাখি তো সাবাড়!

তবে থানায় ঢুকে একটু ভড়কে গেল তপন। ভিতরে বসে, রঘুবীরের ছায়াসঙ্গী বিপ্রকাশ। ও ব্যাটা এখানে কী করছে!

তপন তরাইকে ঢুকতে দেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন থানার মেজবাবু অনিমেষ সরখেল, ‘‘আসুন-আসুন, তপনবাবু। আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। দেখুন তো, এই ছেলেটাকে চিনতে পারেন কি না?’’

‘‘হ্যাঁ, ও তো আমারই পাড়ার ছেলে, বিলু। ও আবার কী করেছে স্যার? ও-ও কি জড়িয়ে আছে এই ষড়যন্ত্রে?’’

‘‘সে এক বিরাট কাণ্ড!’’ রসিকতার সুরে বলেন অনিমেষ সরখেল। তার পর নাটকীয় ভঙ্গিমায় যোগ করেন, ‘‘দেখুন তো, ওর ফোন রেকর্ডিংয়ের এই ক্লিপগুলোয় গলাটা কার, সেটা চিনতে পারেন কি না?’’

ভয়েস ক্লিপের প্লে বাটনটা অন করলেন মিস্টার সরখেল।

ক্লিপ যত এগোতে লাগল, ততটাই শক্ত হতে থাকল তপন তরাইয়ের চোয়াল...

২৭

‘থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তপনদাকে গ্রেফতার করেছে’, খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা শ্রীপল্লিতে!

এমনিতেই রঘুদার গ্রেফতারি নিয়ে একটা চাপা আলোচনা চলছিল, ব্যাপারটা কারওরই ঠিক হজম হচ্ছিল না। ছৌ নাচের শিল্পীদের দলে মিশে গিয়ে কাণ্ডটা যে রঘুদা নিজে হাতেই ঘটিয়েছে, সেটা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটা ছিল, কার প্ররোচনায়? তপনদার গ্রেফতারিতে ছাই-চাপা আগুনটাকে কেউ যেন খুঁচিয়ে তুলল!

জানা গেল, বিলুদা নাকি আজ সকালে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ওর ফোন রেকর্ডিং থেকেই পুলিশ জানতে পেরেছে, সৌজন্যদার উপর হামলার পুরো ছকটা আসলে তপনদারই করা!

যে বিলুদাকে আমরা আড়ালে-আবডালে ‘মাথামোটা’ বলে ডাকতাম, কারণে-অকারণে আমাদের আড্ডাগুলোকে ফোনে রেকর্ড করা নিয়ে খেপাতাম, সেই বিলুদার কারণেই যে আজ তপনদার মুখোশটা আরও এক বার খুলে গিয়েছে সকলের সামনে— সেটা জেনে এখন ওকে নিয়েই গর্ব হচ্ছে আমাদের। যে রাতে ওকে আর রঘুদাকে এই পুরো প্ল্যানটা বুঝিয়ে ছিল তপনদা, তার পুরোটাই নাকি সেদিন রেকর্ড করে রেখেছিল বিলুদা এবং এখন সেটাই ‘খুনের ষড়যন্ত্র’

রচনার ক্ষেত্রে তপনদার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ! শুনলাম, বিলুদা নাকি রাজসাক্ষী হতে চলেছে।

প্রশ্ন মূলত দুটো। এক, রঘুদা এটা কেন করতে গেল? আর দুই, ষড়যন্ত্র রচনার সময় কোনও রকম প্রতিবাদ না করে, সেই প্ল্যানে সামিল হওয়ার পর এখন বিলুদা থানায় গিয়ে পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করল কেন? রঘুদাকে বাঁচানোর চেষ্টা একটা উদ্দেশ্য তো বটেই, কিন্তু বান্টিদার খবর অনুসারে— রঘুদা গ্রেফতার হওয়ার পর তপনদা ও তন্ময়ের কোনও একটা কথোপকথন বিলুদার কানে আসার পরই নাকি ও বুঝতে পারে, সৌজন্য সান্যাল নামক পথের প্রথম কাঁটাটিকে সরানোর জন্য কী ভাবে দ্বিতীয় কাঁটা মানে রঘুবীরকে ব্যবহার করেছিল তপন তরাই। তার আসল উদ্দেশ্য যে ছিল, এক টানে দুটো কাঁটা উপড়ে ফেলা, সেটা বোঝার পর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে, থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে নিজে, পুলিশের সামনে তুলে ধরে আসল ঘটনা। সৌজন্য সান্যাল যে আসলে ইনোসেন্ট, সেটা জানার পরই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি বিপ্রকাশ।

সৌজন্যদা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে যে মুষড়ে পড়া ভাবটা আমাদের উপর ক্রমে চেপে বসছিল, আজ যেন তা থেকে আমাদের মুক্তি! পাড়ার পুজোর আধিপত্য নিয়ে বন্ধুতে-বন্ধুতে রেষারেষির যে গল্পটা তপনদা সকলকে প্রায় খাইয়ে দিয়েছিল, সেটা কিছুটা হলেও মুখ থুবড়ে পড়ায় স্বস্তি ফিরেছে আমাদের সকলের মনে।

থানায় যাওয়ার আগে, একটা লম্বা ভয়েস নোটে পুটাইদাকে পুরো বিষয়টা জানিয়ে গিয়েছে বিলুদা। সেটা পাওয়ার পরই, সকলকে জরুরি ভিত্তিতে ক্লাবে আসার কথা জানায় পুটাইদা। গ্রুপ মেসেজে লিখেছে, ‘আজ দুপুর বেলা ১২টা। হবে যবনিকা পতন!’

ক্লাবের সেন্টার টেবিলে পুটাইদার ফোনটা রেখে, তার চার পাশে এখন গোল হয়ে বসেছি আমরা। শুনছি, পুজোর আড়ালে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য চক্রান্তের এক রোমহর্ষক কাহিনি।

পুরোটা মন দিয়ে শুনে, প্রথম প্রশ্নটা করল বিম্বো, ‘‘আচ্ছা পুটাইদা, সৌজন্যদার পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশট দেখিয়েই তো রঘুদার বিশ্বাস প্রথম অর্জন করেছিল তপনদা। সৌজন্যদা যদি হোয়াটসঅ্যাপ না-ই পাঠায়, তা হলে ওই স্ক্রিনশটটা তপনদা পেল কোথা থেকে?’’

প্রশ্নটা হয়তো আমাদের সকলের মাথাতেই ঘুরছিল। কিন্তু করল বিম্বো-ই। বিম্বোর পিঠে একটা চাপড় মেরে পুটাইদা বলল, ‘‘সাবাশ বিম্বো, কে বলে তোর মাথায় বুদ্ধি নেই?’’ তার পর নিজের ফোনটা হাতে নিয়ে বলতে লাগল, ‘‘ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। ধর, তোর হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিটা আমি প্রথমে ডাউনলোড করলাম। তার পর আমার হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি হিসেবে সেভ করলাম। আর রুবাইয়ের ফোনটায় আমার নম্বরটা ‘বিম্বো’ বলে সেভ করলাম। এ বার আমি রুবাইকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করলাম ‘পুটাইদা একটা আস্ত গাধা’ লিখে। নে রুবাই, এ বার তোর হোয়াটসঅ্যাপের ইনবক্সটা খোল।’’ স্টেপ বাই স্টেপ বলে গেল পুটাইদা।

আমি হোয়াটসঅ্যাপের ইনবক্সটা খুলে সেটা মেলে ধরলাম সকলের সামনে। সেখানে ‘বিম্বোর পাঠানো’ মেসেজে লেখা, ‘পুটাইদা একটা আস্ত গাধা’।

পুটাইদা বলল, ‘‘নে, এ বার এটার স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দে।’’

অনেকটাই বুঝতে পেরেছি, তাও পুরোটা বোঝার জন্য ‘বিম্বোর পাঠানো’ মেসেজ স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিলাম পুটাইদাকে।

পুটাইদা নিজের ইনবক্স খুলে, কানটা টেনে ধরল বিম্বোর। তার পর নাটক করে বলল, ‘‘বিম্বো! তুই রুবাইকে বলেছিস আমি একটা আস্ত গাধা!’’

ব্যাপারটা প্রায় জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে!

‘‘কিন্তু তপনদার মাথায় এত বুদ্ধি? আমি তো জাস্ট ভাবতেই পারছি না!’’ বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছে জিকোর।

‘‘ভুলে যাস না, তন্ময় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রপআউট। অল্প বয়সে নেশা-ভাং করে, কাকার পাল্লায় পড়ে কাঁচা টাকার চসকা লেগে গেঁজে গেল ঠিকই, কিন্তু ওর বুদ্ধিটা বরাবরই মারাত্মক!’’ বলল পুটাইদা। তার পর কিছুটা উদাস গলাতেই যোগ করল, ‘‘রঘু যদি এত প্যাঁচপয়জার না কষে সৌজন্যকে সরাসরি বলত যে ও ভোটে দাঁড়াতে চায়, আমার মনে হয় সৌজন্যই তাতে সবচেয়ে বেশি খুশি হত! যথাসাধ্য চেষ্টা করত রঘুর ইমেজ বিল্ডআপের জন্য। কী যে মাথায় ঢুকল ছেলেটার!’’

জিঙ্গো বলল, ‘‘সৌজন্যদাকে কাল কখন ছাড়বে গো পুটাইদা?’’

‘‘শ্রীময়ীবৌদিকে ফোন করেছিলাম। বলল, হাসপাতাল বলেছে কাল ফার্স্ট আওয়ারেই ছেড়ে দেবে। তবে ইনশিওরেন্সের কাগজপত্র সব ক্লিয়ার হতে-হতে দুপুর দুটো-আড়াইটে!’’

এ বার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পুটাইদা। একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, ‘‘সৌজন্যকে আনতে কাল তোরা কে-কে যাবি আমার সঙ্গে?’’

আমরা সকলে হাত তুললাম একসঙ্গে। সকলেই বলে উঠল ‘আমি যাব!’

ঠিক সেই সময়ই তিনটে গাড়ির কনভয় নিয়ে আমাদের ক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল এলাকার বিধায়ক মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাসের কালো এসইউভি।

কালো সাফারি সুট-কালো সানগ্লাস পরা দুটো লোক গাড়ি থেকে নেমে, হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে এল ক্লাবের মধ্যে। ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘‘অর্ণাশিস লাহিড়ি কে আছেন?’’

পুটাইদা বলল, ‘‘আমি। কী ব্যাপার বলুন তো?’’

‘‘আপনি একটু আসুন আমাদের সঙ্গে। এমএলএ সাহেব কথা বলতে চান।’’

পুজোর মূল মঞ্চটা খোলা হয়নি এখনও। এটা ছিল অম্লানজেঠু, প্রদীপ্তজেঠুদের আবদার। তাঁদের দাবি ছিল, সৌজন্যদা বাড়ি ফিরলে, ওই মঞ্চেই হবে ওর ‘হোম কামিং পার্টি’ সেলিব্রেশন। আজ সেই মঞ্চটা সেজে উঠেছে একেবারে অন্য ভাবে। বিগত দেড়-দু’মাস ধরে সুমেধার তোলা বিভিন্ন ফটোর কোলাজে। যাতে ধরা আছে ফুটবল খেলা থেকে পুজো, সৌজন্যদার সঙ্গে আমাদের কাজের বিভিন্ন মুহূর্ত। সাজানো-গোছানো, পোজ় দেওয়া ফটো নয়। সবই ক্যানডিড শট। তাই দেখতে বড় ভাল লাগছে। আমার খালি মনে হচ্ছে, এত ফটো সুমেধা তুলল কখন!

কাল দুপুরে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফেরার পর সৌজন্যদাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম নিজের নিজের বাড়ি। আবার ওর কাছে ফিরে এসেছিলাম সন্ধে হতে না-হতেই। পুজোর মণ্ডপে পার্টির প্রস্তাবে একেবারেই রাজি হয়নি সৌজন্যদা। বিধায়ক মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকতে চেয়েছেন শুনে তো আরওই বেঁকে বসেছিল। আমরা সকলে যখন অপারগ, তখন ‘স্নেহ-ভালবাসার আবদার এভাবে ফেরাতে নেই’ বলে, শ্রীময়ীবৌদিই রাজি করিয়েছিল সৌজন্যদাকে।

কোনও টাকা না নেওয়ার শর্তে আজ আবার দেড়শোটা চেয়ার দিয়েছে কল্যাণদা। চেয়ার দেওয়ার সময় আবেগপ্রবণ গলায় বলেছিল, ‘‘গরিব মানুষের আশীর্বাদ আদৌ কোনও কাজে লাগে কিনা জানি না, কিন্তু ধরে নাও, তোমাদের সৌজন্যর জন্য আমি আমার আশীর্বাদটুকু না হয় এভাবেই দিলাম!’’

‘গুল্লু-বিল্লু ডেকরেটার্স’-এর সেই চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে মঞ্চের সামনে। বিকেল সাড়ে চারটে, এখন আর একটা চেয়ারও খালি নেই। পাড়ার বহু মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চের সামনে, আশপাশে।

মঞ্চের উপর আমরা সকলে, মানে সমস্ত ক্লাব মেম্বাররা। সুমেধাও আজ এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করছি, আজ আর কোনও সংশয় নেই সুমেধার মনে, নেই সৌজন্যদাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও প্রবণতা। ওর হাতে আবার উঠে এসেছে প্রিয় ডিএসএলআর। ছোট্ট-ছোট্ট ক্লিপিং ধরে রাখছে তার মেমরি কার্ডে। আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আছে অম্লানজেঠুদের গ্রুপের বেশ কয়েক জন। এবং অবশ্যই আমাদের বিধায়ক, শ্রীমুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস।

চকলেট কেকে সৌজন্যদা ছুরিটা চালাতেই পুটাইদা ও বান্টিদা নিজের-নিজের হাতে ধরা কনফার্টিগুলোতে দিল প্যাঁচ। 'ফট' 'ফট' শব্দে সে দুটো ব্লাস্ট করতেই, রঙিন প্লাস্টিকের হাজার-হাজার টুকরো ছড়িয়ে পড়ল আমাদের মাথার উপরে। বাতাসে ভর করে মাটি স্পর্শ করার আগে, তার বেশ কিছু টুকরো আটকে গেল আমাদের চুলে, কপালে, গায়ে। এখন আক্ষরিক অর্থেই ঝলমল করছি আমরা! আমাদের মুখের হাসিতে ধরা পড়ছে তার রেশ।

টেবিলের উপর রাখা কর্ডলেস মাইক্রোফোনটা নিজেই হাতে তুলে নিলেন বিধায়ক মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস। তার পর আবেগঘন গলায়, নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলতে শুরু করলেন— "বন্ধুগণ, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন শ্রীসৌজন্য সান্যাল— একজন প্রকৃত নেতা ঠিক কেমন হওয়া উচিত, সৌজন্যবাবু তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৌজন্যবাবুর মতো ছেলেদেরই আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। দেশের কাজে, দশের কাজে..."

"দেখেছিস, কেন এসব করতে না করেছিলাম," আমার কানে-

কানে বলল সৌজন্যদা। তার পর বিড়বিড় করতে লাগল, "এ ভাবে এমব্যারাস করার কোনও মানে হয়!"

মুকুন্দ নারায়ণ তখন সম্পূর্ণ নিজের মুডে, তিনি বলে চলেছেন, "এই রত্ন আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার একার নয়। এই কৃতিত্ব আপনাদের। এই শ্রীপল্লির সমস্ত অধিবাসীবৃন্দের। আপনারা, যারা সাড়া দিয়েছিলেন সৌজন্যবাবুর ডাকে— আপনার, যারা দু'হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছিলেন তাঁকে— আপনাদের সকলকে আমার হার্দিক অভিনন্দন। আমাদের পার্টি মনে করে, দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে এমনই সব তরুণ নেতাদের হাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে কথাটা আমি বলতে চলেছি, আমাদের পার্টি তাতে নিশ্চয়ই অনুমোদন দেবে," একটা ছোট্ট বিরতি নিলেন মুকুন্দনারায়ণ। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখলেন সৌজন্যদার দিকে। তার পর বলে বসলেন, "আপনাদের সকলের সম্মতি নিয়ে, আগামী পৌরসভা নির্বাচনে এই ওয়ার্ড থেকে আমাদের দলের প্রার্থী হিসেবে শ্রীসৌজন্য সান্যালের নাম আমি প্রস্তাব করছি।"

পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে নিজের মুখটা মুকুন্দনারায়ণের হাতে ধরা মাইক্রোফোনের সামনে নিয়ে গিয়ে পুটাইদা বলে উঠল, "আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি!"

মুকুন্দনারায়ণ যে বিষয়টাকে সরাসরি এদিকে নিয়ে চলে যাবেন, সেটা আমরা কেউই আন্দাজ করতে পারিনি! ব্যক্তিবিশেষের কোনও একটি কৃতিত্ব বা সাফল্য থেকে রাজনৈতিক দলগুলির টুকরোটাকরা ফায়দা তোলার যে চিরন্তন রীতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত, আমার সকলেই ভেবেছিলাম বিষয়টি হয়তো তার মধ্যেই থাকবে সীমাবদ্ধ। এই সুবাদে শ্রীপল্লির বাসিন্দাদের হয়তো মুকুন্দনারায়ণ বার্তা দেবেন, তিনি আমাদের পাশে আছেন। সোজা কথায়, ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর সস্তা পলিটিক্স— কিন্তু এ তো সৌজন্যদাকেই সরাসরি পার্টির সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান! তবে পুটাইদা যে এই পুরো ব্যাপারটা আগে থেকেই জানত, সেটা এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি।

মুকুন্দনারায়ণের আচমকা ঘোষণায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে সৌজন্যদা। তবে কার্য-কারণ যাই হোক না কেন, মুকুন্দনারায়ণের প্রস্তাবে আমরা কিন্তু দারুণ খুশি। আমাদের প্রত্যেকের চোখ-মুখের ঔজ্জ্বল্যই তা বলে দিচ্ছে। পুটাইদা জড়িয়ে ধরেছে সৌজন্যদাকে। বুকের মধ্যে চেপে ধরে শুধু বলে যাচ্ছে, "উই আর প্রাউড অফ ইউ মাই ব্রাদার। উই আর প্রাউড অফ ইউ!" মঞ্চের সামনে বসে থাকা শ্রীপল্লির বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত করতালি বলে দিচ্ছে, এই প্রস্তাবের সঙ্গে ঠিক কতটা সহমত তাঁরাও।

নিজেকে পুটাইদার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে-করতে সৌজন্যদা বলল, "ওরে, আমার সেলাইগুলো এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি! করছিস কী! ছাড় আমাকে।"

পুটাইদা "সরি-সরি," বলে, আলগা করল বাহুডোর। তার পর সৌজন্যদার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, "আমাদের কচি নেতা!"

সৌজন্যদা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, "শয়তান ছেলে, এই ছিল তোর মনে?" তার পর মুকুন্দনারায়ণের বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে মাইক্রোফোনটা নিল নিজের হাতে। দু'বার ফুঁ দিয়ে দেখে নিল, সেটা চালু আছে কি না। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার গলা খাঁকরানি দিয়ে বলতে শুরু করল সৌজন্যদা, "মাননীয় বিধায়ক, শ্রীমুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস আজ যে সম্মান আমাকে দিলেন, তা কখনও ভুলব না। আজ আপনারা প্রত্যেকে আমার পাশে যে ভাবে দাঁড়িয়েছেন, তাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছি। আমি খুব খুশি হতাম আজ মুকুন্দবাবুর প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারলে। কিন্তু আমি অপারগ।"

এ কী বলছে সৌজন্যদা! ও কী প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে না? আমরা সকলে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। যেন একই প্রশ্ন আমাদের সকলের মনে।

সৌজন্যদা বলে চলে, "এই রাজনীতির খেলায় দিগভ্রষ্ট হয়ে আমার দুই বন্ধু রঘু এবং বিলু আজ পুলিশ কাস্টডিতে। জানি না, ওরা কবে সেখান থেকে মুক্তি পাবে! তপনদার পরিণতিও তাই," তার পর আমাদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সৌজন্যদা যোগ করল, "আমি সত্যিই চাই না, রাজনীতির কারণে আমার আর কোনও বন্ধুকে হারাতে। একথা ঠিক, দশমীর দিনের ওই দুর্ঘটনার পর আমার স্ত্রী, পরিবারের মানুষজন অত্যন্ত ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কেউ চাননি, সুস্থ হয়ে আমি আবার এই পাড়ার কোনও কাজে পুনরায় যুক্ত হই। কিন্তু এটাও ঠিক, আজ এই মঞ্চে আমি এসে দাঁড়িয়েছি আমার স্ত্রীর কথাতেই। আর আমার এই বন্ধুদের ভালবাসায়। আমি একটা সামান্য চাকরি করি, সেটা করি অত্যন্ত ভালবেসে। ওটাই আমি করতে চাই নিষ্ঠার সঙ্গে। রাজনীতিটা ঠিক আমার জন্য নয়। আমাকে আপনারা মাফ করবেন।"

আবেগে বুজে আসে ওর গলা। দুই হাতের চেটোর মধ্যে

মাইক্রোফোনটা চেপে, এ বার হাত দুটো কপালে ঠেকায় সৌজন্যদা।

আমরা সকলে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি মঞ্চে। এ রকম একটা প্রস্তাব যে সৌজন্যদা অবলীলায় ছেড়ে দিতে পারে, তা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কারও। ভোটে দাঁড়ালে সৌজন্যদার জয় যে শুধু সময়ের অপেক্ষা, সেটা এখন পাড়ার প্রতিটি কুকুর-বিড়ালও জানে! এমন একটা অফার, কেউ ফেরাতে পারে? জীবনে এতটা নির্মোহ হওয়া কি কারও পক্ষে সম্ভব?

সন্ধে নামছে শ্রীপল্লির আকাশে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। ওদের কলতান যেন শুনিয়ে দিয়ে গেল 'ঘরে ফেরার গান'। একটা শিরশিরে বাতাস টের পাচ্ছি অনেক ক্ষণ ধরে। এ কী! আমার দৃষ্টিটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? 'আবেগ'— 'ভালবাসা'— 'শ্রদ্ধা'— শব্দগুলো কেন ভিড় করে আসছে মনে? পাশে তাকিয়ে দেখি, সুমেধার চোখের কোল দুটো ভরে উঠেছে জলে। এই দু'দিন আগে পর্যন্ত যে সৌজন্যদাকে এড়িয়ে চলছিল রীতিমতো, আজ সেই মানুষটার কথাতেই কিনা ওর চোখে জল! সত্যি, মেয়েদের মন বোঝা বড় দুষ্কর।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে সেটা প্লেটের উপর নামিয়ে রাখলেন মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস। বাঁ-হাতে ধরা প্লেট এ বার কাপসুদ্ধ নামিয়ে রাখলেন সামনের টি-টেবিলে। দুধসাদা পাঞ্জাবির পকেট থেকে সুতির রুমাল বের করে, চেপে-চেপে মুছলেন ঠোঁটের কোণ দুটো। যা ঢাকা পড়েছে এক জোড়া মোটা গোঁফের অন্তরালে। তার পর একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন, ''তা হলে ওটাই আপনার ফাইনাল ডিসিশন, মিস্টার সান্যাল?''

''হ্যাঁ স্যার। ওটাই ফাইনাল।''

''পার্টি কিন্তু আপনার নামের পাশে শিলমোহর বসিয়েই দিয়েছে। এগজ়িকিউটিভ কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষেই কিন্তু কাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলেছিলাম... আপনার কাউন্সিলার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা!''

''আমি জানি মুকুন্দবাবু। কিন্তু কী করব বলুন, রাজনীতিটা যে আমার আবার ঠিক আসে না!''

''রাজনীতিতে আপনার কেরিয়ার কতটা উজ্জ্বল, সেটা হয়তো আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না সৌজন্যবাবু...''

''সমস্যাটা তো এখানেই স্যার। রাজনীতিকে আমি ঠিক 'কেরিয়ার' হিসেবে দেখতে পারি না। কিছু মনে করবেন না মুকুন্দবাবু... মেয়ের লেখাপড়ার খরচ, এই ফ্ল্যাটের ইএমআই কিংবা আমাদের সংসার খরচের টাকাটা রাজনীতি করে আসুক, সেটা আমি চাই না। রইল বাকি সমাজের জন্য কাজ করার কথা... আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, চাকরি সামলে সেটা আমি ঠিক নিজের মতো করে করে যাব...'' সৌজন্য সান্যালের গলায় ফুটে বেরোয় প্রত্যয়। বরাবরের মতো।

কথাগুলো মুকুন্দনারায়ণের গায়ে লাগার মতো। কিন্তু পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ অসন্তুষ্টির কোনও রেখা ফুটে উঠতে দিলেন না মুখমণ্ডলে। মিষ্টি হেসে বললেন, ''বেশ। আপনার সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নিলাম। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে যদি কখনও মনে হয়, দেশের জন্য, এই সমাজের জন্য আরও বড় স্তরে কিছু করতে চান, তা হলে প্লিজ় আমাকে একটা ফোন করবেন। ফোন নম্বর তো রইলই। আসি তা হলে?'' হাতজোড় করে সৌজন্য সান্যালকে নমস্কার জানালেন মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস। তার পর বললেন, ''বাই দ্য ওয়ে, চা-টা কিন্তু দারুণ বানিয়েছিলে বৌমা! মাঝেমধ্যে এসে খেয়ে যাব কিন্তু...''

মুকুন্দনারায়ণ বিশ্বাস নেমে গেলেন ২/৯৫-এ ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে। লিফ্ট নেই, তাই একটু অসুবিধেই হল তাঁর। নীচের তলায় অপেক্ষা করছিল তাঁর দেহরক্ষীরা। মুকুন্দনারায়ণ নীচে নামতেই তৎপর হয়ে উঠল তারা। দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল এক জন। কালো এসইউভি-র মধ্যে সেঁধিয়ে গেলেন মুকুন্দনারায়ণ। জ্বলে উঠল এসইউভি-র মাথার উপরের নীল হুটার... ফ্ল্যাটের নীচ থেকে বেরিয়ে গেল বিধায়কের তিনটি গাড়ির কনভয়।

সৌজন্য-শ্রীময়ী এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ফ্ল্যাটের ছোট্ট বারান্দায়। বাড়ির পাশের বকুল গাছটায় কিচিরমিচির করছে শত-শত পাখি। একটু আগেই হয়তো বাসায় ফিরেছে তারা। বিধায়কের ফেলে যাওয়া পথের দিকে চোখ রেখে স্বামীর হাতটা আলতো করে ধরে শ্রীময়ী। তার পর মাথাটা তার কাঁধে এলিয়ে দিয়ে বলে, ''এদের কী রাজকীয় জীবন, না?''

''আফসোস হচ্ছে?'' মজা করে বলে সৌজন্য।

''ধুস, কী যে বলো না!'' লজ্জা পায় শ্রীময়ী, তার পর আরও একটু গা ঘেঁষে দাঁড়ায় সৌজন্যর। বলে, ''তুমি আর একটু সুস্থ হয়ে ওঠো, তার পর কিন্তু আমাদের বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা ফাইনাল কোরো... প্লিজ় সাম্য।''

উল্টো দিকের ফ্ল্যাটবাড়িতে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতি। সেখান থেকে ভেসে আসছে শঙ্খধ্বনি। ভেসে আসছে ধুনোর গন্ধ। ভারী মনোরম হয়ে উঠেছে পরিবেশটা।

সাম্য ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শ্রী-কে, নিজের মাথাটা আলতো করে রাখে স্ত্রীর মাথার উপর।

ছবি: সৌমেন দাস

সেরার সিঁড়িতে কিয়ারা

কেরিয়ারের সিঁড়িতে তরতরিয়ে উঠছেন এই নায়িকা। কিয়ারা আডবাণীর সাফল্যের জার্নি সায়নী ঘটকের কলমে

তিনিও আলিয়া। তবে তাঁর স্ক্রিন নেম 'কিয়ারা'তেই মজে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে দর্শককুল। অভিনয়, লাস্য, সৌন্দর্যের জৌলুস ছাড়াও কোনও একটি এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে হিন্দি ছবির এই উঠতি তারকার মধ্যে, যা পুরুষদের হৃদয়ে আধুনিক 'ড্রিম গার্ল'-এর আসনে বসিয়েছে তাঁকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কেরিয়ারের ঠিক রাস্তায় গড়গড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে কিয়ারা আডবাণীর সাফল্য-রথ। তিরিশের কোঠায় সদ্য পা রাখা কিয়ারার ঝুলিতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে দুশো-তিনশো কোটির একাধিক ছবি। নবাগতা হয়েও অক্ষয়কুমার, শাহিদ কপূরদের বিপরীতে নিজের ছাপ রেখে চলেছেন সমান তালে।

কেউ কেউ বলেন, তিনি 'প্রিভিলেজড'। সাউথ মুম্বইয়ের বিত্তশালী পরিবারের সন্তান, যোগাযোগ রয়েছে বলিউডের 'হু'জ় হু'দের সঙ্গে। পারিবারিক সূত্রেও দূর সম্পর্কের সূত্রতা রয়েছে সৈয়দ জ়াফরি এবং অশোককুমারের মতো অভিনেতাদের

ছেলেবেলার বন্ধু ইশা অম্বানি

মায়ের কোলে ছোট্ট কিয়ারা

সঙ্গে। তবে সেই অর্থে 'নেপো কিড' না হলেও কিয়ারা আডবাণী যে কেরিয়ারের শুরুতে সলমন খানের সহায়তা পেয়েছিলেন, আলিয়া থেকে পাল্টে তাঁর 'কিয়ারা' নামটাও যে সলমনেরই দেওয়া, তা অকপটে স্বীকার করেন নায়িকা। ভট্ট পরিবারের বিখ্যাত তারকা-সন্তানের সঙ্গে আর এক উঠতি অভিনেত্রীর নাম

ইশা অম্বানি আমার ছোটবেলার বন্ধু। তা নিয়েও অবশ্য পরবর্তীকালে কম কথা শুনতে হয়নি আমাকে
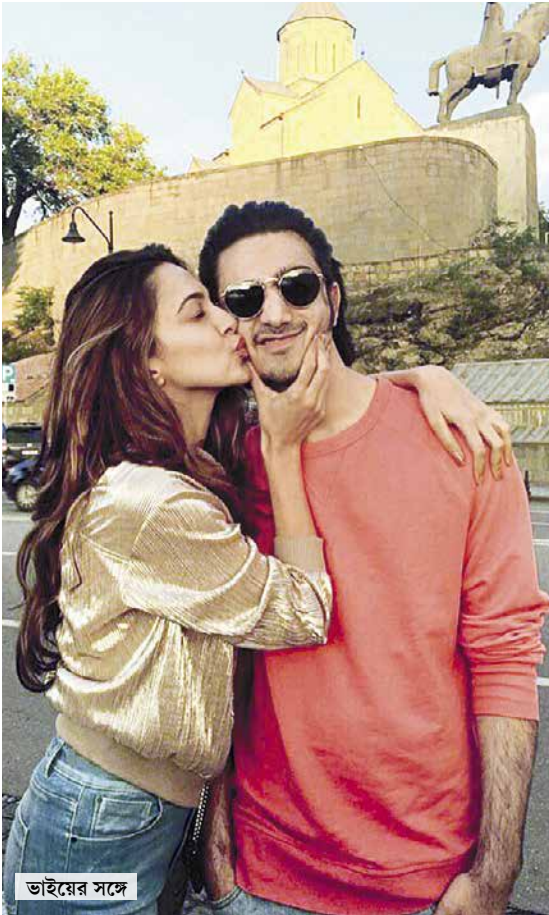
এক হলে মুশকিল, আঁচ করেই কিয়ারার নামকরণ করেছিলেন ইন্ডাস্ট্রির ভাইজান। 'অনজানা অনজানি' ছবিতে প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার চরিত্রের নাম থেকে ধার করে হয়েছিল সেই নামকরণ। অনুপম খের অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি থেকে কোর্স করা কিয়ারার প্রথম ছবি ('ফাগলি', ২০১৪) অবশ্য বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। প্রথম অডিশন, প্রথম সুযোগ সলমনের সৌজন্যে এলেও তার পরের লড়াইটা যে নিজের জোরেই লড়তে হবে, সেটা প্রথম থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন কিয়ারা। ''আগে মনে হত, কোনওক্রমে প্রথম ছবিটা হাতে পেয়ে যাই। একবার মাথাটা গলাতে পারলেই বাকিটা মসৃণ ভাবে শুরু হয়ে যাবে ঠিক। ভাবনাটা যে কতটা ভুল ছিল, 'ফাগলি' ফ্লপ করার পরেই বুঝতে পারলাম। তার পরের সময়টা সত্যিই খুব কঠিন ছিল। একের পর এক অডিশন আর রিজেকশন...'' ব্যর্থতার মুখ দেখেই কেরিয়ার শুরু হয়েছিল কিয়ারার। নিজেই বলেছেন, সে সময়ে প্রত্যেকটা দিন কাটানো কঠিন হয়ে পড়েছিল তাঁর পক্ষে। ভাবতেন, আদৌ কিছু করতে পারবেন তো ইন্ডাস্ট্রিতে? ছোট থেকে মায়ের ওড়না নিয়ে মাধুরী দীক্ষিতের নাচের তালে পা মেলানো মেয়েটির নায়িকা হওয়ার স্বপ্নের উড়ান টেক-অফ করতে না করতেই গোত্তা খেয়ে ধরাশায়ী! তবে হাল ছাড়েননি। 'এম এস ধোনি: দি আনটোল্ড স্টোরি'তে সাক্ষী ধোনির চরিত্র তাঁকে প্রথম সাফল্যের স্বাদ এনে দিল। ছবি হিটের সীমানা পার করল। সুশান্ত সিংহ রাজপুত-দিশা পটানির মাঝে আলাদা করে নজর কাড়লেন কিয়ারা। ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিংহ ধোনির স্ত্রী সাক্ষী নিজে ফোন করে বাহবা দিয়েছিলেন কিয়ারাকে। আর কিয়ারা প্রথম বার অনুভব করলেন, দর্শকের ভালবাসা, গ্রহণযোগ্যতা কাকে বলে। ব্যর্থতার অবসাদে চব্বিশটা ঘণ্টা এক সময়ে কাটতে চাইত না যাঁর, তিনি দিনে বারো-চোদ্দো ঘণ্টা কাজের জন্য সময় বার করতে লাগলেন। ''একসময়ে যাঁরা অডিশনে সুযোগ দেননি, তাঁদের কাছ থেকেই ডাক পেতে শুরু করলাম। তবে তা নিয়ে কখনও বিরূপ মনোভাব তৈরি

ভাইয়ের সঙ্গে

সুশান্তের নায়িকা হয়েই প্রথম সাফল্য

সাহসী কাজ ‘লাস্ট স্টোরি’তে

ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিংহ ধোনির স্ত্রী সাক্ষী নিজে ফোন করে বাহবা দিয়েছিলেন কিয়ারাকে, তাঁর অভিনয়ের জন্য

হয়নি। এমনও নয় যে, আমি সাফল্য পেয়েছি বলেই তাঁরা আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি বলেই তাঁরাও আমার উপরে আস্থা দেখালেন,” প্রত্যয়ী কিয়ারার কণ্ঠ। ধর্মা, নাদিয়াদওয়ালা, ভূষণ কুমারদের অফিস থেকে ঘন ঘন ডাক পেতে শুরু করলেন কিয়ারা।

ইন্ডাস্ট্রির তাবড়দের সঙ্গে চেনাশোনা থাকলেই যে সব সহজ হয়ে যাবে এটা ‘মিথ’, তা বুঝতে পেরে পরিশ্রম করতে শুরু করেছিলেন কিয়ারা। তিনি জানেন, ব্যর্থতার মতোই সাফল্যও ক্ষণস্থায়ী। যে কোনও মুহূর্তে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা। তাই ‘লাস্ট স্টোরিজ়’, ‘কবীর সিংহ’, ‘শেরশাহ’, ‘ভুলভুলাইয়া টু’... পরপর ‘হিট’-এর অংশীদার কিয়ারা স্রোতে গা ভাসাননি। “কেরিয়ারের শুরুতে নতুনদের নিয়ে অনেকে নানা মন্তব্য করেন। ইশা অম্বানি আমার ছোটবেলার বন্ধু। তা নিয়েও পরবর্তীকালে কম কথা শুনতে হয়নি আমাকে। লোকে বলেছে, অম্বানি পরিবারের সঙ্গে ওর ওঠাবসা, ওর আর কিসের চিন্তা! এ দিকে আমার পেশা, আমার পরিশ্রমের সঙ্গে যে তার কোনও সম্পর্ক নেই, তা কাউকে বোঝাতে পারিনি। একই রকম ভাবে সলমনের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যও একই কথা শুনতে হয়েছে আমাকে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও পরে হ্যান্ডল করতে শিখে গিয়েছিলাম,” কিয়ারার ভিতরে কষ্ট রয়েছে এ নিয়ে।

তবে ‘হ্যান্ডল’ করতে যে তিনি ভাল মতোই শিখে গিয়েছেন, তার প্রমাণ এখন তাঁর আত্মবিশ্বাস। ফিল্মি পার্টিতে আগে একা যেতে পারতেন না। কোনও বন্ধু বা পরিচিত কারও সঙ্গে যেতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। আর এখন একাই দাপিয়ে বেড়ান পার্টিতে। প্রথম বার অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির দীপাবলির পার্টিতে আমন্ত্রণ পেয়ে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, “সেই প্রথম বচ্চনদের বাড়িতে যাওয়া। শ্বেতা ম্যাডাম ও পরিবারের বাকি সকলে এত ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন আমার মতো একজন নবাগতাকে, সারা জীবন মনে থাকবে। খুবই সম্মানিত বোধ করেছিলাম বচ্চনদের দিওয়ালি পার্টির প্রথম আমন্ত্রণ পেয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়, অভিনয়জীবনের প্রাপ্তি এগুলোই।”

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে

'যুগ যুগ জিয়ো' ছবিতে বরুণের সঙ্গে

প্রথম প্রেম ক্লাস টেন-এ। বোর্ডের পরীক্ষার আগে ঘনঘন ফোনে কথা বলা চোখ এড়ায়নি তাঁর মা জেনেভিভ আডবাণীর। অতএব মায়ের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া ও চূড়ান্ত বকুনি। ছেলেবেলার সেই প্রেমের ইতি সেখানেই। তাঁর মা-বাবা অবশ্য প্রেম করেই বিয়ে করেছিলেন। স্কুল থেকে একে অপরকে চিনতেন তাঁরা। ''বিয়ের এত বছর পরেও দু'জনে এতটাই ভালবাসায় মজে আছেন যে, আমি আর ভাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যাই। ওঁদের বলি, ''প্লিজ় তোমরা এ বার একটু ক্ষান্ত দাও,'' মা-বাবার সঙ্গে মশকরা করতেও ছাড়ে না মেয়ে। কলেজের ক্লাস কেটে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া, পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য কম বকুনি জোটেনি অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিন্তু এই মা-বাবাই সারা দিন শুটিং করে ফেরার পরে এখন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন কিয়ারাকে। সারা দিন ধরে কী কী হল, শুটিংয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে গল্প শুনতে চান মেয়ে বাড়ি ফেরামাত্র। বিরক্ত হয়ে মেয়ে শুতে চলে যায় নিজের ঘরে। ভাই মিশালের সঙ্গেও খুনসুটি লেগেই থাকে। এক সময়ে ভাইয়ের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি আর মিউজ়িয়মে ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল কিয়ারার। বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে হইহই করে প্রতি শুক্রবার সিনেমা দেখতে যাওয়ারও অভ্যেস ছিল। আর রবিবারে সপরিবার লাঞ্চ। 'ফিল্মি' ছিলেন ছোট থেকেই। ভাল গাইতেও পারেন, যে গুণের কথা অনেকেই জানেন না। মায়ের সঙ্গে ছোট্ট কিয়ারা বেবি প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনও করেছিলেন মাত্র আট মাস বয়সে। তবে প্লে-স্কুলে পড়ানো দিয়ে চাকরিজীবন শুরু করা মেয়েটি এক সময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করবেন, সে কথা কেউই ভাবেননি।

এখন কেউ প্রশ্ন করলে সযত্ন এড়িয়ে যান প্রেমে পড়ার প্রসঙ্গ। 'সত্যিকারের প্রেমে একবারই পড়েছি'— এ কথা স্বীকার করলেও সিদ্ধার্থ মলহোত্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কিয়ারা সরাসরি স্বীকার করে নেননি এখনও। চলতি বছরের জুলাই মাসের শেষ দিনে নিজের ৩০ বছরের জন্মদিন কাটাতে প্রিয় 'মাঙ্কি'র (সিদ্ধার্থকে ভালবেসে এই নামেই ডাকেন কিয়ারা) সঙ্গে দুবাই গিয়েছিলেন

সিদ্ধার্থ মলহোত্রের জীবনে আলিয়া ভট্টের পরে দ্বিতীয় আলিয়ার অনুপ্রবেশ 'শেরশাহ'র শুটিংয়ের সময় থেকে

নায়িকা। সেখানে ফ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে আলাদা আলাদা ছবি তুলেছেন দু'জনেই। নেটিজ়েনরা দুয়ে দুয়ে চার করেছেন সে ছবি দেখে। সিদ্ধার্থের জীবনে আলিয়া ভট্টের পরে দ্বিতীয় আলিয়ার অনুপ্রবেশ 'শেরশাহ'র শুটিংয়ের সময় থেকে। দু'জনের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি ছবিকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকটাই। করণ জোহরের জন্মদিনের পার্টি হোক বা আরমান জৈনের বিয়ে, মলদ্বীপ কিংবা সাউথ আফ্রিকায় ছুটি কাটানো— সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম না করে দু'জনেই ঘনিষ্ঠতার আভাস দিয়ে থাকেন নানা উপায়ে। 'কফি উইথ করণ'-এর চলতি সিজ়নে এসে অনন্যা পাণ্ডে তো একপ্রকার বলেই দিলেন সে কথা। মাঝে দু'জনের ছাড়াছাড়ির খবর শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। সে সময়ে করণ জোহর নিজেও নাকি মধ্যস্থতা করেছিলেন এ ব্যাপারে। বিভিন্ন পার্টি, ডিনার বা লাঞ্চ-ডেট কিংবা এয়ারপোর্টে যুগলের উপস্থিতি এখন নজর এড়ায় না কারও। মুম্বইয়ের পাপারাৎজ়ির খ্যাতি কী আর সাধে!

তবে এই ছবিশিকারিদের জেরেই একাধিক বার জেরবার হতে হয়েছে কিয়ারাকে। সম্মুখীন হতে হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিংয়েরও। নিজেই এক সাক্ষাৎকারে কিয়ারা জানিয়েছিলেন সে কথা, ''ইন্ডাস্ট্রির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। অসম্ভব দেরি হয়ে গিয়েছে, তাই প্রায় দৌড়চ্ছিলাম। গাড়ি থেকে নামতেই যথারীতি ফোটোগ্রাফাররা ঘিরে ধরেন। কয়েকজন ফ্যান ছবিও তুলতে চান পাশে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে এতটাই তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম যে, অনুরোধ রাখতে পারিনি। পরের দিনই দেখি, সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমাকে নিয়ে

'কবীর সিংহ'-এর সেটে, শাহিদ কপূরের সঙ্গে

অনেকে আমার সঙ্গে প্রীতিকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের বোঝাতে হয়েছিল, আমি কিন্তু অভিনীত চরিত্রটির মতো নই

লেখা হয়েছে, আমি নাকি অত্যন্ত নাক উঁচু, অহঙ্কারী। এডিট করে আমার ভিডিয়ো ক্লিপও ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে। খুব খারাপ লেগেছিল সে সময়ে। এখন আর লাগে না অবশ্য। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও কমেন্টই পড়ি না এখন। মজার কমেন্ট হলে লক্ষ করি অবশ্য। আমার হলুদ রঙের একটা ফেদার্ড পোশাক নিয়ে একবার 'টু মিনিটস নুডলস'-এর মতো কমেন্ট দেখেছিলাম। এই ধরনের মন্তব্যে মজা পাই। তবে ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ান যাঁরা, তাঁদের পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।''

ট্রোলিংয়ে পাত্তা না দিলেও কিয়ারা মনে করেন, কখনও কখনও জোরালো ভাবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা জরুরি। আগে ভক্তদের কী ভাবে সামলাবেন, বুঝে উঠতে পারতেন না। এমনও হয়েছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে কোনও ভক্ত বহুতলের অজস্র সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে দরজায় কড়া নেড়েছেন। কিংবা আবাসনের বাগানে ওয়ার্কআউট করার সময়ে এসে ছবি তোলার আবদার করেছেন। এখন অভিনেত্রী পোড় খেয়ে অনেকটাই পোক্ত, সহজেই 'ম্যানেজ' করতে পারেন পাপারাৎজ়ি, ফ্যান, ট্রোলদের। আর পাঁচজন 'স্টার'-এর মতোই।

কেউ ভুল বুঝলে বা অসম্মান করলে কষ্ট পান। যেমন পেয়েছিলেন, 'কবীর সিংহ'র মুক্তির পরে। প্রীতির চরিত্রে কিয়ারার কম কথায় বাঙ্ময় অভিনয় এক দিকে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছিল, অন্য দিকে, নারীবিদ্বেষ ও উগ্র পুরুষতন্ত্রের সামনে নত হওয়ার 'অপরাধ'-এ
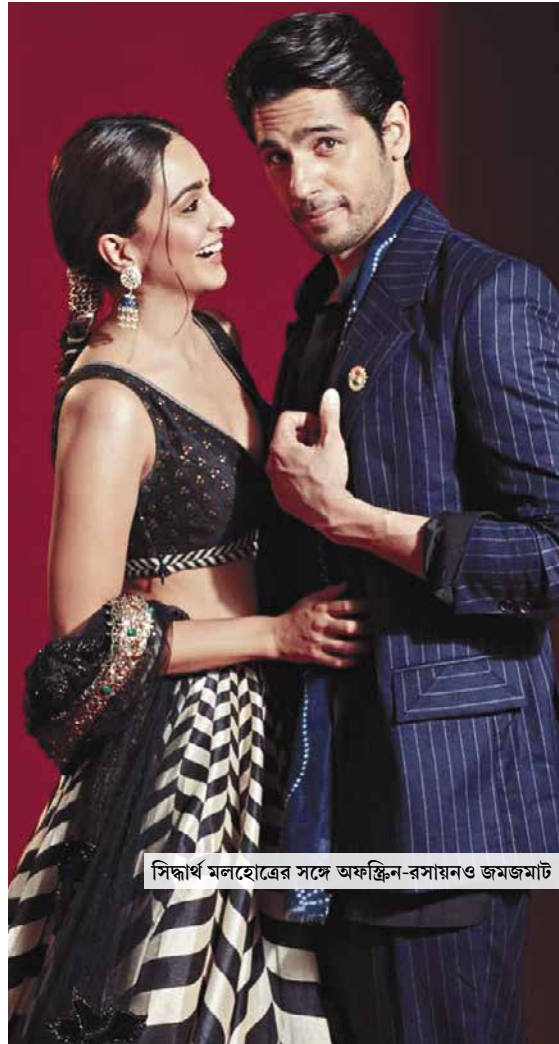
সিদ্ধার্থ মলহোত্রের সঙ্গে অফস্ক্রিন-রসায়নও জমজমাট

তবে এখনও মাটিতে পা রেখে চলতে বিশ্বাসী কিয়ারা আডবাণী। নায়কের ‘আর্মক্যান্ডি’ হয়েই শুধু থাকতে চান না।

ফিটনেস ফ্রিক কিয়ারা

সমালোচনায় বিদ্ধও হতে হয়েছিল নায়িকাকে। “অনেকে আমার সঙ্গে প্রীতিকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের বোঝাতে হয়েছিল, আমি ব্যক্তিমানুষটি কিন্তু আমার অভিনীত চরিত্রের মতো নই। অভিনেত্রী হিসেবে কোনও চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলাই আমার কাজ। তাকে ‘জাজ’ করা নয়,” বলেছিলেন কিয়ারা। ‘কবীর সিংহ’ জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছিল। সে বছরই মুক্তি পেয়েছিল ‘গুড নিউজ়’। অক্ষয়কুমার, করিনা কপূর, দিলজিৎ দোসাঞ্জের পাশে জায়গা করে নিয়েছিলেন কিয়ারা। কমেডির মোড়কে আইভিএফ নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছিল সে ছবিতে, যা বক্স অফিসে তিনশো কোটির গণ্ডি পার করে। তবে এ সবেরও আগে ‘অভিনেত্রী’ কিয়ারাকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল ‘লাস্ট স্টোরিজ়’-এ। এই নেটফ্লিক্স অ্যান্থলজিতে করণ জোহর পরিচালিত ছবিতে ভিকি কৌশলের স্ত্রীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল কিয়ারাকে। অসুখী দাম্পত্য থেকে বেরোতে চাওয়া মেঘা অর্থাৎ কিয়ারার চরিত্রটি প্রশংসিত হয়েছিল। প্রযোজক-পরিচালকদের নজরেও পড়েছিলেন কিয়ারা। ভিকি কৌশলের সঙ্গে আরও একটি ছবির শুটিং শেষ করেছেন কিয়ারা সম্প্রতি। ‘গোবিন্দ নাম মেরা’ নামের সেই ছবি আপাতত মুক্তির অপেক্ষায়। দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণের সঙ্গে জুটি বেঁধে তেলুগু ছবি ‘আরসি ফিফটিন’-এও কাজ করেছেন কিয়ারা। শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘যুগ যুগ জিয়ো’র প্রচারে বরুণ ধওয়নের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন কিয়ারা। ঝটিকা সফরে সাক্ষাৎকার দেওয়ার পাশাপাশি হলুদ ট্যাক্সিতে নগর-দর্শন ও পার্কস্ট্রিটের বিখ্যাত বেকারি-রেস্তরাঁয় ব্রেকফাস্ট সেরে নিতেও ভোলেননি।

গত চার বছরের মধ্যে তাঁর একের পর এক ছবি সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তবে এখনও মাটিতে পা রেখে চলতে বিশ্বাসী কিয়ারা আডবাণী। নায়কের ‘আর্মক্যান্ডি’ হয়েই শুধু থাকতে চান না, চান নিজেকে ভাঙতে। তাঁর বড় ইচ্ছে, অ্যাকশন ছবিতে অভিনয় করার। অথচ অভিনেত্রীর কাছের মানুষরা জানেন, পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজেও ভয় পান কিয়ারা, ওরফে তাঁদের আলিয়া! বন্ধুদের ‘অ্যাল্স’। ঘরের মেয়েটি যে কখন বড় হয়ে গিয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে অসংখ্য মানুষের ভালবাসার দরবারে, টেরই পাননি কেউ!

হাসিমুখের এক ঘাতক

অনুশীলন করতে ছোটবেলায় উত্তরাখণ্ড থেকে মায়ের সঙ্গে গভীর রাতে বাসে দিল্লি আসা। বাবাকে হারিয়েও খেলতে নেমে পড়া, ক্রিকেটবিশ্বকে শাসন করা। ঋষভ পন্থের গলি থেকে রাজপথে উত্তরণের কাহিনি লিখলেন কৌশিক দাশ

ফ্ল্যাশব্যাক

স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। ঠিক দেখছেন তো? এ তো অম্বেডকর স্টেডিয়াম। ভুল হয়ে গেল নাকি! তা হলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘড়ির কাঁটা তখন বিকেল পাঁচটা ছুঁইছুঁই। হাতে আর সময় নেই। কোনও মতে কয়েক জনের কাছে জানতে চাইলেন— এটা তো দিল্লির ক্রিকেট স্টেডিয়াম নয়। ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠটা কোথায়? শুনলেন, তিনি ভুল করে পাশের স্টেডিয়ামে চলে এসেছেন। যে সময়ের মধ্যে তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল, তা প্রায় পার হয়ে গিয়েছে। কোটলায় (এখন অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) পৌঁছতে আরও কিছুটা সময় গেল। কিন্তু মা তো হেরে যাওয়ার মানুষ নন। দৌড়তে
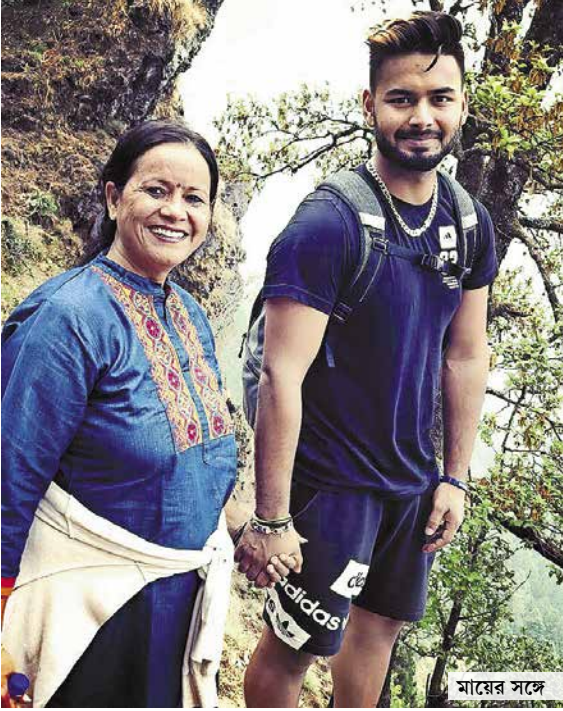
মায়ের সঙ্গে

ঋষভ এবং ধোনি

দৌড়তে কোটলায় ঢুকে যখন সংশ্লিষ্ট লোকের হাতে ছেলের স্কুলের সার্টিফিকেটটা তুলে দিলেন, তখন সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, কোনও ক্ষতি হয়নি। ‘স্পেশ্যাল কেস’ বলে একটু বাড়তি সময় চেয়ে রাখা হয়েছিল। জানতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সরোজ পন্থ। ঋষভ পন্থের মা!

২০১৩ সালের ঘটনা। বিনু মাঁকড় ট্রফির জন্য তখন দিল্লির অনূর্ধ্ব-১৯ দল বাছাই হচ্ছে। ঋষভ পন্থ নামে একটি ছেলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে। ছেলেটির প্রতি নজর ছিল তখনকার দিল্লির নির্বাচক প্রধান নিখিল চোপড়ার। কিন্তু দিল্লির ক্রিকেট তো আর যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের মতো সোজা রাস্তা নয়। সেখানে অনেক কানাগলি। ঠিক যেন ভুলভুলাইয়া। কোথায় যে কোন উঠতি প্রতিভা হারিয়ে যাবে, কেউ জানে না। সে রকমই অবস্থা হয়েছিল বছর ষোলোর কিশোরের।

দল নির্বাচনের ঠিক আগে হঠাৎ করে ঋষভকে জানিয়ে দেওয়া হয়, স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট না পেলে তাঁর নাম ভাবা হবে না। শুনে মাথায় হাত শুভানুধ্যায়ীদের। ঋষভ পড়াশোনা করেছেন তাঁর জন্মস্থান উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে। দিল্লি থেকে ছ’ঘণ্টার রাস্তা। কী করে সময়মতো পাওয়া যাবে ওই সার্টিফিকেট? যোগাযোগ করা হল ঋষভের মা সরোজ দেবীর সঙ্গে। তিনি ছুটলেন রুরকির স্কুলে। সেখান থেকে সার্টিফিকেট বার করে উঠে পড়লেন বাসে। কিন্তু দিল্লি নেমে কোটলায় আসার বদলে তিনি সে দিন চলে যান অম্বেডকর স্টেডিয়ামে।

ওই সময় এক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওই ক্রিকেটার বিশেষ অনুরোধ করে বাড়তি কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছিলেন ঋষভের জন্য। যে কারণে দিল্লির অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়ে যান ওই তরুণ ক্রিকেটার। এবং বাকিটা যাকে বলে ইতিহাস।

দিল্লি ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত লোকজনের সঙ্গে কথা বললে যেমন জানা যায় সে দিনের কথা, তেমনই এখনও অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, সে দিন যদি মা না পৌঁছতে পারতেন, তা হলে

ঋষভের মা সরোজ দেবী ছুটলেন রুরকির স্কুলে। সেখান থেকে সার্টিফিকেট বের করে উঠলেন বাসে...

কী হত! একটা বছর নষ্ট হত ঋষভের। এবং, সেই এক বছরে বদলে যেতে পারত ভাগ্যের চাকা।

প্রথম পর্ব: কাঁটা বিছানো রাস্তা

খুব ছোট থেকেই ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছিল ছেলেটি। রুরকিতে আর ক’টা মাঠই বা ছিল। খেলা হত ম্যাটের উইকেটে। আর সেখানে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলতে হত খুদে ঋষভকে। কিন্তু তাতে কোনও সমস্যা হয়নি। পাঁচ-সাত বছরের বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলতে নেমে দশটার মধ্যে অন্তত আটটা প্রতিযোগিতাতেই সেরা ক্রিকেটারের সম্মান ছিনিয়ে আনত ঋষভ। আর ২০ ওভারের ম্যাচ হত বলেই তখন থেকে আগ্রাসী ক্রিকেটটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল ঋষভের।

বাবা রাজেন্দ্র নিজেও ক্রিকেট খেলতেন। কিন্তু একটা পর্যায়ের বেশি এগোতে পারেননি। পরিবারের সমর্থন কখনও যে পাননি রাজেন্দ্র পন্থ। কিন্তু ঠিক করেছিলেন, ছেলের পাশে সব সময়ে থাকবেন। আর শুধু থাকা-ই নয়, অভিনব এক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি ঋষভের মন থেকে ফাস্ট বোলারের ভয়টাও চিরতরে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন।

রুরকিতে বেশির ভাগ পিচ ম্যাটের ছিল। সেখানে অনুশীলন সেরে ঋষভ যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন তৈরি থাকতেন বাবা। হাতে একটা কর্কেট বল নিয়ে। যে বল অত্যন্ত শক্ত। জোরে গায়ে লাগলে অবশ্যই যন্ত্রণা হবে। কংক্রিটের ছাদে ছোট্ট ঋষভকে নিয়ে গিয়ে ওই কর্কেট বল ছুড়ে ছুড়ে অনুশীলন করাতেন বাবা। কংক্রিট হওয়ায়

সপরিবার

অভিনব এক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে রাজেন্দ্র ছেলের মন থেকে ফাস্ট বোলারের ভয় পুরোপুরি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন।

বলের গতি অনেক বেড়ে যেত। বুকের সামনে একটা বালিশ বেঁধে দিতেন। যাতে সেখানে চোট না লাগে। হাতে-পায়ে লাগলে লাগুক, কুছ পরোয়া নেহি। রাজেন্দ্র পন্থ নিজেই এক বার বলেছিলেন, ‘‘আমি চেয়েছিলাম, ছেলের মন থেকে যেন ফাস্ট বোলারদের ভয়টা দূর হয়ে যায়। বালিশটা বাঁধা থাকত চোট এড়ানোর জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অনেক বার চোট পেয়েছে।’’ ২০২২ সালে পিতৃদিবসে এসে সেই অনুশীলনের কথা নিজের মুখেই মনে করিয়ে দিয়েছেন ঋষভ।

ছোটবেলা থেকেই শরীরে আঘাত পেতে পেতে লোহা থেকে ইস্পাতে বদলে গিয়েছিলেন ঋষভ। যতই আঘাত পান, তখন থেকেই তাঁর মুখে লেগে থাকত সারল্যে ভরা সেই হাসিটা। যা এখনও ঋষভের লড়াইয়ে তাঁর অন্যতম রসদ।

ভারতীয় ক্রিকেট তারকার কাছে এখনও অমূল্য হয়ে আছে একটা এসজি ব্যাট, যা তাঁর বাবা ১৪০০ টাকায় কিনে দিয়েছিলেন ছোটবেলায়। মা পছন্দ করেননি এত টাকা একটা ব্যাটের পিছনে খরচ হওয়ায়। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে ঋষভের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার নেপথ্যে কিন্তু বাবার চেয়েও একটা সময়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন মা সরোজ।

ঋষভের বয়স তখন বছর ১২। রুরকিতে দু’বেলা অনুশীলন চলছে। স্কুলে দু’বাক্স টিফিন নিয়ে যেত ছেলেটা, যাতে খাওয়ার জন্য বাড়িতে এসে সময় নষ্ট না হয়। কিন্তু এই ভাবে কত দিন? হঠাৎ খবর আসে দিল্লির সনেট ক্লাবে প্রতিভাবান খুদে ক্রিকেটার বেছে নেওয়ার ট্রায়াল হবে। আর সেই সব প্রতিভাবানকে বেছে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দিল্লিতে পৌঁছে সনেট ক্লাবের ট্রায়ালে যোগ দেয় ঋষভ। সেই ট্রায়ালে কোচ তারক সিংহের হিরে চিনে নিতে ভুল হয়নি। ঠিক হয়, প্রথমে সপ্তাহে দু’দিন করে অনুশীলনে আসতে হবে ঋষভকে।

অত অল্প বয়সের ছেলে কী করে আসবে রুরকি থেকে ছ’ঘণ্টা বাসযাত্রা করে? তখনই এগিয়ে আসেন মা।

মোটামুটি রাত দু’টোয় শুরু হত মা-ছেলের যাত্রা। নানা সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে যে যাত্রার কথা বলেছেন ঋষভই। রুরকি থেকে রাতের বাসে উঠে পড়তেন তাঁরা। পুরো রাত বাসে কাটিয়ে পরের দিন ভোরে পৌঁছে যেতেন দিল্লি। সারা রাত মা চোখের পাতা এক করতে পারতেন না। কারণ, ছোট্ট একটা বাচ্চাকে নিয়ে যে রাতের বাসযাত্রা কখনওই সে রকম নিরাপদ নয়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মা তাঁর বছর বারোর ছেলেকে নিয়ে যখন দিল্লিতে নামতেন, তখনও ভোরের আলো ফুটত না। কিন্তু তত দিনে ঋষভের জীবনে সূর্যোদয়ের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে সংগ্রাম শেষ হয়নি। মা-ছেলে কারওই। ছেলে তো চলে গেল অনুশীলনে। মা কী করবেন? খাওয়াদাওয়ারই বা কী হবে? সনেট ক্লাবের অ্যাকাডেমির কাছেই ছিল মোতিবাগ গুরুদ্বার। ছেলে অনুশীলনে চলে যাওয়ার পরে মা চলে যেতেন গুরুদ্বারে। সেখানে ‘সেবা’র কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। খাদ্য পরিবেশন করতেন ক্ষুধার্তদের। এবং রাতে, মা-ছেলে শুয়ে থাকতেন ওই গুরুদ্বারেই। খাওয়াদাওয়াও হত ওখানে।

ঋষভ তখনও হাসতেন।

কিন্তু কোচ তারক সিংহ এবং বাবা-মা বুঝেছিলেন, এই ভাবে চলতে পারে না। সপ্তাহে দু’দিন অনুশীলন করে কত দূর যেতে পারে একটা ছেলে? তখন তারক স্যারের চেষ্টায় দিল্লির একটি স্কুলে সুযোগ পেয়ে যায় ঋষভ। ঘুরতে থাকে ভাগ্যের চাকাও।

দ্বিতীয় পর্ব: ওঠা-পড়ার কাহিনি

ঋষভের ক্রিকেট জীবন ‘টেক অফ’ করার পিছনে মা ছাড়াও দু’জনের অবদান খুবই বেশি। প্রথম জন, বাবা রাজেন্দ্র। দ্বিতীয় জন,

ঋষভের জীবনে কোচ তারক সিংহের অবদান বিরাট

এজবাস্টন টেস্টে ঋষভের সেঞ্চুরি

কোচ তারক সিংহ। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা কেউই আজ আর বেঁচে নেই। কোচ তারক সিংহের কথা ঋষভের জীবনে বেদবাক্য হয়ে উঠেছিল। কোচ এক বার বলেছিলেন, স্টান্স আর ব্যাটিং গ্রিপ বদলে ফেললে আরও সফল হবেন ঋষভ। যে কথা শুনে রাত দু'টোতেও ব্যাট হাতে ঘরের মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন ঋষভ। এবং চলত অবিরাম অনুশীলন। কোচ বলেছেন, তাই যে ভাবেই হোক ঠিক করতে হবে ব্যাটের গ্রিপ। কোচের মন্ত্র ছিল, এমন ভাবে অনুশীলন করবে যাতে 'মাসল মেমরি'র অংশ হয়ে যায় তোমার স্টান্স আর গ্রিপ। সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দু'বছর ধরে অনুশীলন করে নিজেকে ধারালো করে তুলেছিলেন ঋষভ।

দিল্লিতে সনেট ক্লাবে বছর দু'য়েক অনুশীলন করার পরে ঘনিষ্ঠরা ঋষভকে বলেন, দিল্লি নয়, তুমি রাজস্থানে চলে যাও খেলতে। বলার পিছনে কারণ ছিল, দিল্লি ক্রিকেটের রাজনীতি। অনেকেই ভয় পেয়েছিলেন, ঋষভের মতো 'বহিরাগত' হয়তো হারিয়ে যাবে দিল্লি ক্রিকেট রাজনীতির ভুলভুলাইয়ায়। যে কারণে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট খেলতে ঋষভকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজস্থানে। সেখানে অনূর্ধ্ব ১৪ এবং ১৬ দলে খেলার পরেও একই বৈষম্যের শিকার হতে হয় ঋষভকে। অর্থাৎ গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় 'বহিরাগত' তকমা। তাঁকে বলা হয়, নতুন নিয়মে কোনও বাইরের রাজ্যের ক্রিকেটার রাজস্থানের হয়ে খেলতে পারবে না। অবস্থা দেখে ঋষভ সিদ্ধান্ত নেন, রাজস্থানে কিছু হবে না। ডুবতে হলে দিল্লিতে গিয়েই ডুবব। অতএব— আবার দিল্লি চলো!

ঋষভের ক্রিকেট জীবন ছুটতে শুরু করে অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট থেকে। প্রথমে দিল্লি দল। যেখানে প্রায় একটা বছর নষ্ট হতে চলেছিল এই প্রতিভাবান উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের। কিন্তু মা সরোজ দেবীর তৎপরতায় ঠিক সময়ে স্কুল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে দিল্লি দলে জায়গা করে নেন ঋষভ। এর পরে ২০১৫ সালে রঞ্জি অভিষেক। যার এক বছর পরেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি। ছেলের বয়স তখন ১৮। পরের বছরেই ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া। এবং, তার পর থেকেই দুনিয়া টের পেতে থাকে ঋষভ পন্থ নামে একটি ছেলে উল্কাগতিতে ধেয়ে আসছে ক্রিকেট মহাকাশে।

ঋষভ নামের উল্কার তেজ ক্রিকেটবিশ্ব প্রথম পেয়েছিল বাংলাদেশের যুব বিশ্বকাপে। নেপালের বিরুদ্ধে ২৪ বলে ৭৮।

যে উল্কার তেজ ক্রিকেটবিশ্ব প্রথম পেয়েছিল বাংলাদেশের ওই যুব বিশ্বকাপে। নেপালের বিরুদ্ধে ২৪ বলে ৭৮। ওই ম্যাচে যুব বিশ্বকাপের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি আসে ঋষভের ব্যাটে। এর পরে কোয়ার্টার ফাইনালে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি। যে সেঞ্চুরি থেকে দুটো ব্যক্তিগত প্রাপ্তি হয়েছিল এই তরুণ প্রতিভার।

সে বার অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভের অন্যতম প্রিয় ক্রিকেটার। ঋষভের বরাবরের ইচ্ছে ছিল দ্রাবিড়ের সঙ্গে একটা ছবি তুলবেন। কিন্তু সে কথাটা কোচকে বলার সাহস করে উঠতে পারছিলেন না। তার পরে ঠিক করে নেন, সেঞ্চুরি করে ছবির কথা বলবেন। নামিবিয়ার সঙ্গে ওই সেঞ্চুরির পরেই দ্রাবিড়ের সঙ্গে ছবি তোলার স্বপ্নপূরণ হয়।

দ্বিতীয় প্রাপ্তিটি, আইপিএল চুক্তি। বেশ কয়েকটি আইপিএল দলের নজরে ছিলেন ঋষভ। আর ওই সেঞ্চুরির পরে দেরি না করে ঋষভকে ১ কোটি ৯০ লাখে তুলে নেয় তৎকালীন দিল্লি ডেয়ারডেভিলস! যে দলে তিনি আজ অধিনায়ক।

তৃতীয় পর্ব: শেষ নয়, শুরু

ঋষভের ক্রিকেট জীবন আলোকিত করেছেন দুই গুরু। দুর্ভাগ্যবশত, ক্রিকেট জীবনের মধ্যগগনে পৌঁছনোর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে

ঋষভ বরাবরই আগ্রাসী

হাতে ক্ষত নিয়েও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। আর ম্যাচ খেলতে নেমে ৩৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন তিনি।

গিয়েছেন তাঁরা।
আইপিএল অভিষেকের পরের বছরই ঋষভের জীবনে নেমে আসে কালো একটা দিন। তখন ২০১৭ সালের আইপিএল চলছে। সে বছর এপ্রিল মাসে হঠাৎ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মারা যান রাজেন্দ্র পন্থ। ঋষভ তখন দিল্লিতে। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন রুরকিতে। শেষকৃত্যের দু'দিন পরেই ছিল বেঙ্গালুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে ম্যাচ। এরই মধ্যে আবার এক বিপত্তি। শেষকৃত্য করতে গিয়ে ঋষভের বাঁ-হাত একটু পুড়ে যায়। একে ও রকম একটা মানসিক ধাক্কা, তার উপরে বাঁ-হাতেই জখম। সবাই ধরে নিয়েছিলেন, কয়েক দিন এখন আইপিএল থেকে দূরেই থাকতে হবে। এক জন শুধু অন্য রকম ভেবেছিলেন। তিনি ঋষভ। তিনি যে এক যোদ্ধা। পরের দিন সকালেই উড়ে যান বেঙ্গালুরু। দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। আর ম্যাচ খেলতে নেমে ৩৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করে যান।
দ্বিতীয় ধাক্কাটা আসে গত বছর। যখন ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে মারা যান কোচ তারক সিংহ। তারকবাবুকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন আর ভালবাসতেন ঋষভ। কোচের প্রতি কতটা ভালবাসা আর শ্রদ্ধা ছিল ছাত্রের, তা বোঝা যায় তারকের মৃত্যুর পরে ঋষভের শ্রদ্ধার্ঘ্যতে। টুইটারে ঋষভ লিখেছিলেন, ‘‘আমার মেন্টর, কোচ, প্রেরণার উৎস। আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক এবং সবচেয়ে বড় ভক্ত। নিজের ছেলের মতো আমার খেয়াল রেখেছিলেন আপনি। আমি আজ বিধ্বস্ত। তবে যখনই আমি মাঠে নামব, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি, তারক স্যর।’’
তবে তারক সিংহ দেখে যেতে পেরেছিলেন, তাঁর ছাত্র কী ভাবে ক্রিকেট বিশ্বে ঝড় তুলে দিতে পেরেছেন। কী ভাবে টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মাঠে। কী ভাবে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ বলে পরিচিত গ্যাবায় ব্যাট হাতে ঐতিহাসিক জয় এনে দিয়েছেন ভারতকে। তবে তারক স্যর দেখে যেতে পারলেন না কী ভাবে এজবাস্টন টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসাধারণ, আগ্রাসী এক সেঞ্চুরি করে গেলেন ঋষভ। সেই সেঞ্চুরির জন্য প্রয়াত কোচকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান।
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়— সকলেই মোহিত হয়েছেন এই তরুণের আগ্রাসী ক্রিকেটে। তার চেয়েও বড় কথা, ভারতীয় ক্রিকেটের নেপথ্যে থাকা মস্তিষ্করা ঋষভকে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর হাতে সাময়িক দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু ঋষভের এই রাস্তায় শুধু ফুলই নয়, কাঁটাও ছড়ানো আছে। তাঁর উইকেটকিপিং নিয়ে নিরন্তর প্রশ্ন উঠেছে। তুলনা হয়েছে কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে। এমনকি, প্রথম দিকে ঋষভ যখন ভারতের হয়ে উইকেটকিপিং করতেন, গ্যালারির একটা অংশ থেকে ‘ধোনি-ধোনি’ আওয়াজ উঠত ঋষভকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু তখনও হাসিটা মুছে যেতে দেননি ঋষভ।
ব্যাটিংয়ের সময়ে অনেক বারই উইকেট ছুড়ে দিয়ে এসেছেন তিনি। যা নিয়ে সমালোচনার তিরে জর্জরিত হতে হয়েছে। তাঁর অদ্ভুত সব শট খেলা দেখে ভ্রু কুঁচকেছেন অনেকেই। এ-ও বলা হয়েছে, অধিনায়ক হিসেবেও অনেক খামতি রয়ে গিয়েছে ঋষভের।
আর তিনি শুধু হেসেছেন। এখনও হাসছেন। ব্যর্থতার দিনেও যেমন, আবার বিলেতের মাঠে সেঞ্চুরি করে ইংরেজ নিধনের পরেও সে রকম।

রোহিত শর্মার সঙ্গে ঋষভ

কারণ ঋষভ পন্থের জীবনে একটাই মন্ত্র— ‘রাস্তা যত কঠিন হবে, ততটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, হাসিটা যেন মুছে না যায়।’
তিনি যে যোদ্ধা। তিনি যে হাসিমুখের এক ঘাতক। তিনি— ঋষভ পন্থ।

নীতি, মেরি জান...

এক দশকের কেরিয়ারে হিন্দি ইন্ডাস্ট্রির বেশির ভাগ নায়িকার কণ্ঠ তিনি। গায়িকা **নীতি মোহনের** সঙ্গে কথোপকথনে **মধুমন্তী পৈত চৌধুরী**

একটি ওয়াকম্যান আর এ আর রহমানের মিউজ়িক! বোর্ডিং স্কুলে অনুমতি ছিল না। তাই কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে সাধের ওয়াকম্যান লুকিয়ে রাখত এক কিশোরী। পেনসিল দিয়ে ক্যাসেটের রিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবার করে গানগুলি শুনত। দশটি ব্যাটারিও খরচ করত বুঝেশুনে। বন্ধুদের বলত, 'মনে হয়, কোনও দিন রহমান স্যারের স্টুডিয়োয় গিয়ে একটা টেবিলের নীচে লুকিয়ে থাকি। আর সেখান থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি, উনি কী ভাবে সুর সৃষ্টি করেন।'

চার বোন মুক্তি, কৃতী, নীতি ও শক্তি (বাঁ দিক থেকে)

বড়দিন, দীপাবলি, পরিবারে কারও বিয়ে থাকলে, চার বোন পারফর্ম করবই। তার জন্য আগেভাগে রিহার্সাল শুরু হয়ে যেত।

বন্ধুরা তাকে সাহস দিত, 'টেবিলের নীচে কেন লুকোবি? দেখিস, একদিন তুই-ই ওঁর সুরে গাইবি।' এই কথা শুনে কিশোরী হয়তো মনে মনে বেজায় খুশি হত। কিন্তু কাউকে বুঝতে দিত না। ভাবছেন, সেই কিশোরী কে? তাঁর কণ্ঠ ছুঁয়েছে মেয়েবেলার 'ইশকওয়ালা লাভ' থেকে যৌবনের 'জিয়া রে'-র হিল্লোল, 'সও আসমান' ছুঁয়ে আসা যে কণ্ঠের 'মেরি জান'-এর আকুতি ফেরাতে পারে না কোনও প্রেমিক... তিনি নীতি মোহন। প্রায় এক দশকের কেরিয়ারে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাতি এবং বাংলাতেও গেয়েছেন জনপ্রিয় সব গান। রিয়্যালিটি শো থেকে জার্নি শুরু করেছিলেন। আর এখন নিজেই বলেন, ''এই প্রজন্মের মোটামুটি সব নায়িকার লিপেই গান গাওয়া হয়ে গিয়েছে।'' ব্যস্ত গায়িকা লকডাউনের অবসরে মা হয়েছেন। ছেলে আর্যবীরের বয়স মাত্র এক। মঞ্চের টানে নীতিও শুরু করে দিয়েছেন শো, কনসার্ট। কলকাতায় তিন-চার মাসের মধ্যে চার-পাঁচটি শো করে গিয়েছেন। এমনই একটি শোয়ের পরে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে নিজের ঘরে-বাইরের গল্প শোনালেন খোদ গায়িকা।

ভাল লাগে এই শহরের ছন্দ

শুনলে হয়তো অবাক হবেন, নীতি মোহনের মামাবাড়ি কলকাতার ভবানীপুরে। স্কুলে যখন পড়তেন, গরমের ছুটিতে নিয়ম করে মা এবং তিন বোনের সঙ্গে ট্রেনে করে এই শহরে আসতেন দিল্লি থেকে। ছোটবেলায় দেখেছেন কলকাতার দুর্গাপুজোও। ''এই শহরের যে আরামপ্রিয় ছন্দ, তা সত্যিই ভাল লাগে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীতের উপরে এই শহর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মুম্বইয়েও দুর্গাপুজোয় কয়েক বার গিয়েছি। এক বার অভিজিৎদার (ভট্টাচার্য) দুর্গাপুজোয় পারফর্মও করেছি,'' স্মৃতিচারণ নীতির।

পারফর্ম করতে না পারলে সে বিয়েবাড়ি ভাল নয়

নীতির জন্ম দিল্লিতে। বাবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মা গৃহবধূ। মধ্যবিত্ত পরিবার। চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় নীতি। তার পরে কৃতী, শক্তি, মুক্তি। ''চার মেয়ে হলেই আশপাশের লোকেদের ভাবনা বেড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত, আমার মা-বাবা তেমন ভাবতেন না। ছোটবেলা থেকেই যা যা করতে চেয়েছি, সেই সুযোগ পেয়েছি। পড়াশোনা এবং তার পাশাপাশি নাচ-গান শেখার উপরে বাড়িতে জোর দেওয়া হত,'' বললেন নীতি।
চার বোনের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা নিশ্চয়ই ঘটনাবহুল এবং মজার ছিল? ''বড়দিন, দীপাবলি এবং পরিবারে কারও বিয়ে থাকলে, আমরা চার বোন পারফর্ম করবই। তার জন্য আগেভাগে রিহার্সাল শুরু হয়ে যেত। আমি বোনেদের কোরিয়োগ্রাফি করতাম। 'কুচি কুচি রখমা', 'হম্মা হম্মা', 'রঙ্গীলা রে'-এর মতো গানগুলো ছিল আমাদের প্রিয়। গানের হুক স্টেপগুলো ছিল মুখস্থ। আর কোনও বিয়েবাড়িতে পারফর্ম করার সুযোগ না থাকলে, আমরা আগেভাগে ফিরে আসতাম। বলতাম, বোরিং বিয়েবাড়ি!'' ছোটবেলার দিনে ফিরে গিয়েছিলেন নীতি। তাঁর চোখেমুখে হাসির ঝিলিক।

নীতি, শক্তি এবং মুক্তি রাজস্থানের একই বোর্ডিং স্কুলে পড়তেন। চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ছিল শক্তি। ‘‘তখন শক্তি ক্লাস সিক্সে পড়ে। এক দিন মৌচাকে নোটবুক ছুড়ে মেরেছিল। আর পিলপিল করে মৌমাছির ঝাঁক হস্টেলের বাকি মেয়েদের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করে। শক্তির বকুনি তো জুটেই ছিল। পাশাপাশি দিদি হিসেবে আমাকে ডেকেও বলা হয়েছিল। আমি চিঠি লিখেছিলাম যে, এমন কাজ ও আর কখনও করবে না,’’ নস্ট্যালজিয়া তাঁর কণ্ঠে।

নীতি নিজে কেমন ছিলেন? ‘‘আমি খুব দুষ্টুও ছিলাম না, আবার শান্তও নয়। তবে মা বলেছিলেন, চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তাই সব সময়ে এমন কিছু করি, যা দেখে বোনেরা শিখতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকে ওই দায়িত্ববোধ কাজ করত।’’

মেজ বোন কৃতী হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে আসেননি। তবে নীতির বাকি দুই বোন শক্তি (মোহন) নৃত্যশিল্পী এবং মুক্তি (মোহন) অভিনেত্রী। ‘‘নাচ-গান মিলিয়ে আমাদের পরিবারে ভ্যারাইটি কম নেই! কৃতী আমাদের ব্যাকবোন। ও পর্দার আড়ালে থাকে। তবে তিন বোনকে সামলে রাখে কৃতীই,’’ বলছেন তাঁর বড় দিদি। চার বোনের সোনালি মুহূর্তের ঝলক দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

পারফর্ম করছেন রহমানের সঙ্গে

রাইফেল চালাতেও পারি

গায়িকা নীতি মোহন এক সময়ে আর্মি অফিসার হতে চাইতেন। ছ’ বার প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারাডে অংশ নিয়েছেন। ষোলো বছর বয়স হওয়ার পরে এনসিসিতে (ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস) যোগ দেন। চেন্নাইয়ে তাঁর প্রশিক্ষণও হয়। ‘‘রাইফেল ধরা, শুট করা সবই শিখেছিলাম। এখনও এয়ারপোর্টে যখন সিআইএসএফ-এর পোশাক পরা মহিলাদের দেখি, গর্ববোধ করি।’’ গান না সেনাবাহিনী— কী ভাবে বেছেছিলেন নীতি? ‘‘একদিন বাবার সঙ্গে বসেছিলাম এটা নিয়ে আলোচনা করতে। বাবা বললেন, পরে যেন কোনও আক্ষেপ না থাকে, সেটা মনে রেখো। তখন আমিও ভেবে দেখলাম, সেনাবাহিনীতে গেলে আমি গান মিস করব, মঞ্চ মিস করব। গান আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আর সেনা অফিসার হওয়া হয়তো শুধুই ইচ্ছে ছিল।’’

সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন নীতি

রহমান স্যর ছিলেন বলেই শিল্পী হতে পেরেছি, গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি

ফ্লাইট থেকে নেমে পেলাম প্রতীক্ষিত মেসেজ

দিল্লিতে ছোটদের গান এবং নাচ শেখাতেন নীতি। তাঁর আগে পরিবারে কেউ কখনও সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে নেননি। মুম্বই গিয়ে আদৌ স্বপ্নকে ছুঁতে পারবেন কি না— ছিল না কোনও দিশা। একদিন একটি বেসরকারি চ্যানেলে রিয়্যালিটি শো ‘পপস্টারস’ দেখে ইচ্ছে জাগে মুম্বই যাওয়ার। বন্ধুরাও এগিয়ে যেতে বলেন। ২০০৩ সালে ‘পপস্টারস’ শোয়ে বিজয়ী হন নীতি। বিজয়ীদের নিয়ে তৈরি করা হয় ব্যান্ড ‘আসমা’। মুম্বইয়ে প্রথম দিকে কোরিয়োগ্রাফার অ্যাশলে লোবোর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন নীতি। সেই সুবাদে ইমতিয়াজ় আলির ‘সোচা না থা’ ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়ও করেন। দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে ইন্ডাস্ট্রির নামী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে।

এমনই একবার এ আর রহমানের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল নীতির। তিনি জানান, আমেরিকায় দশটি টুরের জন্য নতুন কণ্ঠ খুঁজছেন রহমান। ‘‘তখন ‘গুরু’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। ‘তেরে বিনা’, ‘মাইয়া মাইয়া’ রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলাম। এক মাস কোনও উত্তর আসেনি। তার পর এক দিন ফ্লাইট থেকে নেমেই পেলাম মেসেজ, ‘‘রহমান লাইকড ইয়োর ভয়েস। ইউ আর গোয়িং ফর দ্য টুর।’’

চেন্নাইয়ে প্রথম দিকে যখন রিহাসার্ল করতেন, নীতির তখন সাহস হয়নি রহমানের সঙ্গে দেখা করার। ‘‘স্যর রিহাসার্লে

নীহার পাণ্ড্যর সঙ্গে বিয়ের দিন

সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর প্রভাবও নীতির জীবনে উল্লেখযোগ্য। ‘পদ্মাবত’ ও ‘গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি’তে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি

আসতেন। খোঁজখবর নিতেন। জানতেন, আমি ভাল পারফর্ম করছি। তবে প্রথম বার সামনে গিয়ে কথা বলি সান ফ্রান্সিসকোয় শো শেষ হওয়ার পরে। ওখানে স্টেজে আমাকে কয়েকজন মিলে (পারফরম্যান্সের অংশ) লিফ্‌ট করবে, তার মধ্যেও গাইতে হবে। সেটা ভাল করেছি দেখে স্যর খুশি হয়েছিলেন। তখন ২০০৭ সাল। আর এ বছরও আইপিএলে স্যরের সঙ্গে পারফর্ম করেছি। আমার গায়ে কাঁটা দেয়, যখনই ওঁর সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াই। উনি ছিলেন বলেই আমি শিল্পী হতে পেরেছি, গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি,” নাগাড়ে কথাগুলো বললেন মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্যা!

নামজাদা শিল্পীদের পাশে নবাগতা নীতি

এ আর রহমানের সুরে ‘জিয়া রে’ গানটি প্রথম রেকর্ড করেন নীতি। যশ চোপড়া পরিচালিত ‘জব তক হ্যায় জান’ ছবিতে অনুষ্কা শর্মার কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়েছিল সেই গান। কিন্তু হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে তারও আগে নীতি ঝড় তোলেন আলিয়া ভট্টের লিপে ‘ইশকওয়ালা লাভ’-এ (স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার)। “গানটা যখন রেকর্ড করেছিলাম, জানতাম না করণ জোহরের ছবিতে ব্যবহার হবে, আলিয়ার লিপে। তবে প্রথম দিনেই শেখর (বিশাল-শেখর) আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। নতুন শিল্পীদের এই ভরসাটুকু খুব প্রয়োজন। সালিম মার্চেন্ট এবং শেখর রভজিয়ানীর সঙ্গে আমার কণ্ঠ এক গানে! এর পর পরই ‘জিয়া রে’ রিলিজ় করল। দুটো গানে আমার কণ্ঠস্বর খুব আলাদা শুনতে লেগেছিল। চারদিকে এত মানুষের প্রশংসা—পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নের মতোই লাগছিল!”

এ আর রহমানের পাশাপাশি সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর প্রভাবও তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য, মানেন নীতি। পরিচালকের ‘পদ্মাবত’ (নেনোওয়ালে নে) এবং ‘গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি’তে (মেরি জান) কণ্ঠ দিয়েছেন নীতি। এক দশক আগে আলিয়ার লিপেই ছিল তাঁর প্রথম হিন্দি গান। আলিয়া-বৃত্তও যেন সম্পূর্ণ হয়েছে ‘মেরি জান’-এর মূর্ছনায়। এই গানের সাফল্যের পরে ভন্সালীকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন নীতি। “স্যরের সঙ্গীত সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। এই গানে মেলডি রয়েছে। কিন্তু পুরনো দিনের আমেজও রয়েছে। এই প্রজন্মের যখন এমন গান এত ভাল লেগেছে, তা দেখে ভরসা জাগে। স্যরও সে কথাই বললেন আমাকে।”

ওয়েস্টার্নের প্রশিক্ষণ ছিল না

লতা মঙ্গেশকর, ভীমসেন জোশী, জগজিৎ সিংহের মতো শিল্পীদের শুনে বেড়ে ওঠা নীতির ওয়েস্টার্নে তেমন প্রশিক্ষণ ছিল না। “আমি বরাবর হারমোনিয়াম-তবলার সঙ্গতে গাইতাম। ব্যান্ড ‘আসমা’র সুবাদে আমি প্রথম ওয়েস্টার্ন সঙ্গীতের স্বাদ পাই। প্রথম বার গিটারের সঙ্গে গাই।”

অনুরাগ কাশ্যপের ‘বম্বে ভেলভেট’ ছবিতে অমিত ত্রিবেদীর সুরে জ্যাজ় গেয়েছিলেন নীতি। “এই ছবিটা আমার মনের খুব কাছের। দু’বছর ধরে এর মিউজ়িক নিয়ে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। জ্যাজ় গাওয়ার জন্য তখন আমি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের প্রশিক্ষণও নিই।”

নীহারকে সব কিছু বলতে পারি

‘আসমা’ ব্যান্ডের সহ-শিল্পী জিমির সুবাদেই মডেল-অভিনেতা নীহার পাণ্ড্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ নীতির। “জিমি আমাদের দু’জনের বন্ধুই ছিল। জিমির বিয়ের অনুষ্ঠানে ও বলে, একবার নীহারের সঙ্গে দেখা করতে। নীহারকেও একই কথা বলে রেখেছিল জিমি। তবে আমার

ছেলে আর্যবীরের সঙ্গে ছুটির মেজাজে

নীতির সেরা দশ

ইশকওয়ালা লাভ (স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার)
জিয়া রে (জব তক হ্যায় জান)
তুনে মারি এন্ট্রিয়া (গুন্ডে)
তু হি তু (কিক)
মনোহারী (বাহুবলী)
সও আসমান (বার বার দেখো)
বাওয়ারা মন (জনি এলএল বি টু)
ফার্স্ট ক্লাস (কলঙ্ক)
দিল উড় জা রে (পগলৈট)
মেরি জান (গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি)

প্রথমে খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখা করে সবটাই বদলে গেল,'' হাসি নীতির কণ্ঠে। ২০১৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি নীহার ও নীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ''নীহার প্রিয় বন্ধু। ওকে সব কিছু বলতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর চেয়েও বন্ধুত্বের সম্পর্কই আমাদের কাছে বড়,'' বললেন নীতি।

মাতৃত্ব টাইম-ম্যানেজমেন্ট শিখিয়েছে

লকডাউনের ঠিক আগেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছিলেন নীহার, নীতি এবং তাঁর দুই বোন। একটা ফার্ম হাউসে তাঁরা কোয়রান্টিনে ছিলেন, যখন প্রথম বার লকডাউন ঘোষণা করা হল। লকডাউনের অবসরে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নীতি। ''তখন ট্রাভেল করছিলাম না। মা হওয়ার জন্য সময়ও চাই। সব মিলিয়ে ওই সময়ে প্রেগন্যান্ট হলাম। ছেলে হল। গত জুন মাসে ওর এক বছর পূর্ণ হল। আবার কাজও শুরু করে দিয়েছি। মাতৃত্ব আমাকে টাইম-ম্যানেজমেন্ট শিখিয়ে দিয়েছে।'' ছেলে আর্যবীরকে নিয়ে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ছুটিও কাটিয়ে এসেছেন নীতি। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে খুদের সঙ্গে আদুরে পোস্ট। ''বেড়ানো ও ভালই উপভোগ করেছে,'' হাসি নতুন মায়ের কণ্ঠে।

অনুপ্রেরণা খুঁজি

প্লেব্যাকের পাশাপাশি ইন্ডিপেনডেন্ট গান নিয়ে কাজ করছেন নীতি। তিন বোন মিলে 'নারী' নামের একটি গান তৈরি করেছিলেন। ''শিল্প বদল আনতে পারে। আমি মনেপ্রাণে এটা বিশ্বাস করি। গানের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া যায়। আমি কিছু ভজনও গেয়েছি এর মধ্যে। ভবিষ্যতেও ইন্ডিপেনডেন্ট মিউজ়িককে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাই।''

অতিমারি পাল্টে দিয়েছে চারপাশ, প্রতিটি জীবন। তবে কালো মেঘের আড়ালে বরাবর নতুন আলোর হাসি খোঁজেন নীতি। ''লকডাউনের মধ্যে প্রথম বার আমি নিজের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করি। অরিজিৎ (সিংহ) 'পগলৈট' ছবিতে ওই গানটা ব্যবহার করে। ও প্রথম বার শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কে এটা রেকর্ড করেছে। আমি করেছি শুনে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল!''

সুরেলা সফরে এ ভাবেই নীতি ভরসা রাখেন তাঁর পরিবার, পরিজন এবং নৈঃশব্দ্যে! যে নৈঃশব্দ্যে তিনি খুঁজে পান আগামী সৃষ্টির অনুপ্রেরণা।

‘যোগ’ফল

যোগবিদ্যার চর্চা বিতত। প্রাত্যহিক জীবনে আসন ও প্রাণায়ামের অভ্যাস ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলেন নবনীতা দত্ত

যোগাভ্যাস বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, তা সিন্ধুদর্শনের বিন্দু বলা যেতে পারে। যোগবিদ্যার উৎস যেমন প্রাচীন, তেমনই এর শাখাপ্রশাখাও অনেক। আসলে যোগবিদ্যা হল গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর মুখ থেকে নিঃসৃত হত এবং শিষ্যরা তা শ্রুতির মাধ্যমে স্মরণে রাখতেন। মৌখিক ভাবেই যোগবিদ্যার প্রসার লাভ ঘটে প্রাচীন কালে। বেদ, উপনিষদে উল্লেখ পাওয়া যায় যোগবিদ্যার। প্রাচীন মুনি, ঋষিরা তাঁদের মতো করে বিভিন্ন আসনের পরিমার্জনও করেন। পরবর্তী কালে তা লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগবিশেষজ্ঞ তাপস মণ্ডল বললেন, “মহর্ষি পতঞ্জলি অনুভব করেছিলেন যে, কালে কালে মানুষের স্মৃতি বা মেধা হ্রাস পাবে। ফলে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি লেখেন ‘পতঞ্জল যোগদর্শন’। সেখানে চারটি ভাগে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করা রয়েছে— সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য।

উষ্ট্রাসন

সমাধি পাদের দ্বিতীয় সূত্রে যোগের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হচ্ছে, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। মনুষ্যচিত্তের পাঁচটি বৃত্তি আছে, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পাঁচটি বৃত্তির যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে মানুষ বিপথগামী হয় বলে ধরা হয়। এ বার সময়, কাল, সমাজ, দেশ, পরিবেশ, পরিস্থিতির আনুকূল্যে এর বিবর্তন বা পরিবর্তন ঘটে থাকে। কিন্তু এর অভ্যাস করা হয় না। করা হয় আসনের অভ্যাস। তা শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখতে কিছু ক্ষেত্রে সক্ষম। কিন্তু মানসিক সুস্থতা বা সুস্থিরতার জন্য প্রয়োজন চিত্তের বিকাশ। সেখানেই সামগ্রিক যোগের সাফল্য। কিন্তু তা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ ও সাধনার বিষয়।" তাই আসনের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতার দিকে একটা পদক্ষেপ করা যায়। যোগবিদ্যার মধ্যে আসনের ব্যাপ্তিও কম নয়।

আসন

কথিত আছে, পৃথিবীতে যত সংখ্যক প্রাণ আছে, তত সংখ্যক আসন আছে। "এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয়, পৃথিবীতে প্রায় ৮৪ লক্ষ আসন রয়েছে। যত প্রাণ আছে, তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত ভাবে সঙ্কুচিত, প্রসারিত করতে পারে, তার সবক'টি ভঙ্গিমা ধরা যায় আসনে," বললেন তাপস মণ্ডল। হঠযোগ প্রদীপিকায় মাত্র ১৫টি আসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর ঘেরন্ড সংহিতায় ৩২টি আসনের উল্লেখ রয়েছে। ঘেরন্ড সংহিতা অনুযায়ী, শিবমুখে ৮৪ লক্ষ আসনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে মাত্র ৩২টি আসন মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই ৩২টি আসন হল, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরখাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সঙ্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্মাসন, উত্তানকূর্মাকাসন, উত্তানমণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, মণ্ডুকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন ও যোগাসন। হঠযোগ প্রদীপিকা অনুযায়ী এর মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন,

কথিত আছে, পৃথিবীতে যত সংখ্যক প্রাণ আছে, তত সংখ্যক আসন আছে। সেই অনুযায়ী, প্রায় ৮৪ লক্ষ আসন রয়েছে।

সিংহাসন ও ভদ্রাসন হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আসন। আর একটা দিক মনে রাখাও জরুরি। সেটা হল আসন করার নির্দিষ্ট সময় আছে। চার প্রহরে আসনে বসা যায়। আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা চার প্রহরেই আসন করতেন, নির্বাণ, মধ্যাহ্ন, গোধূলি এবং নিশীথ। ভোর চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে নির্বাণ, বেলা বারোটায় মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে গোধূলি আর রাত বারোটায় নিশীথ।

সিদ্ধাসন: চলিত ভাষায় বাবু হয়ে বসা যাকে বলে (সুখাসন), সে ভাবে বসে দু'পাশে হাত প্রসারিত করতে হবে। বাঁ পায়ের উপরে ডান পা তুলে বসতে হবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকবে বাঁ পায়ের হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে। পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে থাকবে মধ্যচ্ছদা। হাতের পাতা আকাশের দিকে করে হাঁটুর উপরে রাখতে হবে। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে জ্ঞানমুদ্রায় থাকবে। পুরাকালে ধ্যানের জন্য এই আসনে বসা হত।

পদ্মাসন: পদ্মাসনে বাবু হয়ে বসার মতো। কিন্তু এখানে বাঁ পায়ের পাতা থাকবে ডান থাইয়ের উপরে আর ডান পায়ের পাতা নিয়ে যেতে হবে বাঁ পায়ের উপরে। পায়ের পাতা থাকবে উর্ধ্বমুখী। হাত থাকবে হাঁটুর উপরে জ্ঞানমুদ্রায়। আর চোখ বন্ধ থাকবে।

ভদ্রাসন: দু'পা এমন ভাবে ভাঁজ করতে হবে যাতে দু'পায়ের পাতা একে অপরকে স্পর্শ করে থাকে। এ বার দু'হাতে পায়ের পাতা ধরে একদম শরীরের কাছে নিয়ে আসতে হবে। তার পরে হাতদুটো কনুই সোজা করে হাঁটুর উপরে রাখতে হবে।

মুক্তাসন: মাটিতে বসে বাঁ পায়ের থাইয়ের উপরে ডান পা রাখতে

ভুজঙ্গাসন

সিংহাসন করার সময়ে জিভ বার করে বসতে হবে। জিভ থেকে লালারস মাটিতে পড়া অবধি জিভ বার করে রাখতে হবে।

হবে। আর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকবে বাঁ হাঁটুর ভাঁজে। বাঁ পা মাটিতেই থাকবে। পদ্মাসনের মতো তা অন্য পায়ের থাইয়ের উপরে উঠবে না। কিন্তু বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নীচের দিক দিয়েই ডান পায়ের হাঁটুর ভাঁজে গুঁজে দিতে হবে।

বজ্রাসন: সামনের দিকে পা মুড়ে বসতে হবে। হাত দুটো থাইয়ের উপরে প্রসারিত রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে বসতে হবে।

স্বস্তিকাসন: মাটিতে বসে দু'পায়ের পাতা দু'পাশে যথাসম্ভব শরীরের পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আর সামনের দিকে এক হাঁটুর উপরে আর-এক পায়ের হাঁটু উঠে থাকবে।

সিংহাসন: বজ্রাসনে বসে হাঁটুর মাঝের দূরত্ব বাড়াতে হবে। দুই হাঁটুর মাঝে সোজা ভাবে দুই হাত মাটির উপরে রেখে সাপোর্ট দিতে হবে। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে এগিয়ে আসবে। জিভ বার করে সিংহাসনে বসতে হবে। যতক্ষণ না জিভ থেকে লালারস মাটিতে পড়ছে, ততক্ষণ জিভ বার করে রাখতে হবে। আর ভোকাল কর্ড থেকে আওয়াজ বার করতে হবে। এ ভাবে সিংহের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সেই ভাবেই এই আসন করা হয়।

গোমুখাসন: পা ক্রস করে হাঁটুদুটো একদম সামনের দিকে নিয়ে আসতে হবে। একটা হাঁটুর উপরে অপর হাঁটু থাকবে। গোড়ালি দুটো নিতম্বের দু'পাশে স্পর্শ করে থাকবে। দু'হাত হাঁটুর উপরে থাকবে। আবার আর এক ভাবে করা যায়। সে ক্ষেত্রে হাতের ভঙ্গিমা থাকবে পিঠের উপরে। ডান হাত উপর থেকে আর বাঁ হাতে কোমরের পিছন দিকে নীচ থেকে উঠে একে অপরকে ধরবে।

বীরাসন: মাটিতে বসে দু'পা এমনভাবে ভাঁজ করতে হবে যাতে বাঁ

বজ্রাসন

ভদ্রাসন

হাঁটুর উপরে ডান পায়ের গোড়ালি থাকবে। আর ডান পায়ের হাঁটুর নীচে থাকবে বাঁ পায়ের গোড়ালি।

ধনুরাসন: উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পা পিছন দিকে তুলতে হবে। এ বার দুই হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে পায়ের গোছের অংশ ধরতে হবে।

মৃতাসন: একে শবাসনও বলা হয়। পিঠ মাটিতে ঠেকিয়ে সোজা শুয়ে পড়তে হবে। হাত শরীরের দু'পাশে ছড়ানো থাকবে, হাতের তালু চিত করা থাকবে। দু'পা দু'দিকে অল্প ছড়িয়ে দিতে হবে।

গুপ্তাসন: অনেকটা পদ্মাসনের মতো। পা ভাঁজ করে বসে বাঁ পায়ের উপরে ডান পায়ের গোড়ালি তুলে বসতে হবে। হাঁটুর উপরে দুই হাত রাখা থাকবে।

মৎস্যাসন: পদ্মাসনে বসে তার পর শুয়ে পড়তে হবে। এ বার ঘাড় তুলে মাথার ব্রহ্মতালু মাটির সঙ্গে স্পর্শ করতে হবে। আর দু'হাতে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরতে হবে এবং কনুই মাটিতে স্পর্শ করে থাকতে হবে।

মৎস্যেন্দ্রাসন: পদ্মাসনে বসে যে পা উপরে থাকবে, সেটা তুলে বুকের কাছে আনতে হবে। এ বার বাঁ হাতটা ডান হাঁটুর উপর দিয়ে এনে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে ধরতে হবে। ডান হাতটা পিছন দিক দিয়ে গিয়ে বাঁ কোমরের কাছে ডান হাত রাখতে হবে।

গোরক্ষাসন: এই আসন অনেকটা ভদ্রাসনের মতো। তবে এই আসনে বসে গোড়ালির উপরে অ্যানাসের অংশ স্পর্শ হবে।

পশ্চিমোত্তানাসন: দু'পা সোজা করে জুড়ে বসতে হবে। এ বার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দু'হাতে ধরে মাথা নিচু করে হাঁটুতে মাথা ঠেকাতে হবে।

উৎকটাসন: চেয়ারে বসার মতো ভঙ্গিতে এই আসনে বসতে হবে। এ ক্ষেত্রে অর্ধেক বসতে হবে, ঠিক যেন চেয়ারের সিট। আর মেরুদণ্ড থাকবে সোজা ৯০ ডিগ্রিতে। হাতও কাঁধ থেকে সামনের দিকে ছড়ানো থাকবে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে।

সঙ্কটাসন: প্রথমে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে হবে। তার পরে বাঁ পা ডান পায়ের উপরে তুলে দিতে হবে। গোড়ালির কাছে এক পা অন্য পাকে অতিক্রম করবে।

ময়ূরাসন: মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। এ বার দুই হাতে ভর দিয়ে পুরো শরীর ভূমির সমান্তরালে তুলে ধরতে হবে। সেই পজ়িশনই কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে। ময়ূর যেমন দু'পায়ে থাকে, সে ভঙ্গিমাতেই করা হয় এই আসন। গর্ভধারণের আগে মহিলাদের এই আসন না করাই ভাল। এতে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

গর্ভধারণের আগে মহিলাদের ময়ূরাসন না করাই ভাল। এতে ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে গিয়ে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

কুক্কুটাসন: পদ্মাসনে বসতে হবে প্রথমে। এ বার দুই হাত দু'দিকের হাঁটু ও থাইয়ের ভাঁজের মাঝখান দিয়ে গলিয়ে দিতে হবে নীচের দিকে। ওই দুই হাতের উপরে ভর দিয়ে পুরো শরীর উপর দিকে তুলতে হবে।

কূর্মাসন: দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে বসতে হবে। এ বার শরীর নীচের দিকে নামিয়ে দু'হাত দু'পায়ের হাঁটুর তলা দিয়ে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে হবে।

উত্তানকূর্মাসন: কুক্কুটাসনের মতো বসে দুই হাত দিয়ে গলার কাছে ধরতে হবে। তার পর পিঠের উপরে শুয়ে পড়তে হবে।

উত্তানমণ্ডুকাসন: বজ্রাসনে বসে হাতদুটো মাথার উপর দিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে যেতে হবে। হাতের তালুদুটো পাশাপাশি পিঠে স্পর্শ করে থাকবে। কনুইদুটো সামনের দিকে ভাঁজ অবস্থায় যথাসম্ভব সোজাসুজি থাকবে।

বৃক্ষাসন: দু'পায়ে বিশ্রাম ভঙ্গিমায় দাঁড়াতে হবে। এ বার বাঁ পা ভাঁজ করে ডান পায়ের হাঁটুর উপরে পায়ের পাতা রেখে এক পায়ে শরীরের ওজন ব্যালান্স করতে হবে। ক্রমশ গোড়ালিটা কুঁচকির কাছে নিয়ে যেতে হবে। এ বার দু'হাত মাথার উপরে তুলে প্রণামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মণ্ডুকাসন: বজ্রাসনে বসে পেটের কাছে এক হাত দিয়ে অন্য হাতের মুঠি ধরতে হবে। এ বার শরীরের উপরে অংশ ঝুঁকে সামনে একেবারে হাঁটুজোড়ার কাছে নিয়ে আসতে হবে। সামনের দিকে তাকাতে হবে। দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী থাকবে।

গরুড়াসন: সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে বাঁ পা দিয়ে ডান পা জড়িয়ে ধরতে হবে। আর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরতে হবে।

বীরাসন

শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থে যা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, শ্বাস আর অয়ম মানে নিয়ন্ত্রণ।

বৃষাসন: বজ্রাসনের মতো এক পা ভাঁজ করে বসতে হবে। আর এক পা শরীরের পিছন দিকে মাটির উপরে প্রসারিত থাকবে। দু' হাত সামনে হাঁটুর উপরে রেখে শরীর ও মাথা পিছন দিকে হেলাতে হবে।

শলভাসন: উপুড় হয়ে শুয়ে হাত শরীরের দু'পাশে থাইয়ের নীচে ঢুকে যাবে। এ বার পেটের উপরে শরীরের ওজন রেখে পিছন দিকে দু'পা জোড়া করে তুলতে হবে আর থুতনি থাকবে মাটি স্পর্শ করে। আর কাঁধও মাটিতে স্পর্শ করে থাকবে। কোমর থেকে পা উঠবে পিছন দিকে।

মকরাসন: উপুড় হয়ে শুয়ে কপালের নীচে হাত দুটো রাখতে হবে। আর পায়ের পাতার মধ্যে একটু ব্যবধান থাকবে অর্থাৎ পা ছড়িয়ে দিতে হবে।

উষ্ট্রাসন: বজ্রাসনে বসে শরীরটা সোজা সামনে তুলে ধরতে হবে। এ বার পুরো শরীরে পিছনে বেঁকিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে।

ভুজঙ্গাসন: উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে হাতে ভর দিয়ে কোমর থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সাপের মতো উপর দিকে তুলতে হবে। চোখ খোলা রাখতে হবে।

যোগাসন: পদ্মাসনে বসতে হবে ডান পা উপরে রেখে। কোলের কাছে নাভির সামনে বাঁ হাতের উপরে ডান হাত থাকবে। তবে এখানেই শেষ নয়। এগুলো হল মূল ৩২টি আসন। এর পরেও পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ফলে আরও আসন তৈরি হয়েছে। চক্রাসন, পবনমুক্তাসন ইত্যাদি আসনের সংখ্যা কম নয়। শুধু পদ্মাসনই করা যায় একাধিক ভাবে। তেমনই সব আসনেরও আবার ভাগ আছে। যোগাভ্যাসের মধ্যে আসন ছাড়া আরও কিছু
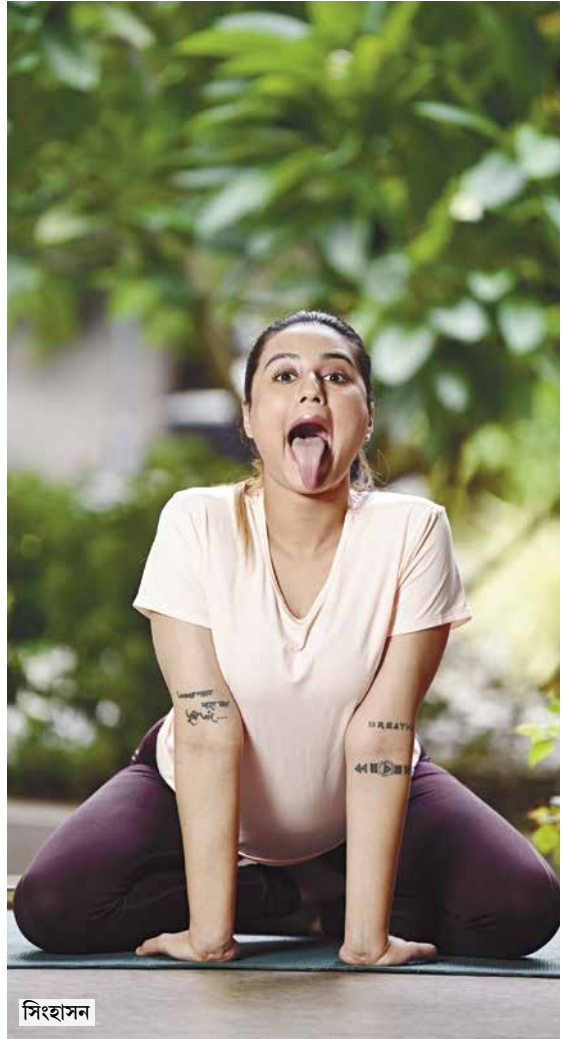
সিংহাসন

গরুড়াসন

অভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। "হঠযোগের প্রথম দু'টি অধ্যায় যম ও নিয়ম অভ্যাস করলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। নিয়মের মধ্যে পড়ে শৌচ, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সকালে উঠে প্রথমে ধৌতি ক্রিয়া অর্থাৎ জল খেয়ে বমি করা হয়। এর পর চোখের ব্যায়াম বা ত্রাটক। তার পরে অন্ত্রের ব্যায়াম করা হয়। এ ক্ষেত্রে পেটকে তিনটি ভাগে ভাগ করে পেটের মধ্যভাগ বার করে দু'পাশটা ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। একে বলে নৌলি। আর সেটা যদি তরঙ্গায়িত ভাবে মুভ করা হয়, তাকে বলে চক্রানৌলি। যোগাভ্যাসের মধ্যে এটা পড়ে। তার পরেই চলে আসছে কপালভাতি। এটা তিন ভাবে করা হয়, বাতক্রম, ব্যুৎক্রম, শীতক্রম। অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম পড়বে বাতক্রমের মধ্যে। নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে ফেলতে হবে, একে বলে ব্যুৎক্রম। আবার ঠিক এর উল্টোটা অর্থাৎ মুখ দিয়ে জল টেনে নাক দিয়ে বার করলে তাকে বলে শীতক্রম," বলে জানালেন যোগবিশেষজ্ঞ তাপস মণ্ডল। এগুলিকে বলা হয় ষটকর্ম। এর মধ্যে আবার অজস্র ভাগ আছে, যা ক্রমশ অভ্যাসের মাধ্যমে রপ্ত করা হয়।

সকালে উঠে প্রথমে ধৌতি ক্রিয়া অর্থাৎ জল খেয়ে বমি করা হয়। এর পরে করতে হবে চোখের ব্যায়াম বা ত্রাটক।

প্রাণায়াম

আসন, ষটকর্মের পরে আসে কুম্ভক। প্রাণায়ামে এই কুম্ভক অভ্যাস জরুরি। শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থে যা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, শ্বাস আর অয়ম মানে নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই হল প্রাণায়াম। তাপস মণ্ডলের কথায়, "আসলে আমাদের শ্বাসগ্রহণ-বর্জনের নিয়ম হল ১:২ অনুপাতে। অর্থাৎ যতটা শ্বাসবায়ু গ্রহণ করব, তার দ্বিগুণ শ্বাস বর্জন করতে হবে। কিন্তু আমরা নিয়মিত সে ভাবে শ্বাস নিই না। কখনও জোরে, কখনও আস্তে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করি। ধরুন ভয় পেলে জোরে জোরে শ্বাস নিই। এগুলো আমাদের গ্রন্থির উপরে চাপ সৃষ্টি করে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে শ্বাসবায়ুর ব্যায়াম করা হয় প্রাণায়ামে।" প্রাচীন সংস্কৃত সূত্রানুসারে প্রাণায়ামকে পুণ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যোগবিদ্যায় মানুষের শরীর ভাগ করা হয়েছে পঞ্চকোষে, যার মধ্যে অন্যতম হল প্রাণায়াম কোষ।

শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম নয়, বরং শ্বাসবায়ুর গ্রহণ ও বর্জনের বিবিধ পদ্ধতিতে শরীরচালনার বিজ্ঞান। এই শ্বাসবায়ুর ব্যায়ামকে গীতায় চারটি পর্বে ভাগ করে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণা (শ্বাসগ্রহণ), বিধর্না (গৃহীত বায়ু ধরে রাখা), প্রচ্ছার্দনা (শ্বাসবায়ু বর্জন), অপনা (বর্জন অবস্থা ধরে রাখা)। প্রচলিত শব্দে তা হল পূরক, কুম্ভক, রেচক ও শূন্যক। শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হলেও প্রাণায়াম তার চেয়েও অনেক গূঢ় প্রক্রিয়ার সন্ধান দেয়। এখানে আটটি প্রাণায়াম নিয়ে আলোচনা করা হল। এদের 'অষ্টকুম্ভক'ও বলা হয়। কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাসবায়ু গ্রহণের পরে তা ধরে রাখার প্রক্রিয়া। আমরা যে পরিমাণ শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি, তার দ্বিগুণ যদি বর্জন করতে হয়, তা হলে শ্বাসত্যাগের দ্বিগুণ সময় শ্বাস ধরে রাখতে হবে কুম্ভকে।

সূর্যবেদন: আরামদায়ক ভঙ্গিমায় বসে প্রথমে ডান নাক দিয়ে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করতে হবে। সেই বায়ু ধরে রাখতে হবে, যতক্ষণ ধরে রাখা যায়, অর্থাৎ কুম্ভক অভ্যাস করতে হবে। তার পর ধীরে ধীরে বাঁ নাক দিয়ে তা ছেড়ে দিতে হবে। ঘেরণ্ডসংহিতা মতেও ডান নাক দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করে জলন্ধর বন্ধ অভ্যাস করতে হবে। শ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করে থুতনি বুকে ঠেকিয়ে কুম্ভক অভ্যাস করতে হবে, অর্থাৎ শ্বাসবায়ু ধরে রাখতে হবে। যতক্ষণ না চুল বা নখের ডগায় ঘাম জমা হচ্ছে শ্বাস ধরে রাখতে হবে। তার পরে মাথা তুলে ধীরে ধীরে বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসত্যাগ করতে হবে।

উজ্জায়ী: মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে শ্বাসবায়ু ভরে নিতে হবে হৃৎপিণ্ডে। কিছুক্ষণ তা ধরে রেখে ইদার (বাঁ নাকের) মাধ্যমে তা বর্জন করতে হবে। এতে নাড়ির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মেরুদণ্ডের ভিত থেকে নাড়ি তিন ভাবে মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে। বাঁয়ে ইদা, মাঝে সুষুম্না ও ডানে পিঙ্গলা। এই ব্যায়ামে এই নাড়িপথ পরিষ্কার রাখার অভ্যেস করা হয়। ফলে স্নায়ুরোগ দূরে রাখা যায়।

ভস্ত্রিকা: পদ্মাসনে দুই থাইয়ের উপরে দুই পায়ের পাতা উর্ধ্বমুখী

চক্রাসন

ভস্ত্রিকা অভ্যাস করলে এক দিকে হজমশক্তি বাড়ে, অন্য দিকে নাকে বা শ্বাসনালিতে শ্লেষ্মা জমা প্রতিরোধ করে।

ভাবে রেখে বসতে হবে। তার পরে ডান হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাঁ নাক বন্ধ করতে হবে আর ডান নাক দিয়ে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করতে হবে। এ বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান নাক বন্ধ করে বাঁ নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এটা একটা প্রক্রিয়া। আর এক ভাবে ভস্ত্রিকা অভ্যাস করা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রথমে বাঁ নাক অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে বন্ধ রেখে ডান নাক দিয়েই শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। ক্লান্তি এলে তখন ডান নাক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বন্ধ করে বাঁ নাক খুলে সেই নাকে একই ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ অভ্যাস করতে হবে। ভস্ত্রিকা অভ্যাস করলে এক দিকে হজমশক্তি বাড়ে, অন্য দিকে নাকে বা শ্বাসনালিতে শ্লেষ্মা জমা প্রতিরোধ করে। ফলে সর্দিকাশির সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। শরীরের তাপমাত্রার সমতাও বজায় থাকে।

ভ্রামরি: এই প্রাণায়ামের সময়ে নিঃশ্বাস এমন ভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন ভ্রমরের মতো আওয়াজ হয়। এর ফলে কান থেকে মস্তিষ্কের ভিতরে আওয়াজের প্রতিফলন হতে থাকে। এই প্রাণায়ামে মস্তিষ্কের ভার হালকা হয়। আত্মিক শান্তি লাভ হয়।

শীতলি: এই প্রাণায়ামের উল্লেখ হঠযোগ প্রদীপিকা ও ঘেরন্ড সংহিতা দু'জায়গাতেই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে জিভ প্রসারিত করে বার করতে হবে। তার পরে জিভ গুটিয়ে পাখির চঞ্চুর মতো তা ভাঁজ করে ওষ্ঠদ্বয়ের মাধ্যমে বাইরের দিকে ধরে রাখতে হবে। এ ভাবে জিভ ও ঠোঁট দিয়ে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে নিতে হবে। এ বার কুম্ভক অভ্যাস করতে হবে। তার পরে নাক দিয়ে বর্জন করতে হবে শ্বাসবায়ু। এই প্রাণায়ামে বদহজম, পিত্তের সমস্যার নিরাময় হয়। ঠোঁট চঞ্চুর মতো করে এই প্রাণায়ামের অভ্যাসকারী পরিবেশ থেকে জল শোষণ করতে পারে। ফলে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণ হয়।

শীতকারি: হঠযোগ প্রদীপিকা অনুযায়ী, এই প্রাণায়ামে শ্বাসগ্রহণের সময়ে জিভটা গোল করে শ্বাস নেওয়া হয়। আর মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে ঠান্ডা বায়ু গ্রহণ করতে হবে। মুখ দিয়ে হিস-হিস শব্দ করা হয় আর শ্বাসবায়ু ছাড়া হয় নাক দিয়ে। এই প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাসে শরীরের উপরে নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। তবে ঘেরন্ড সংহিতায় এই প্রাণায়ামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অ্যাসিডের রোগীরা এই প্রাণায়াম করতে পারেন। কিন্তু সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগলে তিনি এই প্রাণায়াম করতে পারবেন না। তাঁর আরও ঠান্ডা লেগে যাবে।

মূর্চ্ছা: জোরে শ্বাসগ্রহণ করে মনকে কপালের দুই ভ্রুর মধ্যবিন্দুতে এনে স্থির হতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এ ভাবে জাগতিক সুখদুঃখ থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নেওয়া যায়।

প্লাবনী: মাছ যেমন খাবি খায়, ঠিক সে ভাবে হাপ-হাপ করে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করতে হবে মুখ দিয়ে। এ ভাবে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে পুরো পেট ফুলিয়ে দিতে হবে। এতে শরীর এমন পর্যায়ে চলে যায়, যেখানে জলের উপরে ভেসে থাকা অভ্যাস করা যায়। তবে তা সহজ নয়। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হয়ে শরীরকে শূন্যতায় পৌঁছে দিতে পারলে তবেই এই প্লাবনী প্রাণায়াম অভ্যাস করা সম্ভব।

এক-একটি প্রাণায়াম ঠিকমতো রপ্ত করতে একজনের প্রায় ২-৩ মাস সময় লাগে। আর মনে রাখতে হবে, যোগবিদ্যা হল গুরুমুখী বিদ্যা। প্রত্যেকের জন্য তার অভ্যাস আলাদা। ইউটিউব দেখে বা কোনও চ্যানেল দেখে যোগাভ্যাস করবেন না। আপনার শরীরের কী রোগ আছে, কী আসন আপনার জন্য কার্যকর আর কোনটা নয়, সেটা আগে জানা দরকার। সরাসরি কোনও যোগবিশেষজ্ঞের কাছ

বৃক্ষাসন

গোমুখাসন

শ্বাসগ্রহণ-বর্জনের নিয়ম হল ১:২ অনুপাতে। অর্থাৎ যতটা শ্বাসবায়ু গ্রহণ করব, তার দ্বিগুণ শ্বাস বর্জন করতে হবে।

থেকে আসন-প্রাণায়াম শেখার চেষ্টা করাই শ্রেয়। কারণ আসনের যে নিয়ম আছে, তা মেনে না চললে, শিরা ও হাড়ের উপরে চাপ পড়ে আঘাতের আশঙ্কা থাকে। সুস্থ জীবনযাপনে যোগ দিশা দেখাতে সক্ষম, কিন্তু তা রপ্ত করতে হবে ঠিক পথে।

তথ্য সহায়তা: যোগবিশেষজ্ঞ তাপস মণ্ডল

মডেল: স্বস্তিকা দত্ত, ঐশ্বর্য সেন, ঐন্দ্রী রায়, অয়ন ঘোষ, তৃণা বৈদ্য, মৃত্তিকা মৈত্র
ছবি: জয়দীপ দাস
মেকআপ: চয়ন রায়
পোশাক: ভেরো মোডা, কোয়েস্ট মল
লোকেশন ও হসপিটালিটি: প্রিন্সটন ক্লাব, ২৬ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা

সিদ্ধাসন

প্রজ্ঞায় মাত

সচিন তেন্ডুলকরের পরে ভারতীয় খেলার আরও এক বিস্ময় বালক। একদিন যে আনন্দ বনাম কার্লসেনের দাবার মহারণ দেখতে গিয়ে বলে উঠেছিল, ''আমি বিশ্বসেরা হব।'' তখন কে আমল দেয় তার কথায়? আজ দিচ্ছে। **প্রজ্ঞানন্দ**কে নিয়ে লিখছেন **সুমিত ঘোষ**

অবশেষে ভারতীয় খেলাধুলোর আকাশে উদিত হওয়া নতুন তারার ইন্টারভিউয়ের সময় পাওয়া গিয়েছে। শুনে একটু অদ্ভুতই লাগল যখন নিজেই বলল, ফোনে সাক্ষাৎকার নয়, দুপুরে জুম কলে কথা বলবে। তাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবে সে।
দ্রুত নোটপ্যাডে যে কথাগুলো সাজিয়ে ফেলা গেল...
এক) নতুন বিস্ময় আসলে এক বালক। তা সে যতই বিশ্বের এক নম্বরকে হারিয়ে হইচই ফেলে দিক।
দুই) একে খুব কড়া কড়া প্রশ্ন করে কী লাভ! সেই পরিপক্বতাই তো নিশ্চয়ই আসেনি এখনও।
তিন) যতই দাবার বোর্ডে ঝড় তুলুক, যতই বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে ধরাশায়ী করে চমকে দিয়ে থাকুক, সহজ-সরল ভাবে কয়েকটা কৌতূহলের জবাব পেলেই চলবে। কী ধরনের প্রশ্ন?
যেমন, ধরা যাক তোমার স্কুলের জীবনটা কেমন ছিল? দাবায় হাতেখড়ি হল কী ভাবে? তার পর হ্যাঁ, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর বিশেষ কৌশল কী ছিল? বিশ্বের এক নম্বরকে হারানোর প্রতিক্রিয়া, প্রভাব কী ছিল কিশোর মনে?
কে জানত, দাবার বোর্ডে অকস্মাৎ যে ভাবে ঝড় তোলে বালক, সে ভাবেই সমস্ত প্রশ্নপত্র ঘেঁটে দিয়ে যাবে। আলাপচারিতা যত এগোল, দ্রুতই প্রাক-ইন্টারভিউ ধারণাগুলো সংশোধন করতে করতে চলতে হল।
যেমন, তার বয়স ১৬।
ভুল।
সার্টিফিকেট যতই বলুক ১৬, আসলে মস্তিষ্কের বয়স কমপক্ষে ৩৬। না হলে ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর প্রভাব কী জানতে চাওয়ায় কোনও কিশোর অমন গড়গড় করে বলে দিতে পারে, ''ওই জয় দুটো আমাকে বুঝিয়েছে, বড় মঞ্চে আমার উন্নতি হচ্ছে। বুঝিয়েছে, আমি পারব।'' এত আত্মবিশ্বাস এই বয়সেই! সত্যি ইন্টারভিউ চলছে নাকি কল্পকাহিনি!
আচ্ছা, সংশোধন নম্বর দুই— বালকের কাছ থেকে পরিণতবোধ আশা করা উচিত হবে না।

দিদি বৈশালী এবং মা নাগলক্ষ্মীর সাহচর্যই লড়াই করার সাহস দেয় প্রজ্ঞাকে

একদম ডাহা ফেল। কারণ, যাবতীয় হোমওয়ার্ক আর প্রশ্নপত্রকে টপাটপ দাবার ঘুঁটি খাওয়ার মতো উড়িয়ে দিল সে। বলে দিল, ম্যাগনাস কার্লসেন বলেই আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে কে বলল! আমি প্রতিপক্ষ দেখে নিজেকে তৈরি করি না!

বলে কী? এ ছেলের বয়স ১৬! সকালে স্কুলে যায় আর রাতে দাবার বোর্ডে বসে ইন্দ্রপতন ঘটায়! কেউ বিশ্বাস করবে!

নোটপ্যাড খুলে দেখলাম পরের লাইন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে বালক নিশ্চয়ই আপ্লুত।

ধুর, ধুর, একদম ভুল।

কথাবার্তা শুনে বরং মনে হবে, বাকি বিশ্ব যে তার বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারানোটা অঘটন মনে করে, সেটাই সে বিশ্বাস করে না। বরং যেন, খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এমনটাই যেন হওয়ার ছিল। 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' স্লোগানে বিশ্বাসই করে না চেন্নাইয়ের কিশোর। ভণিতা-টনিতা না করে সটান বলেই দিল, "আমার স্বপ্ন, লক্ষ্য যা-ই বলুন না কেন, বিশ্বের এক নম্বর হওয়া। অন্য কিছু নিয়ে ভাবি না।" অর্থাৎ, পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া যে, শুনুন, দু'নম্বর-টম্বর হওয়ার জন্য পৃথিবীতে আসিনি।

কে বলছে? না, ১৬ বছরের এক কিশোর। সচিন তেন্ডুলকরের পুরনো একটা ভিডিয়ো চোখের সামনে ভেসে উঠল। সচিনের প্রথম বড় সাক্ষাৎকার। তখন তিনি ১৬ বছরের বিস্ময় বালক। স্কুল ক্রিকেটে বিনোদ কাম্বলির সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড গড়ে এসেছেন। ব্যাটিং গড় এক সময় এক হাজার ছিল (ভুল লেখা হয়নি, এক হাজারই)। সারদাশ্রম স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ক্রিকেট মহলে। গুরু রমাকান্ত আচরেকরের সাক্ষাৎকার নিতে ছুটে আসছে দেশ-বিদেশের মিডিয়া। তখনও সোশ্যাল মিডিয়া আসেনি। টুইটার, ফেসবুক নামক গনগনে গণমাধ্যম ছিল না যে, কারও বারান্দায় বা ছাদে নেওয়া দুরন্ত কোনও শটও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যেতে পারে।

সেই সময়, ১৯৮৯-এ ঝাঁকড়া চুলের কিশোর সচিনের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন অভিনেতা টম অল্টার। ইউটিউবে গেলে এখনও পাওয়া যায় সেই সাক্ষাৎকার। টম প্রথম প্রশ্নই করেছিলেন, "এই যে এত অল্প বয়সে তোমাকে ঘিরে এত লোকের উন্মাদনা, সারাক্ষণ সকলের নজরে তুমি— কতটা চাপ পড়ছে মনের উপরে?" একটুও না ভেবে, ঝাঁকড়া চুলের মাথা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে জবাব দিল, "না, না। আমার ভালই লাগছে। আর আমার মনে হয়, এ তো সবে শুরু।" তখন বিস্ময় বালককে ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিয়ে যাওয়া হবে কি না, তা নিয়ে উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট। টমের ফের প্রশ্ন, "যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিয়ে যাওয়া হয়, তুমি কি খুশি হবে? নাকি মনে করছ আরও অপেক্ষা করার দরকার?" সচিনের স্ট্রেট ড্রাইভ, "অবশ্যই আমি খুশি হব।"

"আমার স্বপ্ন, লক্ষ্য যা-ই বলুন না কেন, বিশ্বের এক নম্বর হওয়া। অন্য কিছু নিয়ে আমি ভাবি না।" — প্রজ্ঞানন্দ

পরিবারের সঙ্গে একান্তে খুদে প্রতিভা

প্রজ্ঞার মগজাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনও

আনন্দের মতোই কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু মন রয়েছে প্রজ্ঞানন্দের। আর সেই আগ্রহ শুধু দাবার বোর্ডেই সীমাবদ্ধ নেই।

টম: মনে হয় না, তুমি খুব বাচ্চা?
সচিন (শিশুসুলভ হাসি নিয়ে): না।
টম: অ্যামব্রোজ খুব ফাস্ট, ওয়ালশ খুব ফাস্ট। তাদের খেলতে ভয় করবে না?
সচিন (মুহূর্তে যেন শক্ত চোয়াল): না, না। আমি ফাস্ট বোলারদের খেলতে পছন্দ করি।
টম (অবাক হয়ে) কেন?
সচিন (ভীষণ প্রত্যয়ের সঙ্গে): কারণ, ফাস্ট বোলারদের বলটা খুব ভাল আমার ব্যাটে আসে!

বিস্ময় প্রতিভারা বোধহয় এ জন্যই আলাদা হয়। খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁদের শরীরে রক্তের মতোই বাহিত হয় চ্যাম্পিয়নের আত্মবিশ্বাস যে, আমি এই পৃথিবীতে জিততে এসেছি। অন্যদের জয় দেখে সময় কাটাতে আসিনি।

এর পরেই পাকিস্তানে অভিষেক ঘটে সচিন রমেশ তেন্ডুলকরের। তেত্রিশ বছর পরে ভারতীয় খেলাধুলোর আকাশে উদিত নতুন এক বিস্ময় বালক। ক্রিকেটে নয়, দাবায়। এক জন মুম্বই থেকে, অন্য জন চেন্নাইয়ের। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। যাকে নিয়ে বিশ্বের দাবা মহলও এই মুহূর্তে উত্তাল, সেই প্রজ্ঞানন্দকে মনে করা হচ্ছে শুধু ভারতীয় খেলাতেই নয়, বিশ্বমঞ্চে ঝকঝক করার মতো নতুন হিরে। প্রজ্ঞানন্দ— নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে অনেকে হোঁচট খান। ইংরেজি বানানটাও বেশ কঠিন, ১৪টি বর্ণ রয়েছে। কিন্তু ১৬ বছরের কিশোরের ‘প্রজ্ঞা’-য় রয়েছে নামের সার্থকতা।

মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক যদি হয় ভারতীয় ক্রিকেটের তাজমহল-ফতেপুর সিক্রি, তা হলে চেন্নাই নিশ্চিত ভাবেই দাবার রাজধানী। দেশের ৭৪ জন গ্র্যান্ডমাস্টারের ২৬ জন চেন্নাইয়ের। যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম অবশ্যই বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার ভিশি। দেশের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারও চেন্নাই থেকে। ম্যানুয়েল অ্যারন— যাঁকে অনেকেই দাবার পথিকৃৎ মনে করেন। সেই কোন ১৯৬১-তে আইএম হয়েছিলেন অ্যারন। এশিয়ার এক নম্বর ছিলেন। জাতীয় প্রতিযোগিতা জেতেন মোট ন’বার। তার মধ্যে টানা খেতাব ছিল পাঁচ বার। খেলা ছাড়ার পরেও প্রিয় খেলায় অবদান রাখতে থাকেন অ্যারন। দাবার স্কুল খোলেন। আর সেখানে এক ৯ বছরের বাচ্চাকে দেখে নড়েচড়ে বসেছিলেন তিনি। বালকের অনুসন্ধিৎসা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন অ্যারন স্যর। রোজ ক্লাসে এসে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলত স্যরকে। সেই ছেলের নাম? বিশ্বনাথন আনন্দ। যিনি পরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবেন।

আনন্দ দাবাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে ফুলটাইম দাবাড়ু হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আর চেন্নাইয়ের নতুন রত্ন প্রজ্ঞানন্দ নিজেই হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় এক তারকা। তা-ও আবার কি না মাত্র ১৬ বছর বয়সে! বিমানবন্দরে, হোটেলে, রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখে লোকে ফিসফাস করে ওঠে, “দ্যাখ দ্যাখ, প্রজ্ঞানন্দ।” অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দেয় অনেকে, নিজস্বী তোলার আবদার রাখতে হয়। ক্রিকেট-মত্ত দেশে আনন্দের পরে আর কোনও দাবা খেলোয়াড়কে নিয়ে এমন আগ্রহ দেখা যায়নি। প্রজ্ঞানন্দের কোচ রমেশ এক বার বলেছিলেন, “ভারতে এখনও ততটা জনপ্রিয় নয় দাবা। সেই খেলায় ১৬ বছরের এক কিশোর এতটা জনপ্রিয় হয়েছে দেখলে বলতেই হবে, সেই ছেলে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন কেউ।”

আনন্দের মতোই কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু মন রয়েছে প্রজ্ঞানন্দের। আর সেই আগ্রহ শুধু দাবার বোর্ডেই সীমাবদ্ধ, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তামিলনাড়ুতে ভোটের ফল কী দাঁড়াল, তা দেখার জন্য ভোরবেলায় উঠে টিভির সামনে বসে পড়ত কিশোর।

বিশ্বের যে প্রান্তেই এখন আনন্দ খেলতে যান না কেন, তাঁকে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে— আপনার দেশের এই প্রজ্ঞানন্দ ছেলেটি কতটা প্রতিভাবান বলে মনে করেন? আনন্দ কী উত্তর দেন সেই প্রশ্নের? “আমার চেয়েও প্রতিভাবান,” বলতে শোনা গিয়েছে ভারত থেকে প্রথম দাবার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করা কিংবদন্তিকে। আনন্দ নিশ্চয়ই জানবেন। সত্যিই তো এমন সব কীর্তি ইতিমধ্যেই গড়ে ফেলেছে প্রজ্ঞানন্দ, যা সেই বয়সে তাঁরও ছিল না। ২০১৬-তে বিশ্বের সবচেয়ে কমবয়সি আইএম হন প্রজ্ঞানন্দ। মাত্র ১০ বছর ৯ মাস বয়সে। ১৯৮৮-তে আনন্দ প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন ১৮ বছর বয়সে। কিন্তু দেশের কনিষ্ঠতম এবং বিশ্বের

নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসই সেরা শক্তি খুদে দাবাড়ুর

দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টারের মুকুট এখন প্রজ্ঞার মাথায়। তার বয়সে ফ্যান্টাসি গেমে বুঁদ হয়ে থাকে বেশির ভাগ কিশোর। আর প্রজ্ঞানন্দ কি না তারকাদের গ্রহে শুধু ঢুকেই পড়েনি, গোটা দাবা দুনিয়া তাকে নিয়ে কৌতূহলী। তার বয়সে ছুটে বেড়ায় দামাল মন। আর প্রজ্ঞানন্দ কি না মগ্ন সাধকের মতো গালে হাত দিয়ে বসে ভাবে, পরের চালেই কী করে মাত করে দেওয়া যায় উল্টো দিকে বসে থাকা দুঁদে বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে। তার বয়সে দস্যিপনায় বাড়ির চাতাল মাতায় কিশোরেরা। আর প্রজ্ঞানন্দ কি না এমন একটা খেলা বেছে নিয়েছে, যেখানে সফল হতে গেলে ধীরস্থির, শান্ত, অবিচল থাকতে হবে। ব্রত নিতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া খুলেও দেখব না। কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া মানেই পুরো সময়টা টুইটার, ফেসবুক থেকে দূরে থাকতে হবে। কার পরামর্শে এমন অনুশাসন? না, আনন্দ স্যারের।

এ সব দেখে কে বলবে, প্রজ্ঞানন্দের যাত্রা শুরুই হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তাকে বড় দাবাড়ু হিসেবে গড়ে তোলার কোনও ইচ্ছেই ছিল না পরিবারের। প্রজ্ঞানন্দের বাবা রমেশবাবু পোলিয়ো আক্রান্ত হয়েও জীবনের রাস্তায় হার না মানা এক যোদ্ধা। সম্ভবত তাঁর থেকেই জায়ান্ট কিলার মনোভাব পেয়েছে ছেলে প্রজ্ঞানন্দ। তামিলনাড়ু স্টেট কো-অপারেশন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রমেশবাবুর এমনিতে দাবা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। প্রজ্ঞার দিদি বৈশালীকে প্রথমে দাবায় দিয়েছিলেন তিনি, মেয়ের অতিরিক্ত টিভির নেশা দূর করার জন্য। সেই দেখাদেখি প্রজ্ঞাকেও ভর্তি করে দেন দাবা ক্লাসে। তখন কি আর তিনি ভাবতে পেরেছিলেন, টিভি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে যে খেলার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, সেই দাবা বোর্ডই এক দিন জীবন পরিচালনা করবে তাঁদের গোটা পরিবারের! তাঁদের পরিবারকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে দাবা? উদাহরণ দেওয়া যাক। বছরের বেশির ভাগ সময়ে বৈশালী (এখন দিদিও গ্র্যান্ডমাস্টার) এবং প্রজ্ঞানন্দকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। নানা প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য। সঙ্গ দেন মা নাগলক্ষ্মী। বাবাকে তাই বছরের বেশির ভাগ সময় একা-একাই থাকতে হয় আর শারীরিক বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হয়। প্রজ্ঞা যত দেশে গিয়েছেন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে, নিজে ততটা ঘুরে দেখার সুযোগ পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বার সাফারিতে গিয়েছিলেন শুধু। বাকি অভিজ্ঞতা বলতে এদিক-ওদিক শপিংয়ে বেরিয়ে ফ্রিজ় ম্যাগনেট নিয়ে ফেরা।

বৈশালীকে প্রথমে দাবায় দিয়েছিলেন রমেশ, মেয়ের টিভির নেশা দূর করতে। তার পর প্রজ্ঞাকেও ভর্তি করে দেন দাবা ক্লাসে।

দক্ষিণ ভারতের খেলোয়াড়েরা অনেকেই নিজেদের পরিচিত খাবারের বাইরে খুব একটা বেরোতে চান না। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় যেমন আবিষ্কার করা গিয়েছিল, ক্রিকেটার অশ্বিনের জন্য দক্ষিণ ভারতীয় রান্না করে খাওয়াচ্ছেন তাঁর মা। প্রজ্ঞানন্দের ক্ষেত্রেও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে চলে মায়ের রান্নাঘর। তাঁর হাতের রান্না করা রসম-রাইস, সম্বর-রাইস বা কার্ড রাইস খেয়েই কার্লসেনদের মাত করতে বসে প্রজ্ঞা। মায়ের ট্রাভেল ব্যাগে থাকবেই থাকবে রাইস কুকার। কার্লসেনের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মহাতারকাকে দু'বার হারিয়ে হইহই ফেলে দিলেও বা বিশ্বনাথন আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জিতে নিলেও, এখনও চ্যাম্পিয়নদের সমুদ্রে প্রজ্ঞানন্দ নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাই খরচের দিকটাও ভাবতে হয়। হোটেলের খাবার মানেই খরচের হ্যাপা, এটাও তাঁর মধ্যবিত্ত পরিবারের মাথায় থাকে। এই মধ্যবিত্ত অনুশাসন আজীবন সঙ্গী থেকেছে সচিন তেন্ডুলকরের। প্রজ্ঞার কথাবার্তা শুনেও এক ঝলকে মনে পড়ে যাবে তেন্ডুলকর পরিবারের সেই মুখগুলো। দুই বিস্ময় বালকের মধ্যে আরও একটা বড় মিল আছে। বিরল প্রতিভাবান হয়েও শুধু প্রতিভার উপরে নিজেদের ছেড়ে না দেওয়া। সচিনের মতোই প্রজ্ঞানন্দও পরিশ্রমে বিশ্বাসী। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। ওই যে বলে না, প্রতিভা তোমাকে ব্রিজের কাছেই নিয়ে যেতে পারবে। ব্রিজ পেরোতে চাই পরিশ্রম। আর উড়ান ধরার স্বপ্নই যদি না দ্যাখো, তা হলে চ্যাম্পিয়নের আকাশে উড়বে কী করে! তাই কিশোর চোখে স্বপ্ন থাকাও জরুরি। প্রজ্ঞানন্দকে যেমন জিজ্ঞেস করুন, এত ট্রাভেল করো, বিশ্বের কোন কোন দেশ ঘোরা হয়ে গেল? বলতে পারবে না।

৪৪তম চেজ় অলিম্পিয়াডে প্রজ্ঞা

স্কুলে প্রজ্ঞার হাতেগোনা কয়েক জন বন্ধু। কেন? ‘‘দাবার বোর্ডে বুঁদ হয়ে থাকে বন্ধুত্ব করবে কখন?’’ বলেছিলেন কোচ।

উত্তর মিলবে, ‘‘আমি কখনও গুনিনি। হিসেব রাখি না।’’ নানা দেশে উড়ে বেড়ানোটাই যে চ্যাম্পিয়নের জীবনের অঙ্গ। মহম্মদ আলির সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘‘যে মানুষটা স্বপ্ন দেখতে পারে না, তার কোনও ডানা নেই। সে উড়বে কী করে!’’

দাঁড়ান, এখানেই শেষ নয়। আরও মিল আছে। দু’জনেই নিজের বাড়ির মধ্যে পেয়ে গিয়েছে সেরা পথপ্রদর্শক। সচিনের জীবনে যেমন ছিল দাদা অজিত তেন্ডুলকর, তেমন প্রজ্ঞানন্দের জীবনে বৈশালী। তফাতটা হচ্ছে অজিত তেন্ডুলকর নিজে না খেললেও দারুণ ভাবে বুঝতেন সচিনের ক্রিকেট। ওয়াংখেড়েতে তাঁর বিদায়ী ইনিংসেরও দুর্দান্ত বিশ্লেষণ ভাইয়ের কাছে করে দিয়েছিলেন অজিত। কিন্তু প্রজ্ঞার দিদি বৈশালী নিজেও যথেষ্ট ভাল দাবা খেলোয়াড়। ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার এবং মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। ভাইয়ের সর্বক্ষণের দাবা-সঙ্গী। ‘মেন্টর’ আনন্দের সঙ্গেও যখন ক্লাস চলে, দিদি-ভাই থাকে একসঙ্গে। কোচ আর বি রমেশের দাবা গুরুকুলে প্রজ্ঞা সাড়া ফেলেছে অন্য একটি খেলার জন্যও। বিরতি হলেই ছাদে গিয়ে টেবল টেনিস ম্যাচ শুরু করে দেয়। কোচ রমেশও পারেন না ছাত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তবু খুব বেশি বন্ধুর খোঁজ পাওয়া যায় না প্রজ্ঞার জীবনে। চেন্নাইয়ের ভেলাম্মাল স্কুল বা নিজেদের এলাকায় হাতেগোনা কয়েক জন বন্ধু। কেন? ‘‘এতটাই দাবার বোর্ডে বুঁদ হয়ে থাকে যে, বন্ধুত্ব করবে কখন?’’ বলেছিলেন কোচ আর বি রমেশ। মাঝরাতেও চলে তার দাবা হোমওয়ার্ক। দাবা খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ ছাড় দেয় তার স্কুল। তাই রোজ সকালে ওঠার তাড়া নেই বলে রাত জেগেই চলে নিজের

দক্ষিণী তারকা রজনীকান্তের সঙ্গে

দাবা ক্লাস। আনন্দ তো এক বার তাকে সরাসরি পরামর্শই দিয়ে বসেছিলেন, ‘‘এ বার একটু রিল্যাক্স করতেও শেখো। চ্যাম্পিয়নদের জন্য সেটাও জরুরি। বন্ধু তৈরি করতে শেখো, যাতে খেলা যখন থাকবে না, সময়টা ভাল কাটে।’’ কিন্তু মেন্টরের পরামর্শ এখনও শুনে উঠতে পারেনি ছাত্র। বরং চেন্নাইয়ের দাবামহলে রসিকতাই আছে, প্রজ্ঞা যখন দাবা খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে ওঠে তখন কী করে? উত্তর, আরও দাবা খেলে!

গুরু বিশ্বনাথন আনন্দও মনে করেন, তাঁর চেয়ে বেশি প্রতিভাধর ১৬ বছরের বিস্ময়-বালক

কার্লসেনের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারানো কতটা পরিবর্তন আনছে তোমার মধ্যে? ইন্টারভিউতে প্রশ্নটা করে যে উত্তর পেতে হয়েছিল, রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। ভেবেছিলাম, ওইটুকু ছেলে বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছে। বিমানবন্দর থেকে শপিং মল— যেখানে যাচ্ছে, মুহূর্তে জনতা ঘিরে ধরছে। এত অল্প বয়সে এই 'স্টারডম' সামলাবে কী করে?

আবার বোকা বনতে হয়েছিল কারণ, শীতল মস্তিষ্ক উত্তর দিয়েছিল, ''মানুষ হিসেবে আমার মধ্যে একেবারেই কোনও পরিবর্তন আনছে না এই জয়। খেলোয়াড় হিসেবে আনছে কারণ ওই জয়গুলো আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, নিজেকে বলতে শেখায় যে, আমি যে কাউকে হারাতে পারি। দাবার যাত্রাপথে এই অনুভূতি, বিশ্বাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'' শুনতে শুনতে ফের প্রশ্ন জেগেছিল, এ ছেলের বয়স ১৬? এখনই তার ভাবনায় এত গভীরতা!

প্রশ্ন করেছিলাম, প্রজ্ঞানন্দকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন অনেক বেশি ভাববে। অনেক হোমওয়ার্ক করে নামবে। কী ভাবে তাদের সামলাবে? ফের সেই প্রজ্ঞা মেশানো জবাব, ''আমি প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশি ভাবব না। নিজের খেলার শক্তি, দুর্বলতার উপরেই মনোনিবেশ করতে চাই। নিজের খেলার উপর বিশ্বাস রেখে এগোতে চাই।'' তার মন্ত্র কী? ''নিজের সেরাটা দাও। তার পর অপেক্ষা করে দ্যাখো কী ঘটে''— এক চালে মাত করার মতোই বলে দিল খুদে প্রতিভা। মানে এত অল্প বয়স থেকেই মাথার মধ্যে গেঁথে ফেলেছে যে, প্রতিপক্ষকে নিয়ে অযথা বেশি ভেবে নিজের ঘুম নষ্ট করব না। পৃথিবীটা আমার, এখানে আমি শাসন করতে এসেছি। তাই শাসকের মতো ভাবব, শাসিতের মতো মিনমিন করব না। মনে পড়ছিল, ১৬ বছরের সচিনের সেই টম ওয়াল্টারকে বলা কথাগুলো, ''আমি ফাস্ট বোলারদের খেলতে পছন্দ করি কারণ ফাস্ট বোলারের বলগুলো খুব ভাল ব্যাটে আসে।'' চ্যাম্পিয়নদের পৃথিবী বোধ হয় এমনই হয়। যেখানে ভয় বলে কিছু থাকে না, থাকে শুধু দুর্গম গিরি জয় করার অদম্য দুঃসাহস!

আনন্দ তো এক বার তাকে সরাসরি পরামর্শই দিয়ে বসেছিলেন, ''এ বার একটু রিল্যাক্স করতেও শেখো...''

নতুন প্রতিভার উত্থানের কথা বলতে গিয়ে দাবার সঙ্গে যুক্ত জাতীয় স্তরের কয়েক জনের মনে পড়ে যাচ্ছে ন'বছর আগের একটি দৃশ্য। সাল ২০১৩। দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছে চেন্নাইয়ের হোটেলে। মুখোমুখি বিশ্বনাথন আনন্দ এবং ম্যাগনাস কার্লসেন। সাত বছরের এক কিশোর ঘুরঘুর করছে হোটেলের লবিতে। আর যাকে দেখছে বলছে, ''আমিও একদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হব!''

তত দিনে দিদির সঙ্গে দাবা খেলতে শুরু করেছে বালক। কিন্তু কে আমল দেবে তার কথায়! কে ভাবতে পেরেছিল, সে দিন আনন্দের চ্যালেঞ্জার, পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন একদিন ভূপতিত হবেন ওই বাচ্চার সামনে।

সে দিন চেন্নাইয়ের হোটেলের লবিতে ঘুরঘুর করা সেই সাত বছরের বালক? প্রজ্ঞানন্দ। ১৬ বছরে পা দিয়ে, দু'বার কার্লসেন-বধ করে যিনি আরও জোরের সঙ্গে, আরও চোয়াল শক্ত করে প্রত্যয় নিয়ে বলছেন, ''বিশ্বের এক নম্বর হতে চাই।'' আজ কে না আমল দেবে তার কথায়? কে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে বালকের দিবাস্বপ্ন বলে!